শেষ প্রান্তর
নসীম হিজাযী

# শেষ প্রান্তর

নসীম হিজাযী

অনুবাদঃ
সৈয়দ আবদুল মান্নান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা।

## এক

আরবের মরুপ্রান্তর থেকে উৎসারিত হলো ইসলামের নির্ঝর ধারা। যে ঊষর মরুপ্রান্তরের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোন সফরকারীর নজর পড়েনি, পরবর্তী যুগে তা হয়ে উঠলো সারা দুনিয়ার দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জমান মানবতা যে আলোর দিশারী সূর্যের প্রতীক্ষা করছিলো, তার উদয় হলো ফারান গিরিশিখরে।

যেদিন আমেনার অন্তরের নিধি, আবদুল্লার পুত্র ও আবদুল মুত্তালিবের পৌত্রের মুহাম্মদ নামকরণ করা হোল, সেদিন দুনিয়ার মানচিত্র এক নতুন রঙে বিচিত্রিত হল। আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার কওম সমূহের পথ নির্দেশের অধিকার অর্পণ করলেন আরব জাতির উপর, ঐতিহাসিক সেদিন রচনা করলেন দুনিয়ার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়। রহমতের ফেরেস্তা সেদিন গোলামী ও অজ্ঞতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মযলুম মানবতার কানে পৌঁছে দিলেন আযাদী, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মহাপয়গাম।

আরবের মরুচারী মানুষ সেদিন লাত ও হোবলের মূর্তি চুরমার করে দুনিয়ার কাছে রহমতের মেঘরূপে দেখা দিল। তাদের শক্তি দুনিয়ার সকল শক্তিকে পরাভূত করলো। তাদের তাহ্‌যীব, তাদের তমদ্দুন, তাদের আখলাক দুনিয়ার সব তাহ্‌যীব তমদ্দুন ও আখলাকের উপর হোল বিজয়ী। দুনিয়া থেকে দ্বন্দ্ব-কলহের বৃক্ষমূল উৎপাটন করে তারা মানবতার বাগিচায় আপন রক্তের বিনিময়ে সৌহার্দ্য ও শান্তির বৃক্ষ রোপন করে তার মূলে পানি সিঞ্চন করতে লাগলো কুফ্‌রের অন্ধকার দুপুরের ছায়ার মতো সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল। সীজার ও খসরুর স্বৈরাচারের মহল তখন মিস্‌মার হয়ে গেছে। ইসলামের বীর যোদ্ধাদের বিজয় নিশান একদিকে আলবুর্জের তুষারমণ্ডিত গিরিশিখরে, অপরদিকে আফ্রিকার খৈ-ফোটা তপ্ত বালু-প্রান্তরের হাওয়ায় দুলছিল। একই সময়ে তাদের বিজয়ী অশ্ব পূর্বে হিন্দুস্থান ও পশ্চিমে স্পেনের দরিয়ার পানি পান করছিল। তেরশো বছর পর আজও ঐতিহাসিক অবাক-বিস্ময়ে প্রশ্ন করেনঃ আরবদের তেজী ঘোড়ার গতি কি এমন অসাধারণ ছিল, না আল্লাহ্‌তা'আলা তাদের সামনে জমিনকে সংকুচিত হতে শিখিয়েছিলেন?

এছিল ছিল এক বিপ্লব-এক আলোকপ্লাবী ইনকিলাব! আল্লাহ্ পাক আরবের প্রতি বালুকণাকে দিয়েছিলেন সিতারার দীপ্তি এবং সে বালুকণাগুলোকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দুনিয়ার অন্ধকারতম কোণে কোণে।

ছয়শ' বছর পরে আবারো এল এক ইনকিলাব। এক অন্ধকার ইনকিলাব! সম্ভবতঃ ইসলামের চেরাগ কয়েক শতাব্দী ধরে যে অন্ধকারের পিছু ধাওয়া করেছিল, চারদিক থেকে তা সংকুচিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল গোবী মরুভূমির বুকে। আরবের পানি যে আগুনের হলকা নিভিয়ে দিয়েছিল, হয়তো তা গোবীর শান্ত বালুর তলায় আত্মগোপন করে ধিকিধিকি জ্বলছিল। সে আগুন হয়তো

ছয়শ' বছর ধরে প্রতীক্ষা করেছে, কবে ইসলামের বাগিচা-রক্ষকরা ঘুমে ঢুলে পড়ে। আসলে ইসলামের বাগিচা-রক্ষকরা দীর্ঘযুগ ধরে ছিল তন্দ্রায় অভিভূত, কিন্তু কুফরের আগুন ছয়শ' বছর শুধু একটি কারণে আত্মগোপন করেছিল। ইসলামের গোড়ার যুগের মুজাহেদীনের শৌর্যবীর্যের কাহিনী তখনো সে আগুনের উপর পানি বর্ষণের কাজ করছিল। তখনও ইসলামের দুশমনদের চোখে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অন্তঃসারশূন্য মহল ছিল অপরাজেয় কেল্লার শামিল। তাদেরই পূর্বপুরুষরা একদিন দুনিয়ার বড় বড় প্রতাপশালী বাদশার শাহী তাজ তাঁদের পায়ের তলায় পিষে দিয়েছিল। জুলুম ও নির্যাতনের অভিযান চালিয়ে যাবার যে আকাঙ্খা প্রায় ছয়শ' বছর রোম ও ইরানের ধ্বংসস্তূপের তলায় ঘুমিয়েছিল, গোবীর এক মরুচারীর ভিতরে আবার তা নিলো নতুন রূপ। গোবীর এই মরুচারী দুরন্ত মানুষটি ছিলেন তেমুজিন। ইতিহাসে তাঁর খ্যাতি রয়েছে চেংগিস খান নামে। দুনিয়ার এই দিগ্বিজয়ী বীরের সৌভাগ্যের কিশ্‌তি ব'য়ে চলেছিল খুনের দরিয়ার উপর দিয়ে। অন্ধকারের ঝড় নিয়ে তিনি এগিয়ে গেছেন দেশ-দেশান্তরে। এই চেংগিস খানের নেতৃত্বে মঙ্গোলিয়ার বর্বর বাহিনী জেগে উঠেছিল দুরন্ত ঝড়ের মতো, সভ্যতার দীপশিখা একটি একটি করে নিভিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তামাম দুনিয়ার চারদিকে। ছয়শ' বছর আগে আরব মরু থেকে উঠে এসেছিল যে মেঘছায়া, তা মানবতার বাগিচার উপর বর্ষণ করেছিল রহমতের বারিধারা। আর ছয়শ' বছর পর গোবীর মরুবুক থেকে উঠলো যে দুরন্ত অন্ধকার ধূলিঝড়, তা থেকে বারিবর্ষণ হলো না। হলো অগ্নিগিরির ধূম-উদ্‌গীরণ। সেই ধূম্রমেঘের আবরণ তলে ছিল দুরন্ত আগুনের লাভা প্রবাহ। তা এগিয়ে চলল দুর্দমনীয় গতিতে কত শহর কত বস্তি জ্বালিয়ে নাস্ত-ও-নাবুদ ক'রে। বাবেল, নিনোয়া, পম্পিয়াইর ধ্বংসস্তূপের রূপ দেখে মানুষ প্রকৃতির ধ্বংসতান্ডবের ভয়াবহতায় নির্বাক হয়ে যায়, কিন্তু তাতারী অগ্নিঝড়ের সামনে সে ভয়াবহতার রূপও হয়েছিল নিষ্প্রভ।

●

সভ্য দুনিয়ার কাছে চেংগিস খানের সেনাবাহিনীর যুদ্ধপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। দুনিয়াটা তাঁর কাছে ছিল এক বিস্তীর্ণ শিকারভূমি। গৃহহীন তাতারদের ঘোড়ার কমতি ছিল না। ভেড়া-বকরী ছাড়া ঘোড়ার গোশ্‌ত দুধ খেয়ে হত তাদের দিন গুযরান। আরও তারা খেতো বনের যে কোনো জানোয়ারের গোশ্‌ত। গোবী মরুভূমির বুকে না ছিল শহর, না ছিল বস্তির নামনিশানা। কোথাও খানিকটা বৃষ্টি হলে অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হত এই ঘরছাড়াদের দল। তাদের জানোয়ারগুলো যতক্ষণ ঘাসের শেষ শীষটি পর্যন্ত খেতে পেতো, ততক্ষণ তারা থেকে যেত সেখানেই। এক মুসাফির হয়তো এসে খবর দিতো, অমুক জায়গায় পড়েছে ছিটে ফোটা বৃষ্টি, অমনি তারা আবার সেই দিকেই চলে যেত। কখনও কখনও বা নতুন চারণভূমি খুঁজতে গিয়ে এক দলের সাথে লাগতো আরেক

দলের লড়াই। শক্তিমান দল ছিনিয়ে নিয়ে যেত কমজোর দলের জানোয়ারগুলোকে শুধু তাই নয়, তাদের পুরুষ-নারীকে তারা বানিয়ে রাখতো তাদের গোলাম। তাই কমজোর দলগুলো নিজেদের হেফাযতের জন্য একত্র হয়ে বেছে নিতো কোন শক্তিমান লোককে তাদের সরদার বানাবার জন্য। শীতের দিনে উত্তরে হাওয়া বইতে শুরু করলে তামাম এলাকাটা হয়ে যায় মৃত্যুর মত তুহিন-শীতল। বালুর বিছানার উপর ছেয়ে যায় বরফের চাঁদর। খোরাক না পেয়ে জানোয়ারগুলোর দুধ যায় শুকিয়ে। তখনও তারা দিন গুযরান করে গরমের দিনের রেখে দেয়া শুকনো গোস্ত খেয়ে। কখনও দুরন্ত মরু ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় তাদের খিমা। এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে তাদের জানোয়ারগুলো।

প্রকৃতির সাথে যাদের চিরন্তন সংগ্রাম, তারা স্বভাবতঃই হয়ে ওঠে কষ্টসহিষ্ণু। কোন কিছুরই পরোয়া করে না তারা। দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয় তারা ঘোড়ার পিঠে বসে। দিনের পর দিন উপবাসে থেকে লড়াই করে তারা।

চেংগিস খান বড় বড় সরদারকে দমন করে তাদেরকে করে নিয়েছিলেন তাঁর হুকুম-বরদার। গৃহহীন তাতারদের চোখের সামনে তিনি তুলে ধরতেন দেশ-দেশান্তরের কত রাজ্যের নকশা-যেখানে শ্যামল বাগবাগিচার সমারোহ, সবুজে ঢাকা ক্ষেত আর সদা-বসন্ত বিরাজিত চারণভূমি। লুটে বেড়াবার লোভ গৃহহারা মরুচারী দলকে এনে জমা করেছিল চেংগিস খানের ঝাণ্ডাতলে। তাতার মুলুকের আশেপাশে যে সব রাজ্য, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো তারা ক্ষুধিত ঈগলের মত। আয়েশ-আরামে জিন্দেগী কাটিয়েছে যে সব জাতি, তারা টিকতে পারেনি তাদের হামলার সামনে। কয়েক বছরের মধ্যে চেংগিস খানের সেনাবাহিনী উত্তর ও পূর্বদিকে কয়েকটি রাজ্য দখল করে বসলো। আশপাশের রাজ্যগুলো তাদের বিজয়ের গতি দেখে তখনও হয়রান। একই দিনে কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে এগিয়ে যায় তারা, আর সাথে সাথে এক জায়গা থেকে আরেক রাজ্যের উপর চালায় হামলা। সে রাজ্যের সৈন্যদল হামলাদারদের পথ রোধ করবার জন্য জমা হয় কোন সীমান্ত এলাকায়। চেংগিস খানের ফৌজের এক অংশ দাঁড়ায় তাদের মোকাবিলা করতে, আর বাকী সৈন্যরা নানান দিক দিয়ে রাজ্যের ভিতরে ঢুকে দখল করে শহর ও বস্তি, রাজ্যের শাসন-শৃংখলা দেয় অচল করে। কখনও বা তাতারী বাহিনীর অগ্রগতির খবর পেয়ে কোন রাজ্যের সিপাহসালার তাদের পথ রোধ করবার জন্য তাঁবু ফেলেন সীমান্তে। তাঁর চর এসে রোজ তাঁকে খবর দেয়, হামলাদারদের গতি তাদেরই দিকে। কিন্তু একদিন ভোরে হঠাৎ এক দূত খবর নিয়ে আসে, চেংগিস খানের বাকী সৈন্য অপর দিকের সীমান্ত পার হয়ে দারুল হুকুমাত দখল করে নিয়েছে।

তাতারদের বিস্ময়কর সাফল্যের মূলে ছিল তাদের গতি। ঘোড়ার নাংগা পিঠের উপর সওয়ার হয়ে তারা বেড়াত। প্রত্যেক সওয়ারের সাথে থাকত কয়েকটি ঘোড়া। একটা ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে সওয়ার আরেকটা ঘোড়ায় চড়ে বসত। হামলা করতে এগিয়ে যাবার পথে যখন ক্ষুধা অনুভব করত, তখনও সওয়ার খঞ্জর মেরে ঘোড়ার পিঠে যখম করে তা থেকে রক্ত চুষে খেতো। লম্বা

সফরের পথে তাতার খুব কম করে রসদ নিয়ে যেত। বনের মধ্যে তারা সাথের বাড়তি ঘোড়ার গোস্ত খেত। পথের শহর ও বস্তি থেকে জানোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে যেত তারা। কোন শহরে হামলা করলে শহরের বাসিন্দারা যদি বিনা বাধায় হাতিয়ার সমর্পণ করত, তাহলে যেসব লোক সৈনিক হিসাবে কাজ করতে পারবে, তাদের সবাইকে তাতারীরা হত্যা করত। তাদের প্রত্যেক সিপাহী বিজিত কওমের নারীর ইজ্জত নষ্ট করা তাদের অধিকারের শামিল মনে করত।

বাধা পাওয়ার পর কোন শহর জয় করলে বাড়ীঘরগুলোতে লাগানো হত আগুন আর হত্যা করা হত প্রত্যেকটি বাসিন্দাকে। প্রত্যেক ফৌজের জেনারেল সৈন্যদেরকে হুকুম দেন তাদের বিজয়ে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করতে, কিন্তু তাতারী সিপাহী কেবল নওজোয়ানদের নয়, বাচ্চা, বুড়ো আর নারী সবারই মাথা কেটে তৈরী করে দিত মিনার। যে ফৌজের মিনার যত বেশী উঁচু হত, তার অফিসার আর সিপাহীরা চেংগিস খানের কাছ থেকে পেত তত বেশী বাহ্বা। কখনও কখনও দুই সিপাহীর মধ্যে লাগতো ঝগড়াঃ 'অমুক মেয়ে বা পুরুষকে আমি খতম করেছি, তাই তার মাথা কেটে আনবার অধিকার আর কারুর নেই।' কখনও আবার দুই জেনারেলের মধ্যে ঝগড়া হতঃ 'তোমার এ মিনারের মাঝখানটা ফাঁকা, নইলে আমার ফৌজই আজ সব চাইতে বেশী মাথা কেটেছে।'

এ ছিল সেই কওম, যাদের হাতে আলমে ইসলামের ধ্বংস ভাগ্যলিপির শামিল হয়ে রয়েছিল। এই আলমে ইসলামের ধ্বংস এগিয়ে এসেছিল অনৈক্য ও কেন্দ্রচ্যুতির চরম পরিণতি হিসাবে। এ ছিল সেই মুসলমানদের ধ্বংস, যারা ছিল গাফলতের ঘুমে অচেতন; যারা আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্যের পরিবর্তে নিজের খেয়ালখুশি মোতাবেক তার ব্যাখ্যা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আধা-দুনিয়া বিজয়ী পূর্বপুরুষের তলোয়ার তখনও তাদের হাতে, কিন্তু পূর্ব পুরুষদের ঈমানের উত্তরাধিকার তারা হারিয়ে ফেলেছে।

মদীনা থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটি ছোট্ট বস্তি। সেখানকার মসজিদে ফযরের নামাযের পর কুরআন-হাদীসের দরস দিচ্ছেন শেখ আহ্‌মদ বিন্‌ হাসান। তাহির বিন্‌ ইউসুফ মসজিদে এসে প্রবেশ করলেন এবং শেখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

তাহিরের বয়স বাইশ বছরের কাছাকাছি। তাঁর দীর্ঘদেহ, সুডোল সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠব ও সুন্দর মুখমন্ডল তাঁকে দিয়েছিল অত্যুচ্চ মর্যাদা ও আকর্ষণ। ঈগলের মত তাঁর চোখের সতর্ক দৃষ্টিই ছিল তাঁর প্রতিভার প্রতিচ্ছায়া।

আহ্‌মদ বিন্‌ হাসান প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি তৈরী হয়ে এসেছ?

ঃ জি হ্যাঁ, আম্মাজানের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে এসেছি।

আহমদ বিন্‌ হাসান তাঁর শাগরেদদের বিদায় করে দিলেন। তারপর উঠে নওজোয়ানদের সাথে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

মসজিদের দরজার বাইরে শেখের এক ভৃত্য ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সফরের জরুরি মাল-পত্র তার পিঠে চাপানো। আহ্‌মদ বিন্‌ হাসান ঘোড়ার গর্দানের উপর চাপড় মারলেন। ঘোড়া গর্দান তুললে, কান খাড়া করে সামনের

পা দুটো মারতে লাগলো জমিনের উপর।

আহমদ বিন্ হাসান হাসিমুখে তাহিরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন ঃ তোমার ঘোড়া বলছেঃ রোদের তেজ বেড়ে যাচ্ছে, এখনই ওকে বিদায় করতে হবে। তাহির, আমার মনে এখন এমন কোন কথাই আসছে না, যা আমি তোমায় এর আগে বার বার বলিনি। বাগদাদ হবে তোমার চোখে এক নতুন দুনিয়া। সেখানে তোমার মত নওজোয়ানদের জন্য ভাঙা-গড়ার হাজারো রকম আসবাব মওজুদ রয়েছে। ইচ্ছা করলে তুমি সে বাগিচার কাঁটায় জড়িয়ে থাকতে পার, আবার ইচ্ছা করলে তার খোশবুদার ফুল তুলে ভ'রে নিতে পার তোমার কোঁচড়। বাগদাদ ভাল-মন্দের কেন্দ্রভূমি। কিন্তু আজকাল সেখানে মন্দের যত বাড়াবাড়ি, ভাল ততটা কম। তোমায় কত রকম তিক্ততার মোকাবিলা করতে হবে, অতিক্রম করতে হবে হতাশার বহু পর্যায়। কাজী ফখরুদ্দীন আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই তোমার জন্য অনেক কিছু করবেন এবং সম্ভবত তাঁর সাহায্যে তুমি খলিফার দরবার পর্যন্ত স্থান পাবে। খলিফার দরবারে তুর্কও ইরানী ওমরাহ্ শক্তিমান। তোমার পথ রোধ করবার সব রকম চেষ্টাই তারা করবে। কিন্তু তোমার কর্মক্ষমতার উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। এলমের গভীর দরিয়া তুমি অতিক্রম করে এসেছ। মদীনার শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক তোমার বুদ্ধিবৃত্তির কাছে মাথা নত করে। মোমেনের জিন্দেগীর দ্বিতীয় ঐশ্বর্য হচ্ছে সামরিক নৈপুণ্য। তলোয়ার নিয়ে খেলতেও তুমি জান। বর্তমান মুহূর্তে আলমে ইসলামের তোমার এলমের চাইতে বড়ো প্রয়োজন তোমার তলোয়ারের। বাগদাদে কাজী ফখরুদ্দীন হবেন তোমার শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। তাঁর মাধ্যমে তুমি হয়তো উচ্চ মর্যাদার অধিকার লাভ করবে। তখনও তোমায় মনে রাখতে হবে, পদমর্যাদার নেশা মানুষের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক। আল্লাহর খুশীকে খলিফার খুশীর উপর স্থান দিতে হবে এবং হামেশা খেয়াল রাখতে হবে, বাদশার বান্দা হবার জন্য নয়, আল্লাহর বান্দা হবার জন্যই তুমি পয়দা হয়েছ। সম্পদের দিক দিয়ে তুমি বাগদাদের শ্রেষ্ঠ আমীরদের মধ্যে গণ্য হবে। এইসব জওয়াহেরের ভিতর থেকে একটি হীরা আমি এক জওহরীকে দেখিয়েছিলাম। সে আমায় বলেছে যে, এর দাম দশ হাজার দিনারের কম হবে না। পাঁচটি বড় বড় হীরা আমি রেখে দিয়েছি। এগুলো আমার কাছে আমানত থাকবে। এ ছাড়াও ব্যবসায়ে আমি তোমার অংশ রেখেছি। তোমার আপত্তি না থাকলে এখানে আমি তোমার জন্য একটি বাগিচা খরিদ করবো।

নওজোয়ান বললেন ঃ আপনার কথা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছি। নইলে এতটা অর্থ সম্পত্তি সাথে নিয়ে যাবার প্রয়োজন আমি বুঝতে পারছি না।

শেখ বললেন ঃ এ ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। বাগদাদে গিয়ে তুমি বুঝতে পারবে যে, আমার কথাই ঠিক। হ্যাঁ, এসব দৌলতের চাইতে তোমার কাছে আরও বেশী দামী হচ্ছে সালাহ্উদ্দীনের তলোয়ার। তার হক আদায় করতে তুমি জান। এবার চল, তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমীন কোথায়?

সে আমার সাথে যাবার জন্য জিদ ধরেছিল, তাই নওকরের সাথে ওকে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে তাহির মোসাফেহা করবার জন্য শেখের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু শেখ মোসাফেহার বদলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নওজোয়ানকে গলা ধরে বুকে চেপে ধরলেন।

'বেটা আমার!' বৃদ্ধ আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন ঃ তুমি দূরে গেলে আমাদেরকে বহুত ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। আল্লাহ্ তোমার নেক ইরাদায় বরকত দিন।

আহ্‌মদের পাশে দাঁড়িয়ে নওজোয়ান 'খোদা হাফিয' বলে মোসাফেহার জন্য আবার হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু আহ্‌মদ বললেন ঃ তুমি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যাও।

নওজোয়ান ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। অমনি বৃদ্ধ শেখ গিয়ে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরলেন।

না, এ গোস্‌তাখি আমায় দিয়ে কখনও হতে পারে না বলে নওজোয়ান ঘোড়া থেকে নামবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃদ্ধ শেখ তাঁকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন ঃ বেটা! আমায় এক মুজাহিদের ঘোড়ার লাগাম ধরবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করো না। যদি সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এর ঘোড়ার লাগাম ধরে নিজের মাথা সৌভাগ্য গর্বে উন্নত করে থাকতে পারেন, তাহলে আমারও আজকের সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ অনুভব করা উচিত। বার্ধক্যে যদি আমার এ দুর্বল হাত তলোয়ার ধরতে না-ই পারে, তথাপি এখন তাতে তোমার ঘোড়ার লাগাম ধরবার মত কুওৎ আজো অবশিষ্ট রয়েছে। সৌভাগ্যবান সেই কওম, যার প্রতিটি ব্যক্তি যৌবনে তলোয়ার নিয়ে খেলা করে, আর বার্ধক্যে বাচ্চাদেরকে ঘোড়ার লাগাম ধরে ময়দানে জিহাদের রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

আহ্‌মদ বিন হাসান তাহিরের ঘোড়ার লাগাম ধরে বাগিচার বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তিনি আরও কিছু দূর হতে তাঁর সাথে যেতে চাইলেন, কিন্তু তাহির বললেনঃ আপনি আর বেশী তকলীফ করবেন না। আমায় এবার এজাযত দিন।

আহ্‌মদ বিন্ হাসান ঘোড়ার লাগাম তাহিরের হাতে ছেড়ে দিতে দিতে বললেনঃ তাহির! আমি শুনেছি, বাগদাদের গাছের ছায়া ভারী ঠাণ্ডা। ওখানে গিয়ে ঘুমিয়ে থেকনা যেন, বেটা! আর যায়েদের খেয়াল রেখ। ও ভারী সোজা মানুষ। বাগদাদের আমীরদের হুঁশিয়ার আর চালাক নওকরদের সাথে যেনো তার মোকাবিলা না হয়। ওর সরলতা কখনও মূর্খতার সীমানায় পৌঁছে যায়। কিন্তু ওর বীরত্ব ও বিশ্বস্ততা সব রকম ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করতে পারে।

তাহির বললেনঃ আপনি আস্থা রাখবেন, আমি ওকে আমার শ্রেষ্ঠবন্ধু মনে করি।

আহ্‌মদ বিন্ হাসান 'খোদা হাফিয' বলে তাহিরকে বিদায় দিলেন।

সালাহউদ্দিন আইউবী রহমাতুল্লাহ আলায়হির তলোয়ার যখন আলমে ইসলামের উপর ইউরোপের ইসায়ী শক্তিসমূহের হামলা প্রতিরোধ করছিল, তাহির বিন্ ইউসুফ সেই যামানায় পয়দা হয়েছিলেন। আগের শতাব্দীতে তুর্কী সেলজুকরা একদিকে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাদের কমজোরীর সুযোগ নিয়ে তুগরিল বেগ, আল্প আরসালান ও মালিক শাহের মত বিজয়ী যোদ্ধাদের নেতৃত্বে আর্মেনিয়া, এশিয়া মাইনর ও শাম মুলুকে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন, অপরদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের হাত থেকে রোমের উপকূল এলাকার অনেকখানি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হিজরী ৪৬৩ সালে সেলজুক তুর্করা বাইজেন্টাইন বাহিনীকে মলাযজরদ নামক স্থানে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করল। সেলজুক তুর্কীদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে আতংকিত হয়ে পোপ দ্বিতীয় আরবান ইউরোপের ইসায়ী রাজ্যসমূহের কাছে ইসলামের নয়া সয়লাবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলবার আবেদন করলেন। পোপের আবেদনে দীর্ঘকাল ধরে কোন বিশেষ ফল দেখা গেল না। ইউরোপের শাসকরা সেলজুকদের তলোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য পোপের তরফ থেকে কেবলমাত্র পরকালের পুণ্য লাভকেই যথেষ্ট মনে করতেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার লাভের লোভে সেলজুককদের সাথে লড়াই বাধানো শিকারের জন্য ঈগলের বাসায় হাত দেবার চাইতে কম ভয়াবহ ছিল না।

হঠাৎ এই যামানায় এক ফরাসী যাজক বেরিয়ে এসে আলমে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো ইউরোপের জনসাধারণকে। এই যাজকের নাম ছিল পিতর্স। সে ইসায়ী ক্রস তুলে ধরে গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে তামাম ইউরোপ ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। তার জীর্ণ পুরানো পোষাক আর অনাবৃত পা তার মযলুম অবস্থার পরিচয় দিত। তার দৃষ্টিতে ছিল প্রতিহিংসার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর মুখে ছিল বিষাক্ত ছুরি। সে যেখানেই যেত, লোক এসে তার চার পাশে ভিড় করত। পবিত্র ভূমির উপর সেলজুকদের নির্যাতনের কাল্পনিক কাহিনী সে বলে বেড়াত। নিজে কেঁদে অপরকে কাঁদাতো। প্রত্যেকটি বক্তৃতার শেষে আওয়াম ইসায়ী ক্রুশের সম্মান বাঁচাবার জন্য জান কোরবান করবার কসম খেত। আওয়ামের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে ইউরোপের ছোটবড়ো সব রাজ্যের শাসক আলমে ইসলামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই করবার জন্য তৈরী হলেন। হেলালের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের আগ্রহে তাঁরা উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। হেলালের বিরুদ্ধে ইসায়ী ক্রুশের জুলুমবাজ শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হল, কিন্তু মালিক শাহের ওফাত পর্যন্ত সে সয়লাভের পথ রুদ্ধ থাকল।

মালিক শাহের ওফাতের পর সেলজুক সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। হিন্দুস্থানে আওরঙ্গজেব আলমগীর রাহমাতুল্লাহ আলায়হির ওফাতের পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল যে গতিতে, সেলজুক সাম্রাজ্যের পতনের গতিধারা ছিল তার চাইতেও দ্রুততর।

পশ্চিম দিকে আলমে ইসলামের যে আত্মরক্ষার ঘাঁটি ইউরোপের ইসায়ী রাজ্যসমূহের কাছে অপরাজেয় ছিল, সাত বছর পরে তা আপনাআপনি ভেঙে পড়লো। হিজরী ৬৯১ সালে ইসায়ী সয়লাব এসে আলমে ইসলামকে বিপর্যস্ত করে দিল।

বাগদাদের আব্বাসীয় সাম্রাজ্য তুর্কী সেলজুকদের পতনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু ইসায়ী শক্তির ভয়াবহ সয়লাব রোধ করবার জন্য তাঁরা কিছুই করতে পারলেন না। এক বছরের মধ্যে ইসায়ী বাহিনী পতনমুখী সেলজুক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করল। জেরুজালেম ছাড়া শাম মুলুকের বহু শহর ও বন্দরগাহ্ চলে গেল তাদের অধিকারে। ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার কয়েকটি এলাকা মিলিয়ে তারা কায়েম করল এক ইসায়ী সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্য ছিল আলমে ইসলামের বুকের উপর একটা ছুরির মত।

তখনও প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আলমে ইসলামের আত্মরক্ষার উদ্দীপনা ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর প্রাণপণ হামলা ইসায়ী শক্তিসমূহের অন্তরে ইসলামের বীর যোদ্ধাদের পুরানো ভীতি আবার নতুন করে জিন্দাহ্ করে দিল। গোড়ার দিকে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফার পক্ষ থেকে তাঁকে উৎসাহিত করা হয়েছিল। তাঁর শৌর্যবীর্যের কাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে আলমে ইসলামের হাজার হাজার যোদ্ধাকে তাঁর ঝান্ডা তলে সমবেত করেছিল। কিন্তু সামাজ্যের ভিতরকার দ্বন্দ্ব কলহের দরুণ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো না। পবিত্র ভূমিতে ইসায়ী শাসনের নিভু নিভু দীপশিখা কোন রকম নিভতে নিভতে বেঁচে গেল। কিন্তু হিজরী ৫৮৪ সালে মিসরে সালাহ্উদ্দীন আইউবীর উত্থান সে দীপশিখার কাছে ছিল শেষ ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্টা। পবিত্র ভূমি আরেকবার ইসলামের বীর যোদ্ধাদের সৌভাগ্য অশ্বের খুরের দাপটে মুখর হয়ে উঠলো। ইউরোপের ইসায়ী শক্তিসমূহের নজরে সালাহ্উদ্দীন আইউবীর তলোয়ার সেলজুকী তলোয়ারের চাইতে আরও ভয়াবহ হয়ে দেখা দিল। ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংল্যান্ড ব্যতীত ইউরোপের যাবতীয় ইসায়ীশক্তি তাদের অসংখ্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রাচ্যে ইসায়ী প্রাধান্যের গড়ে ওঠা স্তম্ভকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এসে মওজুদ হল।

আব্বাসীয় খেলাফত এবারেও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে শরীক হল না। কিন্তু সালাহ্উদ্দীন আইউবীর বীরত্বপূর্ণ অগ্রগতি গোটা আলমে ইসলামকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করল। ইউরোপের সীমাহীন সংখ্যা সেনাবাহিনী অগ্রগতির খবর পেয়ে আরব, ইরাক ও তুর্কীস্থানের বীরযোদ্ধারা একে একে এসে জমা হতে লাগলো সালাহ্উদ্দীন আইউবীর ঝান্ডা তলে।

●

ইসায়ী ক্রুশের মোকাবিলায় হেলালী ঝান্ডা উঁচু করে রাখবার উদ্দীপনা মদীনার আরও কতক নওজোয়ানদের মত আহ্মদ বিন্ হাসানকে টেনে

এনেছিল ফিলিস্তিনের মাটিতে। হেলাল ও ইসায়ী ক্রুশের মামুলী লড়াইয়ে আহমদ বিন্ হাসান শরীক হয়েছিলেন এক নাম-না-জানা সৈনিক হিসাবে। তাঁর দলের অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাঁর শৌর্যবীর্য, কিন্তু আহমদ বিন্ হাসানের উচ্চ শিক্ষার ফলে তাঁর ভিতরে যে আত্মনির্ভরতা জন্মলাভ করেছিল, দীর্ঘকাল তা তাঁর পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। বড় বড় লোককে খুশী করবার জন্যও তিনি কখনও নিজের মত বদলাতে রাজি ছিলেন না। তাঁর দলের সালার ছিলেন তুর্কী। তিনি আহমদের আত্মনির্ভরতাকে মনে করতেন অহংকারের শামিল।

এক গৌরবময় বিজয়ের পর রাতের বেলা সালাহুউদ্দীনের সৈন্যদল এক বিস্তীর্ণ খোলা ময়দানে তাঁবু ফেলেছে। ময়দানের এক ধারে জয়তুন গাছের কাছে আহমদ বিন্ হাসানের দলের তুর্কী সালার কয়েকজন সিপাহী ও অফিসারের মজলিসে গত যুদ্ধের ঘটনাবলী আলোচনা করছেন।

আহমদ বিন্ হাসান কোথায়? হঠাৎ সালার এক সিপাহীর কাছে প্রশ্ন করলেন। সিপাহী জওয়াবে বললো ঃ তিনি গাছতলার মশালের সামনে বসে একটা কিতাব পড়ছেন।

তুর্কী অফিসার বললেনঃ কিতাব পড়বার এতটা উৎসাহ না থাকলে লোকটি ভাল সিপাহী হতে পারত। পরশু সে সত্যি সত্যি এক সিপাহীর মত লড়াই করছিল। পাঁচজন নাসারাকে সে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিয়েছে। তখনও আমার বিশ্বাসই হয়নি যে, সে আহমদ। কিন্তু এই কেতাবের নেশাই ওকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

এক নওজোয়ান এতক্ষণ চুপ করে মজলিসের এক ধারে বসেছিলেন। তিনি বলে উঠলেন ঃ হয়তো তিনি নিছক সিপাহী হয়ে থাকার চাইতে গোটা ফৌজের পথ নির্দেশ করবার জন্য পয়দা হয়েছেন। এক সাধারণ সিপাহী সম্ভবতঃ তলোয়ারের বেশী আর কোন কিছুর প্রয়োজনবোধ করে না, কিন্তু একজন সালার কিতাবের প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারেন না।

তুর্কী অফিসার নওজোয়ানের কথার তিক্ততা এক অট্টহাস্যে চাপা দিতে চেষ্টা করে বললেনঃ বাগদাদের লোকেরা সবাই বুঝি সালার। তারা তো কেবল কিতাব পড়ছে।

নওজোয়ান জবাব দিলেনঃ আলমে ইসলামের দুর্ভাগ্য, বাগদাদের লোকেরা কিতাবের সাথে তলোয়ারের প্রয়োজন অনুভব করে না। নইলে আলমে ইসলামের প্রত্যেকটি সিপাহী তাঁদের নেতৃত্বে লড়াই করা গৌরবের ব্যাপার মনে করত।

মশালের আলো থেকে দূরে থাকায় তুর্কী সালার নওজোয়ানকে চিনতে পারছিলেন না। খানিকটা তিক্ত আওয়াজে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'আহমদ বিন হাসানের এ সাথীটি কোত্থেকে এল? ভাই, একটুখানি এগিয়ে এস না এদিকে।'

নওজোয়ান কোণ থেকে উঠে সালারের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সালার তাঁকে দেখে বললেনঃ আরে ইউসুফ যে, আজ তোমার মুখ কি করে খুললো?

বসে পড়। প্রত্যেক বাহাদুর সিপাহীকে দেখে আমার আনন্দ হয়। প্রথম লড়াইতে তুমি আমাদের সবাইর নজরে পড়েছ। কিন্তু এ কথাটা মনে রেখ, এখানকার সাধারণ মানুষ বাগদাদের বাসিন্দাদের তা'রিফ পছন্দ করে না।

ইউসুফ নম্রস্বরে জবাব দিলেন ঃ কথা বলবার সময়ে সাধারণ মানুষের কথা আমার মনে আসেনি, আপনার কথাই আমার মনে ছিল। বাগদাদের বাসিন্দাদের এখন আমি তারিফের যোগ্য মনে করি না; তাদের তারিফ আমি করিওনি। তাদের কথা প্রসঙ্গক্রমে উঠে পড়েছে। সিপাহীদের এলম শিক্ষা করা উচিত কিনা, তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল আমি বলতে চাচ্ছি যে, তলোয়ার হচ্ছে এক উদ্ধত ঘোড়ার মত, তার জন্য এলমের লাগামের প্রয়োজন রয়েছে। বাগদাদওয়ালাদের হাতে কেবল লাগামই রয়েছে, তাদের দখলে ঘোড়া নেই।

সালার প্রশ্ন করলেন ঃ আর আমাদের সম্পর্কে তোমার খেয়াল কি?

ইউসুফ জবাবে প্রশ্ন করলেন ঃ আমাদের বলতে আপনি নিজেকে বুঝাচ্ছেন, না সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইউবীর ফৌজকে?

তুর্কী অফিসার এই প্রশ্নে হয়রান হয়ে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললেন ঃ কথাবার্তায় এ নওজোয়ানকে তো আহ্‌মদ বিন্ হাসানেরও ওস্তাদ মনে হচ্ছে। তাঁকেও ডাকো না!

এক সিপাহী উঠে গিয়ে আহ্‌মদ বিন হাসানকে সাথে নিয়ে এল। তুর্কী সালার বললেন ঃ পরশু আমি দেখেছি, তুমি সত্যি সত্যি এক সিপাহীর মত লড়াই করেছো। তোমার সম্পর্কে এমন ধারণা আমার ছিল না। -বসে পড়।

আহ্‌মদ বিন্ হাসান জবাবে বললেন ঃ আপনার সিপাহীদের সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করা আপনার উচিত নয়।

তুর্কী অফিসার লজ্জিতভাবে বললেন ঃ তোমার সাথে ইউসুফের পরিচয় হয়েছে না? এ হচ্ছে আমাদের নতুন সাথী।

আহ্‌মদ জবাব দিলেন ঃ তাঁর সাথে আমি আগেই পরিচিত হয়েছি।

কি পড়ছিলে আজ?

আমি খালিদ বিন্ ওয়ালিদ্ রাযি আল্লাহুআন্‌হু'র বিজয়ের ইতিহাস পড়ছিলাম।

তুর্কী অফিসার প্রশ্ন করলেন ঃ আচ্ছা, খালিদ বিন্ ওয়ালিদের বিজয় বড়ো ছিল, না আমাদের সুলতানের? আমার তো মনে হয়, তখনওকার জামানায় যুদ্ধ আধুনিক কালের যুদ্ধের তুলনায় মামুলী লড়াইয়ের বেশী কিছু ছিল না।

আহ্‌মদ বিন্ হাসান জবাব দিলেনঃ আপনার খেয়াল সাধারণভাবে নির্ভুল নয়। অজ্ঞানতাকে আমি ক্ষমার যোগ্য মনে করি, কিন্তু লোক দেখানো মনোভাবকে আমি ক্ষমার যোগ্য মনে করি না। সুলতানের সামনে এই ধরণের কথা বলে আপনি হয়তো তাঁকে খুশী করতে পারেন, কিন্তু এখন তিনি হাজির নেই। আমি মেনে নিচ্ছি, কিতাবপত্রের উপর আপনার বিদ্বেষ রয়েছে; কিন্তু একথা মানতে রাজি নই যে, এক মুসলমান মা আপনাকে খালিদে আযম রাযি

আল্লাহুআনহু'র বিজয় কাহিনী শোনাননি এবং আপনাকে গর্ব ও শ্রদ্ধা সহকারে সেই মুজাহেদীনের নাম উচ্চারণ করতে শেখাননি, যারা পেটে পাথর দেহে জীর্ণ পোষাক পরিধান করে সীজার ও খসরুর শাহী তাজ পদতলে দলিত করেছেন। খালিদ বিন্ ওয়ালিদ (রাঃ) এর জামানার বেশীর ভাগ যুদ্ধই ছিল এমন, যেখানে ইসলামের এক তলোয়ারের মোকাবিলা করেছে দুশমনের দশ তলোয়ার। আমার কথায় আপনার মনে কষ্ট লাগবে অবশ্যি আপনি আমার সালার; যুদ্ধের ময়দানে আপনার প্রতিটি ইশারা আমার জন্য হুকুম। কিন্তু তারও কারণ এ নয় যে, আমি আপনার অথবা সুলতান সালাহ্উদ্দীনের সন্তোষ কামনা করি। সুলতানের প্রতি যদি আমি শ্রদ্ধা পোষণ করি, তার কারণ কেবল এই যে, তিনিও আমারই মত ইসলামের এক সিপাহী। এই ধরণের ভুল উক্তিতে সম্ভবতঃ কোন ইতিহাস শিক্ষার্থী বিভ্রান্ত হবে না। বরং হতে পারে যে, সুলতানের সামনে এই ধরণের অন্যায় খোশামোদ করলে তাতে তাঁর ভিতরে এমন এক আত্মপ্রসাদের মনোভাব জাগিয়ে দিতে পারে, যার ফলে বনি আব্বাস খলিফাগণ ইসলামের গোটা দেহে পক্ষাঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গে পরিণত হয়েছেন। বর্তমান মুহূর্তে আলমে ইসলামের বহু আশা-আকাঙ্খা সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইউবীর সাথে জড়িত হয়ে আছে। তাই তাঁকে খালিদ (রাঃ) ও আবু ওবায়েদের (রাঃ) সমপাঙক্তেয় প্রমাণিত করে ভবিষৎ নিরপেক্ষ করবার পরিবর্তে তাঁর জন্য দোআ করুন, যেন উচ্চ থেকে উচ্চতর মঞ্জিলে উন্নীত হয়েও তিনি অনুভব করেন যে, এ তাঁর সফরের প্রারম্ভ মাত্র।

আহমদ বিন্ হাসান আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এক অবগুন্ঠনধারী। এগিয়ে আসতে আসতে তিনি উঁচু গলায় বললেনঃ খোদা সালাহ্উদ্দীনকে আলমে ইসলামের সদিচ্ছা পূরণ করবার যোগ্যতা দান করুন এবং খোশামোদকারীদের হাত থেকে তাঁকে হেফাযত করুন। আগন্তুকের কণ্ঠস্বর ছিল ক্রোধ, ভীতি ও প্রভুত্বব্যঞ্জক। শ্রোতৃগণ ভীত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। মশালের আলোর কাছে এসে তিনি তাঁর মুখের নেকাব খুলে ফেললেন। তুর্কী অফিসার মাথা নত করে বললেন ঃ সুলতান!

অমনি সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। সুলতান সালাহ্উদ্দীন তুর্কী অফিসারকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমার কথা শুনে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু মূর্খ তুমি, তোমার শাস্তি হচ্ছে ঃ আগামী ছ'মাস অবসর সময়ে সাথীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে বসে বসে তুমি ইতিহাস পড়বে। ছ'মাস পরে আমি নিজে তোমার পরীক্ষা নেব। তখনও তুমি আমায় খুশী করতে পারলে তোমার পদোন্নতি হবে, নইলে একাকী বসে থাকার শাস্তি আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। তোমরা দু'জন এদিকে এস। সুলতান আহমদ বিন হাসান ও ইউসুফের দিকে ইশারা করলেন। আহমদ ও ইউসুফ এগিয়ে গিয়ে সুলতানের পাশে দাঁড়ালেন।

সুলতান প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কোত্থেকে এসেছ?

ঃআমি মদীনা থেকে এসেছি। আহমদ বিন হাসান জওয়াব দিলেন। সুলতান এবার ইউসুফের দিকে তাকালেন। তিনি বললেনঃ আমি বাগদাদ থেকে এসেছি।

ঃ তুমি আমার ফৌজে কবে শরীক হয়েছ?

ঃ আহমদ জওয়াব দিলেন আমি এখানে প্রায় ছ'মাস কাটিয়েছি আর ইউসুফ প্রায় পাঁচ দিন।

সুলতান সালাহউদ্দীন বললেন ঃ আমার সম্পর্কে তুমি ভুল ধারণা প্রকাশের অপরাধে অপরাধী। তোমায় কি শাস্তি দেব?

ঃ আহমদ বললেন ঃ আপনি আমার তামাম কথাবার্তা শোনার পরেও যদি আমায় অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তাহলে আমার সাফাই পেশ করবার কিছু নেই।

সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী সাদরে আহমদের কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ

আপাতত আমি তোমার কথায় মুগ্ধ হয়েছি। সৈনিক হিসাবে তোমার যোগ্যতার সঠিক জ্ঞান আমার নেই। তোমায় আমি আমার ফৌজের বারটি দলের উপর সালার নিযুক্ত করছি। আর ইউসুফ, তোমার কণ্ঠস্বরে সিপাহীসুলভ আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। আশা করি সামনে এগিয়ে গিয়ে তুমি ক্রমাগত বড় থেকে আরও বড় দায়িত্ব সামলে নেবার যোগ্যতা প্রমাণিত করবে, কিন্তু এখনকার মত আমি তোমায় পাঁচটি দলের সালার নিযুক্ত করছি। তোমাদের দু'জনকেই আমি আশ্বাস দিচ্ছি, আমার দলের মধ্যে কেবল যৌবন ও বীরত্বের ইজ্জত রয়েছে, খোশামোদের নয়। আর হযরত খালিদ রাজিআল্লাহু আনহু'র সম্পর্কে আমি হয়তো আমার মনোভাব প্রকাশ করতেই পারবো না। হায়, আমি মিসরের সুলতান না হয়ে তাঁর ফৌজের এক মামুলী সিপাহী হতে পারতাম। আমার কাছে কেবল সেই মুজাহেদীনই নন, বরং সেসব লোকও শ্লাঘার পাত্র, যারা ইরাক ও সিরিয়ার ময়দানে খালিদে আযমের সেনাবাহিনীর আরোহীদলকে সামনের দিগন্তরেখার দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছেন। ইসলামের বীর যোদ্ধাদের মুখে পানি তুলে দিতে দিতে শহীদ হয়েছিলেন যে বৃদ্ধা, আমার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের চাইতে তাঁকেও আমি উচ্চতর ইজ্জতের দাবীদার মনে করি।

কিছুকাল পরে সালাহউদ্দীন আইউবীর ফৌজে এমন কোন লোক ছিল না, যে আহমদ বিন হাসান ও ইউসুফ বিন যহীরকে জানত না। এক বছর পর ইউসুফ হলেন সুলতানের বীর সেনাদের একটি দলের সালার, আর আহমদ বিন হাসান ফৌজের মজলিসে শুরার সদস্য। তাঁদের দু'জনেরই পরস্পরের প্রতি উচ্চ ধারণা ছিল। যুদ্ধের ময়দানে আহমদ বিন হাসান একমাত্র ইউসুফের শৌর্য-সাহসেই মুগ্ধ হতেন। ওলামার ময়দানে ইউসুফ তাঁর বন্ধুর বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্বে অভিভূত হতেন। ইউসুফ ও আহমদ বিন হাসান শপথ করেছিলেন যে, জেরুজালেমের উপর আবার ইসায়ী ক্রুশের পরিবর্তে হেলালী ঝান্ডা যতদিন না

উড্ডীন হবে, ততদিন তাঁরা ছুটিতে যাবেন না। তখনওকার দিনে সুলতান সালাহ্উদ্দীন আইউবী জেরুজালেমের উপর শেষ হামলার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুলতানের ফৌজের কয়েকজন রেজাকার বাগদাদে ছুটি কাটিয়ে ফিরে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে এক সিপাহী ইউসুফের খিমায় ঢুকে তাঁর বিবির চিঠি তাঁর সামনে পেশ করলেন। ইউসুফ তাঁকে বসবার জন্য ইশারা করে চিঠি খুলে পড়লেন। তারপর খানিকক্ষণ মাথা নুইয়ে চিন্তা করে সিপাহীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সিপাহী বললেনঃ আমি আমার বিবিকে আপনার বাড়ীতে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আপনার বিবির শরীর দুর্বল! আপনার বাচ্চাটিকে আমি দেখেছি। সে বেশ ভালই আছে। আমার বিবিকে আমি বলে এসেছি আপনার গৃহিনীকে দেখাশুনা করতে।

ইউসুফ মুখের উপর বিষণ্ণ হাসি টেনে এনে বললেনঃ 'আল্লাহ আপনার ভাল করুন।' তারপর আবার চিঠির দিকে মন দিলেন।

খানিকক্ষণ পরে ইউসুফ একাকী তাঁর খিমার মধ্যে অস্থিরভাবে পদচারণা করছিলেন। পাঁচ ছ'বার চিঠিখানা পড়ে তার সংক্ষিপ্ত কথাগুলো তাঁর মুখস্ত হয়ে গেছেঃ

প্রভু আমার! স্বামী আমার! দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আপনার চিঠি পেয়েছি। হায়! জেরুজালেমের উপর ইসলামী ঝান্ডা উড্ডীন করার সময়ে তা দেখবার জন্য যদি আমি আপনার সাথে থাকতে পারতাম! আমার শরীর কিছুটা অসুস্থ, কিন্তু তার জন্য আপনি ভাববেন না। জেরুজালেম বিজয়ের খবর পেলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব। হ্যাঁ, অবশ্যি আমি কামনা করছি, জেরুজালেম বিজয়ের খবর শুনাবার জন্যে সবার আগে আপনিই আমার কাছে আসবেন। আপনি আপনার শপথ পুরা করুন। দিনরাত আমি খোদার কাছে দোয়া করছি, জেরুজালেমের উপর ঝান্ডা উড়াবার সৌভাগ্য যেন আপনার ভাগে পড়ে। তাহির বেশ আনন্দে দিন কাটাচ্ছে আর মোহসীনের বিবি আমায় খুব খেয়াল রাখছে। কোনরকম তকলিফ নেই আমার।

ইউসুফ খিমার মধ্যে টহল দিতে দিতে এই কথাগুলো কখনও আস্তে আস্তে, আবার কখনও কিছুটা জোর গলায় বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। তাঁর দীলের স্পন্দন কখনও দ্রুত, আবার কখনও ধীর হয়ে আসছে। তাঁর মন ও মস্তিষ্কে দুই ভিন্ন খেয়াল, ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও ভিন্ন ইচ্ছার সংঘাত চলছে। তাঁর সামনে তখনও দুটি কর্তব্য। এক দিকে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, যাঁকে শাদী করবার আগে দুনিয়ায় তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ-একা; আর শাদীর পরে যাঁর মুখের একটুখানি সলজ্জ হাসি তাঁর কাছে সারা দুনিয়ার ঐশ্বর্যের চাইতেও বেশী মূল্যবান মনে হয়েছে। তাঁর সেই স্ত্রী আজ রোগে শয্যাশায়ী। চিঠির মধ্যে যে সান্ত্বনার ভাষা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি অনুভব করতে পারেন যে, তাঁর স্ত্রীর অবস্থা খুবই আশংকাজনক, নইলে মামুলী অসুখ বিসুখ হলে তিনি কিছুতেই মহসীনের বিবির শুশ্রূষা পাবার দরকারই বোধ করতেন না। তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হবে। তিনি কল্পনার বিদ্যুৎগতি ঘোড়ায়

সওয়ার হয়ে বাগদাদে পৌছে যাচ্ছেন এবং নিজের বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে আওয়াজ দিচ্ছেনঃ যাবেদাহ! যাবেদাহ! তুমি কেমন আছ! আমি ফিরে এসেছি। তুমি আমার দিকে তাকাও। যাবেদাহ তাঁর দিকে হঠাৎ তাকিয়ে দেখে বেকারার হয়ে বলছেনঃ আপনি! জেরুজালেমের উপর ইসলামের নিশান উড়ানো হয়েছে? এ জিজ্ঞাসা তাঁর কল্পনার ঘোড়াকে আবার দেয় দ্রুতগতি। বাগদাদের শান্তির নীড় থেকে ফিরে তাঁর কল্পনায় তাজী ছুটে চলে জেরুজালেমের লড়াইয়ের ময়দানে! মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে তিনি বলেনঃ আমার শপথ আমি পূর্ণ করব! জেরুজালেম বিজয়ের খবর নিয়েই আমি ফিরে যাব ঘরে! তীর বৃষ্টির ভিতর দিয়ে খন্দক পার হয়ে তিনি এগিয়ে যান কেল্লার পাচিল ভাঙতে। ইসায়ী ক্রুশের নিশান ছুঁড়ে ফেলে হেলালী নিশান উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যান কেল্লার সর্বোচ্চ গম্বুজের দিকে। বিজয়ের আওয়াজ তুলে খুন রাঙা তলোয়ার কোষবদ্ধ করে আবার সওয়ার হন বিদ্যুৎগতি ঘোড়ার পিঠে। আবার ফিরে যান বাগদাদে। নিজের ঘরের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে ঘরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে বলেন ঃ আমার প্রাণ! আমার রূহ! আমি এসেছি। জেরুজালেম বিজয় হয়ে গেছে। আমি নিজ হাতে কেল্লার সব চাইতে উঁচু চূড়ায় উড়িয়ে দিয়েছি ইসলামী নিশান। অমনি যাবেদার সুন্দর মাসুম মুখখানি খুশীতে ঝলমল করে উঠে। আমি যাব নাঃ এই হয় তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত।

আহমদ বিন হাসান ইউসুফের খিমায় এসে প্রবেশ করলেন। তিনি বললেনঃ ইউসুফ বাগদাদ থেকে কয়েকজন সিপাহী এসেছে। তোমার বাড়ীর কোন খবর এসেছে কি?

ঃ বিবির চিঠি এসেছে। ইউসুফ হাসবার চেষ্টা করে বলেন।

ঃ তোমায় পেরেশান মনে হচ্ছে। সব ভাল তো?

ঃ ওর শরীর কিছুটা অসুস্থ।

আহমদ বিন হাসান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন। মুহূর্তকাল চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তোমায় যেতে বলেছেন কি?

ঃ না, আপনি চিঠিটা পড়ে দেখুন। এই কথা বলে ইউসুফ চিঠিটা আহমদের হাতে দিলেন।

আহমদ চিঠি পড়ে বললেনঃ চিঠিতে তো তেমন উদ্বেগের কিছু নেই, তথাপি তুমি পেরেশান হয়েছ নিশ্চয়ই। আমি তোমায় একটি খোশখবর শোনাচ্ছি।

ইউসুফ অধীরভাবে প্রশ্ন করলেনঃ কি ধরণের খোশখবর? শিগগিরই জেরুজালেমের উপর হামলা হবে কি?

আহমদ জওয়াব দিলেনঃ হ্যাঁ, পরশু আমরা জেরুজালেমের পাঁচিল ভাঙতে যাব। ইনশাআল্লাহ, এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি বাগদাদের বাসিন্দাদের কাছে জেরুজালেম বিজয়ের খোশখবর দেবার জন্যে রওয়ানা হবে, কয়েক মঞ্জিল আমিও তোমার সাথে যাব। ইউসুফ আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনার একিন রয়েছে যে, পরশুই হামলা হবে? আহমদ জবাব দিলেনঃ আমি এইমাত্র সুলতানের সাথে দেখা করে এসেছি।

ইউসুফের দিল দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগল। তিনি তাঁর বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন। মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করে তিনি বললেনঃ হায়! এই হামলা আজকেই যদি হত!

আহমদ খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেনঃ আমি পত্রবাহকের নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

ঃ এই চিঠি মহসিন নিয়ে এসেছেন। তিনি বাগদাদে আমার পড়শী।

ঃ তিনি কোন দলের সিপাহী?

ঃ তিনি অগ্রগামী ফৌজের অষ্টাদশ দলের নায়েব-সালার।

সন্ধ্যা বেলায় আহমদ বিন হাসান ইউসুফকে বললেনঃ ইউসুফ! মহসিনের সাথে আমি দেখা করে এসেছি। তাঁর কথায় মনে হল, তোমার বিবির শরীর খুব ভাল নয়। তুমি যেতে চাইলে আমি সুলতানের কাছে তোমার ছুটির জন্য বলবো।

ইউসুফ জবাব দিলেনঃ না, তা হয় না। রুগ্না স্ত্রীর শুশ্রুষা করবার মওকা হয়তো আবার আসবে, কিন্তু জেরুজালেমে বিজয়ের হিস্সা নেবার সৌভাগ্য আর কখনও ফিরে আসবে না।

আটদিন পর মুসলিম ফৌজ চারদিক দিয়ে জেরুজালেমের উপর হামলা চালাচ্ছে। সুলতান সালাহউদ্দীন এক সফেদ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ফৌজ পরিচালনা করছেন। সুলতান যে সিপাহীকে সবার আগে তীর ধনুক ফেলে কেল্লার পাঁচিলের উপর চড়তে দেখলেন, তিনি ইউসুফ। উপর থেকে তীর ও পাথর বর্ষণ হচ্ছে, ইউসুফ মাথার উপর ঢাল রেখে কোন রকমে নিজেকে বাঁচিয়ে চলছেন। পাঁচিলের উপর তিনি যে উঠতে পারবেন, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। সুলতান মনে মনে বললেন ঃ যদি সিপাহীটি পাঁচিলের উপর পৌঁছতে পারে, তা হলে আমি ওকে আমার নিজের তলোয়ার ইনাম দেব। দেখতে দেখতে ইউসুফ পাচিলের উপর পৌঁছে গেলেন এবং আরও কয়েকটি নওজোয়ান তাঁর অনুসরণ করলেন। ইউসুফ কয়েক জনকে মৃত্যুর দেশে পাঠিয়ে দিলেন। সুলতান জেনারেলকে বললিলেনঃ এবার ও আমার ঘোড়াটিও পাবার দাবীদার হয়েছে। কয়েকজন মুজাহিদ তখনও পাঁচিলের উপর উঠে গেছে। যে সব পাহারাওয়ালা পিছন থেকে ইউসুফের উপর হামলা করতে যাচ্ছে, তাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে তারা। ইউসুফ সামন-াসামনি লড়াই করে ছয়-সাত জন সিপাহীকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন ইতিমধ্যে। সালাহউদ্দীন আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠলেনঃ নওজোয়ান আমি তোমায় অগ্রগামী সেনাদলের সালারে আলা নিযুক্ত করছি। কিছু সময়ের জন্য সুলতানের মনোযোগ অপরদিকে নিবিষ্ট হল। আবার তিনি যখন পাঁচিলের ঐদিকটার উপর নজর করলেন, তখনও তাঁর সিপাহীরা সেদিকটা দখল করে ফেলেছে। কিন্তু ইউসুফ সেখানে নেই? সুলতান তাঁর সাথীর কাছে জিজ্ঞেস করলেনঃ ইউসুফ কোথায় গেল?

দরজার সব চাইতে উঁচু গম্বুজের দিকে ইশারা করে তাঁর সাথী জবাব দিলেনঃ ইউসুফ বড় বিপজ্জনক জায়গায় গিয়ে লড়াই করছে, ওই যে দেখুন।

সুলতান উপরের দিকে নজর দিলেন। ইউসুফের তলোয়ার তখনও তিনখানা তলোয়ারের মোকাবিলায় সমানে লড়াই করে চলেছে। সুলতানের দুজন সিপাহী তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে গিয়েছে। ইউসুফের তলোয়ারের এক আঘাতে ইসায়ী ক্রুশ খচিত ঝান্ডা ভূপাতিত হল। সুলতানের চোখ খুশীর আঁসুতে ছলছল করে উঠল। আনন্দ-আবেগে সুলতান বললেন ঃ তুমি আমার বেটা! তোমায় আমি এই শহরের ওয়ালী নিযুক্ত করব। কিন্তু ইউসুফের হাত থেকে তখনও তলোয়ার খসে পড়েছে। এক নওজোয়ান তাঁকে তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। সুলতান তাঁকে চিনলেন। নওজোয়ানটি আহমদ বিন হাসান।

সুলতানের সিপাহীরা ভিতরে ঢুকে কেল্লার দরজা তখনও খুলে দিয়েছে। দুশমন তাদের হাতিয়ার সমর্পণ করে দিয়েছে। সুলতান ঘোড়া হাকিয়ে কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি কয়েকজন অফিসারকে সাথে নিয়ে দ্রুতগতিতে গম্বুজের উপর উঠে গেলেন। ইউসুফের দেহে যখমের দাগ সুস্পষ্ট। আহমদ তাকে আপন পানপাত্র থেকে পানি দিচ্ছেন। সুলতান হাঁটু গেড়ে তাঁর পাশে বসে পড়লেন। তাঁর দেহ থেকে বর্ম সরিয়ে যখম দেখলেন। তারপর নাড়ির উপর হাত রেখে বিষণ্ণকণ্ঠে বললেনঃ বেটা, আমি তোমায় এই শহরের ওয়ালী বানিয়েছি। হয়তো তোমার শাসন আমল খুবই সংক্ষিপ্ত।

শহরের বাসিন্দাদের উপর কোন হুকুম জারি করতে চাইলে জলদী কর।

ইউসুফ একবার সুলতানের দিকে, তারপরেই আহমদের দিকে তাকালেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি ফিরে এসে নিবদ্ধ হল ভেঙেপড়া ইসায়ী ক্রুশখচিত ঝান্ডার উপর।

আহমদ বিন হাসান বললেনঃ শহরের শাসনকর্তার আকাঙ্খা, তিনি নিজ হাতে বিজয়ের ঝান্ডা গড়বেন। সুলতানকে এই কথা বলার সাথে সাথে ইউসুফের চোখে দেখা গেল এক অসাধারণ দীপ্তি। সুলতান আর একবার তাঁর নাড়ি দেখলেন এবং এক সিপাহীকে ঝান্ডা আনতে ইশারা করলেন। এক অফিসার ভেঙেপড়া ইসায়ী নিশান ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী ও আহমদ বিন হাসান ইউসুফকে হাত ধরে তুললেন। ইউসুফের প্রাণস্পন্দনহীন হাত দুটিতে মুহূর্তের জন্য সঞ্চারিত হল নতুন প্রাণ। তিনি ঝান্ডা গাড়লেন। তাঁর মুখে তখনও এক অপূর্ব সুন্দর হাসির রেখা। আল্লাহর রাহে শহীদ হবার খোশ নসীবের অধিকারী যাঁরা, কেবল তাদের মুখে ফুটে উঠে এ হাসি। অকস্মাৎ তাঁর মুখ থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এলঃ যাবেদাহ! জেরুজালেম বিজয় হয়ে গেছে।

সুলতানের হুকুমে ইউসুফকে শাহী মহলের এক কামরায় পৌছানো হল। মৃত্যুপথ যাত্রীর মুখ থেকে আহমদ বিন হাসানের উদ্দেশ্যে শেষ কথাটিঃ আহমদ! আমার বিবির দোআর একটি অংশই কেবল কবুল হয়েছে।

জেরুজালেম বিজয়ের খবর নিয়ে তার কাছে হাজির হতে আমি পারলাম না। কিন্তু কুদরতের একটি রহস্য এখন আমার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যাবেদাহ বাগদাদে নেই। আর কোথাও সে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে। এ দুনিয়ায় সে থাকলে আমি নিশ্চয়ই বাগদাদে পৌছাতে পারতাম। ঝান্ডা গাড়তে গিয়ে আমি অনুভব করলাম, যেন সে আমায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তুমি বাগদাদে চলে যাও। যদি সে জিন্দাহ থাকে, তাহলে বাগদাদে সবার আগে জেরুজালেম বিজয়ের খবর শুনবার দাবী তারই। আর জিন্দাহ না থাকলে আমি, আমি আমার পুত্রকে তোমার হাতে সমর্পণ করছি। এই কথা বলেই তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল ক্ষীণ আওয়াজঃ যাবেদাহ! আমি এসেছি! জেরুজালেম বিজয় হয়ে গেছে। নিজ হাতে আমি বিজয় ঝান্ডা গেড়েছি। আর চোখ খুলে তিনি তাকালেন সুলতানের ও আহমদের দিকে, কিন্তু এক দীর্ঘশ্বাসের সাথে তাঁর চোখের উপর নেমে এল মওতের পরদা।

সুলতান বললেন ঃ আহমদ! তুমি শিগগিরই বাগদাদ যাবার জন্য তৈরী হও। ইউসুফের বিধবাকে দেবার জন্য কিছু অর্থ আমি তোমায় দেব। আর খোদা-না খাস্তা, যদি তিনি জিন্দাহ না থাকেন, তাহলে তাঁদের পুত্রের প্রতিপালনের ভার তোমারই উপর পড়বে।

আহমদ বিন হাসান বললেনঃ আমি তার জন্য তৈরী। আপনার অনুমতি পেলে ইউসুফের পড়শী বাগদাদের এক সিপাহীকে আমি সাথে নিয়ে যাব।

খানিক্ষণ পর। সুলতানের খিমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি ঘোড়া। তার মধ্যে একটিতে সুলতান সালাহউদ্দীন কিছুক্ষণ আগে সওয়ার হয়েছিলেন। বিদায়ের সময় হলে সুলতান আহমদ বিন হাসানকে খিমার ভিতরে ডাকলেন এবং একটি চামড়ার থলে তাঁর হাতে দিতে দিতে বললেনঃ এর মধ্যে পাঁচ হাজার সোনার মোহর রয়েছে। এর মধ্যে এক হাজার তোমার জন্য, আর বাকীটা ইউসুফের বিধবার জন্য। আর খোদা-না খাস্তা, তিনি যদি জিন্দাহ না থাকেন, তাহলে এ অর্থ ইউসুফের পুত্রের প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করবে। তার ভবিষ্যতের জন্য তোমার হাতে কিছু দেব। এই লও।-বলে সুলতান এক রেশমী কাপড়ের থলে নিয়ে বললেনঃ এটা খুলে দেখ।

আহমদ বিন হাসান থলে হাতে নিয়ে খুললেন। তার ভিতরকার বহু দামী জওয়াহের চকমক করে উঠল। সুলতান বললেনঃ ইউসুফের পুত্র বালেগ হলে এ জওয়াহের তাকে দেবে।

আহমদ বিন হাসান বললেনঃ ইউসুফের পুত্র আপনার যে কোন ইনাম গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আমি এখানে ধনদৌলতের আশায় আসিনি, খোদা আমায় সব কিছুই দিয়েছেন।

সুলতান বললেনঃ তোমার এ অর্থের প্রয়োজন যদি না-ই থাকে, তাহলে মদীনার গরীব বাচ্চাদের জন্য এগুলো তুমি নিয়ে যাও।

সুলতানের বলার ভঙ্গী এমন যে, আহমদ কিছুতেই তাঁর দান প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। সুলতান বললেনঃ আরও যে দুটি জিনিস আমি তোমার

কাছে সমর্পণ করছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমার ঘোড়া। ঘোড়াটি বাগদাদে পৌঁছে দেবার জন্য এক সিপাহী তোমার সাথে যাবে। বাগদাদে ঘোড়াটি বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা ইউসুফের বিধবার প্রাপ্য। আশা করি, বাগদাদের লোক আমার ঘোড়াটি ভাল দামেই খরিদ করবেন। দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে আমার তলোয়ার। ইউসুফের পুত্র বড়ো হওয়া পর্যন্ত তা তোমার হেফাজতে থাকবে।

আহমদ বললেন ঃ মহসীন আমার সাথে যাচ্ছেন।

সুলতান বললেনঃ ওকে আমি ভুলবো না। তার ফিরে আসা পর্যন্ত গণিমতের মালে তার ভাগ রাখা হবে। এখন পথ খরচের জন্য আমি তাকে কিছু দিচ্ছি।

সুলতান তাকে ভিতরে নিয়ে পাঁচশ' সোনার মোহর তার হাতে দিলেন। তারপর দু'জনের সাথে মোসাহেফা করে বললেনঃ এবার তোমরা যাও। আমার ইচ্ছা বাগদাদে গিয়ে জেরুজালেম বিজয়ের খবর সবার আগে ইউসুফের বিধবাকে দেবে। খোদা হাফিজ!

কয়েক সপ্তাহ পরে বাগদাদে পৌঁছে আহমদ বিন হাসান জানতে পেলেন যে, জেরুজালেম বিজয়ের চারদিন আগে ইউসুফের বিবি ইন্তেকাল করেছেন। মহসীনের বিবি তাঁর বাচ্চাটিকে নিয়ে গেছেন নিজের ঘরে। সেখানে গিয়েই আহমদ বিন হাসান বাচ্চাটিকে দেখতে চাইলেন। মহসীন আড়াই বছরের সুন্দর বাচ্চাটিকে তাঁর কোলে তুলে দিলে তাঁর সারা মন খুশীতে ভরে উঠল। আহমদ বিন হাসান স্নেহের আতিশয্যে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। অমনি শিশু হাত বাড়িয়ে তাঁর নাক ধরে বলে উঠলেঃ গাজী-আব্বা-গাজী।

আহমদ তাকে বুকে চেপে ধরে আসুঁভরা চোখে বললেনঃ বেটা, আব্বা শহীদ বল।

আব্বা-? ঃ শিশু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আহমদের দিকে তাকালে।

আব্বা শহীদ। ঃ আহমদ শিশুর কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন।

আব্বা শহীদ। ঃ বলে শিশু তাঁর কোলের উপর দাপাদাপি শুরু করল।

সন্ধ্যাবেলার মধ্যে বাগদাদে সালাহউদ্দীন আইউবীর ঘোড়ার আলোচনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাগদাদের আমীরদের প্রত্যেকেরই আগ্রহ, ঘোড়াটি নিয়ে তার আস্তাবলের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেন। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ঘোড়ায় চড়বার চাইতে তাকে সাজিয়ে রেখে আনন্দ পেতেন। খলিফার সম্পর্কে সবাই জানতো, তাঁর দীলে কোন জিনিস খরিদ করবার আগ্রহ থাকত যতটা, নিজের পকেটটাও তিনি মজবুত করে সামলে রাখতেন ততটা। কোন সওদাগরের কাছে খলিফার প্রস্তাব কবুল করার যোগ্য না হলে কোন ওমরাহ তা খরিদ করবার সাহস করতেন না। কিন্তু খলিফার কাছে খবর পৌঁছলো যে চীনের দূত দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার মালপত্রের বিনিময়ে ঘোড়াটি খরিদ করে নিয়েছেন।

পরদিন আহমদ বিন হাসান ইউসুফ বিন যহীরের শিশু পুত্রকে নিয়ে রওয়ানা হলেন মদীনার পথে।

ইউসুফের পুত্রের নাম তাহির। আহমদ বিন হাসান নিজ গৃহে ফিরে এসে শিশুকে তাঁর বিবির কাছে সমর্পণ করে বললেনঃ সাঈদাহ! এ হচ্ছে এক মুজাহিদের পুত্র। আমার বিশ্বাস, তুমি এই ছোট্ট মেহমানকে আপনার করে নিয়ে মদীনার আনসারদের আদর্শ অনুসরণ করবে।

দুপুর বেলায় আহমদ বিন হাসানের সাত বছরের ছেলে তালহা মক্তব থেকে ফিরে দেখলো তার মায়ের কোলে এক সুশ্রী সুন্দর শিশু। সে প্রশ্ন করলঃ আম্মা, এটি কে? সাঈদাহ জবাব দিলেনঃ বেটা, এ তোমার ছোট ভাই।

সন্ধ্যাবেলা তালহা বস্তির তামাম বাচ্চাকে দেখিয়ে আনল তার ছোট ভাইকে।

পাঁচ বছর পর। একদিন আহমদ সাঈদাকে সুধালেনঃ সত্যি কথা বলতো, তোমার কাছে তালহা বেশী প্রিয়, না তাহির।

সাঈদাহ তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দু'জনেরই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর খানিকক্ষণ ভেবে চিন্তে জবাব দিলেনঃ আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

আহমদ বিন হাসানের গৃহে বার বছর বয়স পর্যন্ত তাহির জিন্দেগী কাটাল স্বপ্নের মত। আহমদ বিন হাসান তার ভিতরকার কর্মক্ষমতা জাগিয়ে দিতে কোন রকম কসুর করেননি। মদীনার ওলামা ও রণ-নিপুণ যোদ্ধারা এই প্রতিভাবান বালকের কথা উঠলে বলতেন যে, এই বালক বড় কিছু করবার জন্য পয়দা হয়েছে। আহমদ বিন হাসান ও সাঈদার কাছে তাহির তালহার চাইতে কম প্রিয় ছিল না। আর তালহাও তাকে তার জিন্দেগীর সব রকম সুখ-দুঃখের ভাগী করে নিয়েছিল। হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে হেলাল ও ইসায়ী ক্রুশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ নতুন করে শুরু হল। ইউরোপের ইসায়ী শক্তিগুলো গত কয়েক বছর ধরে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় সালাহউদ্দীন আইউবীর হাতে বারংবার পরাজয় বরণ করে কন্‌স্তানতুনিয়াকে কেন্দ্র করে আরেকবার বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে পূর্বদিকে প্রসারিত করবার জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে। মিসরের সেনাবাহিনী আরেকবার আলমে ইসলামের দিকে ইসায়ী সয়লাবের নতুন ধারা প্রতিরোধের জন্য মজবুত প্রাচীরের মত দাঁড়ালো, কিন্তু বাগদাদের আব্বাসীয় সাম্রাজ্য আবার তেমনি করে ঔদাসীন্য ও গাফিলতের প্রমাণ দিল। সিরিয়া থেকে ব্যবসয়ীদের এক কাফেলা এল মদীনায়। তাদের মুখে নাসারাদের নতুন উদ্যমের খবর শুনে আহমদ বিন হাসান জিহাদে যাবার জন্য তৈরী হলেন। বিদায়ের একদিন আগে তালহা বললেঃ আব্বাজান! আমিও যাব।

আহমদ বিন হাসান তার গলা ধরে কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বললেনঃ আমি তোমারই মুখ থেকে এ কথাটি শুনবার আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম। তোমার মাকে এ কথা বলেছ?

ঃ হ্যাঁ, তিনি আমার এজাযত দিয়েছেন।

তালহা দূরে চলে যাওয়ায় তাহিরের মনে খুব আঘাত লাগল।

দশমাস পর। আহমদ বিন হাসান ঘরে ফিরেছেন। তিনি তাঁর বিবিকে বললেনঃ সাঈদা! আমি এক ভয়ানক খবর নিয়ে এসেছি।

তালহা-? জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সাঈদা বললেনঃ হ্যাঁ, আমরা দুজনই একই উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলাম। তার শাহাদাৎ নসীব হয়েছে, আর আমি ফিরে এসেছি খালি হাতে। সাঈদা ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না-ইলায়হি রাজেউন বলে চুপ হয়ে গেলেন। পর বছর আলাহতায়ালা আহমদ বিন হাসানের ঘরে এক পুত্রসন্তান দান করলেন। তার নাম রাখা হলো আমীন।

তারপর আরও কয়েক বছর কেটে গেল। আলমে ইসলামের অন্যান্য শহরের মত মদীনার লোকেরাও আলমে ইসলামের উপর পশ্চিম থেকে ইসায়ী সয়লাবের পরিবর্তে উত্তর পূর্ব দিগন্তে দেখতে পাচ্ছিল এক অন্ধকার ঝড়ের পূর্বাভাস। আহমদ বিন হাসান তাহিরকে ডেকে বললেনঃ বেটা! এখন মদীনার চাইতে বেশী প্রয়োজন তোমার বাগদাদে। তোমার বিচ্ছেদ আমার ও আমীনের জন্য অসহনীয় হবে, কিন্তু আমি অনুভব করছি, তুমি আমার বার্ধক্যের লাঠি না হয়ে আলমে ইসলামের একটি স্তম্ভ হতে পার। তুমি বাগদাদ যাবার জন্য তৈরী হও।

মদীনায় আহমদ বিন হাসান ছাড়া তাহিরের দৌলত সম্পর্কে আর কেউ কিছু জানতো না। কিন্তু মদীনায় এমন কেউ ছিল না, যার সাথে তাঁর সৌহার্দ্য ছিল না। তাঁর বাগদাদ যাবার খবর যখন সবারই জানা হয়ে গেল, তখনও কেউ কেউ এতটাও বলে ফেলল যে, আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে তাহির বিন ইউসুফের চাইতে ভাল উজিরে আযম মিলবে না।

তাহিরকে বাগদাদে পাঠাবার আগে আহমদ বিন হাসান তার জন্য একজন নির্ভরযোগ্য সাথীর প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তাঁর বস্তি থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে এক গাঁয়ে বাস করত যায়েদ নামে একটি লোক। কয়েক বছর আগে সে ছিল আহমদ বিন হাসানের বাগিচার মালী। যায়েদ যেমন ছিল সাদা দীল, তেমনি বিশ্বস্ত।

আহমদ বিন হাসান তাহিরকে বললেনঃ বেটা! আমি তোমার জন্য একজন নেহায়েত বিশ্বস্ত ও অনুগত ভৃত্যের প্রয়োজন অনুভব করছি, আপাততঃ যায়েদের চাইতে ভাল আর কোন লোক আমার নজরে পড়ছে না। ভাল মনে করলে ওকে তুমি সাথে নিয়ে যাও।

তাহির জবাব দিলেনঃ আমার বয়স যখন আট বছর, তখনই সে আমার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছে যে, যখন আমি বড় হয়ে বাইরে যাব, তখনও ওকে নিয়ে যাব আমার সাথে। তারপর থেকে যখনই দেখা হয়, সে আমার ওয়াদাটি নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আহমদ বিন হাসান বললেনঃ তাহলে ওকে একবার ডাক। আমি ওকে কয়েকটি কথা বুঝিয়ে বলব।

তাহির হাসতে হাসতে জবাব দিলেনঃ আজ ভোর থেকে সে মসজিদে এসে বসে আছে। তার ভয়, আমি তাকে ছেড়ে চলে না যাই।

ঃ ডেকে আন তাকে।

তাহির খানিকক্ষণ পরেই মধ্যমাকৃতি বলিষ্ঠ গড়নের একটি লোককে সাথে নিয়ে এলেন। বয়স তার চল্লিশের কাছাকাছি। তার মুখের উপর ছিল একটি নিরপরাধ শিশু মনের ছাপ। আহমদ বিন হাসান বললেনঃ যায়েদ! তাহিরের সাথে যেতে চাইলে তা আমায় তুমি আগে কেন বলনি।

যায়েদ সরলচিত্তে জওয়াব দিলঃ সত্যি কথাটা হচ্ছে এই যে, বেশী বয়সের লোকেরা সবাই আমায় বে-অকুফ মনে করে। আমার ভয় ছিল, আপনিও আমায় তাই মনে করবেন, আর আমার যাওয়াটা পছন্দ করবেন না।

ঃ তাহলে তুমি তৈরী?

ঃ বাগদাদ যাবার জন্য আমি বিশ বছর আগে থেকে তৈরী হয়ে আছি, কিন্তু কেউ কখনও মদীনা থেকে সেখানে যাবার সময় আমায় বলে যায় ঃ তুমি পয়দা হয়েছ ভেড়া চরাবার জন্য, বাগদাদে গিয়ে করবে কি?

আহমদ বিন হাসান বললেনঃ কিন্তু আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি যে, বাগদাদে তোমার প্রয়োজন রয়েছে।

ঃ দেখুন, আমায় নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। আমি গরীব মানুষ কিন্তু বুকের মধ্যে একটা দীল তো আমারও আছে। তাহিরের সাথে যদি আমায় পাঠাতে না চান, সাপ সাফ বলে দিন। আমি চলে যাই। আমি অপদার্থ, তা আমার জানা আছে। আহমদ বিন হাসান হাসিমুখে বললেনঃ বেটা, ওর যেন কোন তকলীফ না হয়। তারপর আবার যায়েদকে লক্ষ্য করে বললেনঃ যায়েদ! তাহির পরশু এখান থেকে রওয়ানা হবে। তুমি তৈরী হয়ে এখানে এস। আমি ওয়াদা করছি, তাহির তোমায় সাথে নিয়ে যাবে।

তাহির বললেন, ওর বস্তি তো আমার পথেই রয়েছে। আমি ওকে সাথে নিয়ে যাব। ওর এখানে আসার প্রয়োজন নেই।

যায়েদ বললঃ আমারও ইচ্ছা তাই। আমার বস্তির লোকেরা ওঁকে দেখতে চায়। আমি তাদেরকে বলেছি যে, ওঁর ওয়ালেদকে সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী নিজের তলোয়ার আর ঘোড়া ইনাম দিয়েছিলেন। আরও একটি কথা আছে। আমি যে বাগদাদ যাচ্ছি, তা ওরা কেউ মানতে চায় না। তারা বলে, আমি নাকি কয়েকদিন এদিক ওদিক ঘুরে ঘরে ফিরে আসব। উনি যদি ওপথ দিয়ে যান, তাহলে কমপক্ষে ওদেরকে তো লজ্জা দেয়া যাবে।

আহমদ বিন হাসান বললেন ঃ আচ্ছা যাও, তাহির পরশু ভোরবেলা তোমার বস্তিতে পৌছে যাবে। তোমার এখন আর এখানে পাহারা দিতে হবে না। আমার ওয়াদার উপর বিশ্বাস রেখ।

**ঃ আপনার ওয়াদা?** সত্যি বলছি, আপনি যদি আমায় আসমানে পৌছে দেবার ওয়াদা করেন, তার উপরও আমি একিন রাখবো।

আহমদ বিন হাসান যায়েদকে একটি ঘোড়া ও সফরের প্রয়োজনীয় মালপত্র কিনবার জন্য বেশ কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন।

আহমদ বিন হাসানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাহির যায়েদের বস্তির দিকে চললেন। যায়েদ বস্তির গাছের ছায়ায় বসে তার প্রতীক্ষা করছিল। তার আশেপাশে বস্তির কয়েকটি বালক বসেছিল। গাছের সাথে বাঁধা ছিল একটা ঘোড়া, যায়েদ যুদ্ধের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়েছিলেন। তার মোটাসোটা দেহ আটসাট বর্মের ভিতরে যেন পিষে যাচ্ছিল এবং রক্তের চাপে তার মুখ লাল হয়ে উঠছিল। তার দু'খানা হাতকে ব্যস্ত রাখার জন্য নেযাহ আর ঢালই যথেষ্ট ছিল। তীর রাখবার জন্য সে পিঠে বেঁধে নিয়েছিল দুটো তূন। কটিতে ঝুলানো ছিল তলোয়ার আর দুটো খনজর। ধনুক, ফাঁদ, আর খোরাকের থলে সে বেঁধে রেখেছিল ঘোড়ার পিঠের সাথে।

যায়েদ তাহিরকে দেখে উঠতে উঠতে বললেঃ আপনি অনেকখানি দেরী করলেন। লোকগুলো আপনার জন্য ইন্তেজার করে শেষ পর্যন্ত যার যার ঘরে ফিরে গেল। তাহির বললেন এবার ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে যাও। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

যায়েদ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একটি ছেলেকে লক্ষ্য করে বললেঃ ইব্রাহীম! তোমার বাপ আমায় সব চাইতে বেশী ঠাট্টা করেছে। তাকে গিয়ে বল, আমি তাহিরের সাথে বাগদাদে যাচ্ছি। বিশ্বাস না হলে এসে দেখে যাক। আর সোলায়মান, তোমার দাদীকে বল, সেও আজ ভোরে আমায় বলছিল, আমি নাকি বে-অকুফ, আর আমায় বাগদাদে কে নিয়ে যাবে। এই কথা বলেই তাহিরকে লক্ষ্য করে বললঃ আসলে এদেরও কোন কসুর নেই। আমি কয়েকবারই তো বাগদাদ যাব যাব করে থেকে গেলাম।

তাহির হাসতে হাসতে বললেন ঃ চলো এবার। রোদের তাপ বেড়ে যাচ্ছে। বাগদাদে পৌছে যখন তুমি বস্তিওয়ালাদের চিঠি লিখবে, তখনওই তারা বিশ্বাস করবে।

তাহির ও যায়েদ ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। বস্তি থেকে কিছুদূর গিয়ে তাহির পিছন ফিরে দেখলেন, যায়েদের মুখ আগের চাইতেও বেশী করে লাল হয়ে উঠেছে। ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তিনি বললেনঃ তোমার বর্মটা বেশী আটসাট, নয় কি?

জায়েদ জবাব দিলেঃ বর্মটা আঁটসাট নয়, আমি কিছুটা বেশী মোটা হয়ে গেছি। বর্মটা আমি দু'বছর আগে বাগদাদ যাবার ইচ্ছা করে ত্রিশটা বকরীর বিনিময়ে খরিদ করেছিলাম।

তাহির বললেন ঃ ওটা তোমায় খুব বেশী তকলীফ দিচ্ছে না তো?

বর্মটা ঢিলা করবার চেষ্টা করে যায়েদ জবাব দিল ঃ না, আমার শরীর অতটা দুর্বল নয়। কিন্তু দু'তিন ক্রোশ চলবার পর সে আস্তে আস্তে বললঃ তাহির আমার গায়ে পিঁপড়ের মত কি যেন কামড়াচ্ছে।

তাহির জবাব দিলেন ঃ এত শিগগিরই ক্লান্ত হয়ে পড়লে। চলো, আগে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যাবে।

তাহির! কিছুক্ষণ পরেই যায়েদ বলে উঠল ঃ আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তাহির গাছ-গাছড়ার একটি ঝোপের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ চলো, ওই বাগিচায় নেমে পড়বো। ওখানে পানিও পাওয়া যাবে। দুপুরটা ওখানেই কাটিয়ে দেব।

যায়েদের ধৈর্যসীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। সে তৃতীয়বার ঘোড়া থামিয়ে চিৎকার করে উঠল ঃ তাহির! থাম! আমি মরে যাচ্ছি। তাহির জবাবের অপেক্ষা না করে সে ঘোড়া থেকে একলাফ দিয়ে গরম বালুর উপর বসে পড়লো।

তাহির হেসে বললেন ঃ তুমি না বলেছিলে, তোমার শরীর অতটা নাজুক নয়?

যায়েদ দাঁতে দাঁত পিষে বর্ম খুলে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললোঃ না, এটা খোলা যাচ্ছে না। খোদার দিকে চেয়ে আমায় সাহায্য কর। আমার মনে হচ্ছে যেন হাজারো বিচ্ছু আমায় কামড়ে মেরে ফেলছে।

তাহির ঘোড়া থেকে নেমে খুব কষ্ট করে তার বর্মটা খুলে দিলেন। যায়েদ বললে ঃ খোদা তোমায় ভাল করুন, এটা যে খোলা যাবে, এমন আশাও আমার ছিল না। আজ ভোরবেলায় তিনটি লোক ভারী কষ্ট করে এটা আমার দেহে পরিয়ে দিয়েছিল।

তাহির বললেনঃ বর্মটা ভালই, কিন্তু তোমার গায়ে ওটা একটু ছোট।

যায়েদ বললেঃ বর্মটা ছোট? আপনি কেন বলছেন না যে, এক বে-অকুফ হাতী ইঁদুরের খাঁচায় ঢুকতে গিয়ে তার শাস্তি পেয়ে গেছে?

তাহির বললেনঃ আচ্ছা, ওটা তুলে নাও। বাগদাদে গিয়ে আমি তোমার খুব ভাল একটা বর্ম কিনে দেব, আর ওটা আর কাউকেও দিয়ে দেব।

যায়েদ দু'হাত দিয়ে বালুর মধ্যে গর্ত করতে করতে বললঃ এটাকে আমি এখানেই দাফন করে যাব। মনে করব, আমার ত্রিশটা বকরী ব্যারাম হয়ে মরে গেছে। নতুন বর্ম পরবার খায়েশ আমার মোটেই নেই। এমনি লোহার চাপের মধ্যে পড়ে জান দেবার চাইতে খোলা বুকে তীরের ঘা খেতেই আমি রাজি।

যায়েদ বর্মটাকে দাফন করবার জন্য কবর খোদাই করেছিল। কিন্তু তাহির বুঝিয়ে বলায় সে ঘোড়ার পিঠের থলের মধ্যে ওটাকে নিয়ে যেতে রাজি হল।

## দুই

অতীত পাঁচ শতাব্দী ধরে খেলাফায়ে বনু আব্বাসের বহুমুখী সংগঠনের ফলে বাগদাদ পরিণত হয়েছিল কবি-কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে। দজলা নদী তাকে ভাগ করেছিল দুই অংশে। তার দুই কিনারের বাড়ীঘরগুলোর মাঝখানে বিছানো সড়ক ও নহরের জাল। বাগদাদের প্রাসাদ ও অট্টালিকারাজি ছিল পাঁচশ' বছরের

স্থাপত্য শিল্প-সমৃদ্ধির নিদর্শন। গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাগবানরা তার মাটির বুকে রূপ দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছিল জান্নাতের সুন্দরতম কল্পনাকে। বিশ লক্ষ মানুষের বাসভূমি বাগদাদ সৌন্দর্য, মনোহারিত্ব ও মহিমাময় রূপের দিক দিয়ে ছিল দুনিয়ার সর্বোত্তম শহর।

কিন্তু বাগদাদের সংগঠনের সাথে সাথেই শুরু হয়েছে বাগদাদের বাসিন্দাদের পতন ধারা। ইসলামের যে তমদ্দুন আরব মরুর দ্রুতগতিশীল অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ হওয়ার মাঝখানে গড়ে উঠেছিল, তা ঘুমিয়ে পড়েছে আজমী প্রভাবের কোলে। খলিফা আল-মামুনের জামানায় দরবারে খিলাফত থেকে যে আরব প্রভাব কমে যেতে শুরু করেছিল, এখন তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। তথাপি বাগদাদের বিদ্যায়তনগুলোতে আরবদের গুরুত্ব কোন রকম হ্রাস পায়নি। তারা প্রকৃতি বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, উদ্ভিদ বিদ্যার মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় খ্যাতি অর্জন করেছে। তারা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কত গ্রন্থ রচনা করেছে, কিন্তু বাগদাদের আত্মতুষ্ট আরাম-পছন্দ বাসিন্দারা এসব এলম তাদের কওমী সংগঠনের কাজে না লাগিয়ে তাকে করে নিয়েছে তাদের মস্তিষ্কের বিলাসিতার বাহন। তুর্কিস্থান, সিরিয়া ও দূরদারায কত মুলুকের চারুকলার কত ওস্তাদ আসছে বাগদাদে আর তাদেরকে উৎসাহিত করছেন বাগদাদের ওমরাহ।

বাগদাদে কিতাবপত্রে ভরা অগুণ্ত পাঠাগার। কিতাবপত্র যাচাই করে দেখবার জন্য রয়েছেন সমালোচকরা। কিন্তু তা পড়ে তার উপর আমল করবার লোকের সংখ্যা নগন্য। আজমী ওমরাহের মাহফিলে কোরআন-হাদিসের স্থান দখল করে নিয়েছে কাব্য ও সঙ্গীত। খলিফার দরবারে কখনও কখনও সত্যিকার আলেমে দ্বীনের চাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে হাস্য কৌতুক প্রিয় ভাঁড়কে। যে সব আলেম সোজাসুজি খোদা-রসূলের হুকুম পেশ করেন, তাঁদের পরিবর্তে শাহী ইনামের যোগ্য মনে করা হয় তাঁদেরকে, যাঁরা খলিফার ব্যক্তিগত গরজে তাঁকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য সেসব হুকুম অপব্যাখা করেন।

শহরের কেন্দ্রস্থলে 'ক্বাসরে খুলদ' নামে এক আলীশান ইমারত। আব্বাসীয় খলিফাদের বালাখানা। এই ইমারতের আশেপাশে আমীর-উজিরদের মহল। উচুঁদরের ওলামার জন্যও এসব মহলে পৌছাবার দরজা খোলা। তাঁদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত দরজা খোলা, যতক্ষণ তাদের মতামত খলিফার রাজনৈতিক ধারণার বিরোধী না হয়। 'ক্বাসরে খুলদ' থেকে শহরের এক প্রান্তে দরিয়ার কিনারে এক বিস্তীর্ণ কয়েদখানা। কয়েদখানার সব চাইতে ছোট ও অন্ধকার কুঠরীগুলো সে সব সম্মানিত ওলামা ও দরবারের আমীর লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যাঁরা ফতোয়া দেবার বেলায় আব্বাসীয় খলিফার মনোভাবের দিকে নজর না রাখতেন অথবা তাঁর মতামত ইসলামের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখবার সাহস করতেন।

শাসকের নজরে কেবল সেই সব মুফতীকে ইজ্জতের দাবীদার মনে করা হোত, যাঁরা কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে ফয়সালা প্রকাশের পূর্বে তার পূর্ব পুরুষের খবর ও দরবারে তার প্রভাব জেনে নেয়া জরুরী মনে করতেন। সাধারণ মানুষের জন্য মৃত্যুদন্ড মৃত্যুদন্ডই ছিল, কিন্তু খলিফা ও ওমরাহ ছিলেন এ শাস্তির উর্ধ্বে। কখনও কখনও খলিফা সাম্রাজ্যের শ্রদ্ধাভাজন বুজুর্গগণের প্রতি ইজ্জত দেখানোর জন্য তাঁদেরকে শাহী দস্তরখানে দাওয়াত করে নিতেন এবং খানা শেষ হলে বর্তন সরিয়ে নেবার আগে কখনও কখনও খলিফার কর্মচারীদেরকে সম্মানিত মেহমানদের মধ্যে কোন কোন লোকের লাশ সামলাতে হত। এই বিশৃংখলাপূর্ণ জামানায় আব্বাসীয় খলিফাগণ তাঁদের দুশমনদেরকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার বিদ্যায় খুবই পারদর্শী হয়েছিলেন এবং এমন সব বিষ তখনও আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা খাবার কিছুদিন পরে তার ক্রিয়া অনুভূত হত। দাওয়াতে শরীক হবার আগে প্রত্যেক মেহমানকে চিন্তা করতে হত, কখনও কোন কারণে তিনি খলিফাকে অসন্তুষ্ট করেছেন কিনা। খলিফার অসন্তোষভাজন ব্যক্তি দাওয়াতনামা পেয়েই বুঝে নিত যে, তার জীবনের শেষ মুহূর্ত এসে গেছে। কখনও কখনও আবার কতক হুঁশিয়ার ওমরাহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে তখনও খলিফার নিজের জান বাঁচানো হত মুশকিল। ক্ষমতার লড়াইয়ে খলিফা হার মানলে তাঁকে ইরানী ও তুর্কী ওমরাহের হাতে খেলনা বনে যেতে হত। আর ওমরাহ পরাজিত হলে তাদেরকে খলিফার হাতের যন্ত্রে পরিণত হতে হত।

শেষ জামানার আব্বাসীয় খলিফাগণ যত বেশী কবিতা, সংগীত চারুকলার দিকে আকৃষ্ট হলেন, ধর্মীয় শিক্ষা তত বেশী উপেক্ষিত হতে লাগল। ধর্মীয় ব্যবস্থা দানের জন্য একজন নিরপেক্ষ আলেমকে বানানো হত শেখুল ইসলাম। রাজনৈতিক বিধিনিষেধ থাকত খলিফার নিজের হাতে। রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে এই বিচ্ছেদ ইসলামের জন্য ছিল সব চাইতে বিপজ্জনক। শেখুল ইসলামের কলম ছিল খলিফার তলোয়ারের অনুগত।

ইজ্জত ও লোভনীয় অর্থের লালসা শেখুল ইসলামের পদ বেশীর ভাগ ওলামার মঞ্জিলে মকসুদে পরিণত করেছিল। এই মঞ্জিলে পৌঁছতে গিয়ে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদের মতামত বাতিল ঘোষণা করায় ও তাদের দিকে কাদা ছুঁড়ে দেওয়ায় তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করতেন না। গত কয়েক শতাব্দী ধরে সত্যনিষ্ঠ ওলামার ইজতেহাদের ভিতরে সবার উপর ছিল কেবলমাত্র খেদমতে দ্বীনের প্রেরণা। তাঁরা বাগদাদের উপেক্ষিত আনাচে কানাচে বসে ইসলামের অসামান্য খেদমত করে গেছেন, কিন্তু যেসব লোকের উত্থানের আখেরী মঞ্জিল ছিল সরকারী ওলামার আসন, তারা কখনও কখনও এইসব বুজুর্গদের বিরোধিতা করে, আবার কখনও কখনও তাঁদের নামের সাহায্য ও ফতোয়ার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের গুরুত্ব বাড়াবার চেষ্টা করত। শেখুল ইসলাম যদি কোন বিশেষ ইমামের পথ অনুসরণ করতেন তাহলে তারা অপর কোন ইমামের পথ আরও নির্ভুল বলে মত প্রকাশ করে তাঁর সাথীদের বিতর্কের দাওয়াত দিত। বাগদাদের নিরুদ্বেগ লোকেরা যেমন পরম উৎসাহে শহরের চকগুলোতে জমা

হয়ে গান শুনতো এবং ভাড়দের তামাশা দেখতো, তার চাইতেও বেশী উৎসাহ সহকারে তারা শুনতো ওলামার বিতর্ক।

একে অপরকে বুঝবার সদুদ্দেশ্য ঘোষণা করে শুরু হত বিতর্ক। একদলের লোক বক্তৃতা করত অপর দল তা মনোযোগ সহকারে শুনতো। প্রথম বক্তা বসে পড়লে সাহেবে সদরের অনুমতি নিয়ে বিরোধী দলের নেতা উঠে তার জবাব দিত। ধীরে ধীরে উভয় দলের কণ্ঠস্বর চড়া হতে থাকত। তারপর আসতো গালাগালির পর্যায়। উভয় এবার উঠে দাঁড়াতো। একদল অপরের সাত পুরুষের নিন্দা করলে অপর দল অমনি তার বিশ পুরুষ তুলত। একজন দু'তিন ভাষায় বাছাই করা গালি উচ্চারণ করলে অপর দল ছ'সাত ভাষায় মোক্ষম গাল শুনিয়ে দিত। তারপর উভয় দল নিজ নিজ দলের সমর্থক আওয়ামদেরকে লক্ষ্য করে সেসব গালিগালাজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করত। তারপর আওয়ামের জোশ যখন চরমে পৌঁছত তখনও দু'দিক দিয়েই উঠতো নারায়ে তকবীরের আওয়াজ। তার সাথে সাথেই শুরু হত পরস্পরের উপর হামলা। দেখতে দেখতে সেখানে লাশের স্তূপ তৈরী হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও ফৌজের লাঠি এ খেলার পরিসমাপ্তি করত। শাসকদের তরফ থেকে বিতর্ক বন্ধ করা হত না, বরং হুকুম জারী করা হত, যেন কেউ সশস্ত্র হয়ে সেখানে না যায়। বিতর্ক শুরু করবার আগে উভয় দল একে অপরকে আশ্বাস দিত যে তার দলের কোন লোক সশস্ত্র হয়ে আসেনি। এই আশ্বাসের ফলে তাদের লড়াই যেমন অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক মনে করা হত, তেমনি ঘুষাঘুষি ও কুস্তি নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাবার পথও খোলাসা হত। হাতাহাতির পর্যায়ে এলে একে অপরের দাড়ি টানাটানি করা ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়া বাগদাদের আওয়ামদের চলতি রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। ওলামার উপর হাত তোলাকে আদবের খেলাফ মনে করা হত, কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও কখনও বিতর্ককারী দলের ওলামা ও সাহেবে সদর ভিড়ের মধ্যে পড়ে পিটুনী খেতেন।

এসব বিতর্কে কিছু কিছু নয়া সমস্যার উদ্ভব হত এবং তা বাগদাদের তখনওকার দিনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু হত। এসব বিতর্কে যে সব ওলামা খ্যাতি অর্জন করতেন তাদেরকে ওমরাহের খাস মজলিসে ডেকে নেয়া হত। সেখানে আবার দুই প্রতিদ্বন্দী দলের মধ্যে ক্রমাগত দিনের পর দিন চলত বিতর্ক। ওমরাহ্ শেখুল ইসলামের কাছে ফতোয়া চাইতেন এবং তা নিয়ে খ্যাতিমান বিতর্ককারী ওলামার রায় নেওয়া হত। দ্বন্দের মীমাংসার জন্য খলিফার সামনে বিতর্ক চলতো এবং সাধারণভাবে খলিফা তারই পক্ষে ফয়সালা জারী করতেন, যার কণ্ঠস্বর অধিকতর শাণিত এবং বিতর্কের মধ্যে খলিফার জ্ঞানগরিমার তারিফ করে যিনি প্রমাণ করতেন যে, তার এলম ও খলিফার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন সংঘাত নেই।

যে আরবরা হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মুসলিম শক্তিকে আধা দুনিয়ার শাসনকর্তৃত্বের অধিকার এনে দিয়েছিল, এত সব বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও বাগদাদের

খলিফা ও সাধারণ মানুষ তাদের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্য ত্যাগ না করলে বাগদাদ ও বাকী আলমে ইসলামকে এমনি করে লজ্জাজনক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হত না। ওয়ালিদ বিন আবদুল মালেকের জামানায় আরবরা যে সেনাবাহিনী নিয়ে সিন্ধু, তুর্কীস্থান ও স্পেন জয় করেছিলেন, পতনযুগেও আব্বাসীয় খলিফার সেনাবাহিনীর সংখ্যা তার তিনগুণ ছিল। আলমে ইসলামের উপর যত বড় হামলাই আসুক, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের মধ্যে তফাৎ ছিল এই যে, উমাইয়া খলিফা তাঁর ফৌজের শেষ সিপাহীটিকে পর্যন্ত দূর দরায এলাকার যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিতেন। আর আব্বাসীয় খলিফারা বাগদাদের চার দেয়ালের মধ্যে থেকেও নিজের জান বাঁচাবার জন্য দু'তিন লাখ নামজাদা যোদ্ধার প্রয়োজন অনুভব করতেন। উমাইয়া খান্দানের খলিফার সেনাবাহিনী দূরদরায মুলুকের ইসলাম বিরোধী সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। এই কারণে তারা কখনও ভিতরের দ্বন্দ্ব কলহের হিস্যাদার হত না। তাদের বিজয়ের নতুন খবর আওয়ামের মধ্যে সঞ্চার করত কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্যের নতুন উদ্দীপনা। কখনও কোন বিদ্রোহের উদ্ভব হলে সেনাবাহিনী তাতে সমর্থন দিত না। উমাইয়া খলিফাগণ বিভিন্ন দলের সিপাহীদেরকে আলাদা আলাদা দলবদ্ধ হতে দিতেন না। সকল কওম, সকল দেশ ও সকল দলের সিপাহী তাঁদের ফৌজে এসে সমমর্যাদার অধিকার পেত। উচ্চপদের যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন লোকের জন্য তরক্কীর পথ ছিল খোলা। কোন দলের সরদারের পুত্র হত ফৌজের মামুলী সিপাহী, আর সেই দলেরই এক সাধারণ মানুষের পুত্র নিজের প্রতিভা ও যোগ্যতা বলে হতে পারত ফৌজের সিপাহসালার।

আব্বাসীয়দের ক্ষমতা লাভের সাথে সাথে আলমে ইসলামে যে দ্বন্দ্বকলহ ও অনৈক্যের সূচনা হয়েছিল, আব্বাসীয় খলিফাদের পতনের সাথে সাথে তা আরও ব্যাপকভাবে দেখা দিল। এমন কি, যে বিরাট সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ বনু উমাইয়া বংশের গৌরবের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়েছিল, তাও বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিভিন্ন রাজ্যের আমীররা নিজেরাই স্বাধীন সুলতান হয়ে বসলেন। কথা ছিল এই যে, যদি আব্বাসীয় খলিফাগণ বাগদাদের সব মসজিদে নিজেদের নামের সাথে এসব সুলতানের নামও খোতবা পড়াতে রাজি হতেন, তাহলে তাঁরাও নিজ নিজ রাজ্যে মসজিদের খতিবদেরকে খলিফার নামে খোৎবা পড়বার অনুমতি দিতেন। খলিফা তাঁদের নামে খোতবা বন্ধ করে দিলে তাঁরাও খলিফার নামে খোতবা পড়া বন্ধ করে দিতেন। সেলজুক সুলতানদের শাসন আমলে আব্বাসীয় খলিফা ছিলেন তাঁদের হাতে ক্রীড়নক।

আব্বাসীয় খলিফারা যে সব ইরানী ও তুর্কী আমীরদেরকে বাগদাদে এনে জমা করেছিলেন, তাঁদের নিজ নিজ দলের সিপাহীদের নেতৃত্ব তাঁদেরই উপর ন্যস্ত ছিল। খলিফা সিপাহশালার অথবা উজিরে আজমের প্রতি আনুগত্য ছিল নিজের দলীয় আমীরের প্রতি আনুগত্যের শর্তসাপেক্ষ। খলিফার গুপ্তচর এসব ওমরাহের উমর রাখতো কড়া নজর। কারুর দিক দিয়ে ষড়যন্ত্রের বিপদ সম্ভাবনা

দেখা দিলে তাঁকে এবং তাঁর দলের সিপাহীদের হয় কোন বিদ্রোহী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো হত, অথবা অপর কোন উপায়ে খতম করে দেয়া হত।

এমনি করে আমীরদের গুপ্তচররাও খলিফার মতলব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকবার চেষ্টা করত। বরং একদিকে ইতিহাসে যেমন আমরা পাই যে, কখনও কখনও খলিফার দস্তরখান থেকে বর্তনের সাথে সাথে কিছু লোকের লাশও তুলে নিতে হত, তেমনি অপরদিকে এরূপ ঘটনাও দেখতে পাই যে, খলিফাতুল মুসলেমিন একদিন গোসলের জন্য হাম্মামে ঢুকলেন, আর খানিক্ষণ পরে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তাঁর লাশ।

বাগদাদের লোক আব্বাসীয় শাসনের কতটা সমর্থক ছিল, তা অনুমান করা আমাদের পক্ষে মুস্কিল, কিন্তু ইতিহাস থেকে এতটা খবর অবশ্যি পাওয়া যায় যে, তাঁদের মৃত্যুর পর লোক তাঁদের লাশকে বে-ইজ্জত করবে মনে করে কোন কোন খলিফা নিজের কবরের আশেপাশে আরও শত শত নকল কবর তৈরী করবার উপদেশ দিয়ে যেতেন, যাতে কোন লোক সহজে তাঁদের কবর চিনে নিতে না পারে।

কিন্তু এসব ব্যাপার সত্ত্বেও আলমে ইসলামের উপর হাসান বিন সাবাহ্‌ ও তাঁর পরবর্তীদের কার্যকলাপের প্রভাব না পড়লে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়ত এতটা দ্রুতগতিতে নেমে আসতো না। মালিক শাহ্‌ সেলজুকীর মৃত্যু ও তাঁর উজিরে আযম নিজামুল মুল্‌কের হত্যার পর আলমে ইসলামে এই বিপজ্জনক আন্দোলনের গতি প্রতিরোধ করবার চেষ্টা কেউ করতে পারেননি। ফলে আগের শতাব্দীতে হাসান বিন সাবার অনুসারীরা আলমে ইসলামের জ্যোতিদীপ্ত সিতারারাজিকে ক্রমাগত মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছে। যে সব সত্যনিষ্ঠ ওলামার উপর আলমে ইসলাম সঠিক পথ নির্দেশের জন্য নির্ভর করতে পারত, তাদেরকে একে একে হত্যা করা হতে লাগল। এমনি করে যখন খারেযম ও বাগদাদের উপর তাতারী সেনাবাহিনী আল্লাহর গজবের মত নাযিল হল, তখনও আলমে ইসলাম মানুষের এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করেছে।

বাগদাদে পৌঁছে তাহির বিন ইউসুফ চারদিন কাজী ফখরুদ্দীনের বাড়ীতে কাটালেন। এই সময়ের মধ্যে বাগদাদের কয়েকটি গলিকুচা, বিদ্যায়তন ও কুতুবখানার সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছে। কাজী ফখরুদ্দীনের নিজস্ব কুতুবখানায় ছিল পাঁচ হাজারের বেশী কিতাবপত্র। ফিকহ, ন্যায়শাস্ত্র ও ইতিহাস নিয়ে তিনি নিজেও বহু কিতাব লিখেছেন। তা দিয়ে কাজী ফখরুদ্দীনের প্রচুর অর্থাগম হয়। তাহির তাঁর পিতার পুরানো সাথী মহসীনের খবরও পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর গোটা পরিবার পরিজন মিসরে গিয়ে বাস করছে।

ফখরুদ্দীন গৃহে তাহির ও যায়েদের ঘোড়া রাখবার জায়গা ছিল না। তাই তিনি তাঁদের ঘোড়া দু'টোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এক পড়শীর আস্তাবলে। তাহির এসেই তাঁর নিজের জন্য একখানা আলাদা বাড়ীর প্রয়োজন তাকে জানিয়েছেন, কিন্তু ফখরুদ্দীন চারদিন ধরে সে কথাটি এড়িয়ে গেছেন। পঞ্চম দিনে তিনি তার সাগরেদদের তাহিরের জন্য একখানি ভাড়াটে বাড়ী দেখতে বললেন। এক ইহুদী দালাল তাকে দু'খানা বাড়ি দেখিয়ে বলল যে, খরিদ করতে চাইলে বেশ

সস্তা দামেই পাওয়া যাবে এসব বাড়ি।

তখনওকার দিনে বাগদাদের কতক ওমরাহ হিন্দুস্থান, খারেযম, মিসর ও আন্দালুসিয়ার শাসকদের অধীনে চাকুরী নিয়েছেন। বাগদাদে তাদের আলীশান বালাখানা বিক্রি হচ্ছে খুবই কম দামে। তাহির ও যায়েদ যত বাড়ি দেখেছেন তার মধ্যে এমন একটিও নেই, যা কিনবার জন্য যায়িদ আগ্রহ না দেখিয়েছে। কিন্তু তাহির কাজী ফখরুদ্দীনের পরামর্শ নেয়া জরুরী মনে করেছেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বাড়ি খরিদ করার ব্যাপারে কাজীর মতামত জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেনঃ খরিদ বাড়ির দাম অনেকটা কমে গিয়েছে। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ বাগদাদের সাথে জড়িয়ে ফেলেছ। এখনকার উঁচু স্তরের লোকেরা ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দাকে ততটা আমলই দেন না। তোমার বিদ্যাবুদ্ধি ও বীরত্ব দেখবার আগে লোক দেখতে চাইবে তোমার বাড়িঘর। তোমার কাছে বাড়ি খরিদ করার মত যথেষ্ট অর্থ থাকলে অবশ্যি খরিদ করা উচিত, কিন্তু বাড়ি খরিদ করার পরও তোমার কাছে দু'চার বছর চলার মত যথেষ্ট অর্থ থাকা প্রয়োজন। সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার তোমায় অবশ্যি পরিচিত করে দেবে বাগদাদের বড় বড় লোকদের সাথে, কিন্তু গরীবের সাথে কেউ বেশী সময় বন্ধুত্ব বজায় রাখবে না। বাগদাদের যে পদমর্যাদা ব্যক্তিগত যোগ্যতা দিয়ে কেনা যায় না, তা কেনা যায় তোহফা দিয়ে।

তাহির তাঁর জিব থেকে থলে বের করে খুলে ফখরুদ্দীনের সামনে জওয়াহের তুলে ধরে বললেনঃ এর সঠিক দাম আমার জানা নেই। আপনি একে বাড়ি খরিদ করার ও কয়েক বছরের প্রয়োজন মিটাবার মত যথেষ্ট মনে করেন কি? কাজী এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে জওয়াহেরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেনঃ এসব জওয়াহের নকল না হলে তুমি কাসরে খুলদ ছাড়া বাগদাদের যে কোন বাড়ি খরিদ করতে পারবে। কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি আর দৌলত তো কখনও একত্র হয় না। এ তুমি কোথায় পেলে?

তাহির জবাব দিলেনঃ এও সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর দান।

কাজী ফখরুদ্দীন কয়েক খন্ড হীরা হাতের তালুতে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে বললেনঃ তুমি বাগদাদের সব চাইতে ধনী ব্যক্তিদের একজন। তোমার জন্য তরক্কীর কোন দরজাই বন্ধ থাকবে না। কিন্তু শোন! তুমি ছাড়া আর কেউ তো এর খবর রাখে না?

ঃ একমাত্র চাচা আহমদ জানেন।

ঃ আর যায়েদ?

ঃ ওকে আমি বলিনি। কিন্তু বললেও লোকটি বিশ্বাসযোগ্য।

ফখরুদ্দীন জলদি উঠে গিয়ে কামরার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ফিরে এসে বসতে বসতে বললেনঃ বেটা! তোমার জন্য এ জওয়াহের গোপন করে রাখাই ভাল হবে।

তাহির হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তা হলে বাগদাদে কি চোরও

আছে?

কাজী জওয়াব দিলেনঃ বাগদাদে চোরের হাত কাটা যায়। কিন্তু তোমার এমন সব কৃষ্টিসম্পন্ন ডাকাতের ভয় রয়েছে, যাদের হাতে চুমু খাওয়া হয়।

ঃ আপনার এ কথার মানে-?

ঃ আমি কোন বিশেষ লোকের নাম নেব না। দরবারে কতক ওমরাহ্ এমনও রয়েছেন, যাদের দামী জওয়াহেরর হাত করবার লোভ রয়েছে। তার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে তারা নৈতিক কর্তব্যবোধ পর্যন্ত ভুলে যান। যতদিন তুমি এখানে অপরিচিত, ততদিন এদের সম্পর্কে তোমার খোঁজ খবর রাখতে হবে।

ঃ তারা আমার কাছ থেকে এ দৌলত জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নেবে?

কাজী জওয়াব দিলেন ঃ অতটা বে-অকুফ তারা নন। তারা কি এতটুকু খবর জানেন না যে, জবরদস্তি করতে গেলে সাধারণ লোকের নজর শিগগিরই তাদের উপর পড়বে?

ঃ আশ্চর্য! খলিফার কাছে এ ধরণের লোকদের জবাবদিহি করতে হয় না?

ঃ খলিফা এসব লোকের কাছে কৈফিয়ত দাবী করলে দরবারে তাঁর সামনে বহু দামী তোহ্ফা পেশ করবে কারা? তাছাড়া প্রত্যেকটি লোকের আওয়াজ কি আর খলিফার কানে পৌঁছে? আওয়াম তাঁর দর্শন পায় কেবল ঈদের দিনে, আর তাও বেশ দূর থেকে। বাগদাদে তোমার কোন প্রভাব নেই। কেউ চেনে না তোমায়। ওমরাহ তোমার বিরুদ্ধে কোন রকম চক্রান্তও করতে পারেন। হয়তো তারা বলে দেবেন, তুমি খারেযম শাহের গুপ্তচর। তারপর খলিফার কাছ থেকে বিচার ছাড়াই তোমার মৃত্যুদন্ডের হুকুম বের করে নিয়ে আসবেন।

ঃ এমনি অবস্থায় সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার আমায় নিষ্পাপ প্রমাণিত করবে না?

ঃ তারা হয়ত বলবেন, মিসর সরকার বাগদাদ সাম্রাজ্য ওলট পালট করবার জন্যই তোমায় পাঠিয়েছেন।

তাহির খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ দৌলতের মুহাব্বত আমার নেই। এক অতি বড় মকসাদ নিয়ে আমি বাগদাদ এসেছি। দরবারে খিলাফতে ঢুকবার অধিকার আমি কেবল এই জন্য হাসিল করতে চাচ্ছি যে, নেক নিয়ত নিয়ে খলিফার উপদেষ্টা হতে পারলে আমি সরকারের বৈদেশিক নীতিতে পরিবর্তন আনতে পারব। আলমে ইসলামের উপর চার দিক থেকে ঘনিয়ে আসছে ভয়াবহ বিপদের সঙ্কেত-আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস। ইসায়ী শক্তির সাথে অতীতে যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে গেছে, তাতে দরবারে খিলাফতের নির্বিকার ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তা পশ্চিমের নাসারা শাসকদের উদ্যম-উদ্দীপনা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী প্রচন্ড বিক্রমে তাদেরকে পরাজিত করে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত করেছেন, কিন্তু ইসলামী ও ইসায়ী শক্তির মধ্যে এই চূড়ান্ত সংগ্রামে দরবারে খিলাফতের কর্মপন্থা ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। পরাজয় সত্ত্বেও সে সংগ্রাম ইউরোপের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাগদাদ ব্যতীত আলমে ইসলামের বাকী অংশের জন্য খলিফার কোন মাথা

ব্যথা নেই এবং সব চাইতে জরুরী অবস্থাও তিনি লড়াইয়ের ময়দানে কতিপয় রেজাকার পাঠানোর বেশী কিছুই করবেন না। এই কারণেই তারা আবার নতুন করে সংঘবদ্ধ হয়ে মিসর সাম্রাজ্যকে ধুলিসাৎ করবার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। মিসর সাম্রাজ্যই হচ্ছে ইসায়ী সয়লাবের সামনে আলমে ইসলামের সর্বশেষ প্রাচীর। সম্ভবতঃ এ প্রাচীর অপরের সাহায্য ছাড়াই সে তুফানের গতি ফিরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব থেকে চেংগিস খানের রূপ নিয়ে উঠে আসছে আর এক ভয়াবহ তুফান। খারেযম সাম্রাজ্যের সীমান্ত পারে এই নয়া তুফান প্রতিরোধ করতে না পারলে একদিন তা এই বাগদাদকেও স্রোতমুখে তৃণগুচ্ছের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বাগদাদের ছাউনীতে মজুত রয়েছে এক অতি বড় ফৌজ, কিন্তু বাগাদাদের ফৌজের সামনে কোন সম্মিলিত যুদ্ধের ময়দান ও উচ্চ আদর্শ নেই বলেই বাগদাদ হয়েছে ফৌজী সরদারের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। তাদের জিন্দেগী সেই জাহাজীদের জিন্দেগীর মত নয়, যারা নিত্য নতুন দেশ, নতুন পথ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়ে যায় ঘর ছাড়া হয়ে এবং সাথীদের প্রতি হিংসাবিদ্বেষ পোষণ না করে তাদেরকে আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত মনে করে তাদের জন্য জান কোরবান করতে এগিয়ে যায়। ভয়াবহ তুফান ও দুর্লংঘ্য ঢেউ জাহাজের মাল্লাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির পরিবর্তে তাদের ভিতরকার ঐক্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক আরও মজবুত করে তুলে। কিন্তু বাগদাদের বাসিন্দারা হচ্ছে সেই জেলেদের মত, যারা ছোট ছোট ডোবার মাছের ভাগ নিয়ে করে লড়াই; যাদেরকে একথা বলবার কেউ নেই যে, এ দুনিয়া সীমাহীন সমুদ্রের মত অনন্ত। যদি তারা এ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ হয়ে উঠতে না-ই পারে, তাহলে অপর দিক থেকে উঠে আসা তুফানের মউজ তাদেরকে ভাসিয়ে নিবে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করছি। এই কর্তব্যের অনুভূতি আমায় টেনে এনেছে বাগদাদের মাটিতে। ঘর থেকে বিদায় নেবার কয়েকদিন আগেও আমার জানা ছিল না, আমার মুস্কিল আসান করবার জন্য এতটা দৌলত মজুত রয়েছে। সালাহউদ্দীন আইউবীর রক্ত ও ঘামের প্রতিটি বিন্দু ছিল ইসলামের জন্য উৎসর্গিত। আমি জানি তাঁর দেওয়া এ দৌলত আমি ইসলামের কোন খিদমতে লাগাব। তাই আমার নিজের জন্য এ দৌলত হেফাজত করবার উৎসাহ আমার ততটা নেই, যতটা রয়েছে ইসলামের রাহে তা খরচ করবার আগ্রহ। যখন আমি বুঝবো যে, এর উপর কোন আমীরের নজর পড়েছে, সেদিন বাগদাদের নিঃস্ব দরিদ্রের ভিতর আমি এ অর্থ বিলিয়ে দেব। কোন সম্পদলোভী আমীরের ভাণ্ডারে এ অর্থ আমি যেতে দেব না। যে আকাঙ্খা আমি আপনার কাছে ব্যক্ত করলাম, তা হাসিল করবার জন্যই আমায় দরবারে খিলাফতে ঢুকবার অধিকার লাভ করতে হবে। গত চারদিনে আমি বাগদাদ সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছি, তাতে আমার বিশ্বাস, এখানকার আওয়ামকে এখনও কোন নির্ভুল আদর্শে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। সব চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে, ওমরাহ দলের মনোভাব সংশোধন। এ গৃহের মেঝে ও প্রাচীর নিরাপদ রয়েছে, কেবল ফাটল দেখা যাচ্ছে ছাদে, সেই ছাদে পৌঁছবার জন্যই আপনার

সাহায্য আমার প্রয়োজন।

কাজী ফখরুদ্দীন বললেনঃ খোদা তোমার নেক ইরাদা পুরো করবেন। আমার মনে হয়, এ অবস্থায় সব চাইতে বড়ো প্রয়োজন এক আলীশান বালাখানা। তোমার আস্তাবলে থাকবে সব চাইতে ভাল ঘোড়া। যদি তুমি বাগদাদের ময়দানে পোলো খেলায় ও নেজাহ বাজিতে নাম করতে পার, তাহলে শিগগিরই তুমি আমীরদের নজরে পড়বে। তারপর এর ভিতর থেকে দু-এক টুকরো দামী হীরার তোহ্‌ফা তোমার দরবারে খেলাফতে পৌছে দেবে। এর পরই তুমি তোমার এলমের পরিচয় দিতে পারবে। বাগদাদের ভবিষৎ কল্যাণ যদি আল্লাহর মঞ্জুর থাকে, তাহলে তুমি খলিফার কাছেও বিশ্বাসের পাত্র হবে। কিন্তু এখনকার মত তোমার ইরাদা কাউকেও জানিও না। খারেযম শাহকে খলিফা তাঁর নিকৃষ্টতম দুশমন মনে করেন, আর এ দুশমনির দায়িত্ব তাঁর উপরও বর্তে।

তাহির বললেন ঃ আমি জানি, তিনি বাগদাদের উপর হামলা করে খুবই অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু খলিফা খারেযম সাম্রাজ্যের নাম নিশানা মিটিয়ে দেবার জন্য চেংগিস খানের সাহায্য গ্রহণ করলে সে ভুল আর কখনও সংশোধন করা যাবে না।

কাজী ফখরুদ্দীন এক টুকরা হীরা হাতে নিয়ে বললেন ঃ এ সব জওয়াহেরাতের সম্পর্কে আমার নিজের কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই এক টুকরা হীরা দিয়ে তুমি বাগদাদে খুব ভাল বাড়ি খরিদ করতে পারবে। আমি এক আর্মেনিয় ব্যবসায়ীকে খুব ভাল করে জানি। চলো, তাঁর কাছে যাই। বাকী হীরা তুলে নিজের কাছে রেখে দাও। ব্যবসায়ীটি খুবই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু একথা তাঁকে যেন বল না যে, তোমার কাছে এ রকম হীরা আরও রয়েছে।

আছরের নামায পর তাহির ও কাজী ফখরুদ্দীন আর্মানিয় ব্যবসায়ীর কাছে পৌছলেন। তিনি হীরা হাতে নিয়ে মুহূর্তকাল দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেনঃ 'আপনি এ হীরা কোথায় পেলেন?'

তাহিরের বদলে কাজী জওয়াব দিলেনঃ এ হচ্ছে এক বুড়ো লোকের তোহ্‌ফা।

ব্যবসায়ী বললেনঃ সম্ভবত এর পুরো দাম আমি এখখুনি দিতে পারবো না। আপনি মনযুর করলে আমি এখখুনি এর অর্ধেক দাম দেব, আর বাকী অর্ধেক কাল ভোরে দেব।

কাজী প্রশ্ন করলেনঃ এর দাম কত হবে?

ব্যবসায়ী হীরার টুকরাটি দু'তিন বার ভাল করে দেখে বললেনঃ আমি এর জন্য পঞ্চাশ হাজার দিনার দিতে তৈরী।

পঞ্চাশ হাজার? কাজী হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু সওদাগর তাঁর হয়রানির বিপরীত মানে বুঝে হীরার টুকরাটি আবার দেখে নিয়ে বললেনঃ দেখুন, আপনি আমার দোস্ত। আমি ষাট হাজার পর্যন্ত দিতে রাজি। বাগদাদে আর কেউ এর চাইতে বেশী দাম দেবে না।

কাজী বাগদাদের মশহুর ইহুদী জওহরীর কাছ থেকে এর বেশী দাম আশা করছিলেন, কিন্তু তিনি হীরকখন্ডটি এমন কোন দোকানে বিক্রি করতে রাজী ছিলেন না, যেখানে দরবারী আমীরদের গুপ্তচর সব সময় হাজির থাকে। এই এক টুকরো হীরার দাম শুনেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, তাহির তার আন্দাজের চাইতে অনেক বড় দৌলতমন্দ। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে তিনি বললেনঃ আর একটু ভাল করে দেখুন এর দাম সত্তর হাজারের কম হবে না। সওদাগর খানিকক্ষণ কাটাকাটি করে প্রথম দু'হাজার, তারপর পাঁচ পাঁচ শ' করে বাড়িয়ে চৌষট্টি হাজারে উঠলেন। অবশেষে সাড়ে চৌষট্টি হাজার দিনারে হীরকখন্ডটি বিক্রি হয়ে গেল।

রাতের বেলা যখন কাজী ফখরুদ্দীন, তাহির ও আরও কয়েকজন মেহমান খেতে বসেছেন, তখনও যায়েদ সেখানে হাজির নেই। ফখরুদ্দীন তাঁর নওকরের কাছে তার কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে জানালো যে, চক মামুনিয়ায় হচ্ছে এক বিরাট বিতর্ক সভা। মাগরিবের নামাযের পরেই যায়েদ খেয়ে চলে গেছে সেখানে।

এশার নামাজ পড়ে তাহির নিজের কামরায় বসে মোমবাতির আলোয় এক কিতাব পড়ছেন। রাত যত কাটছে ততই যায়েদের কথা ভেবে তাঁর উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে। বারবার উঠে দরজার কাছে গিয়ে তিনি বাইরে তাকাচ্ছেন, আবার ফিরে এসে কিতাব নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছেন। একটি মোমবাতি শেষ হয়ে গেলে তিনি আর একটি জ্বাললেন। তারপর কুরসি থেকে উঠে বিছানার উপর শুয়ে পড়লেন। কয়েকবার তার মনে খেয়াল হল চক মামুনিয়ায় গিয়ে তিনি যায়েদকে খুঁজে দেখবেন, কিন্তু হাজারো লোকের ভিড়ের মধ্যে তাকে পাবেন না মনে করে সে খেয়াল ছেড়ে দিলেন।

দুপুর রাতের কাছাকাছি কে যেন বাইরে দরজা খট খট করল। তাহির কান পেতে শুনলেন, কাজীর এক নওকর আর একজনকে বলছেঃ ওঠ, দরজা খোল। যায়েদ বুঝি এল। দ্বিতীয় নওকর জওয়াব দিলঃ তুমি নিজে গিয়ে খুলছো না কেন? খানিকক্ষণ পরেই দরজা খোলার আওয়াজ ও কাজীর নওকরদের কলরব তাহিরের কানে এল। এক নওকর বলছেঃ হামীদ ওঠ! একবার যায়েদের সুরতখানা দেখ। তারপর দুজনেই হেসে উঠল। এক নওকর বলছেঃ দেখলে তো তোমায় আমি নিষেধ করছিলাম না! শোকর করো, চোখটা বেঁচে গেছে।

তাহির দ্রুত পাশ ফিরলেন। মুখ চাদরে ঢেকে একটুখানি ফাঁক করে দরজার দিকে তাকাতে লাগলেন। যায়েদ বিড়বিড় করতে করতে ঢুকলো। তার গায়ের কামিয ছিঁড়ে গেছে। ডান গাল আর নাক ফুলে রয়েছে। বাম চোখের নিচে কোন বলিষ্ঠ হাতের ঘুষির কালো দাগ। যায়েদ একটু সময় নিজের বিছানার উপর বসে আবার উঠল। তারপর দেওয়ালে লটকানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সুরত দেখে বলে উঠলঃ দোস্ত, এবার আমিই

তোমায় বড় কষ্ট করে চিনতে পারছি। বেশ তামাশা দেখতে গিয়েছিলে তুমি! তারপর নিজের গালে চড় মেরে আবার গিয়ে বিছানার উপর বসল।

যায়েদ তুমি এসেছ? তাহির হাসি সংযত করবার চেষ্টা করে বললেন।

যায়েদ তার দিকে তাকিয়ে দেখলো। তাহির মুখের উপর থেকে চাদর তুলে তার চেহারা দেখে ফেলবেন মনে করে যায়েদ উঠে অমনি নিভিয়ে দিল মোমবাতিটা। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বললঃ হ্যাঁ, আমি এসেছি।

ঃ বড্ড দেরী করলে যে! কি শিখলে ওখানে?

গালিগালাজ ঃ যায়েদ বিষণ্ন কণ্ঠে জওয়াব দিল।

ঃ তোমার গলার আওয়াজ বড়ো ভারী লাগছে। সব খবর ভাল তো?

যায়েদ উদাস হাসি হেসে জওয়াব দিল ঃ আমি বিলকুল ঠিকই আছি।

তাহির বললেনঃ তোমার আওয়াযে মালুম হচ্ছে যেন তোমার নাকে ব্যথা রয়েছে।

যায়েদ বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে বসতে জওয়াব দিলঃ নাকের চাইতে আমার চোখের ব্যথাটাই বেশী। তাহির খলখল করে হেসে ফেললেন।

যায়েদ খানিকটা ভেবে বললঃ তাহির! এক মুসলমানের গায়ে অকারণে হাত তোলা গুনাহ্ নয় কি?

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ যে কোন লোকের উপর অকারণে হাত তোলা গুনাহ্।

ঃ যদি কেউ অকারণে হামলা করে বসে?

ঃ তখনও চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁতের কানুন আমল করতে হয়, তবে মাফ করে দেওয়াটা আরও ভাল।

ঃ আমি বহুত মাফ করেছি, কিন্তু নাকে আঘাত খেলে মানুষের তবিয়ৎ ঠান্ডা থাকে না। আমি ওদের সবগুলো ঘুষিই তো মাফ করেছিলাম, কিন্তু নাক আর চোখের আঘাতটা অমনি ছেড়ে দেওয়া গেল না। তবু আমার সন্দেহ, চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ঘুষিগুলো হয়তো ঠিক জায়গামত লাগেনি। জিন্দেগীভর তীর-তলোয়ার চালানো শিখেছি, কিন্তু এখানে এসে এবার বুঝতে পারছি, বাগ্‌দাদে থাক্‌তে হলে ঘুষাঘুষি ও কুশতি লড়বার বিদ্যাটাও শিখে নেওয়া জরুরি।

তাহির বললেনঃ মালুম হচ্ছে, তুমি বিতর্কের শেষের দিককার পুরোপুরি হিস্সা নিয়ে ফিরেছ।

ঃ শেষের দিকটা যে এমন হবে, তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। বিশ্বাস করুন, হাতাহাতি মারামারি শুরু হলে আমি দূরে বিলকুল আলগা হয়েই দাঁড়িয়েছিলাম। যদিও মোটাতাজা ভারী গলার যে লোকটা অংশ নিয়েছিল, তার সামনে জীর্ণশীর্ণ সরু গলাওয়ালা আলেম লোকটির উপর আমার মনে সহানুভূতি জেগেছিল, তবু মারামারির বেলায় আমি একদিকে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু যখন দুটি বোযর্গ চেহারার লোক পরস্পরের দাড়ি ধরে গালাগালি দিতে দিতে আমার কাছে এসে পড়লো, তখনও আমি আর থাকতে পারলাম না। এক লাফে আমি গিয়ে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালাম। খুব কষ্টে তাদেরকে আমি আলাদা

করে দিলাম, কিন্তু তখনও তারা দুস্তরমত গালাগালি দিয়ে চলেছে। তখনওও আমি তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। এরই মধ্যে আরও তিনজন নওজোয়ান এসে পড়ল। তারা এসে দুই বুড়োর একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি বাধা দিলে বুড়ো তো ছুটে গিয়ে নহরের ভিতর লাফিয়ে পড়বার মওকা পেল। কিন্তু তিনজনই এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর। আমি তখনও প্রাণপণে চীৎকার করছি। আমি বিদেশী লোক, ভাই! কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, আমার উপর ভীষণ পিটুনী চলছে। যে বুড়ো তখনও পাশে দাঁড়িয়েছিল, তার দুশমনকে আমি ভাগবার সুযোগ দিয়েছি মনে করে সে হয়তো ক্ষেপেই ছিল। সে এসে তার কাঁপা হাত দু'টো দিয়ে আমার কামিযের উপর দিকটা ছিঁড়ে ফেলল। আমি নাকে আর চোখে আঘাত লাগার আগে তার উপর হাত তুলিনি। এরপর আমার কয়েকটি ঘুষি ফাঁকা গেল। তারপর একজন আমার চড় খেয়ে জমিনের উপর বসে পড়ল, দ্বিতীয়টি এক ঘুষিতে শুয়ে পড়ল, আর তৃতীয়টি আমায় ঘুষি ভয়ানক মনে করে আমার সাথে কুশতি শুরু করে দিল। সে আমায় তিনবার জমিনের উপর আছড়ে ফেলল। চতুর্থবার দু'জনে ধাক্কাধাক্কি করে নদীর কিনারে পৌছে গেলাম। আমায় ঠেলে নদীতে ফেলবার চেষ্টা করে সেও আমার সাথে সাথে পড়ে গেল। আমার খোশ্ কিসমত, পানি ছিল কম, নইলে তো ডুবেই মরে যেতাম। নদীতে পড়ে লড়াই করতে করতে আমি ওকে দু'টো ঘুষি বসিয়ে দিলে এবার ও হার মানলো। খোদার ইচ্ছা, আমার ঘুষি ওর নাকে আর চোখে লেগেছে।-তাহির! আমার মনে হয়, সাঁতার শেখাও এখানে খুবই দরকার। আপনি সাঁতার কাটতে জানেন কি?

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ খুবই মামুলী, কিন্তু আমার ইচ্ছা, রোজ ভোরে নদীতে সাঁতার অভ্যাস করব এক সিপাহীর পক্ষে ভাল সাঁতার কাটারও প্রয়োজন আছে।

ঃ আমিও শিখবো।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে যায়েদ বললঃ আপনি আমার উপর রেগে যাননি তো?

ঃ কি ব্যাপারে?

ঃ আমি না জানিয়ে ওখানে চলে গেছি।

ঃ আজকের অভিজ্ঞতা যদি তোমার জন্য লাভজনক হয়ে থাকে, তাতে আমার অখুশী হবার কারণ নেই।

ঃ লাভজনক-? আমি ওয়াদা করছি, জীবনে আর কখনও বিতর্ক শুনতে যাব না। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

ঃ সে আবার কি?

ঃ কথাটা হচ্ছে আজ বিতর্কের চল্লিশ রাত গেল। চল্লিশ দিন ধরে যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করছে তাদের প্রত্যেক দল নিজ দাবীকে নির্ভুল ও অপর পক্ষের দাবী ভুল প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তা সত্বেও একে অপরকে তাদের দাবী স্বীকার করাতে পারেনি। এর কারণটা কি?

তাহির জওয়াব দিলেনঃ এই ধরণের লোকের হাজার বছরেও একে অপরকে তার দাবী মানাতে পারবে না।

ঃ কিন্তু কেন?

তাহির বললেন ঃ এর কারণ হচ্ছে, বিতর্কে যারা অংশ নিচ্ছে, তারা একে অপরকে বুঝবার ও সত্যিকথা মেনে নেবার সদিচ্ছা নিয়ে পরস্পরের মোকাবিলা করে না। তাদের মকসাদ হচ্ছে নিজের বলবার শক্তি যাহির করা। ইসলামের যে ইমামদের নাম নিয়ে এরা লড়াই করে যায়, তাঁরা কোন দিন এমনি করে কুফরের ফতোয়া দেন নি। তাঁদের মকসাদ ছিল ইসলামের ইজতেহাদের দরজা খোলা রেখে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে এক জীবন্ত আন্দোলন গড়ে তোলা। আর এসব লোকেরা তাঁদেরই নাম নিয়ে ইসলামে বিদ্বেষ ও অনৈক্যের বীজ বপন করছে।

ঃ কিন্তু এর প্রতিকার?

ঃ এর প্রতিকার হচ্ছে এই শান্তিপ্রিয় লোকদের জন্য কর্মের ময়দান খুঁজে নেওয়া। আমাদের সামনে যদি কর্মের ময়দান খোলা থাকে, তাহলে যেসব ওলামা শান্তির জামানায় মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির অনৈক্য সৃষ্টি করছেন, তাঁদেরকে দিয়েই মুসলমানদের সামাজিক শক্তি সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করা যেতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে যামানায় মুসলমান বিজয়ের আকাংখা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেত, তখনও এ ধরণের সংঘাত সৃষ্টি হত না। কুফরের উপর ইসলামের বিজয়ের আকাংখা হামেশা তাদের মধ্যে সঞ্চার করত ঐক্য ও সংহতির অনুপ্রেরণা। অমনি এক জামানাও ছিল, যখন মুসলিম বাহিনী একই সময়ে সিন্ধু, তুর্কীস্থান ও আন্দালুসিয়ায় লড়াই করেছে, কিন্তু মুজাহেদীন কখনও বিতর্কের প্রয়োজন অনুভব করেছেন বলে শোনা যায়নি। আর আজ যখন দিগন্ত পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধ্বংসের আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস, তখনও আমাদের ওলামা চারদিক থেকে চোখ বন্ধ করে অভ্যন্তরীণ অনৈক্য সৃষ্টি করে চলেছেন। যে কওমের তলোয়ার থাকে কোষবদ্ধ, তাদের কলমও ভুল পথে চালিত হয়।

জায়েদ বলল ঃ বাজারে জোর গুজব, পশ্চিম থেকে নাসারা বাদশাহ মিসরের উপর প্রচণ্ড হামলা চালাবার আয়োজন করছেন, আরও সম্ভবতঃ খারেযমের উপর হামলা করতে আসছেন চেংগিস খান। খলিফা যদি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন, তাহলে সবার আগে আমি সেই দুই ওলামার কাছে গিয়ে বলবোঃ আমি তেগ ও কাফন বেঁধে ময়দানে যাচ্ছি। চক মামুনিয়ায় তোমরা ইসলামের যে মুহাব্বত জাহির করেছ, এবারে এস, যুদ্ধের ময়দানে তার পরীক্ষাটা হয়ে যাক। আপনি আমায় একটা বর্ম খরিদ করে দেবেন না?

ঃ আমার ওয়াদা মনে আছে, কিন্তু তুমি না বর্ম পরতে অস্বীকার করেছিলে?

ঃ তখনও আমার শরীরটার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন? আজ আমি ফৌজের কয়েকজন বর্ম-পরা সিপাহীকে দেখেছি। নতুন বর্ম শরীরে বেশ মানায়।

ঃ কাল আমি তোমায় একটা নতুন বর্ম কিনে দেব।

ঃ আর নিজেও?

ঃ নিজেও নেব একটা।

ঃ আমায় সাঁতারও শিখিয়ে দেবেন না?

ঃ তাও শিখিয়ে দেব।

কিছুক্ষণ পর যায়েদ আবার বললঃ তাহির! একটা কথা আমি আপনাকে বলিনি। সে আবার কি? ঃ তাহির পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন।

ঃ যখন আমি নদী থেকে উঠে এদিকে আসছি, তখনও যে বুড়ো আমার কামিয ছিঁড়ে দিয়েছিল, তার সাথে দেখা। অমনি কিছু না ভেবে-চিন্তে তার মুখের উপর থাপ্পর মেরে দিলাম।

ঃ খুব খারাপ কাজ করেছ তুমি। আবার দেখা হলে মাফ চেয়ে নিও।

ঃ মাফ চাইলেও তা কবুল করবার মত লোক সে নয়। অবশ্যই পরে আমার মনে আফসোস হয়েছে।

ঃ আচ্ছা এবার শুয়েপড়।

তিন মাস পর; তাহির বাগ্‌দাদের আমীরদের মাহ্‌ফিলে যথেষ্ট খ্যাতি ও ইজ্জত হাসিল করেছেন। দজলার কিনারে তিনি এক আলীশান মকান খরিদ করে নিয়েছেন। যায়েদ ছাড়া আরও চারজন নওকর ও তিনজন সহিস তাঁর বাড়ির বাসিন্দা। পোলো ও নেজাবাযি খেলার জন্য তাঁর আস্তাবলে রয়েছে আটটা ঘোড়া। কাজী ফখরুদ্দীনের মেহমানখানা থেকে এই আলীশান মকানে চলে আসার পর তাঁর দিকে সবার আগে মনোযোগ দিয়েছেন বাগদাদের ওলামা। প্রথম দিনেই একে একে ওলামার পাঁচটি দল তাঁর সাথে দেখা করেছেন। সব দলের নেতারই এক দাবীঃ আপনি আমার দলে শামিল হয়ে যান। তাহির তাদের সবাইকে একই জওয়াব দিয়েছেনঃ যদি আপনারা আমায় ইসলামের দাওয়াত দিতে এসে থাকেন, তাহলে আপনাদেরকে একিন দিচ্ছি যে, আমি একজন মুসলমান। ইসলামের সঠিক তাৎপর্য আমি বুঝি। এমন কথা আপনারা আমায় বলবেন না, যা নিয়ে গত পাঁচশ' বছরে আপনারা একমত হতে পারেননি। কোন কোন ওলামা তাঁকে আবার বিতর্কের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাহিরের দু'চারটে কথা শুনেই তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে, এ নওজোয়ানের কাছে কেবল সোনাচাঁদির ভান্ডারই নেই, এলমের ভান্ডারও রয়েছে।

এরপর আমীররা ধীরে ধীরে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। ঘোড়ায় চড়ার কৌশল ভাল করে আয়ত্ত করা তখনওকার জামানায়ও আরব নওজোয়ানের উত্তরাধিকার মনে করা হত। মদীনায় আহমদ বিন্ হাসান তাকে সিপাহী বানাবার মত সবরকম বিদ্যা শেখানোর উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের সাহায্য নিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সের মাথায় তেগ্ চালনা ও নেযাবাযির কৃতিত্বের জন্য মদীনার নওজোয়ানরা তাঁকে প্রশংসার চোখে দেখতো। বাগদাদ পৌঁছে তাহিরের মনে হল, সেখানে পোলো খেলার কদর সব চাইতে বেশী।

শাহী মহলের সামনে এক বিস্তীর্ণ ময়দান। এই ময়দানে একদিকে সারি-বাঁধা উজিরে আযমের ও সালতানাতের বড় বড় আমীর-ওমরাহের বালাখানা। আমীররা শহরের যে সব সম্মানিত লোককে দাওয়াত দিতেন, তারা এসব মহলের ব্যালকনীতে বসে পোলো আর ঘোড়দৌড় খেলা দেখতেন। মহিলাদের

জন্য উপর তলার জানালায় থাকত হালকা পর্দা। ময়দানে খেলাধূলার ব্যবস্থা ন্যস্ত ছিল আলাদা এক নাযিমের উপর। তাহির নাজিমের সাথে পরিচয় করবার আগে পোলো খেলা ভাল করে শিখে নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। শহরে পোলো খেলার আরও অনেকগুলো ময়দান ছিল। তাহির এক ময়দানে খেলার অভ্যাস করতে শুরু করলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শহরের পোলো রসিক মহলে তাঁকে নিয়ে আলোচনা শুরু হল। তার বাপ বাহাদুরীর বদৌলতে সুলতান সালাহুউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার হাসিল করেছিলেন, এ কথাটি তখনও লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। আওয়ামের মুখের আওয়াজ আমীরদের কানেও গেল। তাঁরা উজিরে আযমকে এ খবর জানালেন। উজিরে আযম কোতোয়ালকে ডেকে অনুযোগ করলেন, কেন এ নওজোয়ানের সাথে তাঁর পরিচয় হল না।

তাই একদিন ভোরে যখন তাহির নদীতে গিয়ে সাঁতার কাটার অভ্যাস করছেন, তখনও যায়েদ ছুটে এসে কিনারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বললঃ আপনি এখনই উঠে আসুন। শহরের কোতোয়াল আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

তাহির উঠে এসে কাপড় বদল করতে করতে প্রশ্ন করলেনঃ তুমি ঠিক জান, উনি কোতোয়াল?

ঃ উনি নিজেই বললেন, উনি কোতোয়াল। ওঁর সাথে রয়েছে ছয়জন সশস্ত্র সিপাহী। তাঁদের সবাইকে আমি দেওয়ানখানায় বসিয়ে রেখে এসেছি। খোদা করুন, যেন ওরা ভাল নিয়তে এসে থাকে।

তাহির বললেনঃ অকারণে কারুর নিয়তের উপর সন্দেহ করতে নেই।

বাড়ীতে পৌছে তাহির জানলেন যে, কোতোয়াল উজিরে আযমের কাছ থেকে সাক্ষাৎ করবার দাওয়াত নিয়ে এসেছেন।

আমি এখখুনি তৈরী হয়ে আসছি।-বলে তাহির আর এক কামরায় চলে গেলেন। খানিকক্ষণ পর দামী পোশাক পরে ফিরে এসে তিনি কোতোয়ালের সাথে সাথে চললেন।

বাগ্দাদের উজিরে আজম ইফতেখারুদ্দীনের সাথে তাহিরের প্রথম সাক্ষাৎ ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। ইফতেখারুদ্দীন তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেনঃ বাগদাদে তুমি কবে এসেছ কোথেকে এসেছ এবং কি মক্সাদ নিয়ে এসেছ? তাহির এসব প্রশ্নের জওয়াব দিতে গিয়ে বললেনঃ তিন মাস দশ দিন হল, আমি এখানে এসেছি, আমি এসেছি মদীনা থেকে, আর আমার মক্সাদ হচ্ছে খিদমতে ইসলাম। খুবই নেক মক্সাদ।

ঃ উজিরে আজম নির্লিপ্তভাবে বললেন ঃ এ মক্সাদ তুমি আব্বাসীয় খিলাফতের খিদমতের ভিতর দিয়ে হাসিল করতে চাও, না কোন গোপন সংগঠনের সদস্য হয়ে? আমি শুনেছি, সুলতান সালাহুউদ্দীন আইউবীর তলোয়ারের বদৌলতে বাগ্দাদের আওয়াম তোমায় খুবই শ্রদ্ধা করে।

ঃ এ হয়তো সে মরদে মুজাহিদের তলোয়ারের প্রতিই শ্রদ্ধা। আমি নিজেকে কোন ইজ্জতের হকদার মনে করি না। আর আব্বাসীয় খেলাফতের খেদমতের

প্রশ্নে আমার আরজ হচ্ছে, এই যে, আমার দীলের মধ্যে যদি সে প্রেরণা না থাকত, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ আমি বাগদাদের সাথে জড়িয়ে ফেলতাম না। আব্বাসীয় খেলাফতের নির্ভুল খিদমতকে আমি ইসলামেরই খিদমত মনে করি।

ঃ নির্ভুল খিদমত বলতে তুমি কি বুঝ?

তাহির হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে, এই পাকা লোকটির সাথে আলাপ করতে গিয়ে তাকে খুবই সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে। কিছুটা চিন্তা করে তিনি জওয়াব দিলেনঃ বাইরের বিপদ সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে বাগদাদের আত্মরক্ষার শক্তি মজবুত করে তোলাকেই আমি মনে করি আব্বাসীয় খেলাফতের নির্ভুল খিদমত।

ইফতেখারুদ্দীন বললেন ঃ তুমি কি মনে কর মুহাম্মদ শাহ্ খারেযমের ফিরে যাওয়ার পরও বাইরের বিপদ কেটে যায় নি?

ঃ কিন্তু চেংগিস খানের দিক থেকে তো বিপদ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

ইফতেখারুদ্দীন স্বস্তির সাথে জওয়াব দিলেনঃ আমাদের জন্য নয়। খারেযমের জন্য।

ঃ আপনি কি তাতারী তুফানের সামনে খারেযমকে একা ছেড়ে দিতে চান?

ঃ এ অবস্থায় মোট কথা হচ্ছে, এখন খারেযম শাহ্ আমাদের কাছে মাফ চান নি, সাহায্যের আবেদনও করেন নি। আর এ বিশ্বাসও আমার নেই যে, চেংগিস খান কয়েকজন সওদাগরের হত্যার বদলা নেবার জন্য খারেযমের উপর হামলা করবেন, কেননা সেই সওদাগরের বেশীর ভাগই ছিল বোখারার মুসলমান।

ঃ কিন্তু আমি শুনেছি খারেযম সালতানাতের সাথে আব্বাসীয় খেলাফতের রাজনৈতিক সম্পর্ক আবার বহাল হয়েছে, এবং তাদের দূত এখানে পৌছে গেছেন।

ইফতেখারুদ্দীন এমনি সাথে সাথেই প্রশ্ন করলেন ঃ খারেযমের দূতের সাথে তোমার দেখা হয়েছে?

তাহিরের আবার মনে হল, তিনি ঠিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারছেন না। তিনি জওয়াব দিলেনঃ না তাঁর কাছে আমার কি কাজ?

ইফতেখারুদ্দীন বললেনঃ তোমার ধন-দৌলতের যে সব কাহিনী আমার কানে এসেছে, তা যদি সত্যি হয়, তা'হলে বাগদাদে তোমায় খুবই হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হবে। আমাদের হুকুমাত সরকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে বাইরের পরামর্শকে সন্দেহের নযরে দেখতে অভ্যস্ত। আর আমীরজাদারা সাধারণভাবে দায়িত্বজ্ঞানশূণ্য কাজ করে বসেন।

তাহির জওয়াব দিলেনঃ আমার কাছে যা' কিছু আছে, তা আব্বাসীয় খেলাফতের কল্যাণের জন্যই খরচ হবে, এ বিশ্বাস আপনি রাখতে পারেন। যদি এজাযত দেন, তাহলে আমি আপনার সামনে একটি তোহ্ফা পেশ

করবার সাহস করি।

ইফতেখারুদ্দীন দ্রুত প্রশ্ন করলেনঃ সালাহ্উদ্দীন আইউবীর তলোয়ার?

না, তলোয়ার হয়তো আপনার অস্ত্রাগারে একটা বাড়তি জিনিসের শামিল হবে।

ঃ এই কথা বলে তাহির তাঁর পকেট থেকে একটি সোনার কৌটা বের করলেন। কৌটাটা খুলে তিনি উজিরে আযমের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

কৌটা হাতে নিয়ে ইফতেখারুদ্দীন তার ভিতর থেকে বের করলেন একটি দীপ্তিমান হীরকখন্ড। হীরকখন্ডটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে তিনি বললেনঃ আমি তোমার এ তোহ্ফা হাসিল করবার আশায় এখানে ডেকে আনিনি। এটা নিজের কাছে রেখে দাও। তাহির বললেনঃ যদি আপনি আমায় এখানে ঢুকবার সম্মান না-ও দিতেন, তথাপি আমার দীলের আকাঙ্খা ছিল, কোনদিন আমি এসে এই হীরকখন্ডটি আপনার সামনে পেশ করব। আপনি এটি কবুল করুন।

উজিরে আজম কৌটাটি টেবিলের উপরে রেখে তালি বাজালেন। অমনি এক গোলাম কামরায় ঢুকে সালাম করে কয়েক পা দূরে রেখে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

উজিরে আজম বললেন ঃ এঁকে আমার আস্তাবলে নিয়ে যাও। যে ঘোড়াটি ইনি পছন্দ করেন, তার উপর জিন্ লাগিয়ে এর হাওয়ালা করে দাও।

তারপর তিনি তাহিরের সাথে মোসাহেফা করতে করতে বললেনঃ কাল সন্ধ্যায় আমার এখানে তোমার দাওয়াত রইল। এরই মধ্যে ফয়সালা করব তোমায় দিয়ে আব্বাসীয় খিলাফতের কি খেদমত হতে পারে। তাহির উজিরে আযমের সাথে মোসাফিহা করে বিদায় নিতে যাচ্ছেন, অমনি এক নওজোয়ান এসে কামরায় প্রবেশ করলেন। উজিরে আযম বললেন ঃ তাহির! এ হচ্ছে কাসিম-আমার পুত্র।

তাহির পরম উৎসাহে তাঁর সাথে মোসাহেফা করলেন।

কাসিমের বয়স বিশ-বাইশ বছর। বেশ মোটা তাজা নওজোয়ান। সাধারণ আমীরজাদাদের মত তাঁরও মুখের উপর এক আত্মতুষ্টি, নির্লিপ্ততা ও অনন্যসাপেক্ষতার ভাব সুস্পষ্ট। তাঁর চোখের চাউনীতে বুঝা যায়, উচ্চ বংশমর্যাদার অনুভূতি তাঁর ভিতরে মূর্খতার সীমানায় পৌছে গেছে। তাঁর ঠোঁটের উপর একটা হাসি লেগে আছে, কিন্তু সে হাসিতে শান্ত ভাব ও আন্তরিকতার স্পর্শ নেই, আছে জানোয়ারসুলভ ঔদ্ধত্য ও প্রতারণার অভিব্যক্তি। কাসিমের হাতে একখানা তলোয়ার। তেগ চালনা শেখার জন্যই তলোয়ারখানা ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর দেহ বর্ম দ্বারা আবৃত।

কাসিম বললেনঃ আমি তেগ চালনা শিক্ষার জন্য যাচ্ছিলাম। আপনার কথা শুনে এখানে এসেছি। আপনাকে দেখার চাইতেও আমার বেশী ইচ্ছা সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার দেখবার।

উজিরে আজম তখনি আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে বললেন ঃ ইনি আমাদের আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া পছন্দ করবেন। শোনা যায়, কোন আরব নাকি ঘোড়া বাছাই করতে গিয়ে ভুল করে না। তুমি

এর সাথে গিয়ে দেখ, কোন ঘোড়া ইনি পছন্দ করেন।

কাসিম ঘোড়া বাছাই করে নেবার প্রশ্নের দিকে বিশেষ আমলই দিলেন না। বরং তাহিরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনি যদি বিক্রি করতে চান, তাহলে আমি সালাহুউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার খরিদ করব। আব্বাজান আপনাকে তার জন্য খুব বেশী দাম দেবেন। লেবাস দেখে তো আপনাকে মনে হচ্ছে আলেম লোক। তলোয়ার দিয়ে আপনি কি করবেন?

উজিরে আজম বিরক্তির সাথে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাহির তাঁর পেরেশানী চাপা দিয়ে বললেন ঃ ও জিনিসটি বিক্রি করলে তার অবমাননা করা হয়। আমি ওটা বিনা দামেই আপনাকে দেব। কিন্তু একটা শর্ত থাকবে।

ঃ কি শর্ত?

ঃ আপনি যে আমার চাইতে এ আমানতের বড় হকদার, তা প্রমাণ করতে হবে আপনাকে।

কাসিম আশান্বিত হয়ে জওয়াব দিলেনঃ আপনি হচ্ছেন আলেম আর আমি এক সিপাহী। তলোয়ারের উপর আপনার চাইতে আমার হক বেশী তা তো ঠিক হয়েই আছে। নইলে একবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

তাহির বললেন ঃ বহুত আচ্ছা, আপনি তেগ চালিয়ে আমায় পরাজিত করতে পারেন, তা'হলে এ তলোয়ার আপনার।'

শমশের চালানার কৌশলের দিক দিয়ে কাসিমের আত্মবিশ্বাস অহংকারের সীমানায় পৌছে গিয়েছিল। অবশ্যি তাঁর অহংকার অকারণ নয়। তিনি দূরদারায মুল্কের কত ওস্তাদের কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। তাঁর জিন্দেগীর দু'টি মাত্র শখ্ ছিল পোলো আর তেগ্চালনা। পোলো খেলায় আরও কয়েকজন নওজোয়ান তাঁর সমকৃতিত্ব দাবী করতে পারতো, কিন্তু তেগ চালনায় তাঁর জুড়ি আর কেউ ছিল না। তাই তাহির যখন তাঁকে মোকাবিলা করবার দাওয়াত দিলেন, তখনও কাসিম অট্টহাস্য করে উঠলেন, আর উজিরে আযম অনেকটা তাজ্জব হয়ে তাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ তোমাদের এ মোকাবিলা বেশ দেখার জিনিস হবে, কিন্তু আমার মনে হয়, অপর লোককে এ দৃশ্য দেখে আনন্দ পাবার সুযোগ দেওয়া উচিত। সম্ভবতঃ খলিফাতুল মুসলেমিনও এতে আনন্দ পাবেন, কিন্তু আজ নয়, কালই ভাল হবে। কাল ভোরে তুমি আসবে। দুপুর ও সন্ধ্যায় খানার ব্যবস্থা আমার এখানেই হবে। কাসিম! এবার গিয়ে ওকে ঘোড়া দেখাও।

উজিরে আযমের সাথে আর একবার মোসাফেহা করে তাহির কাসিমের সাথে মহল থেকে নীচে নেমে গেলেন। মহলের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে মর্মর পাথরের সড়কের দু'ধারে স্বচ্ছ জলাশয়ে ফোয়ারা ছুটছে। সেই জলাশয়ের সাথে সাথে ডানে বায়ে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। এক দেউড়ীর উপর দিয়ে পার হয়ে কতগুলো সিড়ি অতিক্রম করে মর্মরের সড়কটি গেছে। এক মুগ্ধকর বাগিচার উপর দিয়ে। দু'দিকের জলাশয়ের পানি দু'টি প্রপাতের নীচে পড়ে দুটি সংকীর্ণ ও দ্রুতগতি নহরে রূপান্তরিত হয়ে ডানে বায়ে কত শাখা বিস্তার করে বাগ-বাগিচায় এনে দিচ্ছে সবুজের সমারোহ। পোলো ও ঘোড়দৌড়ের ময়দান মহলের এই অংশের

পিছনে। তাহির এই দিক দিয়েই মহলে ঢুকেছিলেন।

আর এক দেউড়ীতে এসে বাগিচা শেষ হয়ে গেছে। তার বাইরে এক বিস্তীর্ণ চার দেওয়ালের ঘেরার মধ্যে উজিরে আজমের নওকরদের বাড়িঘর আর এক বিরাট আস্তাবল। আস্তাবলে নানা রকম জাতের দেড়শ' ঘোড়া রয়েছে বাঁধা। এর সবই উজিরে আজমের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাহির আস্তাবলের মধ্যে তিনবার ঘুরে এলেন। কোন ঘোড়াকে এক নজর, আর কোন ঘোড়াকে ভাল করে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত একটি ঘোড়ার পিঠের উপর চাপড় মেরে বললেন ঃ এটিই আমার পছন্দ হচ্ছে।

কাসিম বললেনঃ আমি আপনার নির্বাচনের তারিফ করছি, কিন্তু এ ঘোড়াটি কখনও কখনও উল্টা পায়ে চলতে শুরু করে। এটি আমাদের আস্তাবলে আসার পর আগামীকাল দু'মাস হবে। ঘোড়াটি এমনই দুরন্ত যে, আমিও তাকে বাগ মানাতে পারিনি।

এক হাবৃসী নওকর ঘোড়ার উপর যিন ক'ষে আস্তাবলের প্রাঙ্গনে নিয়ে এল। কাসিম ঘোড়ার লাগাম ধরে তাহিরের হাতে দিয়ে বললেন, কালকের ওয়াদা ভুলবেন না যেন।' তাহির মোসাফেহার জন্য হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেনঃ আপনি বিশ্বাস রাখুন। আমি তলোয়ার সাথে নিয়ে আসবো।

কাসিম এক নওকরকে ইশারা করে ডেকে বললেন ঃ ঘোড়াটি এর বাড়িতে দিয়ে এস। নওকর ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল, অমনি আস্তাবলের দরজার বাইরে ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দেখতে দেখতে দু'টি ঘোড়া প্রাঙ্গনে এসে প্রবেশ করল। তাহির ঘোড়ার সওয়ারদের দিকে তাকালেন। মুহূর্তের জন্য তিনি স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘোড়ার সওয়ার দু'টি যুবতী। দু'জনেই সফেদ রেশমের আঁটসাট পোশাক ও মোতি জড়ানো সফেদা টুপি পরিহিতা। চোখ আর কপাল ছাড়া মুখের বাকী অংশের উপর কালো রঙের সূক্ষ্ম নেকাব। ঘোড়া দু'টি ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে। তাঁরা ঘোড়া থেকে নামলে অমনি নওকর তাহিরের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে তাঁদের ঘোড়ার লাগাম ধরল। এক মুহূর্তে আর এক নওকর সেখানে ছুটে এল এবং প্রথম নওকর ঘোড়া দুটি তার হাওয়ালা করে দিয়ে এসে তাহিরের ঘোড়ার লাগাম ধরল। মেয়ে দুটি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কাসিমের দিকে তাকিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। কাসিম তখনি তাহিরকে বিদায় দিয়ে তাঁদের পিছু পিছু চলে গেলেন।

তাহির যখন নওকরের সাথে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে মহলের দেউড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছেন, তখনও যুবতী দু'টি সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, আর কাসিম তাঁর দিকে ইশারা করে কি যেন বলছেন। শেষ দরজা পার হয়ে গিয়ে তাহিরের সামনে এল একটি চওড়া সড়ক। তার একদিকে দজ্‌লা নদী, আর একদিকে সাল্‌তানাতের বড় বড় আমীরদের সারিবদ্ধ বাড়ি। প্রায় পাঁচশ' কদম দূরে দেখা যাচ্ছে দরিয়ার পুল।

যুবতীদের নাম সুফিয়া আর সকিনা। সকিনা কাসিমের বোন ও সুফিয়া তাঁর মরহুমা চাচার মেয়ে।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসে সকিনা সুফিয়াকে বললেনঃ সুফিয়া! এই নওজোয়ানকে দেখেছ? কি অপূর্ব সরলতার ছাপ তাঁর মুখের উপর! তোমায় দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

ঃ আমি তো ওঁর দিকে তাকিয়েও দেখিনি। তোমায় দেখেই হয়তো হতভম্ব হয়ে গেছেন।

ঃ লোকটি বাগদাদের ওমরাহ্ থেকে আলাদা ধরণের। আমাদেরকে দেখেই অমনি চোখ নামিয়ে নিলেন।

সুফিয়া জওয়াবে বললেন ঃ কাসিমের তামাম দোস্ত সম্পর্কে আমি একই মত পোষণ করি।

ঃ কিন্তু আমিতো ওকে কাসিমের সাথে আর কখনও দেখিনি।

সুফিয়া বললেন ঃ চেহারা দেখে তো লোকটিকে লেখাপড়া জানা মনে হচ্ছে। কাসিম তো এমন লোকের সাথে কখনও মেশে না।

যুবতী দু'টি যখন সিঁড়ির উপর উঠছেন, তখনও কাসিম পিছন থেকে আওয়াজ দিয়ে তাদেরকে দাঁড় করাল। তারপর কাছে এসে বললঃ সুফিয়া! একটি জানোয়ার দেখবে?

সুফিয়া জওয়াব দিলেনঃ দিনে একবার তোমায় দেখার পর কোন নতুন জানোয়ার দেখবার ইচ্ছা কেন জাগবে আমার মনে?

কাসিম তাঁর বিরক্তি হাসির আড়ালে চাপা দেবার চেষ্টা করে বললেন ঃ তোমার দৃষ্টিতে আমি জানোয়ার। কিন্তু এমন লোককে তোমায় আজ দেখাচ্ছি, কাল যাকে বাগদাদের তামাম লোক বলবে জানোয়ার। সকিনা! তুমিও দেখেছো ওই নওজোয়ানকে, আস্তাবলের মধ্যে যে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার বাপ বাহাদুরীর ইনাম হিসাবে সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার হাসিল করেছিলেন, আর আজ সে আমায় দাওয়াত দিয়েছে, তার সাথে তেগ চালনায় বাজি জিততে পারলে সে তলোয়ার হবে আমার।

তাহির তখনও দেউড়ীর সামনের পথ দিয়ে যাচ্ছেন। কাসিম হাতের ইশারা করে বললেনঃ এ বুদ্দুর যেমন বুদ্ধি! হয়ত জিন্দেগীভর কোনদিন তলোয়ার স্পর্শই করেনি, তবু নিজেকে খুব বড় ওস্তাদ মনে করছে। কাল বড্ড আজব তামাসাই হবে একটা। আব্বাজান চেষ্টা করছেন, যাতে এ তামাসাটা খলিফাতুল মুসলেমিনের সামনে হয়। সুফিয়া বললেনঃ যদি তাঁর কাছে সুলতান সালাহউদ্দীনের তলোয়ার থাকে, আর যদি তিনি আসল বুদ্দুই হন, তাহলে আমার ভয়ই হয়, তুমিই অপরের কাছে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে না যাও। চল সকিনা, আমরা এবার যাই। কাল দেখা যাবে, কার কত ক্ষমতা। আমার ভয় হচ্ছে, যদিও একবার সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার হাতে পেয়ে যায়, তাহলে ওর পা আর মাটিতে পড়বে না।

## তিন

সেই রাতে এশার নামাযের কিছুক্ষণ পরে তাহির দেওয়ানখানায় বসে এক কিতাব পড়ছেন। হঠাৎ তাঁর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো এক চার ঘোড়ার গাড়ি। এক নওকর এসে খবর দিল যে, এক ফৌজী অফিসার সিপাহ্সালারের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। কিতাব রেখে দিয়ে তাহির বললেন ঃ তাঁকে ভিতরে নিয়ে এস।

নওকর চলে গেল। খানিকক্ষণ পর ঘরে এসে প্রবেশ করলেন এক দীর্ঘাকৃতি সুগঠিত দেহ, প্রিয়দর্শন যুবক। তাঁর বয়স ত্রিশ বছরের কাছাকাছি মালুম হচ্ছে। তাঁর মুখের উপর আন্তরিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি শৌর্য সাহসের ছাপ সুপরিস্ফুট। তাহির উঠে তাঁর সাথে মোসাহেফা করে নিজের এক কুরসীতে বসতে দিলেন।

আগন্তুক বললেন ঃ আমার নাম আব্দুল আযীয। আমি আপনার পরোক্ষ পরিচয় লাভ করেছি। এখন আমি আপনার কাছে এসেছি সিপাহ্সালারের পয়গাম নিয়ে। তিনি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান, কিন্তু আমিও আপনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে মোলাকাত করতে এসেছি। তার জন্য অবশ্যি যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। আপাততঃ আমি আপনাকে এতটুকু বলা যথেষ্ট মনে করি যে, আপনি আমায় আপনার দোস্ত মনে করবেন। আপনি অতি বড় আমীর, তারই জন্য আমি আপনার সাথে দোস্তি করতে আসিনি। আপনার ওয়ালেদ সালাহউদ্দীন আইউবীর কাছ থেকে যে তলোয়ার ইনাম হাসিল করেছিলেন, আপনি তার অধিকারী বলেও আমি আপনার কাছে আসিনি। আমি এসেছি এই জন্য যে, আপনার দীলের মধ্যে রয়েছে নিজেকে বাহাদুর বাপের স্মৃতিচিহ্নের সত্যিকার হকদার প্রমাণিত করবার আকাঙ্খা। আপনি কাসিমকে মোকাবিলা করবার দাওয়াত দিয়েছেন।

তাহির জওয়াব দিলেনঃ জি হ্যাঁ, এ তলোয়ারের গুরুত্ব বাগদাদে এত বেশী হবে, তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। আমার চোখে এ তলোয়ারের সত্যিকার সদ্ব্যবহার এ নয় যে, তা কোন আমীরজাদার অস্ত্রাগারের শোভা বর্ধন করবে। তাই আমায় তাকে মোকাবিলার জন্য দাওয়াত দিতে হয়েছে।

আব্দুল আযীয বললেনঃ তলোয়ার নিয়ে খেলার কথা বলতে গেলে কাসিমকে আপনি কেবলমাত্র এক আমীরজাদা মনে করলে ভুল করবেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে অবশ্যি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু কাস্‌রে খুল্‌দের আশপাশের বাসিন্দাদের কাছে তাঁর ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে। এ ব্যাপরে আপনি কিছুটা হুঁশিয়ার হয়ে চললে ভাল হয়। আপনি যদি তাঁর কাছে হেরে যান, তাহলে হয়তো তলোয়ার হারানোর জন্যও আপনার আফসোস হবে না, কিন্তু তার ফলে বাগদাদের ফৌজে এক নেহায়েত অবাঞ্ছিত ধরণের কর্মচারীর সংখ্যা বাড়বে। অতীতে যখন আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খারেযম শাহের সেনাবাহিনী বাগদাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখনও আমাদের বাহিনী তাদেরকে পথের মধ্যে বাধা দেবার জন্য এগিয়ে গেল। উজিরে আজমের চেষ্টায় খলিফা তাঁকে

সেনাবাহিনীর বিশটি দলের সালারের পদ দান করেছিলেন। সারাটা পথ এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হলো যে, সিপাহসালারের খিমায় রাতের বেলায় বিশজন সিপাহী পাহারায় থাকলে দিনের বেলায়ও কাসিম চল্লিশ জন পাহারাওয়ালা রাখবার দাবী করতেন। আর প্রত্যেকটি অফিসারের সাথে অবাধ্যতা করতেন। বললেনঃ আমার বাপ সালতানাতে আব্বাসিয়ার উজিরে আজম। আমরাই সবা তখনও অনুভব করেছি যে, বাগদাদে এই নওজোয়ানের খেলার তলোয়ার চালানোর উৎসাহ যতখানি দেখা যাচ্ছে, আসল তলোয়ারের সামনে গিয়ে তিনি ততখানি ঘাবড়ে যাচ্ছেন। চুতর্থ মনজিলে গিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হলো এবং পঞ্চম মনজিলে গিয়েই তিনি ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরলেন। তাঁর খোশ নসীব, খারেযম বাহিনী রাস্তা থেকে ফিরে গেল। তাঁরও খলিফার কাছে সাফাই পেশ করবার মওকা জুটে গেল। এবার সিপাহসালার ভয় করছেন, সুলতান সালাহউদ্দীনের তলোয়ার তাকে আবার খলিফার দৃষ্টিতে কোন উচ্চ পদের হকদার প্রমাণিত না করে। আমারও অমনি একটা আশংকা আছে, কিন্তু আমি সিপাহসালারের মত অতটা পেরেশান নই। আমি মনে করি, বাগদাদের তরক্কীর দিন শেষ হয়ে গেছে। অসংখ্য অযোগ্য কর্মচারী যেখানে রয়েছে, সেখানে আর একজন বেশী হলে এমন কিছু পার্থক্য হবে না। বড় আশা নিয়ে আমি বাগদাদে এসেছিলাম, কিন্ত........

এতটা বলে আব্দুল আযীয চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখের উপর ছেয়ে গেল কেমন একটা উদাস ভাব।

কিন্ত তারপর? তাহির প্রশ্ন করলেন।

আব্দুল আযীয বললেনঃ আমি হতাশ হয়ে গেছি। আমি এখানে আর থাকতে চাচ্ছি না। আর আপনিও যদি দীলের মধ্যে খিদমতে ইসলামের প্রেরণা নিয়ে এসে থাকেন, তাহলে হয়তো বেশীদিন এখানে থাকতে পারবেন না। বর্তমানে মিসরে আবার হেলাল ও ইসায়ী ক্রুশের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছে। আমি সেখানেই চলে যেতে চাই। সেখানেই আমার প্রয়োজন। সেখানে আলমে ইসলামের প্রত্যেক মুজাহিদের প্রয়োজন রয়েছে। আমার আরও কয়েকজন দোস্ত সেখানে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন। আপনাকেও আমি দাওয়াত দিচ্ছি। কিন্তু আপনি সেখানে যেতে না চাইলেও আমায় একখানা পরিচয় পত্র লিখে দিতে হবে। মিসরের সাথে আপনার যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে নিশ্চয়ই। ওখানে আমায় কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে, মনে করে আমি আপনার পরিচয় পত্র চাচ্ছিনা, বরং তার প্রয়োজন এই জন্য অনুভব করছি যে, বাগদাদের প্রত্যেকটি লোককেই ওখানে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। এমনকি, সিপাহসালারের চিঠি নিয়ে গেলেও আমাদেরকে তাঁরা বিশ্বাস করবেন না, বরং আমাদের গুপ্তচর বলে সন্দেহ করবেন। তাহির বললেনঃ নাসারা শক্তির উপর মালিকুল আদিলের ক্রমাগত বিজয়ের খবর হয়তো আপনি শুনেছেন। আমার কাছে তাতারী হামলা ইসলামের পক্ষে অনেকখানি বেশী বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।

আব্দুল আযীয হতাশার স্বরে বললেনঃ আমিও তাকে কম বিপজ্জনক মনে করি না। কিন্তু আফসোস! যে লোকটির উপর খারেযমে আমাদের আত্মরক্ষার শেষ ঘাঁটিটি সামাল দেবার ভার ন্যস্ত, তিনি যদি অমনি আহমক না হতেন! তাঁর নিজের শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা তাকে তামাম দুনিয়ার সাথে লড়াই বাধাবার উৎসাহ সঞ্চার করছে। তাই তিনি কেবল বাগদাদের লোককে নয়, যে কোন বিদেশী লোককে মনে করেন খলিফার গুপ্তচর। তিনি চেংগিস খানকে শক্তি পরীক্ষার দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু সে ভয়াবহ তুফানের মোকাবিলা করবার জন্য কোন ইসলামী সালতানাতের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেননি। খলিফা নাসিরও বিশ্বাস করেন যে, তিনি চেংগিস খানের হাত থেকে নাজাত পাবার পর আবার বাগদাদের উপর তাঁর ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখবেন। এরই জন্য-কিন্তু এখন সে কথা বলবার সময় আসেনি-আচ্ছা, এবার চলুন, সিপাহসালার আপনার জন্য ইন্তেজার করছেন।

তাহির বললেনঃ আপনি চুপ করে গেলেন কেন? আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।

আব্দুল আযীয সন্ধানী দৃষ্টিতে তাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একজন সিপাহী মাত্র। সিপাহীর রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবার হক নেই।

একটু দেরী করুন! বলেই তাহির তখনি উঠলেন। আর এক কামরায় ঢুকে সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর তলোয়ারের হাতলের উপর হাত রেখে বললেন, আমার ওয়ালেদ তাঁর দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই ইনাম হাসিল করেছিলেন। আমি এই তলোয়ারের উপর হাত রেখে যে কোন মকসাদে আপনার ওফাদারী করবার ওয়াদা করছি। এর বদলে আমি আপনার কাছে কোন ওয়াদা দাবী করছি না। আপনার মুখের উপর প্রথম নযরেই আমি বুঝেছি, বাগদাদে আমি যে সাথী সন্ধান করছিলাম, আল্লাহ পাক তাঁকে আমার কাছে এনে দিয়েছেন।

আবদুল আযীয তাঁর হাতের উপর নিজের হাত রাখলেন। তারপর তাহিরের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেনঃ সম্ভবত আমিও কারুর খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলাম। বাগদাদের বহুলোক কোন এক বিশেষ ব্যক্তির সন্ধান করছে। আল্লাহতা'আলা হয়তো আপনাকেই বেছে নিয়েছেন বাগদাদের অচঞ্চল প্রশান্ত জিন্দেগীতে তরঙ্গ বেগ আনবার জন্য। এই ঝিলের গতিচাঞ্চল্যহীন পানি আজ প্রতীক্ষা করছে হাওয়ার প্রচণ্ড ঝাপটার। এই ঘুমের দেশকে জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন ইসরাফিলের শিঙ্গার। তা যদি আপনিই হয়ে থাকেন, তাহলে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি আপনার বন্ধুত্ব ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। গতরাত্রে আমি এক স্বপ্ন দেখেছিলাম, আর এখন দেখছি সে স্বপ্নের বাস্তবরূপ। আমি বহুলোকের সাথে এক কিশতিতে আরোহী। সমুদ্রে উঠল তুফান। এক ছিদ্রপথ দিয়ে ক্রমাগত কিশতিতে পানি জমছে। আমরা ডুবে মরবো, এমনি একটা ধারণা সবারই মনে। জীবনের উপর আমরা হতাশ হয়ে গেছি। হঠাৎ পানির

মধ্যে দেখা গেল এক পাহাড়। তা যেন ক্রমাগত প্রসারিত ও উঁচু হয়ে চলেছে। দুরন্ত ঢেউ এসে তাতে আঘাত খেয়ে টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে যাচ্ছে, আবার কোন কোন ঢেউ এসে যেন তাকে বুকের মধ্যে ঢেকে ফেলছে। আমাদেরই এক নওজোয়ান বসেছে কিশতির হাল ধরে। সে বলছেঃ এই পাহাড়ই হচ্ছে আমাদের শেষ আশ্রয়। কিন্তু আমারা মনে করছি, এ পাহাড় দীর্ঘকাল এ প্রচন্ড ঢেউয়ের আঘাতে টিকে থাকবে না। কোন কোন মাল্লা বিরোধিতা করছে এবং তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে হাল। নওজোয়ান হতাশ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। সে সাঁতরে উঠল সেই পাহাড়ের উপর। আমি আর আমার কয়েকজন সাথী তার অনুসরণ করলাম। কিন্তু আর সব আরোহীরা থাকল কিশতি আঁকড়ে। আমরা সেই পাহাড়ের উপর উঠে গেলাম, আর কিশতি এক টুকরা কাঠের মত সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে চলে গেল দূরে-বহুদূরে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার-তখনও কেউ কেউ সেই পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে যেতে চাইছে কিশতির দিকে। এই দেখেই আমার চোখ খুলে গেল। সে কিশতির শেষ পরিণাম আমি দেখতে পাইনি-।

তাহির কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেনঃ আপনি খারেযম সালতানাতকে তাতারী সয়লাবের পথে শেষ প্রতিরোধভূমি মনে করেন না কি?

আব্দুল আযীয জওয়াব দিলেন ঃ খারেযম আমাদের আত্মরক্ষার শেষ ঘাঁটি অবশ্যি হতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বলা মুশকিল, আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের নেতৃত্বে খারেযমবাহিনী তাতারী সয়লাবের সামনে শেষ প্রতিরোধ দাঁড় করাতে পারবে কিনা। তিনি হচ্ছেন স্বার্থপর, মর্যাদালোভী ও স্বেচ্ছাচারী। তিনি যখন বাগাদাদের উপর হামলা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তখনও বাগদাদের বাসিন্দাদের মন ছেয়ে ফেলেছিল হতাশার মেঘ। আরও আশংকা ছিল যে, তাঁর বিজয়ের সম্ভাবনা দেখে খলিফার ফৌজের বহুসংখ্যক তুর্কী ওমরাহ তাঁর সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। কিন্তু রাস্তায় যখন বরফ পড়ল, তখনও তিনি তাকে আযাবে ইলাহী মনে করে ফিরে গেলেন। আমার আশঙ্কা হয়, চেংগিস খানের কাছে প্রথম পরাজয়ের পরেই তিনি হিম্মৎ হারিয়ে ফেলবেন। মনে করবেন, তাঁর সৌভাগ্যের সিতারা ডুবে গেছে। এই প্রতিরোধভূমি একবার ডুবে গেলে আর দ্বিতীয়বার ভেসে উঠবে না।

তাহির বললেনঃ তাহলে এরূপ পরিস্থিতে বাগাদাদের বাসিন্দাদের মধ্যে কি এই অনুভূতি জাগিয়ে দেওয়া জরুরী নয় যে, আত্মরক্ষার এই শেষ ঘাঁটি ভেঙে পড়লে তাতারী সয়লাব আমাদের আরও নিকটতর হবে? সম্মিলিতভাবে এই বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য খলিফা ও খারেযম শাহের মধ্যে সবরকম বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা কি প্রত্যেক দূরদর্শী লোকের সর্বপ্রথম কর্তব্য নয়? আমার বিশ্বাস, আব্বাসীয় খিলাফত ও খারেযম সালতানাতের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে পারলে আমরা দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চেংগিস খানের পিছু ধাওয়া করতে পারবো। এই মকসাদ নিয়েই আমি বাগদাদে এসেছি এবং এই মকসাদই আমায় ওমরাহ

ও খলিফার দরবারে প্রবেশাধিকার লাভের উদ্দেশ্যে নেহায়েৎ অবাঞ্ছিত ও লজ্জাজনক তরিকা এখতিয়ার করতে বাধ্য করছে। আমি তাদের ঘুম ভাঙাতে চাই। খোদা না খাস্তা, যদি আমি তাতে সফল না হই, তাহলে আমার পরবর্তী মনযিল হবে মিসর অথবা খারেযম।

আবদুল আযীয বললেনঃ তাহলে আমার স্বপ্নের কিশতি থেকে পাহাড়ের পথপ্রদর্শক আর কেউ নন। আমি আপনার সাথে রয়েছি। আমার কয়েকজন দোস্তও আপনার সাথী হবেন। আপনার কোন রকম ব্যস্ততা না থাকলে আমি তাদেরকে কাল রাতের বেলায় এখানে নিয়ে আসব।

তাহির বললেন ঃ কাল উজিরে আজমের ওখানে আমার দাওয়াত। আপনি পরশু তাদেরকে এখানে নিয়ে আসুন।

আবদুল আযীয বললেনঃ কাল রাত্রে যদি আপনার উজিরে আজমের গৃহে দাওয়াত থাকে, তাহলে পরশু নিশ্চয়ই সিপাহসালার আপনাকে ডেকে নেবেন। তারপর আসবে আর সব ওমরাহের পালা। তারপর সম্ভবতঃ খলিফাও আপনাকে দর্শন দেবার যোগ্য মনে করবেন। কিন্তু সত্য বলুন তো, আপনি উজিরে আযমকে কি দিয়ে যাদু করেছেন? কোন মামুলী তোহফায় তো তিনি ভোলেন না-!

তাহির চুপ করে থাকলে আব্দুল আযীয বললেনঃ আমি এ প্রশ্নটা আপনাকে কেবল এই জন্যই করেছি যে, আপনাকে কিছুটা ওয়াকেফহাল করে রাখবো। সিপাহসালার হয়তো সোজাসুজিই আপনার কাছে এই প্রশ্ন করবেন না, কিন্তু কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এর রহস্য জেনে নেবার চেষ্টা করবেন। আপনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। তাছাড়া আপনার সব চাইতে দামী তোহফা রেখে দেবেন খলিফার জন্য। তাহির বললেনঃ আমি উজির আজমকে একটি হীরকখন্ড দিয়েছিলাম, আর আপনি ভাল মনে করলে সিপাহসালারকেও একটি দিতে পারি।

আবদুল আযীয বললেনঃ আপনি কথাটা বলে ভাল করেছেন। তোহফা দিয়ে যেসব আমীরজাদা পদলাভ করতে চান, তাদের উপর সিপাহসালার ভারী চটা। এই ধরণের লোককে তিনি হামেশা সন্দেহের চোখে দেখেন। আপনি চলুন, তিনি এতক্ষণে বহুত পেরেশান হয়ে আছেন হয়ত।

তাহির ও আব্দুল আযীয হাত ধরাধরি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন। পথের মধ্যে আব্দুল আযীয বললেনঃ আপনার দাওয়াতের ধারা শীগগির শেষ হচেছ না, মনে হয়। তাই আপনি ভাল মনে করলে আমি পরশু ভোরেই আমার বন্ধুদেরকে সাথে নিয়ে আসবো। পরশু জুম'আর দিন আমার ছুটি থাকবে। নামাযের পর আমরা কিশতিতে অথবা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাব।

কিছুদুর এগিয়ে গিয়ে তাহির প্রশ্ন করলেনঃ 'সিপাহসালার কেন আমায় মোলাকাতের সম্মান দিচ্ছেন, তাতো আমায় বললেন না?

আব্দুল আযীয হেসে জওয়াব দিলেন ঃ যেসব নতুন বাসিন্দা উজিরে আযমের সাথে দেখা করেন, সিপাহসালার তাদের সাথে মোলাকাত জরুরি মনে করেন। আপনার সাথে মিলবার জন্য তাঁর বেকারারীর আর এক কারণ হচ্ছে, আপনি কাসিমকে মোকাবিলা করবার দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, কাসিমের কোন নতুন সুখ্যাতি সম্ভবতঃ তাঁর জন্য ফৌজে উচ্চতম পদলাভের কারণ হবে। তাই তিনি হয়ত আপনাকে বলবেন যে, আপনি তলোয়ার চালাতে না জানলে তিনি আপনার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন, যাতে আজ রাত্রেই আপনি বাগদাদ ছেড়ে চলে যেতে পারেন। কোন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আপনি কথা বলবেন না। তিনি যে কোন রাজনীতিককে বাগদাদের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করেন। নিজেকে সাদাদীল সিপাহী বলে পরিচয় দিয়ে আপনি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের কথা উঠলে আপনি এ কথা বলবেন না যে, বরফ পড়ার বিপদের জন্যই তিনি ফিরে চলে গেছেন। খারেযম শাহ তারই ভয়ে পালিয়ে গেছেন, শুনলে তিনি খুশী হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি হয়ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পুরো চেহারাটা দেখে নিয়ে গোফে তা দেবেন। তখনও আপনি অবশ্যি বলবেনঃ খারেযমের ভীরু শিয়াল কি করে আসবে বাগদাদের সিংহের সামনে?

সিপাহসালারের বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ালে তাহির ও আব্দুল আযীয ভিতরে প্রবেশ করলেন। এক প্রহরী তাদেরকে উপর তলায় নিয়ে গেল। মোলাকাতের কামরার সামনে সিপাহসালারের দেহরক্ষী দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি দু'জনেরই সাথে মোসাফেহা করে আবদুল আযীযকে বললেন ঃ আপনি খুব দেরী করেছেন। আপনি এখানে থাকুন। আমি একে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।

দেহরক্ষী তাহিরকে ভিতরে রেখে এসে আবদুল আযীযের সাথে আলাপে ব্যস্ত হলেন। কিছুক্ষণ পর এক হাবসী গোলাম বাইরে এসে আবদুল আযীযকে বললেনঃ সিপাহসালার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আবদুল আযীয গিয়ে কামরায় ঢুকলেন। সিপাহসালার বললেনঃ আবদুল আযীয, একে এর বাড়িতে পৌছে দিয়ে এস। কাল ভোরে আবার এর কাছে যাবে। এখানে নিয়ে আসবার আগে একে ভাল করে পরীক্ষা করে নেবে। কাসিমকে আমি আজ সন্ধ্যায় তার ইউনানী ওসতাদের কাছে তলোয়ার চালানো অভ্যাস করতে দেখেছি। তুমি জানো, এ ইউনানী কে?

আবদুল আযীয বললেনঃ তাঁর সম্পর্কে আমি বেশী কিছু জানতে পারিনি, কিন্তু আমি শুনেছি, গত হফতায় তিনি তাঁর বাদশার তরফ থেকে খলিফা ও উজিরে আযমের কাছে কিছু তোহফা এনে হাযির করেছেন। তাঁর দাবী, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাহাদুরী দেখিয়ে তিনি ফরাসীরাজ্যের কাছ থেকে ইনাম হাসিল করেছেন। কাসিম যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছেন।

বৃদ্ধ সিপাহসালার রাগে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললেনঃ আর এরপর তিনি ফিরে গিয়ে বলে বেড়াবেন, বাগাদাদের সন্তানসন্ততিকে তেগ চালনা

শিখাবার জন্যও পশ্চিমের ইসায়ী ওস্তাদের মুখের দিকে তাকাতে হয়। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে ওকে বলে দিতে পারে যে, মুসলমান তোলায়ারের খেলা শেখার জন্য কোন ওসতাদের মুখাপেক্ষী হয় না। এই হীনতার অনুভূতিই আমাদেরকে ডুবাবে।

আবুদল আযীয বললেনঃ এ ব্যাপারে আমাদের মনোভাব আপনার থেকে আলাদা নয়। কিন্তু হায়! লোকটি কেবল ইউনানীই হতেন! তিনি উজিরে আযমের সাহেবজাদাদের ওস্তাদ। এক সাধারণ সিপাহী কি করে তাঁকে মোকাবিলা করবার দাওয়াত দেবে? যদি কাসিমকে মোকাবিলা করবার দাওয়াত দেবার জন্য আমীরজাদা হবার প্রয়োজন না হত, তাহলে এতদিনে তাঁর ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া শক্ত হত না। তাহিরকে এক আমীরজাদা বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। আর যদি তাঁকে আমীরজাদা বলে ধরে নেয়া নাও হয়ে থাকে, তথাপি সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার কাসিমের দীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টির জন্যই যথেষ্ট হয়েছে।

সিপাহসালার বললেনঃ কিন্তু এ তামাসা খলিফার সামনেই হবে। কাসিমের ওস্তাদের হাতে রয়েছে ফরাসী রাজ্যের প্রশংসাপত্র। সাগরেদ যদি একবার বাজি জিতে সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার হাসিল করতে পারে, তাহলে আগামী কয়েক বছর বাগদাদের সেনাবাহিনীতে কি ধরণের লোকের নেতৃত্ব কায়েম হবে, কে বলতে পারে?

আবদুল আযীয বললেনঃ 'তাহির সম্পর্কে আমার আস্থা রয়েছে। সাগরেদের পর যদি কোনমতে ওসতাদকে ময়দানে নামানো যায়, তাহলে সম্ভবতঃ খেলাটা আরও চিত্তাকর্ষক হবে।'

ঃ 'ওসতাদের পর সাগরেদ! নওজোয়ান দূরদর্শী চিন্তার দিক দিয়ে তুমি তো আমাদের উজিরে খারেজার চাইতে মোটেই কম নও, দেখছি। আজ থেকে তোমার নাম আমার দূরদর্শী সালারদের ফিরিস্তিতে তুলে দিচ্ছি। ওসতাদের পর সাগরেদ।

আবদুল আযীয তাঁর মুখের হাসি চাপা দেবার চেষ্টা করে বললেন ঃ 'জি, সাগরেদের পর ওসতাদ!'

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাগরেদের পর ওসতাদ! ঃ সিপাহসালার উচ্চহাস্য করে বললেনঃ 'যদি এ নওজোয়ান আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারে, তাহলে তাদের দুজনেরই সুরত দেখার মত হবে। সাগরেদের পর ওস্তাদ। আযীয, তুমি বহুদূর চিন্তা করেছ। আজ বহুক্ষণ আমার চোখে ঘুম আসবে না। আজ উজিরে আযম আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, কোন কাসিদা বলা শায়ের যদি খলিফার দরবারে এসে যান, তাহলে খলিফা এই চিত্তাকর্ষক খেলা দেখবার ওয়াদা ভুলে যাবেন। তিনি চেষ্টা করবেন যাতে কাল কোন শায়ের তাঁর কাছে যেতে না পারেন, কিন্তু....' তারপর আচানক গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ 'কাল ভোরে এ নওজোয়ানকে ভাল করে পরীক্ষা করে নেবে। এবার ওকে বাড়িতে রেখে এস।' সিপাহ-সালারের মহল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে সওয়ার হয়ে আবদুল আযীয

তাহিরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর হেসে বললেনঃ 'ওসতাদের পর সাগরেদ।'

তাহির হেসে বললেনঃ 'তোমার অনুমান ঠিকই হয়েছে। সিপাহসালার আমার সাথে মোসাফেহা করে আমার বাযু টিপতে টিপতে বললেনঃ "বাছা" তোমার বাযু তো বেশ মযবুত মালুম হচ্ছে কিন্তু তলোয়ার চালানোর যোগ্যতা সম্পর্কে যদি তোমার কোন ভুল ধারণা থাকে, তাহলে আমার সব চাইতে ভাল ঘোড়া তোমায় পৌঁছে দেবার জন্য মওজুদ রয়েছে।"- কাসিমের ইউনানী ওসতাদের নাম কি?'

'লুকাস।'ঃ আবদুল আযীয জবাব দিলেনঃ কিন্তু তাঁর জন্য আপনি পেরেশান হবেন না। আমার বিশ্বাস ওসতাদ সাগরেদদের চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবেন না।'

তাহির ব্যঙ্গব্যঞ্জক স্বরে বললেনঃ তাঁর জন্য আমি মোটেই পেরেশান নই। হায়! আমার আর তাঁর মোকাবিলা এমনি বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় ভোতা তলোয়ার দিয়ে না হত।'

আবদুল আযীয চাঁদের রোশনীতে ভাল করে তাহিরের মুখের দিকে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ আগে যে মুখে ছিল আলেম সুলভ গাম্ভীর্য, এখন তা হয়ে উঠেছে সিপাহী সুলভ দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি।

তাহিরের বাড়ীর সামনে পৌঁছে আবদুল আযীয বললেন ঃ এবার নেমে পড়ুন। আপনার বাড়িতে এসে গেছি।'

তাহির তখনও গভীর চিন্তায় মগ্ন। আবদুল আযীয আস্তে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ 'কি চিন্তা করছেন আপনি? ইউনানীকে তলোয়ার চালানোর সবক দিচ্ছেন না কি?'

তাহির চমকে উঠে বললেন ঃ 'না, না, আমার জন্য এ প্রশ্ন অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি অপর কিছু চিন্তা করছি। আমি ভাবছি, চেংগিস খান এই মুহূর্তে কি করছেন, তুর্কিস্থানে সুলতান আলাউদ্দীন কি করছেন, মিসরে কি হচ্ছে, আর বাগদাদে আমরা কি করছি। জিন্দেগী থেকে কতদূর আমরা?

তাহির গাড়ি থেকে নামলেন। দরজার বাইরে যায়েদ তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে। তাহির বললেন ঃ 'যায়েদ, এখন তুমি ঘুমোও নি? '

যায়েদ রাগ, অভিযোগ স্নেহের স্বরে জবাব দিলঃ 'খালি হাতে আপনি সিংহের গহ্বরে যাবেন আর আমি ঘুমিয়ে থাকবো, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

শাহী মহলের সামনে এক অর্ধ-বৃত্তাকার সামিয়ানার নীচে সালতানাতের ওমরাহ দুই কাতারে কুরসীর উপর উপবিষ্ট। তাদের পেছনে নিরস্ত্র কর্মচারীরা দন্ডায়মান। মাঝখানে কিছুটা উঁচু মঞ্চের উপর ওলী আহাদ (যুবরাজ) যাহির ও তাঁর যুবকপুত্র মুসতানসিরের আসন। যাহির ও মুসতানসিরের সামনে এক টেবিলের উপর সোনার থালায় সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার রক্ষিত। সামিয়ানা ও শাহী মহলের মাঝখানে খালি জায়গায় লাল রঙের গালিচা বিছানো। মহলের প্রাঙ্গনে রেশমী পর্দার আড়ালে শাহী খান্দান ও আমীর ঘরের মহিলারা

উপবিষ্ট। মহলের দ্বিতলের বিস্তৃত গ্যালারির মাঝখানে এক সুদৃশ্য মেহরাবের নীচে এক সোনার কুরসী। সামিয়ানার নীচে উপবিষ্ট তামাম ওমরাহের নজর সেই কুরসীর দিকে নিবদ্ধ। ওলী আহাদের ডান দিকে উজিরে আযমের ও শাহজাদা মুসতানসিরের বাম দিকে সিপাহসালারের আসন। অন্যান্য উজির, ফৌজী অফিসার ও বিদেশী দূতগণকে তাদের মর্যাদা মোতাবেক আসন দেওয়া হয়েছে। চেংগিস খানের দূত উজিরে আজমের পাশে এবং আলাউদ্দীন মুহাম্মদ শাহের দূত ইমাদুল মুলক সিপাহসালারের পাশে বসে আছেন।

প্রথম কাতারের এক প্রান্তে কাসিম ও তাঁর পিছনের কাতারে তাহির উপবিষ্ট। তাহিরের বামদিকে তিন কুরসী পরে কাসিমের ফরাসী ওসতাদ বসে আছেন এবং তাহিরের ঠিক পেছনে তৃতীয় কাতারে আবদুল আযীয দন্ডায়মান।

তাহির আবদুল আযীযের দিকে ফিরে নীচু গলায় প্রশ্ন করলেন ঃ 'আমাদের মোকাবিলা এই গালিচার উপর হবে?'

আবদুল আযীয হেসে জওয়াব দিলেন ঃ 'উজিরে আযমের সাহেবজাদাদের মোকাবিলা হচ্ছে বলেই তো খালি গালিচা দেখা যাচ্ছে। শাহী খান্দানের কারোর সাথে মোকাবিলা হলে এর উপর ফুল সেজে বিছানো হত।'

তাহির হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন ঃ 'পোলো খেলার ময়দানেও গালিচা বিছানো হয় নাকি?'

আবুদল আযীয চাপা গলায় তাঁর কানের কাছে জওয়াব দিলেন ঃ 'না, কিন্তু আমাদের পতনের গতি এমনি দ্রুত চলতে থাকলে সম্ভবত ঃ সে রেওয়াজ চালু হতে বেশী দেরী হবে না। লুকাসকে আপনি দেখেছেন? আপনার বামদিকে চতুর্থ কুরসীতে বসে আছেন।'

তাহির বামদিকে নজর করে বললেনঃ 'আরে, উনি যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে এসেছেন।'

আবদুল আযীয বললেনঃ 'উনি সব সময়ে এই একই পোষাকে থাকেন। হয়ত ঘুমানও এই পোষাকেই। আপনি হিম্মৎ রাখবেন। সাগরেদের পর ওসতাদের পালা নিশ্চয়ই আসেব। সিপাহসালার শাহজাদা মুসতানসিরের সাথে এখন সেই আলাপই করছেন।'

তাহির সিপাহসালারের দিকে তাকালেন। তিনি তখনও মুসতানসিরের সাথে কি যেন পরামর্শ করছেন। কাসিম তাহিরের দিকে ফিরে তাকিয়ে খানিকটা উঁচু গলায় বললেনঃ 'আপনি পেরেশান হবেন না। আমি এ খেলা খুব জলদী খতম করে দেব।'

তাহির কিছু বললেন না দেখে লুকাস ভাঙা আরবীতে বললেনঃ 'জলদী কর না। তোমরা এ তামাসা শীগগিরই শেষ করে দিলে দর্শকরা হতাশ হবেন।

আশেপাশের লোকদের দৃষ্টি তাহিরের দিকে নিবদ্ধ হল। তিনি ফিরে আবদুল আযীযের দিকে তাকালেন। তাহিরের কপালের শিরাটা তখনও ফুলে উঠেছে। এক মুহূর্তের জন্য আবদুল আযীযের দিকে তাকাবার পর তিনি লুকাসকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। দর্শকদের কোন হতাশার

কারণ ঘটবে না। সম্ভবতঃ আপনিও হতাশ হবেন না। যতক্ষণ আপনারা ইচ্ছা না করবেন, ততক্ষণে এ খেলা খতম হবে না।'

তাহিরের কথায় ছিল অতিমাত্রায় আত্মপ্রত্যয়ের সুর। তাতে ওসতাদের মত কাসিমও তাঁর দেহে খানিকটা মৃদু কম্পন অনুভব না করে পারলেন না।

অপরদিকে প্রাঙ্গণের রেশমী পর্দার আড়ালে মহিলাদের মজলিসে সুফিয়া সকিনাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'দেখলে তো, আমি আগেই বলেছিলাম যে, কাসিমের জবান তার তলোয়ারের চাইতে বেশী ধারালো।'

সকিনা বললেনঃ 'ওরা হয়ত বন্ধুভাবে কথা বলছেন।'

সুফিয়া বললেনঃ 'বন্ধুভাবে কথা বললে কথার দ্বারা ওর জবাবের সাথে সাথে অমনি বন্ধ হয়ে যেত না। হয়ত কাসিম কোন শক্ত কথা বলেছিল আর তার ইউনানী ওসতাদ তার সমর্থন করেছিল, তারপর ওর জবাব শুনে এবার দু'জনেই ভিজে বেড়ালের মত নুইয়ে বসে আছে।'

সকিনা বললেনঃ 'আমার ভাই তো সিংহের মতই বসে আছে। তুমি সব কথাই অনুমান করে বলে থাক। তোমার কাছে কোন প্রমাণ আছে যে, কাসিম ওকে কোন শক্ত কথা বলেছেন। এতদূর থেকে ওদের কথা না শুনতে পাচ্ছ তুমি, না শুনতে পাচ্ছি আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফয়সালা হয়ে যাবে, কাসিমের তলোয়ার বেশী ধারালো, না তাঁর জবান। কাসিম ওকে এমনই মজাটা দেখাবেন যে, আর কখনও তলোয়ার হাতে নিতে হবে না।'

সুফিয়া বললেনঃ 'আর যদি কাসিমকে মজাটা দেখানো হয়, তাহলে ......?'

সকিনা বললেনঃ 'সুফিয়া! খোদার কাছে নেক দোয়া কর। অপরিচিত লোকটির প্রতি তোমার এতটা হামদরদী কেন।'

সুফিয়া চমকে উঠে জবাব দিলেন ঃ আমার হামদরদী অপরিচিতের জন্য নয়, এক মুজাহিদের পুত্রের জন্য, যে মুজাহিদ জেরুজালেমে মুসলমানের বিজয় ঝান্ডা গেড়ে সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার হাসিল করেছিলেন। আমি চাই না যে, তাঁর পুত্র এই ভর মাহফিলে পিতার পবিত্র আমানতের অযোগ্য প্রমাণিত হয়। আর কাসিম এ তলোয়ার হাসিল করেই বা করবে কি?'

ঃ 'কেন, তিনি কি এক সিপাহী নন?'

ঃ 'সিপাহী? সে কেমন সিপাহী, তা' সিপাহসালারের বেটির কাছে জিজ্ঞেস কর। আরও বেশী জানতে চাইলে আবদুল মালিকের বিবিকে জিজ্ঞেস করে দেখ। সে হচ্ছে কেবল গালিচার উপর কুস্তি লড়নেওয়ালা পালোয়ান। পাহাড়ী পথের উপর দিয়ে চার মনজিল অতিক্রম করেই সে ফিরে এসেছে সিপাহসালারের সাথে ঝগড়া করে। তার খোশ কিসমৎ খারেযম বাহিনী ফিরে গিয়েছিল, আর তার কৈফিয়ৎ বানাবার মওকা জুটেছিল। নইলে শুনেছি, সে নাকি রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে "ফৌজ এল, পালিয়ে জান বাঁচাও" বলে চিৎকার করে উঠতো। সত্যি বলছি, সে যদি তোমার ভাই না হয়ে কোন সাধারণ মানুষের ছেলে হত, তাহলে ময়দান থেকে পালিয়ে আসা সিপাহীর মত একই সাজা তাকে পেতে হত।'

সকিনা বললেন ঃ 'এসব সিপাহসালারের চক্রান্ত! কাসিমকে খলিফার নজরে ছোট করবার জন্যই তিনিও এসব কথা রটিয়েছেন। কিন্তু আজ তিনি বুঝতে পারবেন বাগদাদের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করার সত্যিকার হকদার কে?'

সুফিয়া কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে উপর তলা থেকে নকীব উঁচু গলায় ডজন খানেক খেতাব উচ্চারণ করে খলিফাতুল মুসলেমিনের আগমনবার্তা ঘোষণা করল। সামিয়ানার নীচে উপবিষ্ট, ওমরাহ্ উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং তাযিমের সাথে গর্দান ঝুঁকালেন, কিন্তু তাহির গর্দান না ঝুঁকিয়ে নীরবে সোজা হয়ে শ্বেতশ্মশ্রু খলিফার মুখের দিকে তাকালেন। দু'জন হাবশী গোলাম বৃদ্ধ খলিফার হাত ধরে সোনার কুরসীতে বসিয়ে দিল। আচানক জানালাগুলোর পরদা পড়ল এবং নকীব সমবেত জনগণকে বসতে বলল।

একজন ফৌজী অফিসার মধ্যস্থতা করবার জন্য ময়দানে এসে দাঁড়ালেন। এক হাবশী গোলাম সোনার থালায় কয়েকখানি তলোয়ার বহন করে নিয়ে এল। সালিসের ইশারায় কাসিম ও তাহির কুরসী ছেড়ে উঠলেন। তাঁরা দু'জনে থালা থেকে এক একখানা তলোয়ার তুলে নিলেন। কাসিম তাঁর লৌহ শিরস্ত্রাণ মাথায় লাগিয়ে নিলেন। তাহিরও তাঁর অনুসরণ করলেন। দর্শকদের মধ্যে এক প্রশান্ত আবহাওয়া বিরাজ করছিল।

তলোয়ারের ঝংকার ধীরে ধীরে উঁচু হতে লাগল। সেই ঝংকারের সাথে সাথে দর্শকদেরও জবান খুলতে লাগল।

যেসব ওমরাহ্ কুরসীতে হেলান দিয়ে আরাম করছিলেন, ধীরে ধীরে উঠে সোজা হয়ে বসে সামনের দিকে তাকাতে লাগলেন। কাসিমের হামলার তীব্রতা বেড়ে চলছে। তাহির কেবল তাঁর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করছেন। দর্শকরা একদিকে কাসিমের আক্রমণের দ্রুত সঞ্চালনের তারিফ করছেন, অপরদিকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে তাহিরের নিপুনতায় মুগ্ধ হচ্ছেন। উজিরে আজম নিজ কুরসীতে উঁচু হয়ে বসবার চেষ্টা করছেন, আর সিপাহসালার হাটুর উপর হাত রেখে অর্ধহাত উঁচু হয়ে উঠছেন। কাসিমের ওসতাদ লুকাস সাগরেদের তীব্র হামলার বিফলতা বরদাশত করতে না পেরে ফরাসী ভাষায় কি যেন বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু পিছন থেকে এক ফৌজী অফিসারের বলিষ্ঠ হাত তাঁর দুই কাঁধের উপর চাপ দিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিল। খানিকক্ষণ পর তিনি আবার উঠবার চেষ্টা করলেন। এবার আবদুল আযীয তাঁর কুরসীর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবার তাঁর কাঁধের উপর দু'খানা নতুন হাতের চাপ তাঁর কাছে আরও বেশী নিরুৎসাহব্যঞ্জক মনে হল।

অপরদিকে মেয়ে মহলে সুফিয়া সকিনাকে বলছিলেন ঃ তোমার ধারণায় বাগদাদের সুসভ্য নওজোয়ান মদীনার বুদ্দুকে মোকাবিলা করবার দাওয়াত দিয়ে ভুল করেনি কি? কাসিম বলছিল, পঞ্চাশ পর্যন্ত গণবার আগেই খেলা খতম হয়ে যাবে, আমি তো এর মধ্যে তিনশ' গুণে ফেলেছি। সকিনা ও সুফিয়ার চাইতেও বেশী করে নিজকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেনঃ পাগলী! আমি তাঁকে বলেছিলাম, কিছুক্ষণ যেন তামাসা চলতে দেন। তিনি ওঁকে নিয়ে একটি বাচ্চার মত খেলছেন।

ঃ আমার ভয় হয়, বাচ্চা যখন ওকে নিয়ে খেলতে শুরু করবে, তখনও ওর অবস্থা দেখে লোকের মনে দয়া জাগবে।

সকিনা বললেনঃ তুমি দশদিন তলোয়ার চালানো শিখে মনে করছ, যেন ভারী ওস্তাদ বনে গেছ। কি জান তুমি পুরুষদের খেলার?

সুফিয়া বললেনঃ আমার মোকাবিলায় তোমার ভাইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব আমি স্বীকার করি, কিন্তু এখানে তার মোকাবিলা হচ্ছে এক পুরুষের সাথে, আর তাও এক বুদ্দুর সাথে-যে লড়াই না করে হার মানে না। দেখ, কাসিম কেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হামলা চালাচ্ছে আর তিনি এখনও প্রতিরোধ করেই যাচ্ছেন।

তাহিরের দেহ বাঁচাবার জন্য তাঁকে পিছু হটতে দেখে সকিনা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেনঃ যে লোক হামলা করতে জানেই না, তার প্রতিরোধ করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

সুফিয়া বললেনঃ যদি বল তো আবার পঞ্চাশ পর্যন্ত গুণতে শুরু করি।

সকিনা জবাবে বললেনঃ না, এবার কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাক। আমার ভাইয়ের উপর তোমার নজর লেগে না যায়।-তোমার বুদ্দু যখন তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে জমিনের উপর লুটিয়ে পড়বে, তখনও তোমায় আমি চোখ খুলতে বলবো।

সুফিয়া চোখ বন্ধ করলেন। এত কথা সত্ত্বেও তিনি এদের মধ্যে কারও জন্য খোদার দরবারে দোয়া করেননি। চোখ বন্ধ করে তিনি যখন দোয়া করবার জন্য মনস্থির করলেন, তখনও কার বিজয়ের জন্য দোয়া করবেন, তার ফয়সলা তাঁর কাছে কঠিন হয়ে দেখা দিল। কাসিম তাঁর চাচার পুত্র-তাদের খান্দানের সকল আশার কেন্দ্রস্থল। তাছাড়া কাসিম তাঁকে ভালবাসেন। আর যতদিন ফৌজ থেকে পালিয়ে এসে তিনি বুযদীল বলে মশহুর না হয়েছেন, ততদিন তাঁর উপর তাঁর নিজেরও কোন ঘৃণা ছিল না। কাসিম যেদিন খারেযম শাহের মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীর শামিল হয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন, সেদিন সুফিয়া নেহায়ত আন্তরিকতা সহকারে দীল থেকে বলেছিলেন ঃ কাসিম! খোদা তোমায় নিরাপদে ফিরিয়ে আনুন। যেদিন বাগদাদের লোক ময়দানে তোমার বাহাদুরীর বিনিময়ে তোমার গলায় পরিয়ে দেবে ফুল হার, সেদিন আমি আমার বাগিচার শ্রেষ্ঠ ফুল তোমারই জন্য রেখে দেব। সকিনা যদি আবার বলেঃ কাসিম তোমায় পছন্দ করে, তাতে আমি কিছু মনে করব না। যেদিন কাসিম ফিরে এলে তার বুযদীলির কাহিনীর সাথে সাথে তার শরাবখোরীর কিস্‌সা বাগদাদে মশহুর হল, সেদিন তিনি মনে করলেন, যেন হামেশাই তিনি তাঁকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এসেছেন। কাসিমের প্রেমনিবেদনের উন্মত্ত প্রয়াস তাঁর ঘৃণার সাগরের বিস্তার আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সেই কাসিম-তাঁর চাচাতো ভাই কাসিম মোকাবিলা করছেন এক অপরিচিতের। সেই অপরিচিত লোকটি সম্পর্কে তিনি কেবল এইটুকুই জানেন যে, তিনি এক বাহাদুর বাপের বেটা, আর তাঁর কাছে রয়েছে সালাহউদ্দীন আইউবীর নিশানা। সালাহউদ্দীন আইউবীর জামানায় তাঁর বাপ হেলাল ও ঈসায়ী ক্রুসের সংগ্রামে হিস্‌সা

নিয়েছিলেন নাম-না জানা সিপাহী হিসাবে। ইসলামের জন্য আত্মদানকারী মুজাহিদের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁকে এই অপরিচিত মানুষটির প্রতি সহানুভূতিপ্রবন করে তুলেছে, কিন্তু তাহিরের প্রতি তাঁর সহানুভূতির জন্য তাঁর কাছে সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার থাকাই কি যথেষ্ট? সুফিয়া বারংবার তাঁর মনের কাছে প্রশ্ন করলেন এবং তাঁর মন সাক্ষ্য দিলঃ না, আর কোন নওজোয়ানের কাছে এ তলোয়ার থাকলেও হয়ত তাঁর ভিতরে এমনি ভাবান্তর সৃষ্টি হত না। সুফিয়াও তাহলে সেই যুবতীদের একজন, যাঁরা মোকাবিলা শুরু হবার আগেই তাঁর সুদর্শন চেহারা দেখে তাঁকে তাঁদের কম্পিত অন্তরের নেক দোয়ার যোগ্য মনে করে নিয়েছেন।

আচানক দর্শকদের গলার চাপা আওয়াজ আনন্দ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হল। সুফিয়া তখনও চোখ বন্ধ করে কল্পনার দৃষ্টিতে দেখে চলেছেন দুটি রূপ।....মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল বিজয়ী কাসিমের গর্বিত মূর্তি আর তাঁর পাশাপাশি পরাজিত তাহিরের অসহায় মুখ। পর মুহূর্তেই দেখলেন, তাঁর চাচা জাত ভাই গর্দান নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। রক্তের সম্বন্ধ এবার তাঁর মনকে অভিভূত করল। মনে মনে তিনি দোয়া করলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! কাসিমের বিজয়.... কিন্তু তাঁর জবান আড়ষ্ট হয়ে এল। যে অপরিচিত লোকটি তাঁর জিন্দেগীর সমুদ্রকে হালকা হালকা মউজ পয়দা করেছেন, তিনি যেন অন্তহীন অসহায়তার স্বরে তাঁকে প্রশ্ন করছেনঃ তোমার চাচা জাত ভাই না হয়ে কি আমি গুনাহ করেছি।

দর্শকদের ক্রমবর্ধমান কোলাহলে সুফিয়ার চোখ খুলে গেল তাহিরের আত্মরক্ষার প্রয়াস এবার বলিষ্ঠ হামলায় রূপান্তরিত হয়েছে। কাসিম নিরুৎসাহিত হয়ে পিছু হটতে হটতে ময়দানের চারদিকে ঘুরছেন। কাসিম তিনবার পিছু হটতে হটতে পড়ে গেলেন, কিন্তু তাহির তাঁর বুকের উপর তলোয়ার ধরে হার মানাবার চেষ্টা না করে প্রত্যেকবারই তাঁকে উঠে দাঁড়াবার মওকা দিলেন। চতুর্থবার পড়ে গিয়ে কাসিম উঠবার চেষ্টা না করে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেললেন। তাহির এগিয়ে গিয়ে তাঁকে হাত ধরে তুলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাসিম এক ঝটকায় তাঁর হাত সরিয়ে দিলেন। তারপর উঠে ডগমগ করে তাকাতে তাকাতে নিজের কুরসীতে গিয়ে বসলেন। লৌহ শিরস্ত্রাণ খুলে তিনি পাশে রাখলেন। তিনি তখনও ক্লান্ত ঘোড়ার মত হাঁফাচ্ছেন। তাঁর মুখের উপর দিয়ে ধারার মত ঝরছে ঘাম। ঘাম মুছবার জন্য লুকাস তাঁকে নিজের রুমাল এগিয়ে দিতে গেলে কাসিম এক ঝটকায় তাঁর হাত পিছে সরিয়ে দিলেন। লুকাস যখন পেরেশান হয়ে নিজের কুরসীতে বসছিলেন, তখনও আবদুল আযীয ঝুঁকে পড়ে তাঁর কানের কাছে বললেনঃ রুমালটা নিজের জন্য রেখে দিন।- এখনও দর্শকরা খুশী হতে পারেননি। তাঁরা আপনার কৃতিত্বও দেখতে চাচ্ছেন।' লুকাসের ঠোঁট কামড়ানো ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বাগদাদের ওমরাহ চাপা গলায় তাহিরের প্রশংসা করছিলেন। কিন্তু খারেযমের দূত কুরসী থেকে উঠে এগিয়ে এসে মোসাফেহার জন্য তাহিরের

দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেনঃ নওজোয়ান! আমি তোমায় মোবারকবাদ দিচ্ছি। সালাহউদ্দীন আইউবীর বাহাদুর সিপাহীর পুত্রের কাছ থেকে এ প্রত্যাশাই আমরা করেছিলাম।

তাহির তাঁর শিরস্ত্রাণ নামিয়ে তাঁর শোকরিয়া আদায় করলেন। ইমাদুল মুলক তাঁর শিরস্ত্রাণ ধরতে ধরতে নিজের রুমাল তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। তাহির রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। এরই মধ্যে উপর থেকে নকীব ঘোষণা করল যে, খলিফাতুল মুসলেমিন চলে যাচ্ছেন। সমবেত জনতা সম্মান প্রদর্শনের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নকীব আবার খলিফার চলে যাবার খবর ঘোষণা করল। সবাই নিজ নিজ আসনে বসে পড়লেন।

তাহির ইমাদুল মুলুকের হাত থেকে শিরস্ত্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে নিজের আসনে বসলেন। আমীরদের দৃষ্টি আজমের দিকে নিবদ্ধ। তিনি তাঁর মানসিক অশান্তি রাজনৈতিক হাসির আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেনঃ

আমি খলিফাতুল মুসলেমিন, ওলী আহাদে সালতানাত, শাহজাদা মুসতানসির ও বাগদাদের ওমরাহের তরফ থেকে তাহির বিন ইউসুফকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এই নওজোয়ান নিজকে যে তলোয়ারের শ্রেষ্ঠ হকদার প্রমাণিত করেছেন, আব্বাসীয় খিলাফতের সর্বোত্তম কল্যাণে তা লাগানো হবে, এই আশা আমরা করি।

উজিরে আজমের বক্তৃতা হাযির জনগণের দ্বিধাসংকোচ দূর করল। তাঁরা একে একে উঠে তাহিরের সাথে মোসাফেহা করতে লাগলেন। সিপাহসালার আর একবার মুসতানসিরের সাথে পরামর্শ করে উঠে দাঁড়ালেন। উঁচু গলায় তিনি বললেনঃ

'শাহজাদা মুসতানসির বিল্লাহ ইচ্ছা করছেন যে, তিনি নিজ হাতে সালাউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার তাহিরের কোমরে বেঁধে দেবার আগে তাঁকে আর একবার পরীক্ষা করবেন। আমাদের সম্মানিত মেহমানদের মধ্যে একজনের দাবী, তলোয়ার চালনায় সারা দুনিয়ায় তাঁর তুলনা নেই। তাহির যদি খুব বেশী ক্লান্ত না হয়ে থাকেন তাহলে আমার অনুরোধ, তিনি আমাদের সম্মানিত মেহমানদের দাওয়াত কবুল করুন, কেননা তাহিরের কাছে যেমন সালাউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার রয়েছে। তেমনি আমাদের সম্মানিত মেহমান লুকাসের কাছে রয়েছে ফরাসীরাজ্যের প্রশংসাপত্র।

লুকাস একথা শুনেই সেই মুহূর্তে কুরসী থেকে উঠে মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ লাগিয়ে ময়দানে এসে দাঁড়ালেন। তাহির এক পিয়ালা পানি পান করে হাসি-মুখে উঠলেন।

আবদুল আজিজ দ্রুতপদে সামনে এগিয়ে এসে বললেন আপনি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, মোকাবিলা শিগগিরই খতম করবার চেষ্টা করুন। তাহির মাথায় শিরস্ত্রাণ লাগাতে লাগাতে বললেন ঃ ওঁর সাথে আমার খেলা খুবই সংক্ষিপ্ত হবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

হাবশী গোলাম তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে এল। লুকাস কেবল নিজের জন্য এক তলোয়ার তুলে না নিয়ে দু'খানা তলোয়ার তুললেন। একখানা তলোয়ার তিনি তাহিরের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তাহির তলোয়ার তুলে নিয়ে অপর পক্ষ থেকে আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। লুকাস তাহিরের যুদ্ধপদ্ধতি আগেই দেখেছেন। তিনি তাহিরের ক্লান্তির সুযোগ নেবার জন্য দ্রুত হামলা চালালেন। তাহির তাঁর নিজের তলোয়ারের সাহায্যে লুকাসের হামলা প্রতিরোধ তো করলেনই, তাছাড়া তিনি দ্রুত এক পা পিছিয়ে গিয়ে তাঁর আঘাত ব্যর্থ করলেন। লুকাসের তলোয়ারের অগ্রভাগ গিয়ে জমিনে লাগল। তাহির তাঁর তলোয়ার পূর্ণ শক্তিতে ঘুরিয়ে এনে লুকাসের তলোয়ারের উপর মারলেন। লুকাসের হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে পড়ল এবং তিনি খালি হাতে ময়দানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে জনতার অট্টহাস্য শুনতে লাগলেন।

শাহজাদা মুনতানসির ওলী আহাদ জাহিরের ইশারায় টেবিলের উপর থেকে তলোয়ার তুলে নিলেন। তারপর সামনে এগিয়ে গিয়ে তা তাহিরের কোমরে বেঁধে দিতে দিতে বললেনঃ আমাদের অস্ত্রাগারে এর চাইতে আরও সুন্দর, আরও চমকদার ও ধারালো বহু তলোয়ার রয়েছে, কিন্তু হায়! আপনার মত আরও কয়েকজন সিপাহী যদি থাকতেন! আপনি এখান থেকে যাবেন না। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে।

তাহির জবাব দিলেন, যতদিন আমায় আপনাদের প্রয়োজন, ততদিন আমি এখানে থাকব।

ঃ চলুন, আব্বাজানের সাথে সাক্ষাত করুন।

তাহির ওলী আহাদের কুরসীর নিকটে গেলেন। ওলী আহাদ তাঁর সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ নওজোয়ান! আমার আস্তাবলের সব চাইতে ভাল যে ঘোড়ায় চড়বার শখ আমি এখনও পূর্ণ করিনি এবং আমার ইসলাহখানার সর্বশ্রেষ্ঠ যে তলোয়ার আমি আজও ব্যবহার করিনি, তাই আমি তোমায় ইনাম দিচ্ছি। - আজই এসব জিনিস তোমার কাছে পৌঁছে যাবে।

এই কথা বলে ওলী আহাদ পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেনঃ মুনতানসির! মেহমানদের বিদায় করার ভার তোমার উপর রইল। আমার তবিয়ৎ খারাপ, আমি চলে যাচ্ছি।

ওলী আহাদ চলে যাবার পর মাহফিলের লোকদের দ্বিধাসংকোচ আরও কেটে গেল। তাঁরা এগিয়ে এসে তাহিরের সাথে মোসাফেহা করতে লাগলেন। অপরের দেখাদেখি চেংগিস খানের দূতও এসে তাঁর সাথে মোসাফেহা করলেন, কিন্তু তাঁর সাথে মোসাফেহা করতে গিয়ে তাহির তাঁর দেহে এক কম্পন অনুভব করলেন।

মজলিস ধীরে ধীরে ভাঙতে লাগল। উজিরে আজম চলে যাবার সময় তাহিরকে বললেনঃ বেটা! আমার ওখানে ভাতের দাওয়াতটা ভুল না যেন।

কাসিম তখনও কুরসির উপর বসে আছেন। উজিরে আজম হাত ধরে তাঁকে উঠালেন এবং সাথে নিয়ে মহলের দিকে চললেন। সবশেষে তাহিরের কাছে

থেকে গেলেন সিপাহসালার ও কতিপয় ফৌজী অফিসার। সিপাহসালার আবদুল আজীজের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ ওস্তাদের পর সাগরেদ।

আব্দুল আজীজ বললেনঃ সাগরেদের পর ওস্তাদ।

সিপাহসালার অট্টহাস্য করে বললেনঃ আজীজ, তোমার খুব শিকারের শখ। আমি কাল থেকে তোমায় ও তোমার বন্ধুদের তিন দিনের ছুটি দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা আটজনের বেশী হবে না। তাহিরকে তোমরা সাথে নিয়ে যাবে।

পর্দার পিছনে সুফিয়া সকিনাকে বললেনঃ সকিনা! দেখলে ওই বুদ্দুকে?

সকিনা চুপ করে বসে থাকলেন। সুফিয়া যখন তাঁর সাথে সাথে মহলের দিকে যাচ্ছেন, তখনও তামাম রাস্তায় তাঁর দীলের ভিতরে বুদ্দু শব্দটি বার বার জাগছে। তাঁর কাছে শব্দটির তাৎপর্য তখনও বদলে গেছে।

## চার

রাতের বেলায় উজিরে আজমের দস্তরখানে কয়েকজন বিশেষ ওমরাহ হাজির। কাসিম হাজির না থাকায় উজিরে আজম তাহিরের কাছে মাফ চেয়ে বললেনঃ কাসিম তার কোন দোস্তের বাড়িতে গেছে। সে তার কার্যকলাপের জন্য লজ্জিত। আমার বিশ্বাস, কাল অথবা পরশু সে তোমার কাছে যাবে। আমি আরও আশা করছি তোমরা দু'জন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ দোস্ত প্রমাণিত হবে।

তাহির বললেন ঃ তিনি আমায় তাঁর দোস্তির যোগ্যই পাবেন।

খানাপিনার মধ্যে অন্যান্য মেহমানের সাথে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ করার পর উজিরে আজম তাহিরকে প্রশ্ন করলেনঃ সিপাহসালার তোমায় ফৌজের কোন উচ্চ পদ দেবার প্রস্তাব করেছেন কি? আমি শুনেছি, ওলী আহাদ আর শাহজাদা মুসতানসির তোমার জন্য সুপারিশ করেছেন।

তাহির জবাব দিলেনঃ সিপাহসালার এ ব্যাপার নিয়ে আমার সাথে কোন কথাই বলেননি। ওলী আহাদ ও শাহজাদা মুসতানসিরের সুপারিশের খবরও আমি জানি না।

উজিরে আজম বেশ ভাল করে তাহিরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন তুমি ফৌজে শামিল হতে চাইলে আমি নিজেও সিপাহসালারকে বলে দিতে পারব, কিন্তু ফৌজের সবগুলো বড় পদ দখল করে আছে তুর্কীরা। তারপরেই ইরানীদের প্রতিপত্তি। এক আরব অফিসারের জন্য কোন তরক্কীর সম্ভাবনা নেই।

তাহির বললেনঃ কোন পদের লোভ নেই আমার। আমি শুধু মুসলমানদের খেদমত করবার জন্যই সুযোগ সন্ধান করছি।

উজিরে আজম বললেনঃ এক মামুলী সৈনিককে সাধারণভাবে তাঁর অফিসারদের খুশী রাখবার ব্যাপারে এতটা ব্যস্ত থাকতে হয় যে, তার কোন খেদমতের সুযোগই থাকে না। আমি চাই যে, তোমার যোগ্যতার পুরোপুরি ফায়দা যেন

আমরা পেতে পারি। বর্তমান সংকট পরিস্থিতিতে তুমি আব্বাসীয় খিলাফতের খুবই মূল্যবান খেদমত করতে পারবে।

তাহির অনুভব করলেন যে, উজিরে আজম কাসিমের বাপ হওয়া সত্ত্বেও এক সত্যিকার গুণী মানুষ এবং বাগদাদের লোক তাঁর সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করছে, তা দুশমনি ও ঈর্ষাপ্রণোদিত। তিনি বললেনঃ আমায় আপনি সালতানাতে বাগদাদের জন্য সব চাইতে বড় কোরবানী দিতে তৈরী দেখতে পাবেন।

উজিরে আজম বললেন ঃ বর্তমান সময়ে বাগদাদের বৈদেশিক সমস্যা খুবই বিশৃংখল হয়ে রয়েছে। বৈদেশিক দফতরের জন্য আমাদের হুঁশমন্দ, বুদ্ধিমান ও নির্ভরযোগ্য লোকের প্রয়োজন রয়েছে।

তাহিরের চোখে যেন তাঁল মঞ্জিলের বাতায়ন দেখা দিল। তিনি বললেনঃ আমার বুদ্ধিবৃত্তি ও হুশমন্দি সম্পর্কে কোন দাবী নেই, কিন্তু আপনি আমায় নির্ভরযোগ্য পাবেন।

উজিরে আজম বললেনঃ কাল আমি উজিরে খারেজার সাথে আলাপ করব। সম্ভবতঃ কয়েকদিনের মধ্যে এক নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তোমার উপর ন্যস্ত করা হবে। হয়ত কাসিমও তোমার সাথী হবে। আপাততঃ তুমি খারেযমের দূতের সাথে সম্পর্ক পয়দা করবার চেষ্টা কর। সম্ভব হলে তুমি তাঁকে আশ্বাস দেবে যে, যে সব লোক খারেযমের উপর তাতারী হামলা বরদাস্ত করবে না, তুমি তাদেরই একজন।

তাহির বললেনঃ তাঁকে কি এ ধরণের আশ্বাস দেবার প্রয়োজন আছে? আলমে ইসলামের হীনতম ব্যক্তিও খারেযমের উপর তাতারী হামলা বরদাস্ত করবে না। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে, চেংগিস খান অবশ্যি তুর্কীস্থানের উপর হামলা চালাবেন?

উজিরে আজম কিছুক্ষণ চিন্তা করে জবাব দিলেনঃ চেংগিস খানের বাগদাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রত্যয় না জন্মালে তিনি হামলা করতে সাহস করবেন না। আরও সম্ভব, তাঁর সেনাবাহিনী তুর্কিস্তানের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে, সকল মতবিরোধ সত্ত্বেও এক ইসলামী সালতানাতের উপর তাতারী হামলা আমরা বরদাস্ত করব না। নতুন খবরে জানা গেছে যে, চেংগিস খানের সেনাবাহিনী খারেযমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপর জমা হতে শুরু করেছে। খুব সম্ভব, তাদের কাছে আমাদেরকে পয়গাম পাঠাতে হবে যে, তারা খারেযমের উপর হামলা করলে বাগদাদের সেনাবাহিনী খারেযম শাহের সাহায্যের ময়দানে অবতরণ করবে। কিন্তু খারেযম শাহের কার্যকলাপের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বাগদাদ থেকে যেসব সওদাগর তাতার মুলুকে যায়, তাদেরকেও তিনি মনে করেন গুপ্তচর। আমাদের দূতদের পর্যন্ত তালাশী নিতে বাধ্য করেন। গত কিছুদিন ধরে তিনি বাগদাদের কোন দূতকে পর্যন্ত সরহদ পার হয়ে চেংগিস খানের মুলুকে ঢুকবার এজাযত দিচ্ছেন না। আমার ভয় হয়, এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে খারেযমের সাথে আমাদের

সম্পর্ক আগের মতই উত্তেজনাদায়ক হয়ে উঠবে। আরও সম্ভব যে, আমরা প্রয়োজনের সময়ে চেংগিস খানকে চাপ দিতে পারব না। এই কারণেই এই নাজুক পরিস্থিতিতে যদি আমরা খারেযমের দূতের সাথে তোমার মত নওজোয়ানের দোস্তীর ফায়দা উঠাতে পারি, তাহলে খারেযম ও বাগদাদ উভয়েরই কল্যাণ হবে। সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ারের বদৌলতে এরই মধ্যে তোমার উপর তার অসীম বিশ্বাস জন্মেছে। এর জন্যই তোমায় তার সুযোগ নিতে হবে। আজ তুমি তার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছ এবং সবার আগে তিনিই উঠে তোমায় জানিয়েছেন মোবারকবাদ। আমার বিশ্বাস তুমি সালতানাতের খারেযম সম্পর্কে নেক ইরাদা জানিয়ে তাকে দোস্ত বানিয়ে নিতে পারবে।

তাহির জওয়াব দিলেনঃ খারেযম সম্পর্কে নেক ইরাদা প্রকাশ করতে গেলে সে হবে আমার দীলেরই আওয়াজ। আমার বিশ্বাস, আমি তাঁকে আন্তরিকতা দ্বারা প্রভাবিত করতে পারব। যদি আপনি আমায় চেংগিস খানকে সতর্ক করে দেবার জন্য মনোনীত করেন, তাহলে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।

উজিরে আজম বললেনঃ সে কর্তব্য কার উপর ন্যস্ত করা হবে, তা এখনও স্থির হয়নি। তুমি খারেযমের দূতের বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে তোমার কামিয়াবীর সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, কেননা আমাদের জন্য খারেযমের পথ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের দূতকে পূর্বদিকের এক বিপদসংকুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ওখানে যেতে হবে। আজও দস্যু দলগুলোর অস্তিত্বের জন্য সে পথ হবে আরও বেশী বিপজ্জনক।

খানা শেষ হয়ে যাবার পর আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে উজিরে আজম তা আর কারুর কানে পৌছবে না আশা করি।

তাহির বললেনঃ আপনি আমার কাছ থেকে এ ওয়াদা না নিলেও আমি এসব কথা কারুর কাছে বলব না। যা হোক আপনার মানসিক স্বস্তির জন্য আমি ওয়াদা করছি আর আমার ওয়াদা রাজনীতিকদের ওয়াদা নয়। একে এক সিপাহীর ওয়াদা মনে করবেন।

উজিরে আজমের ইশারায় তাঁর দেহরক্ষী তাহিরকে মহলের বাইরে পৌছে দেবার জন্য তাঁর সাথী হলেন। পহেলা দরজা পার হবার পর বাগিচায় পা দিয়েই তাহির বললেনঃ আপনি এখন ফিরে যান। রাস্তা আমার জানা আছে।

দেহরক্ষী বললেনঃ আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্য মহলের দরজায় গাড়ি তৈরী রয়েছে।

তাহির ফুলের কেয়ারীর ভিতরকার সড়কের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে পথ চলছেন।

ফুলের সুগন্ধে মাতাল হাওয়া তাঁর মন ও মস্তিষ্কে প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধতা সঞ্চার করছে। দিনটি তাঁর জিন্দেগীর এক পবিত্র দিন। ভোর থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত তিনি দেখেছেন তাঁর কত স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন। তলোয়ার চালনার মোকাবিলায় বিজয় লাভ তাঁর মঞ্জিলে মকসুদের পথ খুলে দিয়েছে। ওলী আহাদের শ্রেষ্ঠ ঘোড়া ও তলোয়ার তাঁর কাছে পৌছে গেছে। শাহজাদা মুসতানসিরের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন। বাগদাদের ওমরাহ তাঁর গুণে

মুগ্ধ। তথাপি তাঁর মনে এক আশঙ্কা। তিনি উজিরে আজমকে অসন্তুষ্ট করেছেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি শুনেছেন যে, উজিরে আজম নেহায়েত প্রতিহিংসা পরায়ণ মেজাজের লোক আর তাঁরই একটি মাত্র চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে পারে তাঁর তামাম ইরাদা, কিন্তু দস্তরখানের উপর উজিরে আজমের হাস্যোজ্জ্বল পেশানী আর শান্ত-সৌম্য মূর্তি সে সব ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। তাঁর কথাবার্তা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তিনি তাঁর সব চাইতে বড় দোস্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষী। বাগদাদের এই বহুদর্শী রাজনীতিক-যার হাজারো দুষ্কৃতির খবর তাঁর কানে এসেছে,-তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন মানবতার সর্বোত্তম গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হয়ে। তাহিরের মনের পরদায় ভেসে উঠল কাসিমের মুখ। তিনি মনে মনে ভাবলেনঃ হায়! আমি যদি তাঁকে ময়দানের মধ্যে এমনি করে অপদস্থ না করতাম। উদার দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও উজিরে আজম তাঁর বাপ। তাঁর পরাজয় উজিরে আজমকে নিশ্চয়ই দুঃখ দিয়েছে। দস্তরখানে কাসিমের হাজির না থাকা তার প্রমাণ। পরাজয়ের বেদনা তাঁকে পীড়ন করছে এখনও। উজিরে আজমের কথা তাহিরের মনে পড়লঃ কাসিম কাল অথবা পরশু তোমার কাছে যাবে। তাহিরের দীলের মধ্যে সর্বপ্রথম কাসিমের জন্য এক ভ্রাতৃস্নেহের অনুভূতি জেগে উঠল। তিনি ভাবলেন, কাসিম হয়ত বাপের কথায় মজবুর হয়ে তাঁর কাছে আসবেন। তথাপি তাঁর মনে থাকবে এক বেদনাদায়ক অনুভূতি। তার চাইতে তিনি নিজে তাঁর কাছে যাবেন। তাঁকে গিয়ে বলবেনঃ কাসিম! আমি তোমার দোস্ত। বাগদাদের ও আব্বাসীয় খিলাফতের কল্যাণের জন্য আমাদের পরস্পরের দোস্ত হওয়া প্রয়োজন। হায়! আমি ঘরে ফিরে যাবার আগে যদি কাসিমের সাথে দেখা করে যেতে পারতাম। কিন্তু এত শিগগিরই নয়, কাসিমের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাবার সময় দিতে হবে। কাল আবদুল আজীজের সাথে শিকারে যাবার আগে তাঁর সাথে অবশ্যি দেখা করব। লুকাস তাঁর ওস্তাদ। এ শহরে তিনিও আগন্তুক। তাঁকেও আমি খুশী করব।

আচানক তাহির তাঁর হাতের উপর কারুর হাতের চাপ অনুভব করলেন। পেছন থেকে কে যেন বললঃ দাঁড়ান।

তাহির চমকে উঠে তলোয়ারের হাতলের উপর হাত রাখতে রাখতে ফিরলেন। তাঁর সামনে এক খাজেসারা দাঁড়িয়ে আছে। খাজেসারা মুখের উপর আঙুল রেখে তাঁকে চুপ করবার ইশারা দিয়ে বললঃ আমার সাথে আসুন।

তাহির এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। খাজেসারা বললঃ ভয় নেই, আমি আপনার জন্য সালামতির পয়গাম নিয়ে এসেছি। সড়কের দু'ধারে প্রবহমান নহরের উপর খানিকটা দূরে দূরে সঙ্গে মর্মরে সীল পুলের কাজ করেছিল। খাজেসারা জলদী করে নহর পার হয়ে ফুলের কেয়ারীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। তাহির এক মুহূর্ত চিন্তা করার পর তার পিছু পিছু চললেন। কোন অপ্রত্যাশিত বিপদের আশঙ্কায় তাঁর ডান হাত তলোয়ারের হাতলের উপর রেখে তিনি চলছেন। ফুলের কেয়ারী অতিক্রম করে তিনি খাজেসারের পিছু পিছু গাছের এক ঘন ঝোপের

মধ্যে ঢুকলেন।.....এখানে দাঁড়ান। এই কথা বলে খাজেসারা এক ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। খাজেসারেরা চলে যাবার পর তাহিরের মনে হল, তিনি পথ ছেড়ে দূরে এসে ভুল করেছেন। হুঁশিয়ারীর জন্য তিনি তলোয়ার কোষমুক্ত করে নিলেন। তারপর তিনি গাছগাছড়ার মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা ছেড়ে গিয়ে এক গাছের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ পর ঝোপের মধ্যে শুকনো পাতার ছড়ছড়ানি শোনা গেল। দেখতে দেখতে এক যুবতী গাছের অন্ধকার ছায়ার ভিতর দিয়ে এসে ঠিক সেইখানে দাঁড়ালেন, যেখানে এতক্ষণ তাহির দাঁড়িয়েছিলেন। পাতার উপর দিয়ে চাঁদের রশ্মি এসে গড়িয়ে পড়ছে তাঁর মুখের উপর। অপরূপ সুন্দরী যুবতী। ফুলের সাদা পাপড়ির উপর চাঁদের আলো পড়ে এমন প্রফুল্লতা ও মুগ্ধকর রূপ পয়দা করতে তাহির আর কখনও দেখেননি। কিন্তু কে এই যুবতী? তাহির মুহূর্তের জন্য অবাক বিস্ময়ে এই সুন্দর সরল ও মাসুম মুখখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যুবতী পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কান্নার মত স্বরে আস্তে আস্তে বললেনঃ আপনি কোথায়?

তাহির তলোয়ার কোষবদ্ধ করে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। যুবতী অমনি তাঁর মুখের উপর নেকাব ফেললেন। এক মুহূর্ত চুপ থেকে তিনি বলে উঠলেনঃ আপনি আমার সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা করবেন না। আমি আপনার ভালর জন্য আপনাকে কয়েকটা কথা বলা জরুরি মনে করছি।

তাহির যুবতীর কথার তাৎপর্যের চাইতে তাঁর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হলেন। যুবতী কিছুক্ষণ থেমে বললেনঃ বাগদাদে আপনি আগন্তুক। হতে পারে, এখানে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা রয়েছেন, কিন্তু এখানে আপনি দোস্তরূপী দুশমনের সংখ্যা অনেক বেশী দেখতে পাবেন। এও সম্ভব, আপনি যার কাছে ফুলের প্রত্যাশা করেন, তার হাতে রয়েছে আপনার জন্য জহর-আলুদা ছুরি। কাসিম সম্পর্কে আপনি সতর্ক থাকুন। আপনার সম্পর্কে তার ইরাদা খুবই বিপজ্জনক।

তাহির জবাব দিলেনঃ কাল আমি তাঁর সাথে কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছি। তিনি নিশ্চয়ই আমার উপর রেগে আছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি আমার সম্পর্কে তাঁর দীল সাফ করে নিতে পারবো। আপনি বিশ্বাস করুন, কাসিমের দিক থেকে কোন বিপদ আসবে না।

যুবতী বললেনঃ বাগদাদে আপনার মত কল্পনা বিলাসীর জন্য কোন জায়গা নেই। আপনি দুনিয়ার এমন এক কোণ খুঁজে নিন, যেখানে মুগ্ধকর হাসির আড়ালে হিংসা-বিদ্বেষ ও দুশমনি মনোভাব ঢেকে রাখা হয় না, যেখানে দীল ও জবানের মধ্যে থাকে না লোক দেখানোর পর্দা। কাসিমকে আমি আপনার চাইতে ভাল করে জানি। আপনার জন্য তার দোস্তি সম্ভবত প্রকাশ্য দুশমনির চাইতেও বিপজ্জনক হবে।

তাহির কিছুটা চিন্তা করে বললেনঃ নেক দীল খাতুন! এই মহলের বাসিন্দাদের আমার চাইতে কাসিমের সাথে বেশী সম্পর্ক থাকা উচিত। আমি জিজ্ঞেস করতে পারি,

আপনি কে?

যুবতী জবাব দিলেনঃ আমার পরিচয় জানবার চেষ্টা করা আপনার উচিত হবে না। আমি অবশ্যি কাসিমের নিকটতর, কিন্তু আপনার সাথে তার বিরোধ আমি পছন্দ করি না।

তার কারণ আমি জানতে পারি কি?

তার কারণ? যুবতী পেরেশান হয়ে জবাব দিলেনঃ তার কারণ আমার জানা নেই, কিন্তু আপনি আমার উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনার জীবনের উপর বিপদ আশঙ্কা রয়েছে। বাগাদাদের কোন জায়গা আপনি আপনার জন্য নিরাপদ মনে করবেন না।

ঃ আপনি আমার জন্য এতটা পেরেশান হবেন না। আমার বাযুই আমার হেফাজত করতে পারবে। তাছাড়া মৃত্যুকে আমি ভয় করি না।

যুবতী ব্যথাতুর কণ্ঠে বললেন ঃ সম্ভবতঃ আমার এখানে আসার কারণও ছিল এই যে, আপনি মৃত্যুকে ভয় করেন না, আর আপনি ভয় করবেন, এটা আমি চাইও না, কিন্তু বাযুর উপর আপনার এতটা ভরসা করা ঠিক হবে না। বাহাদুরের তলোয়ার পিছন থেকে হামলাকারীর খনজর রুখতে পারে না।

তাহির বললেন ঃ আমি কাসিমকে তো এতটা বুজদীল মনে করি না।

যুবতী বললেনঃ কাসিম বুজদীল নয়, কিন্তু প্রতিহিংসার জোশে সে সব কিছুই করতে পারে।

ঃ আমি তাঁর জোঁশ ঠান্ডা করবার চেষ্টা করব।

ঃ আমি আপনার কামিয়াবীর জন্য দোয়া করব। কিন্তু আপনি অবশ্যই সতর্ক থাকবেন।

ঃ আমি আপনার নসীহত আমল করব, কিন্তু এইটুকুই আমি জানতে চাই, আপনি কে?

ঃ এ প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। আপনি আমায় এক মুসলমান যুবতী মনে করবেন, যার দীলের মধ্যে রয়েছে কওমের বাহাদুর সন্তানদের জন্য ইজ্জত। আপনার সম্পর্কে আমি এইটুকুই জানি যে, আপনি এক বাহাদুর বাপের বেটা। এর বেশী আমি কিছু জানি না, আর জানতেও চাই না। আপনিও আমার সম্পর্কে এর বেশী কিছু জানতে চাইবেন না। জীবনে আমাদের দু'জনেরই পথ ভিন্নমুখী। আমি মনে করেছি যে, আপনার কিস্তি আবর্তের কাছাকাছি এসেছে। আপনার চোখ খুলে দেয়া আমি জরুরী মনে করেছি। আমার কর্তব্য আমি পুরা করেছি।-আমি চললাম। আপনি একটু দেরী করুন। খাজেসারাকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও আপনাকে রাস্তায় পৌঁছে দেবে।

যুবতী তাহিরকে হয়রানী ও বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ পর খাজেসারা এসে হাজির হল এবং তাহিরকে পিছু পিছু চলবার ইশারা করে আগে আগে চলল।

ফুলের কেয়ারীর কাছে এসে খাজেসারা বললঃ এর আগের রাস্তা আপনি জানেনঃ এবার আমায় এজাযত দিন।

তাহিরের দীলে খাজেসারার কাছে যুবতীর কথা জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছা জাগল। কিন্তু জবান দীলের সাথে সায় দিল না। তিনি চুপ করে রইলেন।

তাহির তার মনের মধ্যে বিভিন্নমুখী ধারণার সংঘাত নিয়ে বাইরে এলেন। বাইরে দরজার সামনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। কোচওয়ান নুয়ে পড়ে তাঁকে সালাম করল, আর তিনি কোন কিছু না বলে গাড়িতে চাপলেন।

যুবতীটি কে? তাহিরের দীলের মধ্যে বারংবার জাগল এ জিজ্ঞাসা। কাল তিনি আস্তাবলের সামনে যে দুটি যুবতীকে দেখেছিলেন, ইনি হয়ত তাঁদেরই একজন, কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে এতটা পেরেশানি কেন? কাসিম সম্পর্কে তাঁর এতটা খারাপ ধারণা কেন? আচানক তাহিরের মস্তিষ্কে জাগল এক খেয়াল, আর তাঁর পেরেশানি দূর হতে লাগল। যুবতী তাঁকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, বাগদাদে থাকা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁর কথার সমর্থনে তিনি তাঁর সামনে পেশ করেছেন বাগদাদের লোকদের এক কদর্য চিত্র। এ কি কাসিমের চক্রান্ত নয়? আর এ চক্রান্ত কি এই জন্যই করা হয়নি যে, তিনি ভয় পেয়ে বাগদাদ থেকে পালিয়ে যাবেন? উজিরে আজমের মহলের বাসিন্দা এ যুবতী নিশ্চয়ই কাসিমের কোন আত্মীয় অথবা পরিচারিকা। কেন সে যুবতী তাঁর প্রতি এতটা হামদরদী দেখাচ্ছেন?

পরিচারিকা হতে পারেন না এ যুবতী। দেখতে তাঁকে এক শাহজাদী বলেই তো মনে হল। তাঁর সুন্দর মুগ্ধকর রূপ তখনও ভাসছে তাহিরের চোখের উপর। নিশ্চয়ই তিনি উজিরে আজমের খান্দানের কেউ হবেন! তাঁর কথায় ছিল আন্তরিকতার ছোঁয়াচ, মুখে সরলতার ছাপ। তাঁকে মনে হয়েছে প্রতারণা ও ফেরেব থেকে মুক্ত। হয়ত কাসিমের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ রয়েছে, কিন্তু তিনিও তো এক আগন্তুক। উঁচু ঘরের লোকেরা তো কখনও তাঁদের ঘরোয়া ব্যাপার আগন্তুকের সামনে তুলে ধরেন না! তাছাড়া তিনি কি করে জানলেন যে, তিনি বাহাদুর বাপের বেটা? এ সব খবর নিশ্চয়ই তিনি কোন পুরুষের কাছ থেকে পেয়ে থাকবেন! আর সেই পুরুষটি কাসিম ছাড়া কে হতে পারেন? কাসিম হয়ত কোন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে উজিরে আজমের সাথে তার কথাবার্তা শুনে থাকবেন। হয়ত উজিরে আজমকে তাঁর দিকে অতটা ঝুঁকে পড়তে দেখে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যই করছেন এ চক্রান্ত! নিশ্চয়ই তিনি এই যুবতীকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছেন তাঁকে বে-অকুফ বানানোর জন্য। যুবতী এখনও ফিরে গিয়ে কাসিমকে বলবেঃ আমি তাঁকে খুব করে ভয় ধরিয়ে দিয়েছি। তোমার কাছে এসে তিনি মাফ চাইবেন। তোমার সামনে নুয়ে পড়ে দোস্তীর জন্য হাত বাড়াবেন।

এসব চিন্তা তাহিরের মনে দুটি বিভিন্নমুখী ধারণা সৃষ্টি করে দিল। একদিকে তিনি ভাবলেন, কাসিম তাঁর বাপের রাগ-দাপটের পর তাঁর কার্যকলাপের জন্য দুঃখিত, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা, নতুন করে দোস্তি পাতবার জন্য তাহিরই এগিয়ে আসুন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর মনের মধ্যে একটা ভীতির ভাব জাগিয়ে তুলতে চান।

অপরদিকে তিনি ভাবলেন যে, এই ঘটনার পর তিনি যদি দোস্তি পাতাবার জন্য এগিয়ে যান, তাহলে কাসিম ভাববেন, এ সেই যুবতীর ধমকের ফল। তার চাইতে ভাল, তিনি কাসিমের দরজায় না গিয়ে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করবেন।

যুবতী কাসিমকে যতটা বিপজ্জনক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, তাহির কাসিমকে ততটা সরল ও নিরাপদ মনে করতে লাগলেন। নিজের ঘরে পৌঁছে তাহিরের মনে কাসিমের প্রতি অমন একটা অনুভূতি জাগলো, অভিমানী ছোট ভাইয়ের জন্য বড় ভাইয়ের মনে যে অনুভূতি জেগে থাকে। সুন্দরী যুবতীটি সম্পর্কে তাঁর মনে হয়, তিনি সেই আমীরজাদীদেরই একজন, যাদের জীবন কাটে চক্রান্ত ও ফেরেববাজির আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে, যারা মিথ্যাকে সত্য বানানোকে মনে করেন এক বিরাট কৃতিত্ব। গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ে যখন তিনি সম্পূর্ণ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করছিলেন, তখনও তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলঃ এই সরল মাসুম বালিকা কি অতটা মিথ্যা বলতে পারে?

এই প্রশ্নের জবাব চিন্তা করতে করতে তাঁর মনের মধ্যে এমন এক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল, যা মানুষের মন ও মস্তিষ্কে বিভিন্ন আওয়াজ তুলে তাকে কোন মীমাংসায় পৌছতে দেয় না।

পরদিন ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত কাসিমকে ঘরে দেখা গেল না। সুফিয়া কিছুক্ষণ পর পর খাদেমাদের কাছে তাঁর খবর পাবার চেষ্টা করলেন। দুপুর বেলায় তিনি জানলেন যে, কাসিম ফিরে এসেছেন। পনের বিশজন দোস্তকে নিয়ে তিনি বসেছেন মহলের পূর্বদিককার এক কোণে।

মহলের এই কোণের বারান্দার মুখ দরিয়ার দিকে। বারান্দার কুরসী থেকে শুরু করে দরিয়া পর্যন্ত নেমে গেছে সঙ্গে মর্মরের সিঁড়ি। পানির উপরিভাগ থেকে কিছু উপরে শেষ সিঁড়ির উপর কোথাও কোথাও লৌহ-শলাকা বসানো, আর তার সাথে বাঁধা রয়েছে ছোট ছোট খুব সুরত কিস্তি। এই সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে উপর দিকে খলিফার বালাখানা, সিপাহসালার ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীদের মহলের দরিয়ার কিনারের দিককার অংশটা দেখা যায়। প্রত্যেক মহলের সামনেই দেখা যায় অসংখ্য কিস্তির বহর।

সুফিয়া কাসিমের ইরাদা সম্পর্কে কমবেশী করে খবর জেনেছিলেন। এবার কাসিম পনের বিশজন দোস্তকে সাথে নিয়ে বসেছেন শুনে তাঁর উদ্বেগের মাত্রা বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি এক মজবুত ইরাদা নিয়ে মহলের পূর্ব দিককার কোণের দিকে চললেন। এই কোণের উপরতলার কামরাগুলোতে সকাল-সন্ধ্যায় কখনও কখনও মেয়েরা এসে বসতেন এবং দজলা নদীর মুগ্ধকর দৃশ্য দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন। ত্রিতলে এক বিস্তৃত বার দুয়ারী কামরা। দ্বিতল ও ত্রিতল থেকে দরিয়ার দিকে নামবার জন্য এক পেঁচদার সিঁড়ি। সিঁড়ির দরজা দরিয়ার দিককার খোলা বারান্দার কোণের দিকে।

সুফিয়া ত্রিতলের গ্যালারী পার হয়ে বার দুয়ারী ঘরে পৌঁছলেন। সেখান থেকে সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে তিনি নীচে নামতে শুরু করলেন। নীচের কামরার

ছাদের একটুখানি নীচে সিঁড়ির দরজা এক গ্যালারীর দিকে খোলা। গ্যালারীর মুখ পাইন বাগিচার দিকে। কাসিম কখনও কখনও এই গ্যালারিতে বসে কোন কোন দোস্তকে নিয়ে সতরঞ্জ খেলতেন।

নীচ ও উপর থেকে এই সিঁড়ি ছাড়া গ্যালারীতে যাতায়াতের আর কোন পথ ছিল না। কাসিম যে কামরায় বসেছিলেন, তার জানালা গ্যালারীর দিকে খোলা। সুফিয়া একটি জানালার কাছে গিয়ে বসলেন এবং পর্দা একদিকে একটুখানি সরিয়ে নিচে তাকাতে লাগলেন।

কাসিম পনের বিশজন নওজোয়ানের মাঝখানে বসে আছেন। এ সব নওজোয়ান সম্পর্কে বাগদাদের শরীফ লোকদের মতামত ভাল নয়। সুফিয়া আগেও তাদেরকে কাসিমের সাথে দেখেছেন। লুকাসও তাদের সাথে আছেন, কিন্তু আজ তাঁকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে।

কাসিম বললেন ঃ বদনামীর দাগ রক্ত দিয়ে ধুয়ে ফেলা যায়। সে আমায় ধোকা দিয়েছে। গোড়ার দিকে সে দেখিয়েছে, যেন সে হামলা করতে জানেই না। খেলা যাতে জলদী খতম হয়ে না যায়, কেবল এই খেয়াল নিয়ে আমি নেহায়ত বেপরোয়া হয়ে তার উপর হামলা চালিয়ে গেলাম। আমি যদি জানতাম যে, আমার বাযু শিথিল হয়ে এলে সে অমনি করে প্রচন্ড হামলা চালাবে, তাহলে শুরুতেই আমি খেলা শেষ করে দিতে পারতাম। লুকাসকেও সে ধোকা দিয়েছে। লুকাসের উপর অপ্রত্যাশিতভাবে সে হামলা চালিয়েছে। আচ্ছা, এবার দেখা যাবে।

লুকাস বললেন ঃ কম সে কম নিজের সম্পর্কে আমি একথা বলব যে, তিনি আমার সাথে ধোঁকাবাজি করেননি। তাঁর বিজয় তাঁর শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ। আমার আফসোস শুধু এই জন্য যে, আমরা তাঁর কাছে হার মেনে বীরের মত তাঁর দিকে দোস্তির হাত বাড়িয়ে দেইনি।

লুকাসের কথাগুলো তাদের সবারই কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। তারা হয়রান হয়ে তাঁর দিকে তাকাতে লাগল। ইতিমধ্যে আর একটি লোক এসে কামরায় ঢুকল। অমনি লুকাসের দিক থেকে সবারই নজর পড়ল তার দিকে।

কাসিম প্রশ্ন করলেনঃ কি খবর নিয়ে এলে?

নবাগত জবাব দিলঃ তাঁরা দরিয়ার এপারে নীচের দিকে এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে খিমা ফেলেছেন। এখন তাঁরা শিকার খেলেছেন। আর রাতের বেলায়।

কাসিম তার কথার বাকি অংশ পুরো করতে করতে বললেনঃ রাতের বেলায় তারা গাধার ঘুম ঘুমোবে। এই কিনারে উপর দিকে না নীচে?

ঃ নীচে জঙ্গলের কাছাকাছি।

ঃ তারা কত লোক?

ঃ মোট আট জন।

ঃ আর কে কে রয়েছে?

ঃ আবদুল আজীজ, আবদুল মালিক, মোবারক ও আফজল। বাকী কয়েকজন ফৌজী অফিসার। হ্যাঁ, সম্ভবতঃ একজন তাহিরের নওকর।

কাসিম প্রশ্ন করলেন, তোমার মতে আমাদের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাওয়া ঠিক হবে, না কিস্তিতে গেলে ভাল হবে?

জবাবে সে বলল ঃ ঘোড়ায় চড়ে গেলে একথা গোপন থাকবে না। কিস্তিতে গেলে আমরা রাতের মধ্যে ফিরে আসতে পারব।

কাসিম লুকাসকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আমাদের সাথে যাওয়া পছন্দ না হলে এখানে থেকে যেতে পারেন। একজন লোক কম হলেও অমন কিছু এসে যাবে না।

লুকাস জবাব দিলেন ঃ যারা ভুল ও বিপজ্জনক পথে বন্ধুদের সাথী হয় না, আমি তাদের দলের নই। আমি আপনাদের সাথে আছি, কিন্তু একথা আমি বলব যে, আপনারা যা করতে যাচ্ছেন, তা বাহাদুর যোদ্ধাদের ঐতিহ্যের খেলাফ। কম-সে কম, ঘুমন্ত দুশমনের উপর হামলা করার জন্য আমার তলোয়ার আমার কোষমুক্ত হবে না।

কাসিম শুনে বললেন ঃ আপনি কি মনে করেন, আমরা আঠার জন গিয়ে আটজন ঘুমন্ত লোককে কতল করে আসব। না, আমরা তাদেরকে জাগিয়ে মুখ, হাত ধুয়ে হাতিয়ার নিয়ে তৈরী হয়ে সামনে আসার মওকা দেব। যদি তারা পালিয়ে যায়, তাহলে অনর্থক তাদের রক্তে হাত রাঙাবার ইচ্ছে আমার নেই। আমি তাদেরকে মারতে চাই না, জাগিয়ে দিতে চাই। বেশী লোক সাথে নেয়ার ব্যাপারে আমার মতলব এই যে, তারা ভয়ে পালিয়ে যাবে।

লুকাস বললেন ঃ যদি তাঁরা মোকাবিলা করতে নেমে আসেন, তাহলে?

কাসিম বললেনঃ তাহলে যারা নিজের মর্যাদা বুঝতে না পারে, তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হয়, তাই করা হবে তাদের সাথে। আপনি এখনওই আমার কাছে অভিযোগ করছিলেন যে, আবদুল আজিজ আপনাকে ঝাঁকুনি দিয়ে কুরসীর উপর বসিয়ে দিয়েছিল। আপনার যদি নিজের ইজ্জত বোধ না থাকে, আমার তা অবশ্যি আছে। তাহিরের এক দোস্তের থেকে এত কেবল শুরু। আমরা যদি তাদের চোখ খুলে দেবার মত কিছু না করতে পারি, তাহলে বাগদাদের গরীব দুঃখীরাও আমাদের মাথায় উঠবে।

ঃ কিন্তু আপনার আব্বাজান?

ঃ আব্বাজান আমাদের ইরাদা জানতে পারলে নীতি হিসাবে আমাদেরকে নিষেধ করবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস যখন আমি তাঁর সামনে এ অভিযানের সাফল্যের কথা বলব, তখনও তিনি আপনাদের সবাইকে তাঁর দস্তরখানে জমা করবার জন্য দাওয়াত দেবেন।

লুকাস বিষন্ন সুরে বললেনঃ তাহলে আমি আপনার সাথে আছি।

কাসিম তামাম দোস্তকে লক্ষ্য করে বললেনঃ মনে রাখবেন, তাহিরের যে কোন অবস্থায় পালিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে ভাল হবে। সে সিপাহসালারের মহল ও খলিফার বালাখানা পর্যন্ত গতিবিধির অধিকার হাসিল করেছে। যদি সে কোন উচ্চ পদে পৌছে যেতে পারে, তাহলে প্রত্যেক ময়দানে সে তার দোস্তদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাদের সবারই তরক্কীর পথ হবে বন্ধ।

সুফিয়া যা কিছু জানতে চান, তা তাঁর জানা হয়ে গেছে। তিনি উঠে পা টিপে টিপে গ্যালারী অতিক্রম করে সিঁড়ির উপর চড়তে লাগলেন। তাঁর মনের মধ্যে বারবার ভেসে উঠছেঃ দরজার এই কিনারে- এখান থেকে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে-নীচের দিকে। তাঁর বুকের স্পন্দন কখনও দ্রুত, কখনও ধীর গতিতে চলছে। ধারণার সংঘাতে বিপর্যস্ত মন নিয়ে কখনও তিনি চলতে চলতে থেমে যাচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই পা ফেলছেন দ্রুতগতিতে। তাহিরকে তিনি আর একবার হুশিয়ার করে দেবেন। কিন্তু কেন? তিনি এক বাহাদুর নওজোয়ান শুধু এই কারণেই? তিনি বাগদাদে এক আগন্তুক শুধু তারই জন্য? এক অপরিচিত-বুদ্দু-বুদ্দু-বুদ্দু!! কয়েকবার এই শব্দটি তিনি মনে মনে উচ্চারণ করলেন। তার ভিতরে তিনি যেন এক অদ্ভুত মাধুর্য, এক অপূর্ব স্বাদ ও আকর্ষণ অনুভব করছেন! মনে মনে তিনি বললেনঃ হায় আমিও যদি এক বুদ্দু হতে পারতাম, আর কোন মরুপ্রান্তরে তাঁরই ছায়ায় জীবন কাটাতে পারতাম! এক বুদ্দুর খিমার মোকাবিলায় সঙ্গে মর্মরের আলীশান মহল তাঁর চোখে তুচ্ছ-অপূর্ব মনে হতে লাগল। তিনি শ্বাস ফেলতে চান সেই মুগ্ধকর আবহাওয়ার ভিতরে, যেখানে আজাদীর বাগিচায় বয়ে চলে মুহাব্বতের প্রস্রবণ, প্রতারণা ও লোক দেখানো প্রদর্শনী যেখানে মানবতার মুখ বিকৃত করেনি। আবার তাঁর দীল বলে ওঠেঃ সুফিয়া! সুফিয়া!! আত্মপ্রতারণা করো না। তাঁর দুনিয়া আর তোমার দুনিয়ার মাঝখানে প্রসারিত রয়েছে এক দুর্লংঘ্য মহাসমুদ্র। তিনি একটি সাধারণ মানুষ, আর তুমি উজিরে আজমের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তাঁর জান যদি বাঁচাতে পার, একটা ভাল কাজ করলে। এর বেশী এমন কোন স্বপ্ন দেখ না, যা কোনদিন বাস্তবে রূপ নেবে না।

সকিনার খোঁজে তিনি এক কামরায় ঢুকলেন। সকিনা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গালিচার উপর বসে এক কিতাব পড়ছেন। সুফিয়াকে দেখে তিনি বললেনঃ সুফিয়া কোথায় গিয়েছিলে? আমি তোমায় বহু তালাশ করেছি। আমায় এই কবিতাগুলোর তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও তো!

সুফিয়া বললেনঃ আজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেড়াতে যাবে না, সকিনা?

সকিনা হয়রান হয়ে বললেনঃ এক্ষুনি?

সুফিয়া বললেন ঃ আমার মতলব হচ্ছে, খানিকক্ষণ পর।

সকিনা কিতাবের দিকে নজর রেখেই বেপরোয়াভাবে জবাব দিলেনঃ সন্ধ্যাবেলায় যাব বেড়াতে।

সুফিয়া সকিনার গা ঘেঁসে বসতে বসতে বললেনঃ আজ ময়দানে না বেড়িয়ে দরিয়ার কিনারে যাব।

সকিনা জবাব দিলেনঃ তোমার মকসাদ হচ্ছে, বাগদাদের লোকেরা আমাদের কথা ভাল করে জানুক, আর আব্বাজান আমাদের ঘোড়ায় চড়াটা বন্ধ করে দিন। মনে পড়ে, আমরা একবার দজলার কিনারে গিয়েছিলাম, আর কতটা নারাজ হয়েছিলেন তিনি?

সুফিয়া বললেনঃ নেকাবের ভিতর দিয়ে কে আমাদেরকে চিনতে যাচ্ছে?

ঃ কিন্তু আমাদের ঘোড়া তো সবাই চিনবে। কথাটা শুনে সুফিয়া চিন্তায় পড়ে গেলেন। এ বিষয় নিয়ে আর বেশী কাটাকাটি তাঁর ভাল লাগল না।

সন্ধ্যা হওয়ার মধ্যে সকিনা কয়েকবার প্রশ্ন করছেনঃ সুফিয়া! তুমি বড়ই বিষন্ন বল তো, কেন তুমি এতটা পেরেশান হয়ে পড়েছ। প্রত্যেকবারই তিনি জবাব দিয়েছেনঃ সকিনা! আজ আমার শরীরটা কেমন যেন ভেঙে পড়েছে। ঘোড়ার উপর এক লম্বা দৌড় লাগল তবে আমার তবিয়ৎ ঠিক হয়ে যাবে।

সুফিয়ার অনুরোধে সেদিন সকিনা একটু আগেই বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হলেন। তাঁরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মহল থেকে বাইরে এলে সুফিয়া নিজের ঘোড়ার লাগাম খিচে ধরে কয়েকবার তার পেটের উপর পা দিয়ে গুতো মেরে বললেনঃ এস সকিনা দরিয়ার কিনারে একবার দৌড় লাগানো যাক। আমরা জলদী ফিরে আসব। এই কিনারে শহরের লোকেরা যাতায়াত এমনিই কম। আর যদি কেউ আমাদের ঘোড়া দেখে চিনেই ফেলে, তবু নালিশ নিয়ে আসতে তার সাহস হবে না। আর এতে দোষটাই বা কি? আমাদের মা-বোনেরাও তো পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে যেতেন।

সকিনা বললেনঃ কিন্তু দরিয়ার কিনারে কি ধরণের লড়াইয়ের ময়দান?

সুফিয়া লা-জবাবের মত হয়ে বললেনঃ আমার মনে হয়, তুমি ভয় পেয়ে গেছ। কিন্তু আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি, আমার খনজর তোমায় হেফাজত করবে।

সকিনা বললেনঃ কেন আমি ভয় পেতে যাব? আমার কাছে খনজর নেই?-চল।

সকিনার ইরাদা বদলে যেতে পারে, এই ভয়ে সুফিয়া জলদী তাঁর ঘোড়ার গতি দরিয়ার কিনারের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে দু'জন শহরের বাড়িঘর ছাড়িয়ে বাইরে চলে গেলেন। আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সকিনা চিৎকার করতে শুরু করলেনঃ সুফিয়া দাঁড়াও। আগে যাওয়ায় বিপদ আছে। সুফিয়া! সুফিয়া!! তুমি কি হাসান বিন সাবার জান্নাতে পৌঁছবার মতলব করে এসেছ না কি?

সুফিয়ার কৌশল কামিয়াব হয়েছে। তিনি চান, সকিনা তাঁর সাথে কিছু দূর মাত্র এগিয়ে যাবেন। ঘোড়া না থামিয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকালেন। বাইরে তিনি দেখালেন যে, ঘোড়ার লাগাম টেনে তিনি তাকে থামাবার চেষ্টা করছেন। সুফিয়া উঁচু গলায় চিৎকার করে বললেনঃ সকিনা! ঘোড়াটা আজ বড়ই দুরন্ত হয়ে উঠেছে। কিছুতেই বাগ মানছে না। আমি ওর মেজাজ ঠিক করতে চাচ্ছি। আগে যেতে তোমার ভয় লাগলে থেমে পড়। আমি এক্ষুনি আসছি।

সকিনা তখনও বলছেন ঃ কি রকম বে-অকুফ তুমি! আমি তোমায় বলেছিলাম না, ও ঘোড়ায় কেবল কাসিমই সওয়ার হতে পারে। তুমিই তো কথা শুনলে না।

সুফিয়া আবার মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলেনঃ ওর জোশ এক্ষুণি ঠান্ডা হয়ে যাবে। খুব বেশী না হয় দু'ক্রোশ ছুটবে।

সকিনা আরও কিছু দূর তাঁর পিছু পিছু গেলেন। শেষ পর্যন্ত ঘোড়া থামিয়ে তিনি অসীম পেরেশানির মধ্যে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যে, সুফিয়ার ঘোড়া বায়ুবেগে ছুটে চলেছে। চারপাশে উড়ন্ত ধূলোরাশির মধ্যে ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে গেল। সকিনা

অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। সূর্য অস্ত যাবার তখনও ঢের বাকী। দরিয়ার কিনারে আশপাশে কিষাণ ও রাখালদের বস্তিগুলো নজরে পড়ায় সুফিয়া খুব বেশী বিপদের আশঙ্কা করলেন না। সকিনা কয়েকবার রেগে গিয়ে ঘরে ফিরে যেতে চাইলেন। তারপরই মনে হল, ঘরে ফিরে গিয়েই বা কি বলবেন। তাই তাঁর ইরাদা বদলে গেল। আচানক তাঁর মনে খেয়াল এল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। তাই তিনি মামুলী গতিতে ঘোড়া হাঁকালেন। প্রায় আধ মাইল নীচে গিয়ে আবার মোড় ফিরলেন। তারপর শহরের দিকে প্রায় এক মাইল গিয়ে আবার থেমে পড়লেন।

পশ্চিমা আকাশে গোধূলীর লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের ছায়া দ্রুত দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে। পাখীরা খেত ছেড়ে উঠে চলেছে আশিয়ানার দিকে। সকিনার উদ্বেগও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তবু নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি আপন মনে বলছেনঃ ও তো এতটা নির্বোধ নয়। নিশ্চয়ই বহুত দূর যায়নি ও। আমায় ক্ষেপাবার জন্য হয়ত ও দরিয়ার কিনারে কোথাও গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চলতে থাকলে ও ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আমায় ধরবে, আমার কাছে এসে অট্টহাস্যে ফেটে পড়বে। সকিনার দীলের মধ্যে আবার এল নতুন ধারণাঃ কিন্তু খোদা-না-খাস্তা যদি ওর কোন বিপদ ঘটে থাকে? তবুও আমায় চলতে হবে। আব্বাজানের কাছে গিয়ে আমি বলব, ওর ঘোড়া অবাধ্য হয়ে ওকে নিয়ে এদিকে ছুটে এসেছে।

দীর্ঘ সময় চিন্তা করে সকিনা ফিরে চলবার ফয়সালা করলেন। তবু সুফিয়া এসে পড়বে, এই আশায় মাঝে মাঝে ঘোড়া থামিয়ে তিনি তাঁর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

## পাঁচ

তাহির আবদুল আজীজের বন্ধুদের মধ্যে আবদুল মালিক ও মোবারকের সাথে খুব শিগগিরই সৌহার্দ্য স্থাপন করলেন। মোবারক সুগঠিত দেহ, সাদা দীল সিপাহী। শিক্ষার দিক দিয়ে সে ছিল আর সবারই পিছনে। বন্ধু-বান্ধবদের মজলিশে কথা বলতে তার কুণ্ঠার অবধি ছিল না, কিন্তু দরিয়ায় সাঁতার কাটা, ঘন বনের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে হরিণের পিছনে ছুটে বেড়ানো আর উড়ে-যাওয়া পাখীর উপর তীরের নিশানা করায় তিনি তাহিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাহির জায়েদ ও মোবারকের মধ্যে অনেক দিক দিয়ে মিল দেখতে পেলেন। জায়েদ যেমন কারুর সাথে কথা বলতে গিয়ে ঘাবড়ে যেত, তেমনি মোবারকের সাথে দীল খুলে আলাপ করবার চেষ্টা করত।

আফজল ছিল অমায়িক নওজোয়ান। কথাবার্তায় সে ছিল খুবই হুঁশিয়ার, কিন্তু অপরের তুলনায় তার রুচিবান ও আরামপ্রিয় স্বভাব দেখে তাহির তার উপর কোন উঁচু ধারণা পোষণ করতেন না। শিকারে আফজল তার দোস্তদের সাথে খানিকটা দূরে ছুটাছুটি করে তারপর এক গাছের ছায়ায় ঘোড়া বেঁধে

আরামে ঘুমিয়ে পড়ল। দুপুর বেলায় তারা যেমন দরিয়ায় সাঁতার কাটতে গেল, তখনও জায়েদ তাকে নিয়ে খুব খুশী। গভীর পানি থেকে দূরে থাকার জন্য এক সাথী জুটেছে।

তাহির যে নওজোয়ানের গুণে মুগ্ধ হলেন, তিনি ছিলেন আবদুল মালিক। উচ্চতায় আবদুল আজীজের চাইতে কিছুটা কম, দেহখানা যথেষ্ট বলিষ্ঠ, কিন্তু মুখখানা অপেক্ষাকৃত লম্বা ও পাতলা। তাঁর চওড়া কপাল, মুগ্ধকরআকৃতি ও বড় বড় কালো কালো চোখ অনেকখানি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। বাগদাদের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়সমূহে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন। বাগদাদের চলতি এলম তিনি যথেষ্ট আয়ত্ত করেছেন। তাহির তাঁর ধারণার পরিপক্কতায় যথেষ্ট মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনিও ততটা পরিচিত হয়েছিলেন, তাহিরের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মকুশলতার সাথে। খানিকক্ষণ আলাপ করে তাহির ও আবদুল মালিকের মনে হচ্ছিল যেন তারা দীর্ঘযুগ ধরে পরিচিত।

মুসা ও নাসির খান খাঁটি সিপাহী। শিক্ষা ও সাহিত্যের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তাদের। আবদুল আজীজের ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ও মুহাব্বত তাদেরকে এই দলের শামিল করেছিল। অন্যান্য দোস্তরা যখন গাছের ছায়ায় বসে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, তখনও তারা দু'জন খানিকটা দূরে আপসে ঝগড়া করছে। মুসা বলছেঃ আমি যে হরিণ শিকার করেছি, তা ওজনে তোমার হরিণের চাইতে ভারী আর তার শিং তোমার হরিণের শিংয়ের চাইতে খুব সুরত।

নাসির তার কথা মিথ্যা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছে। সে বললঃ এমন হরিণ শিকারের কথা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারনি।

জায়েদের কাছে তাদের ঝগড়া এলমী আলোচনার চাইতে ভাল লাগল। সে উঠে গিয়ে তাদের কাছে বসল। তারা নিজের নিজের কথা অপরকে মানাবার চেষ্টা করে হতাশ হয়ে জায়েদের উপর বিচারের ভার দিল। জায়েদ হরিণের গুণের দিকে বেশী বিবেচনা না করে নাসিরের জোশ ও উৎসাহ প্রভাবিত হল এবং নাসিরের পক্ষে রায় দিল।

মুসা তাকে তার ফয়সালা আবার নতুন করে বিবেচনা করতে প্ররোচিত করল, কিন্তু নাসির বলল বাস, সালিসের ফয়সালার পরে তোমার কিছু বলবার হক নেই।

মুসা জায়েদের উপর রাগ ঝাড়বার সংকল্প করল। তারা তিনজন যখন দরিয়ায় গোসল করতে গেছে, তখনও মুসা ঠাট্টাচ্ছলে জায়েদের গর্দান দু'তিনবার পানির মধ্যে চেপে ধরল। জায়েদ পানি থেকে উঠে এলে মোবারক, আফজল ও আবদুল আজীজ, তাহির ও আবদুল মালিককে তাদের কাছে এসে জমা হলেন। জায়েদ মুসাকে মাটিতে ফেলে তার ছাতির উপর উঠে বসল এবং তাকে বললঃ এবার এদের সামনে এলান কর যে, হরিণ সম্পর্কে আমার ফয়সলা ঠিকই ছিল। মুসা খানিকক্ষণ হাত-পা ছুড়ে হাসতে হাসতে বললঃ আমি এলান

করছি যে, তোমার ফয়সলা বিলকুল ঠিক ছিল। এবার ওয়াদা কর, আর কখনও আমায় পানির মধ্যে চেপে ধরবে না। জায়েদ বলল।

মুসা ওয়াদা করলে জায়েদ তাকে ছেড়ে দিল।

আসরের নামাজের পর তাহিরের সাথীরা সবাই তীরন্দাজির অভ্যাস করতে শুরু করল। কিন্তু তাহির, আবদুল আজীজ ও আবদুল মালিক দরিয়ার কিনারে বেড়াতে বেরুলেন। সূর্য অস্ত যাবার সময় হয়ে এসেছে। তারা খিমায় ফিরে যাবার ইরাদা করছেন। অমনি তাঁদের নজরে পড়ল যে, দূর থেকে সওয়ার দ্রুতগতিতে ছুটে আসছেন। তাঁরা সওয়ারের দিকে দেখতে লাগলেন।

সওয়ারকে কাছাকাছি আসতে দেখে আবদুল আজীজ বললেনঃ কোন মহিলা হবেন, মনে হচ্ছে। তাহির তাঁর দলের মধ্যে কেমন একটা উদ্বেগ অনুভব করলেন। ঘোড়া নিকটে এলে তাঁর মানসিক উদ্বেগ পেরেশানি ও বিরক্তিতে রূপান্তরিত হল।

যুবতীটি সুফিয়া। পেশানী ও চোখ দু'টি ছাড়া তাঁর মুখের বাকী অংশটা নেকাবে ঢাকা। কিছুটা দূরে তিনি ঘোড়া থামালেন। নির্বাক হয়ে তিনি একে একে তাঁদের তিনজনের দিকেই তাকাতে লাগলেন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি ঘোড়াটিকে কয়েক কদম এগিয়ে এনে তাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তাঁর চোখ দিয়ে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছিল এর পীড়াদায়ক অনুভূতির অভিব্যক্তি। বালিকার দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করে আবদুল মালিক তাহিরকে বললেনঃ ইনি তোমায় কিছু বলতে চাচ্ছেন, যাও।

তাহির এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেনঃ আপনি আমায় কিছু বলতে চান?

বালিকা খানিকটা সামলে নিয়ে জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ আমি আপনাকে জানাতে এসেছিলাম যে, কাসিম..আজ রাতে.....।

তাহির কতকটা বিদ্রূপের স্বরে তাঁর কথাটা পুরো করতে করতে বললেনঃ আমাদেরকে খুন করে ফেলবে। তাই আমাদের বাগদাদ থেকে শত ক্রোশ দূরে চলে যেতে হবে। আমার মনে হয়, এর আগেও আমি আপনার সাথে মোলাকাতের সম্মান লাভ করেছিলাম।

সুফিয়ার দিলে এক কঠিন আঘাত লাগল। তিনি ভেঙেপড়া কম্পিত আওয়াজে বললেনঃ আমি আপনাকে বাগদাদের সস্তা বিদ্রূপপ্রিয় ও হাজির-জওয়াব নওজোয়ানদের থেকে আলাদা মনে করেছিলাম। সে যাই হোক, আমি আমার কর্তব্য পুরা করছি। কাসিম রাতের বেলায় পনের বিশজন লোক নিয়ে কিস্তিতে এখানে পৌঁছে আচানক আপনাদের উপর হামলা করবে। আপনারা এখান থেকে চলে যান অথবা কোন নিরাপদ জায়গা দেখে নিন। তাতে আপনাদের ভালই হবে। নইলে কে খুন হল আর কে খুন করল, তা বাগদাদে কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না হয়ত। তাহিরের সন্দেহ প্রত্যয়ের সীমানায় পৌঁছে গেছে। তিনি বললেনঃ আপনার তকলীফের জন্য শোক্‌রিয়া! আপনি কাসিমকে বলবেন, কোন আকলমন্দ লোক বারংবার একই ভুল পথ চলে না। আমি আগেও আপনাকে বলেছি যে, আমি তাঁর দুশমন না হয়ে দোস্ত হওয়াই বেশী পছন্দ

করব। কিন্তু আমায় ভয় দেখাবার জন্য যে তরিকা এখতিয়ার করা হয়েছে, তা যে কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক অন্যায় মনে করবেন। আমি তাঁকে বুকে তুলে নিতে তৈরী। তাঁর পায়ে পড়তে আমি কখনও রাজি নই।

তাহিরের প্রতিটি কথা সুফিয়ার অন্তরে বিষাক্ত ছুরির মত বিঁধলো। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি উঁচু গলায় বললেনঃ তুমি-তুমি এক বন্য জাহেল আর গর্বিত বুদ্দু! তুমি ভেবেছো, কাসিম আমায় পাঠিয়েছে।-তার কথায় আমি এখানে এসেছি। কালও তুমি এই ধারণা নিয়ে গিয়েছ যে, আমি তার চক্রান্তের সাথী আর আমি তোমায় ভয় দেখাবার জন্য মিথ্যা বলছি। তোমায় আমি বুঝতে ভুল করেছি। কাসিম থেকে তুমি আলাদা নও-আমি এক বে-অকুফ-আর এখনও আমি তোমায় বলে যাচ্ছি রাতের বেলা খিমায় চেরাগ জ্বালিয়ে আরামে ঘুমিয়ে থেক, যেন কাসিমের তোমাদেরকে খুঁজে বেড়াতে দেরী না হয়।

সুফিয়া বলতে বলতে হাঁপাতে লাগলেন। তাঁর কথার তিক্ততার চাইতে তার খুব সুরত চোখে উছলে ওটা অশ্রুধারা তাহিরকে বেশী করে অভিভূত করছিল। তাঁর চোখের কোণে উছলে উঠা অশ্রুবিন্দুতে তিনি যে মুগ্ধকর রূপ দেখছিলেন, ফুলের পাপড়িতে জমে থাকা শিশির বিন্দুতে তো তিনি তা দেখেননি কখনও। তিনি ভাবলেনঃ এই যুবতী সম্পর্কে যদি আমি ভুল ধারণা করে থাকি, তাহলে?

সুফিয়া মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখ দু'টি আস্তিনে ঢাকলেন। তারপর তাহিরের দিকে এমন এক চাউনী হেনে ঘোড়ার বাগ ঘুরালেন, যে চাউনীতে একদিকে ছিল ক্রোধ, অপর দিকে ছিল করুণা। কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আবদুল মালিক তাঁদের কথাবার্তা শুনে ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছেন। তিনি দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে ঘোড়ার বাগ ধরে বললেনঃ মোয়াজ্জেজ খাতুন! আপনার সাথে কথা বলার হক আমার নেই, কিন্তু এ অবস্থায় আমি কিছু না বলে চুপ করে থাকতে পারছি না। আপনি আর তাহির কবে পরস্পর পরিচিত হয়েছেন তাও আমি জানি না। যাই হোক, আপনার আন্তরিকতার সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনার চোখের পানি। তাহির হয়ত আপনাকে বুঝতে ভুল করছেন, কিন্তু সে ভুলকে আপনি ক্ষমার অযোগ্য মনে করবেন না। বাগদাদে তিনি এক আগন্তুক। এখানকার অবস্থা তাঁর জানা নেই। যদি তিনি আপনার সম্পর্কে ভুল ধারণা করে থাকেন, তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তিনি কাসিমকে এক বাহাদুর নওজোয়ান মনে করে তার সম্পর্কে হঠাৎ কোন খারাপ ধারণা মনে আনতে পারেননি। তিনি জানেন না, বাগদাদের ওমরাহের বুদ্ধিবৃত্তি কতটা ঘৃণ্য পথে চালিত হতে পারে। আমি কাসিমকে জানি। তাহিরের তরফ থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তাহিরের কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনার কাছে বেদনাদায়ক হয়েছে, কিন্তু আজ রাতেই কাসিম সম্পর্কে তাঁর প্রীতিকর ধারণা দূর হয়ে যাবে, তারপর আপনার সাথে এই আচরণের জন্য তাঁর মনে যে লজ্জা ও আফসোস জাগবে, আপনি হয়ত তা কল্পনাও করতে পারেন না। আমি অবশ্যি বুঝতে পারি, আপনি কতখানি মুশকিলের মোকাবিলা করে এসে এখানে পৌঁছেন। আপনি আমাদের অনেকখানি উপকার করেছেন। আমি আপনাকে আরও নিশ্চিত বলে দিচ্ছি যে

আমরা যে আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচবার জন্য সব রকম চেষ্টা করব। আমি আপনাকে আরও আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাহিরও কোনদিন আপনার এ উপকার ভুলবেন না। গোস্তাখী নেবেন না, আমার ধারণা, আপনি সুফিয়া। সুফিয়া জবাব দিলেনঃ হ্যাঁ, কিন্তু আমি এখানে এসেছি বলে আপনাদের যদি কোন ভুল ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার বিবির কাছে জিজ্ঞেস করবেন। আপনি যদি আবদুল মালিক হয়ে থাকেন তাহলে আপনার বিবি আমাকে ভাল করে জানেন।

আবদুল মালিক বললেনঃ আপনি বিশ্বাস রাখবেন, আপনার সম্পর্কে আমার কোন ভুল ধারণা থাকতে পারে না।

সুফিয়ার রাগের আগুন এতক্ষণে নিভে গেছে। তাহিরকে লজ্জায় ও আফসোসে মাথা নুইয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেনঃ উনি যখন নিজের কার্যকলাপের জন্য লজ্জিত হবেন, তখনও আমারও শক্ত কথা বলার জন্য আফসোস্ হবে। আমি আর একবার বলছি, কাসিম আজ রাতে আসবে। আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন। আমি আরও চাই, কাসিমের যেন কোন অনিষ্ট না হয়। আপনি ওয়াদা করুন।

আবদুল মালিক বললেনঃ আমি ওয়াদা করছি, কাসিমের একটি চুলও কেউ স্পর্শ করবে না।

তাহির গর্দান তুলে বললেনঃ এখনই যদি আমি লজ্জা প্রকাশ করি তাহলে কি আপনি আমায় ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন?

না, এখনও নয়, বলে সুফিয়া ঘোড়া হাঁকালেন।

তাহির হতভম্বের মত তাঁর দৃষ্টি পথ থেকে দ্রুত ক্ষীয়মান ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আবদুল মালিক তাঁর কাঁধের উপর হাত রেখে বললেনঃ তুমি এ যুবতীকে চেনো।

না। ঃ তাহির জবাব দিলেন।

ঃ আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, তুমি ওকে প্রথমবার কবে কোথায় দেখেছিলে?

ঃ কাল রাত্রে উজিরে আজমের মহলের বাগিচায় দেখেছিলাম। কিন্তু উনি কে?

ঃ কাসিমের চাচা জাত বোন সুফিয়া।

ঃ তা সত্ত্বেও তুমি মনে কর যে, আমার অনুমান ভুল?

ঃ তোমার অনুমান আমি ভুল মনে করছি, কারণ- উনি কাসিমের চাচা জাত বোন সত্যি, কিন্তু এর বাপ বাগদাদের তামাম ওমরাহ্ থেকে আলাদা ধরণের লোক ছিলেন। এবার চল, নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তাহির তাঁর সাথে সাথে চললেন। আবদুল আজীজ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তাহিরকে লক্ষ্য করে এবার তিনি বললেন আপনার পেরেশান হবার কারণ নেই। আপনি যে মাফ চেয়েছেন, তা তো উনি প্রত্যাখান করেননি! তারপর আবদুল মালিককে লক্ষ্য করে তিনি বললেনঃ তোমার ধারণায় আমার কর্তব্য কি? লড়াই করতে গেলে আমরা মাত্র আটজন হয়েও তাদেরকে ভাল

করে শিক্ষা দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তুমি তো আগেই ওয়াদা করে বসলে, কাসিমের একটি চুলও কেউ স্পর্শ করবে না। তলোয়ার চালাবার সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর চুলের দিকে নজর রাখা খানিকটা মুস্কিল নয় কি?

আবদুল মালিক বললেন ঃ আমি ওর কাছে কাসিমের জান হেফাজত করবার ওয়াদা করেছি। তা বলে তাঁর গলায় ফুলের মালা দেবার কথা বলিনি।

আবদুল আজীজ বললেন ঃ তাহলে আজ রাত্রে আমরা তাকে এমন শিক্ষা দেব, যা তিনি জীবনে কখনও ভুলবেন না। কিন্তু তুমি সত্যি বিশ্বাস কর যে, কাসিম রাতের বেলায় আমদের উপর হামলা করবেন?

আবদুল মালিক জবাব দিলেন ঃ এ যুবতীর সম্পর্কে আমি যতটা জানি, তাতে তাঁর কথার উপর বিশ্বাস না রাখলে গুনাহ্ হবে, আমি মনে করি। কাজী আবদুল রহমান তাঁকে কোরআন-হাদীস শিখিয়েছেন। আমার বিবিও তাঁরই শাগরেদ ছিলেন। তার ফলে তাঁরা দু'জন পরস্পরকে খুব ভাল করেই জানেন। আমার বিবি ওঁর সম্পর্কে খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করেন।

আবদুল আজীজ বললেন ঃ কিন্তু তুমি ওকে কি করে চিনলে?

ঃ তুমি খেয়াল করনি, উনি কাসিমের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছেন।

সকিনা ক্লান্ত ঘোড়াটিকে কখনও আস্তে, আবার কখনও দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে চলেছেন। মহল থেকে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে তিনি সুফিয়ার নাগাল পেলেন। সকিনা রাস্তায় কয়েকবার থেমে থেমে রাগে তাঁকে গালিগালাজ করেছেন। আবার ভালবাসার পীড়নে তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়াও করেছেন। কখনও তিনি বলছেনঃ সুফিয়া তুমি জিন্দা অবস্থায় নিরাপদে ফিরে এলে আমি অনেকগুলো দিনার খয়রাত করব। পরক্ষণেই আবার রাগে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বলেছেন, সুফিয়া, একবার ফিরে এস। আমি তোমার সাথে এমন ব্যবহার করব, যা তুমি আজীবন মনে রাখবে। তোমার সাথে বেড়াতে যাওয়া তো দূরের কথা, আমি তোমার সাথে কথাটি পর্যন্ত বলবো না। সুফিয়া! পাগলী, নাদান, বেতকুফ, এখনও সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তুমি কোথায় গেলে? ঘরে ফিরে আমি কি জবাব দেব? কাল পর্যন্ত সারা শহরে মশহুর হয়ে যাবে যে, সুফিয়া গায়েব হয়ে গেছে।

সুফিয়া যখন কাছে এসে বললেনঃ আপা সকিনা, এও কি হতে পারে যে, তুমি আমার উপর রাগ করে থাকবে? একবার আমার দিকে তাকাও। দেখ, আমি সুফিয়া, তোমারই ছোট সুফিয়া! তখনও সকিনা কি যে বলবেন, স্থির করতে পারছেন না। সুফিয়া আবার বলতে শুরু করলেনঃ আপা! আমার আপা! তুমি আমার উপর এমনি রাগ করে থাকবে, তা দেখার চাইতে আমার যে ঘোড়া থেকে পড়ে মরে যাওয়াই ছিল ভাল।

ভারী বে-অকুফ তো তুমি! বলে সকিনা সুফিয়ার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে তখনও পানি উছলে উঠেছে। খানিকটা পথ চলার পর সকিনা বললেনঃ যদি তোমার সাথে হাসান বিন সাবার জামাআতের কোন লোকের সাথে দেখা হত, তাহলে ব্যাপারটা কি ঘটত?

সুফিয়া হাসতে হাসতে বললেনঃ তাহলে আমি তাকে বলতামঃ তোমাদের জান্নাতের হুর হয়ে থাকবার যোগ্য আমি নই, সকিনা।

সকিনা বললেনঃ বাড়ির লোকেরা যদি আমাদেরকে খোঁজ করতে শুরু করে থাকেন, তাহলে কি কৈফিয়ত দেবে?

সুফিয়া স্বস্তির সাথে জবাব দিলেনঃ সবেমাত্র সন্ধ্যা হল। চাঁদনী রাতে কতবার আমরা এশার ওয়াক্তে ঘরে ফিরেছি।

দরিয়ার পুলের কাছে গিয়ে সুফিয়ার নজরে পড়ল দু'খানা কিস্তি। বেশ দূরে বলে কিস্তির আরোহীদের মুখ চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু কিস্তির গতি দেখেই তিনি বুঝলেন, কিস্তির আরোহী কাসিম ও তাঁর সাথীরা।

সাথীদের সাথে পরামর্শ করে কাসিম তাহির ও তাঁর সাথীদের খিমা থেকে প্রায় দু'শো গজ উত্তরে কিস্তি দু'খানি ভিড়বার হুকুম দিলেন।

কিনারে নেমে তারা মুখোশ পরে মুখ ঢেকে নিলেন। চাঁদের রশ্মি এড়িয়ে চলার জন্য তারা গাছের ছায়া দিয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে খিমার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। খিমার কাছে গিয়ে তারা ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের ছায়ার দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খানিকক্ষণ ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার পর একজন সামনে এগিয়ে গেল। লোকটি আস্তে আস্তে পা ফেলে খিমার চারদিকে ঘুরে এসে ভিতর দিকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। তারপর সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে বললোঃ ভিতরে এক কোণে আগুন জ্বলছে। আর ওরা গায়ে চাদর জড়িয়ে খরগোশের মত ঘুমাচ্ছে। আমাদের জন্য এখনই হচ্ছে সব চাইতে ভাল মওকা।

কাসিম বললেনঃ কিন্তু ওদের ঘোড়াগুলো তো দেখা যাচ্ছে না।

এক ব্যক্তি জবাব দিলেনঃ ঘোড়া যদি ওরা বনের মধ্যে চরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে না দিয়ে থাকে, তাহলে ওদের বেহুশ অবস্থার সুযোগে হয়ত কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

কাসিমের ইশারায় সবাই তলোয়ার কোষমুক্ত করল। লুকাস এগিয়ে গিয়ে কাসিমের বাহু ধরে বললেন ঃ আপনি ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে জাগিয়ে তোলবার অথবা মোকাবিলার জন্য হাতিয়ার নেবার মওকা দেবেন।

কাসিম জবাবে বললেন ঃ আপনি আমাদের সাথে থাকতে না চাইলে আলাদা থাকতে পারেন। আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হলে ডেকে নেয়া যাবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনি আমাদের কার্যকলাপের হিস্‌সাদার। যদি আপনার কাছে এ রহস্য গোপন না থাকে, তাহলে আমাদের অপরাধ প্রমাণ করা মুশকিল হবে, কিন্তু আপনার অপরাধ সম্ভবতঃ সহজেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। আপনি যদি বাগদাদে থাকতেন, তাহলে এর সাথে সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারতেন, কিন্তু আপনাকে এই জন্যই সাথে আনা হয়েছে যে, এখনও আপনি ফিরে গিয়েও প্রমাণ করতে পারবেন না যে, এতটা পথ আপনি শুধু তামাশা দেখতেই এসেছিলেন। যদি আপনি তলোয়ার কোষমুক্ত করতে না-ও চান, তবু আপনাকে ওয়াদা করতে হবে যে, আপনার জবান সংযত থাকবে।

লুকাস খানিকটা চিন্তা করে জবাব দিলেনঃ আমি এক দোস্ত হিসাবে আমার কর্তব্য করেছি, কিন্তু এই-ই যদি হয় আপনার ফয়সলা, তাহলে আমি আপনার সাথে আছি।

কাসিম বললেনঃ আপনার কাছে আমি এই প্রত্যাশাই করেছিলাম। আমি এ খেলা কিছুটা চিত্তাকর্ষক করে তুলতে চাই। আমরা ওদেরকে জাগবার মওকা দিচ্ছি না। তাতেও যেন আপনার আপত্তি না হয়। সম্ভব হতে পারে যে, ওরা লড়াই না করেই ভাগবার চেষ্টা করবে। আমাদের তলোয়ার যেন খামখা ওদের খুনে রাঙিয়ে তুলতে না হয়। যদি তারা ওয়াদা করে যে, তারা আর দ্বিতীয়বার বাগদাদে প্রবেশ করবে না, তাহলে সম্ভবতঃ তাদের গায়ে আচঁড়ও লাগবে না। আমি এখন তাদের খিমাটা ভেঙে দিতে চাই। আমাদেরকে এখন জলদী কাজ করতে হবে।

কোন কোন সাথী কাসিমের প্রস্তাব দীল খুলে সমর্থন করল। গাছের ছায়া থেকে বেড়িয়ে তারা মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে খিমার কাছে গেল। কাসিমের ইশারায় তারা একই সঙ্গে খিমার সবগুলো দড়ি কেটে এক দিকে টেনে খুটিগুলো ফেলে দিল। এক মুহূর্তের জন্য সবারই দীল ধরফর করে উঠল। মুহূর্তের জন্য তারা সেই জমিনের উপর বিছিয়ে ফেলা কাপড়ের তলা থেকে রকমারী আওয়াজ শুনবার প্রতীক্ষা করতে লাগল। আবার কিছুক্ষণের জন্য তাদের চোখ তাঁবুর মধ্যে শায়িত লোকদের পাশ ফেরার দৃশ্য দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করল।

কাসিম আর তাঁর সাথীদের উদ্বেগ বিরক্তিতে রূপান্তরিত হতে লাগল। তারা একে অপরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। কয়েকটি জায়গায় কাপড়ের ফুলে ওঠা অংশ তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, খিমা খালি নয়।

লুকাস চাপা গলায় কাসিমকে বললেন ঃ হতে পারে, তাঁরা আমাদেরকে দেখে থাকবেন, আর আমাদের সংখ্যা দেখে ভয় পেয়ে থাকবেন। আপনি আওয়াজ দিয়ে তাঁদের জান বাঁচাবার ওয়াদা করুন। আমার বিশ্বাস, তাঁরা বাগদাদ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন।

খিমার একদিকে আগুন জ্বলে উঠল। কাসিমের এক সাথী তার কুন্ডলীতে ধোঁয়ার দিকে ইশারা করে বললঃ ওরা ভিতরে গাধার ঘুম ঘুমালেও তো কম বেশী করে তাপ অনুভব করা উচিত ছিল।

কাসিম উঁচু গলায় বলে উঠলেন আর ধোকা দিয়ে কাজ চলবে না। যদি বাচঁবার সাধ থাকে, তাহলে বাগদাদের দিকে মুখ না করে সোজা আর কোন দেশে যাবার পথ দেখ। তোমাদের মাথার উপর আঠারখানা তলোয়ার ঝুলছে। খিমায় আগুন জ্বলছে। বাগদাদ ছেড়ে যাবার ওয়াদা করছ কিনা, জবাব দাও।

কোন জবাব না পেয়ে কাসিম এগিয়ে গিয়ে খিমার ফুলে ওঠা একটা জায়গায় তলোয়ারের মাথা দিয়ে খোঁচা দিতে শুরু করলেন। কোন ঘুমন্ত মানুষের লক্ষণ না দেখে তিনি তলোয়ার দিয়ে খানিকটা জোরে চাপ দিয়ে অনুভব করলেন যে, সেখানে মানুষের পরিবর্তে আর কোন শক্ত জিনিস পড়ে

আছে। তার দেখাদেখি সাথীরাও খিমার উপর উঠল। একজন অমনি ফুলে ওঠা আর একটা জায়গায় পা মেরে চিৎকার করে বললঃ নীচে পাথর আছে,মানুষ নেই। পাথরের উপর চাদর ঢাকা দিয়ে ওরা আমাদেরকে বে-অকুফ বানিয়েছে। চলো এবার ফিরে যাই। কাসিম রাগে গড় গড় করতে করতে আরও দু'একটা ফুলে ওঠা জায়গায় তলোয়ার মেরে দেখতে দেখতে বললেনঃ ওরা আমাদের আসার খবর পেয়েই পালিয়ে গেছে।

কয়েক কদম দূর থেকে এক গর্জনের আওয়াজ শোনা গেল। আমরা এখানেই আছি। আপনারা ভাগবার চেষ্টা করবেন না।

কাসিমের সাথীরা এক অপ্রত্যাশিত হামলার মোকাবিলা করবার জন্য তৈরী হল, কিন্তু আশেপাশে কোথাও কোন জন-মানুষ দেখা গেল না।

কে যেন বললঃ তোমরা সবাই এখনও আমাদের তীরের নাগালের মধ্যে রয়েছ। আর বিশ্বাস কর, আমাদের মধ্যে ভুল নিশানা করবার লোক একটিও নেই।

কাসিমের মনে হল, সামনে গাছের উপর গা ঢাকা দেয়া কোন লোকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে এ আওয়াজ। তিনি সাথীদেরকে দরিয়ার কিনারা দিয়ে ডান দিকে হটবার পরামর্শ দিলেন।

গাছের উপর থেকে আওয়াজ এলঃ 'ভাগবার চেষ্টা বিফল হবে। তোমাদের পিছে রয়েছে দরিয়া, আর ডানে, বাঁয়ে ও সামনের দিকের গাছে রয়েছে আমাদের সাথীরা তীর ও ধনুক হাতে নিয়ে। বিশ্বাস না হলে যে কোন দিক চার কদম এগিয়ে এসে দেখে। তোমরা আমাদেরকে দেখতেও পাবে না, অথবা তোমাদের হাতিয়ারও এখানে পৌঁছাবে না।

কাসিম সীমাহীন হতাশার স্বরে চীৎকার করে উঠলেনঃ 'কি চাও তোমরা? আমরা শুধু তোমাদের সাথে ঠাট্টা করতে এসেছিলাম।'

ঃ 'আমরাও তো শুধু ঠাট্টা করবার জন্যই গাছের উপর উঠে বসেছি।'

ঃ 'আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি তোমাদেরকে শুধু ভয় দেখাতে এসেছি।'

ঃ 'তুমিও আমার কথা বিশ্বাস কর, আমরাও তোমায় ভয় দেখাতেই চাচ্ছি।'

কাসিম বললেন ঃ 'তোমরা গাছ থেকে নেমে আমার সাথে আলাপ কর। তাই কি ভাল নয়?'

ঃ 'কি করতে হবে?'

ঃ 'তুমি সাথীদেরকে তলোয়ার সমর্পণ করতে হুকুম দাও।'

কাসিম বললেন ঃ 'কথা বলবার সময়ে উভয়ের উদ্দেশ্য বিবেচনা করাই কি ভাল হত না?'

গাছের উপর থেকে আওয়াজ এল ঃ 'গোস্তাখী মাফ কর। তোমার মুখের নেকাব না খুললে শুধু আওয়াজে তোমায় চেনা যাচ্ছে না।'

কাসিম বললেন ঃ 'তাহলে এর অর্থ, আমাদের আসার খবর না জেনেই তোমরা এতটা সতর্ক হয়েছিলে?'

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর আওয়াজ এল ঃ 'আমরা দরিয়ার কিনারে বসে চাঁদনী রাত উপভোগ করছিলাম। সম্ভবতঃ এটা তোমাদেরই বদ-কিস্‌মতি যে, তোমাদের

কিশ্‌তি দেখে আমরা বিপদ-সম্ভাবনার অনুমান করতে ভুল করিনি।'

খিমায় আগুনের শিখা জ্বলে জ্বলে উঠছিল। কাসিম তাঁর লোকদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমরা দাঁড়িয়ে কি দেখছ? দেখছ না, খিমা জ্বলে যাচ্ছে? ওটাকে টেনে পানির কাছে নিয়ে যাও না!'

গাছের উপর থেকে গর্জনের আওয়াজ এল ঃ 'দাঁড়াও। তোমাদের ভিতর থেকে কেউ এদিক ওদিক নড়বার চেষ্টা করলে ভাল হবে না। তোমরা আমাদেরকে খিমার বোঝা বয়ে নেবার তকলিফ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছো, আমরাও তোমাদেরকে এক মুশ্‌কিল থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি! কিশ্‌তি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার তকলীফ তোমাদেরকে করতে হবে না। তফাৎ হচ্ছে এই যে, আমদের খিমার ছাই কারুর কাজে লাগবে না, আর তোমাদের কিশ্‌তি দুটো থেকে কোন জেলের ফায়দা হবে। এখনও আর কোন কিস্‌সা শুরু করবার আগে তলোয়ার সমর্পণ কর।'

কাসিম সাথীদের দিকে তাকিয়ে হাতের তলোয়ার ছুঁড়ে ফেললেন, কিন্তু গাছের উপর থেকে আবার আওয়াজ এল ঃ 'অতোটা দূরে নয়। তোমাদের প্রত্যেকে একে একে এসে এই গাছের তলায় তলোয়ার রেখে আবার ওখানে দাঁড়াও।'

কাসিম বললেন ঃ 'আমরা এমনি করে হার মানবার চাইতে লড়াই করাই পছন্দ করি। তোমাদের সাহস থাকলে নীচে নেমে এসে মোকাবিলা কর।'

গাছের উপর থেকে আওয়াজ এল ঃ 'আল্লার শোকর, আপনারা আমাদেরকে এতটা যোগ্য মনে করেছেন, কিন্তু আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই-আমাদের কাছে ভোঁতা তলোয়ার নেই। আপনারা আমাদের তলোয়ারের তেজ আর আপনাদের জানের কীমত সম্পর্কে ভুল ধারণা করে বসে আছেন। তবু যদি আপনারা মোকাবিলার দাওয়াত দিতেই চান, তাহলে আমরা তৈরী। আপনাদের মধ্যে যে ব্যক্তির ভুল ধারণার মাত্রাটা বেশী, তিনি খানিকটা এগিয়ে আসুন। আমাদের মধ্যেও একজন নীচে নেমে যাবেন। এমনি করে আপনাদের প্রত্যেকেরই শক্তি পরীক্ষার মওকা মিলবে। আর যদি আপনারা এতে কোন ফায়দার সম্ভাবনা না দেখেন, তাহলে সাথীদের তরফ থেকে আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি, হাতিয়ার সমর্পণ করবার পর আপনাদেরকে ফিরে যাবার এজাযত দেওয়া হবে।'

কাসিম আবার সাথীদের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি একজনের দিকে ইশারা করলে সে গিয়ে গাছের তলায় তলোয়ার রেখে চলে এল। তারপর একে একে সবাই তার অনুসরণ করল। তারা সবাই এসে খিমার কাছে দাঁড়িয়ে গেল। এবার একজন গাছ থেকে নেমে এলেন। লোকটি আবদুল আজীজ। তিনি তলোয়ার কোষমুক্ত করে কাসিমও তাঁর সাথীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্ত চিন্তা করে তিনি বললেন ঃ 'আমি সাধারণভাবে গলার আওয়াজ চিনতে ভুল করি না। আমার ধারণা, আমি উজিরে আযমের সাহেবজাদার মোলাকাতের সৌভাগ্য হাসিল করেছি।'

কাসিম তাঁর মুখের নেকাব খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

আবদুল আজীজ আওয়াজ দিলেন ঃ 'তাহির, আবদুল মালিক, এবার নেমে এস। এ যে কাসিম। আমরা তো মনে করেছিলাম, কোন দুশমনই বুঝি আমাদের উপর হামলা করল।'

আবদুল আযীযের সাথীরা সবাই একে একে নাংগা তলোয়ার হাতে তাঁর কাছে দাঁড়ালেন।

কাসিম বললেনঃ 'তোমরা তো ভারী হুঁশিয়ার। আমরা শুধু ঠাট্টা করবার জন্যই এসেছি।'

আবুদল আজীজ বললেনঃ 'অত্যন্ত বাধিত করেছেন আমাদেরকে। আপনার কথা আমরা শুনেছি।'

কাসিম বললেনঃ 'আপনি ওয়াদা করেছেন যে, আমাদের তলোয়ার রেখে দেবার পর আপনারা আমাদের পথ রোধ করবেন না।'

আবদুল আজীজ জওয়াব দিলেনঃ 'আমাদের ওয়াদা আমরা ঠিকই রাখব। কিন্তু আপনার সাথীদেরকে তো দেখতে পেলাম না। তাঁদেরকে নেকাব খুলতে বলুন।'

কাসিমের ইশারা পেয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে তারা মুখের নেকাব খুলে ফেলল। আবদুল মালিক কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে চারজন ফৌজী অফিসারকে চিনে নিয়ে বললেনঃ 'আজীজ, কাসিমের প্রভাব তো দেখছি ফৌজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এঁদেরকে চিনতে পারছো? আমার মনে হয়, এঁদের চারজনকে আমাদের কাছে মেহমান রেখে দেওয়া খুবই জরুরি।'

আবদুল আজীজ বললেনঃ 'আমি এঁদের সবারই জান বাঁচানোর ওয়াদা করেছি। কাসিম, এবার তুমি চলে যেতে পার। কিন্তু একটা কথা ভাল করে বুঝে নাও, তোমার ইরাদা থেকে বিরত না থাকলে তার ফল খুবই খারাপ হবে। তাহিরের গায়ে একটু আচড় লাগলে আমি উজিরে আজমের মহলের নীচে পঞ্চাশ হাজার সিপাহী নিয়ে হাজির হবো। আমাদের দুশমন কে, তার সাক্ষ্য দেবে আমাদের কাছে রক্ষিত তোমাদের তলোয়ারগুলো। আমাদের দীলে যদি উজিরে আজমের জন্য ইজ্জত না থাকত, তাহলে আজ আমাদের কার্যকলাপ অন্য রকম হত। দজলার পানি যদি আমাদের লাশ গোপন করতে পারে, তাহলে তোমাদের লাশও সেই পানিতে ছেড়ে দেয়া যেত। যাহোক, এবার তুমি চলে যাও। ভবিষ্যতে আবার তোমার দীলের মধ্যে যদি প্রতিহিংসার আগুন ধূমায়িত হয়ে ওঠে, তাহলে মনে রেখ, কাল পর্যন্ত বাগদাদে আমাদের এমন পনের বিশজন আরও এমন নওজোয়ান মিলবে, যাঁরা আমাদের পর আমাদেরই জন্য যে কোন বড় শক্তির উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের হলফ নেবে।'

এই কথা বলে আবদুল আজীজ সাথীদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'যায়েদ, নাসির, তোমরা ওই তলোয়ারগুলো তুলে নাও।'

যায়েদ ও নাসির গাছের তলা থেকে তলোয়ারগুলো তুলে নিল। আবদুল আজীজ বাকী সাথীদের ইশারা করলে তাঁরা একদিকে চলে গেলেন। কাসিম

আর তাঁর সাথীরা অন্তহীন লজ্জা ও পেরেশানি নিয়ে তাঁদেরকে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন।

বনের পথে প্রায় আধ মাইল চলবার পর আবদুল আজীজ ও তাঁর সাথীরা একটি জায়গায় পৌঁছলেন। সেখানে তাঁদের ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল গাছের সাথে। খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর তাঁরা একমত হয়ে ফয়সলা করলেন যে, তাঁদেরকে অবিলম্বে বাগদাদে পৌঁছতে হবে। তখখুনি তাঁরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে পথ ধরলেন।

●

দিনে অনেকখানি বেলা হয়ে গেলে কাসিমকে এক পরিচারিকা গভীর ঘুম থেকে জাগাল। কাসিম হাই তুলতে তুলতে চোখ খুললেন এবং পরিচারিকাকে খানিকটা শাসিয়ে দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

পরিচারিকা বললে ঃ 'উঠুন, দুপুর হয়ে যাচ্ছে। মনিব আপনাকে ডাকছেন। তিনি আপনাকে এখখুনি হাযির হবার হুকুম দিয়েছেন।'

কাসিম বিড় বিড় করতে করতে উঠলেন। তারপর চোখ কচলাতে কচলাতে উজিরে আজমের কামরায় ঢুকলেন। উজিরে আজম এক জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি ফিরে কাসিমের দিকে না তাকিয়েই বললেন ঃ 'কাসিম, রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?'

মুহূর্তকালের জন্য কাসিম এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের কোন জওয়াব দিতে পারলেন না। তারপর পেরেশানী দমন করতে করতে বললেন ঃ 'রাত্রে এক দোস্তের বাড়িতে দাওয়াত ছিল। সেখানে কথাবার্তায় দেরী হয়ে গেল।'

উজিরে আযম তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন। কাসিম তাঁর দৃষ্টির সামনে চোখ নীচু করলেন। উজিরে আজম কাসিমের হাতে একখানা চিঠি দিতে দিতে বললেন ঃ 'বেটা! তুমি এখনও মিথ্যা কথা বলবার বিদ্যায় এতটা হুঁশিয়ার হতে পারনি যে, আমায় ধোকা দেবে। এটা পড়ে নাও তো।'

কাসিম চিঠিখানা পড়ে বাপের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর দৃষ্টিই যেন সুধাচ্ছিল ঃ 'এখন আপনার হুকুম?'

কামরার এক কোণে ছোট্ট একটা টেবিলের উপরকার তলোয়ারের দিকে ইশারা করে উজিরে আজম বললেনঃ 'তাহির এই চিঠিসহ তোমার তলোয়ার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ তাঁর শরাফতের চিহ্ন। নইলে তাঁর পক্ষে ওলী আহাদ অথবা খলিফা পর্যন্ত পৌঁছতে কোন মুশকিল ছিল না। কাসিম তুমি খুব খারাপ কাজ করেছ। এমন হুঁশিয়ার লোকের উপর এই জঘন্য হামলা করা তোমার উচিত হয়নি।'

কাসিম বললেনঃ 'আব্বাজান, এ শুধু ঠাট্টার ব্যাপার। তাহির অতটা হুঁশিয়ার ছিল না। শুধু আবদুল আজীজের কারণেই আমায় এতখানি অসুবিধায় পড়তে হয়েছে।'

উজিরে আজম বললেনঃ 'সে লোকটি কে?'

ঃ 'সে ফৌজের এক মামুলী কর্মচারী।'

ঃ 'কিন্তু বাকী সতেরখানা তলোয়ার সিপাহসালারের কাছে পেশ করে তিনি সেখানে যথেষ্ট গুরুত্ব হাসিল করবেন। ফৌজে আগেও তোমার সম্পর্কে কারুর মতামত ভাল ছিল না। আর এখনও তুমি তোমার পথে এক নতুন কাঁটা বপন করলে। কাসিম, তুমি খুবই খারাপ করেছ। তাহিরকে আমি তোমার তরক্কীর সোপান বানাতে চেয়েছিলাম। তাঁকে নায়েব করে নিয়ে তুমি চেংগিস খানের দরবারে দূত হয়ে যেতে পারতে, কিন্তু এখন........?

'কিন্তু এখন?' ঃ কাসিম উদ্বেগের স্বরে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'এখনও তাঁকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে বাগদাদে তোমার জন্য রাস্তা সাফ করার বেশী কিছু আমি করতে পারি না। তুমি হয়ত জান না যে, ওলী আহাদ সিপাহসালারের কাছে তাঁকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করবার সুপারিশ করেছেন। কাযী ফখরুদ্দীন খলিফার কাছে চিঠি লিখে এই নওজোয়ানের প্রশংসায় আসমান জমিন এক করে দিয়েছেন। তার ফলে বাগদাদে তোমার তরক্কীর প্রত্যেক ময়দানে তিনি ও তাঁর বন্ধুরা একদিন পথ রোধ করে দাঁড়াবেন!'

কাসিম বললেন ঃ 'আপনি তাঁকে কোন কর্তব্যের ভার দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেন না কেন?'

ঃ 'আমি তা করতে পারি, কিন্তু তার আগে তোমার কার্যকলাপের ফলে তাঁর মনে যে সন্দেহ পয়দা হয়েছে, তা আমি দূর করতে চাই। নইলে বরাবরই তিনি আমায় সন্দেহের চোখে দেখতে থাকবেন। এখনও আমার সম্পর্কে তাঁর ভাল ধারণা রয়েছে। তাই তিনি তোমার বিরুদ্ধে আর কারুর কাছে নালিশ না করে আমারই কাছে করেছেন।'

কাসিম বললেন ঃ 'আপনি কি চান যে, আমি তার কাছে মাফ চাই।'

ঃ না, এভাবে নয়। তোমার উপর তাঁর মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। তার চাইতে ভাল, আমি তাকে নিজের কাছে ডেকে তাঁর সামনে তোমায় গালমন্দ করব। কিন্তু তার আগে আমি তোমার দিক থেকে নিশ্চিত হতে চাই যে, আর কখনও তুমি এমন নির্বুদ্ধিতার কার্য করবে না। ফৌজের যে সব নওজোয়ান তোমার সাথে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে আমি সিপাহসালারকে লিখে দেব, যেন তাদেরকে অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়া হয়।'

ঃ 'কিন্তু আব্বাজান, তারা তো আমার দোস্ত। তারা আমার সাহায্য করতে চেয়েছিল। এতে তাদের কসুর?'

ঃ তাদের কসুর ছিল কিনা, আপাততঃ তা আমার দেখার ব্যাপার নয়। তাহিরের দোস্তদের কাছে আমায় প্রকাশ করতে হবে যে, তাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। তাহির ওলী আহাদ, শাহাদা মুসতানসির ও সিপাহসালারের কাছে সুপরিচিত হয়ে গেছেন। খলিফা যদি তাকে মিসরের গুপ্তচর মনে না করে থাকেন, তাহলে আমার পরামর্শ ছাড়াই তাঁকে কোন

উচ্চপদে বহাল করার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় দুশমনদের বিরুদ্ধে তাঁর সবচাইতে বড় হাতিয়ার হবে তাঁর দৌলত। আল্লাহ্ যার বাযুতে পাহাড়ের কলিজা বিদীর্ণ করার ও আসমানের তারা তুলে আনবার কুওৎ দান করেছেন, তাঁকে তুমি তোমার দুশমন বানিয়ে নেবে, এটা আমি চাই না। তিনি এক প্রশংসনীয় ও বিশ্বস্ত নওজোয়ান। এ ধরণের লোকের দোস্তী কল্যাণকর ও দুশমনি বিপজ্জনক হয়ে থাকে। আমার তাঁকে প্রয়োজন হবে তাঁর বিরুদ্ধে তোমার কোন সুপারিশ আমি বরদাশ্‌ত করব না। সম্ভব হতে পারে যে, আমার পর এই নওজোয়ানই একদিন বাগদাদের উজিরে আজম হবেন এবং তোমায় তোমার নির্বুদ্ধিতার জন্য পস্তাতে হবে। এও সম্ভব, তিনি আর কোন আমীরদের দলে যোগ দিয়ে আমার ওযারতের সমাপ্তি ঘটাতেও পারেন।'

## ছয়

চেংগিস খান কারাকোরামকে কেন্দ্র করে নিয়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য ছিল বহু দূর বিস্তৃত আর সেনাবাহিনী ছিল বেশুমার। কিন্তু আলমে ইসলামের উপর হামলা করতে গিয়ে তাঁর সামনে দেখা দিল এক অপরাজেয় কেল্লা। তাতারী বাহিনীর সয়লাবের গতিধারার পথে দুর্লংঘ পাহাড়ের মত দাঁড়িয়েছিল আলাউদ্দীন মোহাম্মদ খারেযম শাহের 'আযীমুশ্‌শান সালতানাত'। তার সারহাদ একদিকে হিন্দুস্তান ও বাগদাদ এবং অপর দিকে আরাল সাগর ও পারস্য উপসাগরে গিয়ে মিশেছিল।

বাগদাদের সালতানাত যখন সুখনিদ্রায় বিভোর, তখনও পূর্ব ও পশ্চিমের হামলাদারদের কাছে খারেযম ও মিসরের সালতানাত ছিল ইসলামের শক্তির কেন্দ্রভূমি।

খারেযমের শক্তি সম্পর্কে চেংগিস খানের সঠিক জ্ঞান ছিল না। তাই হামলা করবার আগে তিনি খারেযম শাহের সাথে মৈত্রী সম্পর্ক পাতিয়ে তথাকার যাবতীয় তথ্য হাসিল করবার প্রয়োজন বোধ করলেন। এমনি করে দুই দেশের মধ্যে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হল এবং তারই বদৌলতে তাদের মধ্যে তেজারতি রাস্তা খুলে গেল।

খারেযম শাহের সাথে তাতারীদের তেজারতি সম্পর্কের ফলে চেংগিস খানের গুপ্তচরদের খুবই সুবিধা হয়ে গেল। কিন্তু বেশী দিন এ অবস্থাটা চলল না। বোখারার কয়েকজন সওদাগর চেংগিস খানের গুপ্তচরদের কাছে খারেযমের বিশেষ বিশেষ তথ্য পরিবেশন করেছে, এই অপরাধে খারেযম সীমান্তের এক শাসনকর্তা তাদের মালপত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে কতল করে ফেললেন। চেংগিস খান খারেযম শাহের কাছে এক দূত পাঠিয়ে শাসনকর্তার কার্যকলাপের প্রতিবাদ করলেন। তার ফলটা হল উল্টো। বোখারার সওদাগররা ছিল খারেযম শাহের রায়ত। তাদের প্রতি চেংগিস খানের হামদদী খারেযম শাহের মনের সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিল। তিনি ভাবলেন, চেংগিস খান খারেযমে যে কাজ তাতারীদের দ্বারা করাতে পারছেন না, তা করিয়ে নিচ্ছেন বোখারার

সওদাগরদের মারফতে। তিনি রাগে অন্ধ হয়ে চেংগিস খানের দূতকে কতল করবার হুকুম জারী করলেন। কোন কোন ওমরাহ্ তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, কোন অবস্থায়ই দূতকে কতল করা ঠিক হবে না। কিন্তু সুলতান আলাউদ্দীন খারেযম শাহ্ ছিলেন স্বেচ্ছাচারী শাসক। তিনি কারুর কথাই শুনলেন না। দূতকে কতল করে তার বাকী সাথীদের দাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল।

চেংগিস খানের কাছে এ অবমাননা ছিল অসহনীয়। তিনি এ ঘটনা শুনে এক পাহাড়ের উপর গিয়ে বহুক্ষণ সূর্যের সামনে মাথা নত করে থাকলেন। (১) তার পর তিনি উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেনঃ 'গ্রহলোকে দু'টি সূর্য নেই, এই জমিনের উপরও দুই শাসক থাকবে না।'

চেংগিস খান ও খারেযম শাহের মধ্যে লড়াই অবধারিত। কিন্তু চেংগিস খানের মনে হল খারেযমের সেনাবলের চাইতেও বেশী আশঙ্কা জাগিয়েছিল আর একটি সম্ভাবনা। সূর্য-পরাস্ত দলের বিরুদ্ধে দুনিয়ার খোদাপরাস্ত দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে সাহ্রায়ে গোবীর বিরাণ ভূমিতেও আশ্রয় খুঁজে পাবে না তারা!

●

এই ঘটনার আগে খারেযম শাহ্ ও বাগদাদের খলিফার মধ্যে বেধেছিল এক বিরোধ। খারেযম শাহ দাবী করলেন যে, বাগদাদ সালতানাতের মসজিদগুলোতে খলিফার সাথে সাথে তাঁর নামেও খোতবা পড়া হবে, কিন্তু এ দাবী যখন অগ্রাহ্য হল, তখনও তিনি নিজের রাজ্যে খলিফার নামের খোতবা বন্ধ করে দিয়ে বাগদাদের উপর হামলা চালাবার জন্য এগিয়ে এলেন। পথের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বরফপাতের ফলে আসন্ন বিপদ সম্ভাবনা দেখে তিনি ফিরে চলে গেলেন দেশে। এরপর যদিও দুই সালতানাতের বিরোধ মীমাংসা হয়ে গেল, তথাপি বাগদাদের সীমান্তে এমনি এক শক্তিমান সুলতানের অস্তিত্বকে খলিফা মনে করতেন এক স্থায়ী বিপদের কারণ।

চেংগিস খান দুই সালতানাতের মধ্যে এ বিরোধের খবর জানতেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত জানতেন না, খারেযমের উপর হামলা করলে বাগদাদের জনমত খলিফাকে নিরপেক্ষ থাকতে দেবে কিনা। তাঁর ভয় ছিল, যদি খলিফা সকল বিরোধ ভুলে গিয়ে খারেযমের সাহায্যের জন্য জিহাদ ঘোষণা করেন, তাহলে আফ্রিকা থেকে শুরু করে হিন্দুস্তান পর্যন্ত তামাম ইসলামী রাজ্যের সেনাবাহিনী তাঁকে ধ্বংস করবার জন্য এসে মওজুদ হবে। এ সব আশঙ্কার দিকে নযর রেখে চেংগিস খান কারাকোরামে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

খারেযম শাহের সাথে বিরোধ শুরু হবার আগেও চেংগিস খান বুঝে নিয়েছিলেন যে, খারেযম সালতানাতকে বিপর্যস্ত না করে তার দুনিয়া জয়ের স্বপ্নকে কখনও বাস্তব রূপ দেওয়া যাবে না। যদি খারেযম শাহ্ তাঁকে অভিযোগ করবার মওকা দিতেন, তাহলেও বড় জোর তাতারীদের হাতে খারেযমের ধ্বংস

মাত্র কয়েকবছর পিছিয়ে যেত। শক্তিশালী প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করা অথবা কমজোর প্রতিবেশীকে দয়ার চোখে দেখা ছিল চেংগিস খানের নীতি বিরোধী।

উজিরে আজমের সাথে তাহিরের মোলাকাতের কয়েক হফ্‌তা আগে খারেযম শাহের হাতে চেংগিস খানের দূতের কতল হবার খবর খলিফা নাসিরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল এবং কয়েকদিন থেকে তা তামাম বাগদাদ শহরে মশহুর হয়েছিল। শিকার থেকে ফিরে এসে তাহির ও খারেযমের দূতাবাসের দিকে গেলেন।

খারেযম-দূত ইমাদুল মুল্‌ক তাহিরের তলোয়ারের চালনায় যতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার চাইতে আরও বেশী মুগ্ধ হলেন তাঁর কথাবার্তায়। তাহিরের উচ্চাকাংখার পরিচয় পেয়ে তিনি বললেনঃ 'হায়! বাগদাদে আপনার মত নওজোয়ান যদি আরও থাকতেন।'

তাহির বললেন ঃ 'বাগদাদে আমার মত নওজোয়ান আরও রয়েছেন। কিন্তু আমার আফসোস, আপনাদের হুকুমাত যেমন খলিফার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন, তেমনি বাগদাদের আওয়ামকেও সন্দেহের চোখেই দেখেন এবং খলিফার সম্পর্কেও আমি বলতে পারি, খোদা-না-খাস্তা যদি খারেযমের উপর কোন মুসিবত নেমে আসে, তাহলে তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হবে না। কম-সে-কম, উজিরে আজম সম্পর্কে আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, কাসিমের বাপ হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়ে তাঁর ভিতরে রয়েছে মুসলমানের দীল এবং খলিফাকে তিনি কোন ভুল মন্ত্রণা দেবেন না।'

ইমাদুল মুল্‌ক বললেন ঃ 'আপনার মত স্বপ্ন বিলাসী মানুষের আরও পাঁচশ' বছর আগে পয়দা হলে ভাল হত। দুনিয়া এখনও অনেকখানি বদলে গেছে।'

তাহির বললেন ঃ 'খলিফার সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু উজিরে আজমের কথা আমি আস্থার সাথে বলতে পারি যে, খারেযম সম্পর্কে তাঁর নিয়ত খারাপ নয়।'

ইমাদুল মুল্‌ক মুখের উপর এক বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি টেনে আনতে আনতে বললেন ঃ 'যদি আমি উজিরে আজম সম্পর্কে আপনার ভুল ধারণা দূর করে দিতে পারি, তাহলে?'

ঃ 'আপনি হর ওয়াক্ত আমায় ভুল সংশোধনের জন্য তৈরী পাবেন এবং আমার জায়গা বাগদাদের পরিবর্তে খারেযমেই হবে।'

ঃ 'আপনি ওয়াদা করছেন যে, এ রহস্য আপনারই ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে?'

ঃ 'আমি ওয়াদা করছি।'

ইমাদুল মুল্‌ক উঠে একটি ছোট্ট সিন্দুক খুললেন, আর তার ভিতর থেকে বের করলেন এক টুকরা চামড়া। তিনি তা তাহিরের হাতে দিলে দেখা গেল, তাতে লেখা রয়েছে ঃ 'খলিফাতুল মুসলেমিন খারেযম শাহের হাতে তাতার-সম্রাটের দূতের বর্বর হত্যাকে অমার্জনীয় অপরাধ মনে করছেন এবং আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তাতার-সম্রাট এই যালেম শাহকে শাস্তি দেবার ইরাদা করলে

যালেমকে সাহায্য করবার জন্য আলমে ইসলাম থেকে কোন আওয়াজ উঠবে না এবং আলমে ইসলামের নেতার দোআ থাকবে তাঁরই জন্য।
বিশ্বস্ত ঃ ওয়াহিদুদ্দীন, উজিরে খারেজা।'

এই লিপির নীচে চীনা ভাষার কয়েকটি হরফ লেখাছিল। তাহির এই হরফগুলোর উপর আঙুল দিয়ে ইমাদুল মুলকের কাছে প্রশ্ন করলেন ঃ 'এ কি লেখা রয়েছে?'

ইমাদুল মুলক জওয়াব দিলেন ঃ 'এ হচ্ছে চেংগিস খানের দূতের সমর্থন সূচক স্বাক্ষর। তিনি লিখেছেন ঃ "আপনার খাস খাদেম খলিফাকে তার সাথে একমত করে নিয়েছে।'

তাহির খানিকক্ষণ চিন্তা করে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনার ধারণায় খাস খাদেমটি কে?'

ইমাদুল মুলক জওয়াব দিলেন ঃ 'ওয়াহিদুদ্দীন ছাড়া আর কে?'

তাহির বললেন ঃ 'না, এ আর কেউ হবে। খলিফার বিশ্বস্ত কোন লোক চেংগিস খানের গুপ্তচরের কাজ করছে।'

ইমাদুল মুলক বললেন ঃ 'ওয়াহিদুদ্দীন না হল উজিরে আজম হবেন।'

ঃ 'না, আমার ধারণা, উজিরে আজম ও উজিরে খারেজা ছাড়া আর কেউ রয়েছে। এ লেখাটা আপনার পরিচিত?'

ঃ 'না, আমি নাম পড়তে পারি।'

ঃ 'কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, উজিরে খারেজা তাঁর চিঠির উপর তাতারী দূতের স্বাক্ষর না নিয়ে তাঁকে এই ধরণের পয়গাম পাঠাতে কেন বললেন না।'

ইমাদুল মুলক জওয়াব দিলেন ঃ 'এর দু'টি ওজুহাত হতে পারে। প্রথমতঃ, যখন গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে সওদাগরদের কতল করা হল, তখনও আমাদের হুকুমাত চেংগিস খানের কাছে বাগদাদের তাতারী দূতের খবরবার্তা আদান প্রদানের পথ বন্ধ করে দিলেন। তিনি নিজে কয়েকবার কারাকোরাম যাবার জন্য আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করবার এজাযত চেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের হুকুমাত তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন। তারপর চেংগিস খানের দূতকে কতল করবার পর তাঁর পক্ষ থেকে ওখানে কোন পয়গাম পাঠানোর অথবা নিজে যাওয়ার কোন উপায়ই থাকল না। আমাদের এলাকার মধ্য দিয়ে না গেলে তাঁদের জন্য মাত্র দু'টি রাস্তা রয়েছে। এক হচ্ছে পশ্চিমের রাজ্যগুলো অতিক্রম করে রাশিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং রাশিয়ার দুস্তর এলাকা পার হওয়া। সেখানকার বাসিন্দারা হালে তাতারীদের রক্তাভব দেখেছে। তারা কোন তাতারী অথবা তাদের দূতের দেখা পেলে তার কোন খোঁজ খবর না নিয়েই তাকে কতল করে দেবে। দ্বিতীয় রাস্তা হচ্ছে সমুদ্রপথে হিন্দুস্তান হয়ে কারাকোরামের দিকে যাওয়া। সেদিকে তাদের পথে দাঁড়াবে উঁচু পাহাড়, যার উপর দিয়ে পাখীও উড়ে যেতে পারে না।

তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ 'এ লিপি আপনার হাতে কি করে এল?'

ইমাদুল মুলক বললেন ঃ 'খলিফার দূরদর্শিতাই আমাদেরকে হুঁশিয়ার

থাকতে শিখিয়েছে। তিনি এই কর্তব্যের জন্য এক খারেযমী তুর্কীকে কাজে লাগিয়েছিলেন। এ চামড়াটা তার জুতার তলায় সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সীমান্ত অফিসাররা গুপ্তচরকে চিনে ফেলতে ভুল করেন না। সীমান্তের শাসনকর্তা দূতকে কতল করে লিপির নকল সুলতানের কাছে ও আসল লিপি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ঃ 'খলিফা এ ঘটনা সম্পর্কে জেনেছেন?'

ঃ 'আমি উজিরে আজমের সাথে দেখা করেছি। তাঁকে আমি অবশ্যি একথা বলিনি যে, আসল লিপি আমার হাতে এসেছে। তাঁকে আমি শুধু একটা নকল দেখিয়েছি।'

ঃ 'উজিরে আজম আপনাকে কি জওয়াব দিলেন?'

ঃ 'তিনি বেশুমার কসম খেয়েছেন। উজিরে খারেজাকে গাল দিয়েছেন। তারপর আমায় তাঁর মহলে বসিয়ে খলিফার কাছে গিয়েছেন এবং ফিরে এসে আমায় বলেছেন যে, খলিফা উজিরে খারিজাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। খলিফার ইরাদা, তাঁকে মহলে ডেকে গেরেফতার করবেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় উজিরে আজম আমায় আর একবার তাঁর মহলে ডেকে বললেন যে, উজিরে খারেজা পলাতক। তাঁকে তালাশ করা হচ্ছে।'

ঃ 'এখনও তাঁকে পাওয়া যায়নি কি?'

ঃ 'না।'

ঃ 'আর এসব সত্ত্বেও আপনি মনে করেন যে, খলিফা ও উজিরে আজম এ চক্রান্তে শরীক রয়েছেন? আমার তো মনে হয়, উজিরে খারেজা একদিকে আলমে ইসলামের সাথে, অপর দিকে খলিফা ও উজিরে আজমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। তাঁর পলায়নের কারণও তা-ই হতে পারে।'

ইমাদুল মুল্‌ক বললেন ঃ 'হতে পারে আপনার ধারণাই ঠিক। দুপুর বেলায় খলিফার দূত গিয়ে যখন তাঁকে তখখনিই খলিফার মহলে যাবার হুকুম পৌঁছাল, তখনওই হয়ত তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু এও তো সম্ভব যে, তিনি খলিফার কাছে গিয়েছিলেন, আর খলিফা ও উজিরে আজম বদনামের ভয়ে তাঁকে গোপন করেছেন। আরও সম্ভব, যে শরবত খেলে কেউ খলিফার মহল থেকে জিন্দাহ্ ফিরে আসেনি, তারই হয়ত খানিকটা তিনি গিলেছিলেন।'

ঃ 'এর সব কিছুই যদি তিনি খলিফা ও উজিরে আজমের হুকুম মোতাবেক করেছেন, আপনার এ সন্দেহ যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে, তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে?'

ঃ 'এমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে ব্যর্থ হয়ে যাবার পর খলিফা তাঁকে ভাল ব্যবহারের যোগ্য মনে করতে পারেন না। যদি তাঁকে মেরে না ফেলে গোপন করে রাখা হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ এই হতে পারে যে, খলিফা ও উজিরে আজম এ ব্যাপারে খোলাখুলি অনুসন্ধান করতে ঘাবড়াচ্ছেন। আমার সন্তোষের জন্য তাঁকে নিশ্চয়ই শাস্তি দিতে হবে, আর তিনি নিজের গর্দানের উপর জল্লাদের তলোয়ার ঝুলতে দেখে তারপরেও খলিফা বা আমীরুল

মুমেনিনের রহস্য গোপন রাখায় কোন ফায়দা নেই মনে করে সব কিছু ফাঁস করে দেবেন।'

ঃ তাহির বললেন ঃ 'আপনি ছবির কেবল একটা দিকেই নজর দিচ্ছেন। এ চক্রান্ত একমাত্র উযির খারেজোরই এবং তিনি শাস্তির ভয়ে আত্মগোপন করেছেন, এদিকটা আপনি কেন ভাবছেন না?'

ঃ 'আমি এরূপ সম্ভাবনা অস্বীকার করছি না, কিন্তু পরিস্থিতি আমায় সব কিছুরই অন্ধকার দিক দেখতে বাধ্য করেছে।'

তাহির বললেন ঃ 'আমার উপর আপনার বিশ্বাস আছে?'

ইমাদুল মুল্ক জবাব দিলেন ঃ 'আপনার উপর বিশ্বাস রাখার জন্যই শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আপনি এক বাহাদুর নওজোয়ান, এক মুজাহিদের বেটা, যাঁর ঈমানের সাক্ষ্য দিচ্ছে সালাহউদ্দিন আইউবীর তলোয়ার। আপনার বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করবার সাহস আমার নেই।'

ঃ 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, চেংগিস খান খারেযমের উপর হামলা করবেন?'

ঃ 'উজিরে খারেজার এ পয়গাম তাঁর কাছে পৌঁছে গেলে হয়ত এতদিনে তিনি হামলা করেই বসতেন।'

ঃ 'আর যদি উজিরে আজমের তরফ থেকে পয়গাম যেত যে, হামলা করলে বাগদাদের প্রত্যেকটি মুসলমান খারেযমের ঝান্ডাতলে জমা হবে, তাহলে?'

ঃ 'তা হলে চেংগিস খানের আলমে ইসলামের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাবারও সাহস হবে না।'

ঃ 'আমি উজিরে আজমের কাছ থেকে এই ধরণের পয়গাম হাসিল করতে পারলে খারেযমের সরহদ পার হত আপনি আমায় সাহায্য করবেন কি?'

ঃ 'দেখুন, আমি উজিরে আজমের যে কোন পদক্ষেপকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখব, কিন্তু আপনি যদি এই ধরণের পয়গাম হাসিল করতে পারেন, তাহলে আমার মনে বিশ্বাস জন্মাবে যে, কারাকোরাম পৌঁছে সে পয়গামের তাৎপর্য বদলে যাবে না। কিন্তু কি করে আপনার মনে আস্থা জন্মালো যে, উজিরে আজম এই ধরণের পয়গাম পাঠাবেন আর আপনাকেই তাঁর দূত বানাবেন?'

এই প্রশ্ন তাহিরকে মুহূর্তের জন্য নিরুৎসাহ করে দিল। তাঁর দীলে সন্দেহ পয়দা হল যে, উজিরে আজম যে তাঁকে চেংগিস খানের কাছে পাঠাবার ইরাদা প্রকাশ করছেন,সে কথাটি বললে ইমাদুল মুলকের সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে। তাই তিনি জওয়াব দিলেন ঃ 'উজিরে আজমের কাছে আমি এ দাবী পেশ করব। তিনি অস্বীকার করলে আমি বাগদাদের জামে মসজিদে দাঁড়িয়ে এলান করব যে, খলিফা ও উজিরে আজম আলমে ইসলামকে চেংগিস খানের নিকট বিক্রি করে দিয়েছেন। তখনও আপনি দেখবেন যে, আমার আওয়াজ বাগদাদের বাচ্চা-বুড়ো সবারই মুখের আওয়াজে পরিণত হবে। আমি যখন উজিরে আজমের লিপি আপনাকে দেখাতে পারব, কেবল তখনওই আপনার কাছে খারেযম অতিক্রম করবার এজাযতনামা দাবী করব।'

ইমাদুল মুল্‌ক বললেন ঃ 'উজিরে আজমের লিপি না দেখেও আমি আপনাকে এজাযতনামা লিখে দিতে তৈরী।'

তাহির উঠে তাঁর সাথে মোসাফেহা করতে করতে বললেন ঃ 'না, এখনও নয়। আমি উজিরে আজমের সাথে মোলাকত করে আবার আপনার কাছে আসব।'

তাহির ইমাদুল মুলকের ভবন থেকে বেরিয়ে এলে সড়কের উপর যায়েদকে দেখতে পেলেন। যায়েদ বিরক্তির সাথে বললঃ 'আমি আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি। উজিরে আজমের দূত আপনাকে ডাকতে এসেছিল। সে আপনাকে খুঁজে এখনওই পাঠাতে বলে গেল। সে এক আজব ধরণের আহ্‌মক। সে আমায় বলে ঃ 'তোমায় তো বিলকুল বদ্দু মালুম হচ্ছে।' তারপর আমি যখন তাকে কুস্তি লড়বার দাওয়াত দিলাম, তখনও সে হো হো করে হেসে চলে গেল।'

তাহির বললেন ঃ 'প্রত্যেক লোককেই কুস্তি লড়বার দাওয়াত দিতে নেই।'

পাঁচদিন পর এক সন্ধ্যায় মাগরেবের নামাজের পর আবদুল আজীজ ও আবদুল মালিক তাহিরের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। তাহির এক কামারায় বসে একখানা কিতাব দেখছিলেন। আবদুল আযীয কামরায় ঢুকতে ঢুকতে বললেন ঃ ' আমি মনে করেছিলাম আপনি বুঝি সফরের মালপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন।'

তাহির উঠে তার সাথে মোসাফেহা করতে করতে বললেন ঃ 'সফরের প্রস্তুতি তো কাল থেকেই চলছে, কিন্তু উজিরে আযম আজ খলিফার হুকুম শুনিয়ে দিলেন যে, পরশু মাহে রমজান শুরু হচ্ছে। আমার রোযা রেখে সফর করতে তকলীফ হবে। তাই ঈদের পরদিন আমার এখান থেকে রওয়ানা হবার এজাযত মিলবে।'

আবদুল আযীয বললেন ঃ 'তাজ্জবের কথা, খলিফা আপনার তকলীফ নিয়ে এতটা মাথা ঘামাচ্ছেন। চেংগিস খানের নামে তাঁর লিপি আপনার হাতে এসেছে কি?'

তাহির জবাব দিলেনঃ 'সে চিঠি উজিরে আজমের কাছে রয়েছে। চিঠির বিষয়বস্তু আমি পড়েছি আর তাতে খলিফার মোহরও দেখেছি। উজিরে আজম ইমাদুল মুল্‌ককেও চিঠিটা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বিদায়ের দিন ওটা আমার হাতে আসবে।'

আবদুল মালিক বললেনঃ 'আপনার সফর মুলতবী রাখার জন্য মাহে রমজানের এ বাহানা আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হচ্ছে না। আপনি রোযা রেখেও সফর করতে পারবেন, এ কথা বলেননি?'

তাহির বললেন ঃ 'আমি তো জোর দিয়েই বলেছিলাম যে, যে ব্যক্তি আরবের উত্তপ্ত হাওয়ার ভিতরে রোযা রাখতে অভ্যস্ত, রোযা রেখে তার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ঠান্ডা আবহাওয়ায় সফর করতে কোন তকলীফই হবে না। তাছাড়া এ সফরের গুরুত্ব মত বেশী যে, তার জন্য এসব মামুলী তকলীফ আমার উপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু উজিরে আজম বললেন যে, ঈদের দিনে খলিফা

পোলো ও নেযাবাযি খেলা দেখবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি তাতে অবশ্যি হিস্‌সা নেই।'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'এ বাহানা আরও বেশী অযৌক্তিক। আযীয, তুমি বলতো, চেংগিস খানের সেনাবাহিনী যখন খারেযমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত এবং খলিফা তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করছেন, তখনও তাহিরকে আরও একমাস এখানে আটকে রাখার কি কারণ থাকতে পারে?'

আবদুল আজীজ তাঁর চওড়া কপালের উপর হাত বুলাতে বুলাতে বললেন ঃ 'খলিফা ও উজিরে আযমের নীতি বুঝে ওঠা অত সোজা নয়। হতে পারে, রমজানের শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের ইরাদা বদলে ফেলবেন। বুড়ো বয়সে খলিফার ফয়সালা করার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। তাই মত বড় একটা কাজে ঝাঁপিযে পড়বার আগে একমাস বা এক বছর চিন্তা করাটা বুড়ো কথা নয়। হ্যাঁ, আমার মনে হয় একটা আশঙ্কা জাগে। তাহির আপনার সাথে আর কে কে যাচ্ছে?'

তাহির বললেন ঃ 'আমি তোমাদের দু'জনের কথা বলেছিলাম, কিন্তু উজিরে আজম আমার সাথে একমত হননি। তিনি বলেছেন যে, আমি তিন চারজন নওকর সাথে নিয়ে যেতে পারবো।'

আবদুল আজীজ বললেনঃ 'নওকর বেছে নেবার ব্যাপারটা আপনার মর্জির উপর ছেড়ে দেওয়া হবে, না উজিরে আজম তাঁর পছন্দ মত লোক পাঠাবেন?'

তাহির বললেন ঃ 'খারেযম দূতও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে, আমার কোন সাথী ওখানে গিয়ে আবার খলিফার আর কোন পয়গাম না পৌঁছে দেয়, কিন্তু খলিফার চিঠি দেখার পর চেংগিস খান আর কোন মামুলী লোকের কথায় কি করে বিশ্বাস করতে পারেন, তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। তাছাড়া সতর্কতা ব্যবস্থা হিসাবে ইমাদুল মুলক পথের চৌকিগুলোকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকেও তালাশী না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না। আমি নিজেও তাদের উপর নজর রাখবো।' আবদুল মালিক বললেন ঃ 'যদি কেউ ওখানে গিয়ে তাতারী দূতের কোন নিশানা পেশ করে, তখনও?'

তাহির বললেন ঃ 'তার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি এতটা বন্দোবস্ত করে রেখেছি, যে মুলকে তাতারের সীমানায় ঢুকবার আগেই তাদের লেবাস ও জুতা পর্যন্ত বদলী করে দেওয়া হবে।'

আবদুল আযীয বললেন ঃ 'কিন্তু তবু হুঁশিয়ার থাকবেন। যেন এমনটি না হয় যে, খারেযমের সীমানা পার হয়ে কোন সরাইখানায় রাত কাটাতে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকলেন; ভোর বেলা জেগে দেখলেন যে, আপনার সাথী খলিফার চিঠি সমেত গায়েব হয়ে গেছে। আপনি তাকে খুঁজতে থাকলেন, আর সে ওদিকে কারাকোরামে পৌঁছে গেল।'

তাহির খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ 'সে জন্য ব্যস্ত হয়ো না। তারা নিশ্চয়ই এ কথাটা বুঝবে যে, আমায় ছাড়া তারা ফিরে আসতে পারবে না।'

ঃ কিন্তু এও তো হতে পারে যে, বাগদাদের চাইতে কারাকোরামের আবহাওয়াই তাদের বেশী ভাল লাগবে। এই কারণে কমসে কম যায়েদকে সাথে নিয়ে যাবেন।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'যায়েদকে বাড়িঘর দেখাশোনার জন্য এখানে রেখে যাওয়া

আমি জরুরি মনে করছি। তোমরা আশ্বস্ত থেক, এখান থেকে যে ধরণের লোকই আমার সাথে যাক না কেন, এক মনজিল অতিক্রম করতে করতে খলিফা বা উজিরে আজমের পরিবর্তে আমারই প্রভাব তাদের উপর পড়বে। যদি ইনামের লোভ কোন লোককে গাদ্দার বানাতে পারে, তাহলে আরও বেশী ইনামের লোভ তাকে সোজা রাস্তায়ও আনতে পারে।'

আবদুল মালিক বললেনঃ 'আমি বর্তমান উজিরে খারেজা মুহাল্লাব-বিন দাউদকে একটি বিপজ্জনক লোক মনে করি। দু'বছর আগে তিনি বাগদাদে ছিলেন বিলকুল অপরিচিত। কিন্তু কয়েক মাস থেকে অবস্থা এই হয়েছে যে, তিনি দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার খলিফার সঙ্গে মোলাকাত করেন। ওয়াহিদুদ্দীনের গায়েব হবার আগে তিনি ছিলেন তাঁর নায়েব। কিন্তু আজব ব্যাপার, ওয়াহিদুদ্দীনের চাইতে তাঁরই বেশী মোলাকাত হত খলিফার সাথে। কখনও কখনও এমনি মোলাকাতের সময় তিনি চেংগিস খানের দূতকে নিয়ে যেতেন সাথে করে। এই কারণে তাঁর কোন লোক আপনার সাথে না গেলেই ভাল।'

তাহির বললেন ঃ 'একথা আমি অবশ্য খেয়াল রাখবো। আপনি জানেন, মুহাল্লাব বিন্ দাউদ কোত্থেকে এসেছেন?'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'তা কেউ জানে না। তবে শোনা যায়, তিনি নাকি বেশুমার দৌলতের মালিক, আর তিনি খলিফা ও শাহজাদা মুসতানসিরকে বহু দামী তোফা দিয়ে খুশি করেছেন।'

সুফিয়া খুব ভোরে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। কামরার মধ্যে আবছা আলোয় চারদিকে তাকিয়ে দেখে তিনি আবার বিষণ্ণ মনে চোখ বুজলেন। আজ আবার তিনি দেখেছেন সোনালী স্বপ্ন। আজ আবার তিনি উড়ে বেড়িয়েছেন সেই মুগ্ধকর আবহাওয়ায়, যেখানে আযাদ পাখীরা গাইছে মুহাব্বতের অপূর্ব সঙ্গীত। তিনি নির্বাক দৃষ্টিতে কাউকে জানাচ্ছেন তাঁর অন্তরের আবেদন। কে যেন তাঁর আবেদনের জওয়াবে বলছেন ঃ 'সুফিয়া! নির্বোধ হয়ো না। তোমার জিন্দেগীর পথ আলাদা।'

সুফিয়া তাঁর মুখের উপর এক বিষণ্ণ হাসি টেনে এনে বললেন ঃ 'বন্ধু আমার! বড় অভিমানী তুমি।'

আবার চোখ খুলে তিনি উঠে পড়লেন। তারপর আর এক কামরায় গিয়ে ওজু করে নামাযে দাঁড়ালেন। নামাযের পর তিনি হাত তুলে দোয়া করলেন। নিত্যকার মত আজ তাঁর দোয়ার শেষ কথাটি ঃ 'আমার আল্লাহ! ওঁকে তুমি সব বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রেখ।'

দোয়া খতম করে সুফিয়া নিজের কামরায় ফিরে জানালা খুলে পাইন-বাগিচার দিকে তাকাতে লাগলেন। হালকা ও মিষ্টি সুরে একটি গান গাইতে গাইতে তিনি দেয়ালে লাগানো বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বসন্ত-বাগিচার পাখীদের কল কণ্ঠের চাইতে মধুরতর তাঁর শিরীন আওয়াজ ধীরে ধীরে উঁচু হতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আয়নায় আর একটি ছবি ভেসে উঠতেই তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন।

তিনি দ্রুত পিছনে ফিরে কাসিমকে দেখে বললেন ঃ 'কাসিম, তুমি?'

কাসিম হেসে বললেন ঃ 'সুফিয়া! তুমি কেন চুপ করে গেলে? তোমার আওয়াজ...?'

সুফিয়া তিক্তকণ্ঠে তাঁর কথার বাধা দিয়ে বললেন; 'হ্যাঁ, আমার আওয়াজ বড্ডই মধুর, কিন্তু চোরের মত আমার কামরায় ঢুকবার কোন অধিকার তো তোমার নেই। চলে যাও এখান থেকে, নইলে আমি সকিনাকে আওয়াজ দেব।'

কাসিম বললেন ঃ 'সুফিয়া! কি অপরাধ আমি করেছি? আমার উপর তোমার কেন এ বিদ্বেষ? তোমার এ গান যদি আমার জন্য না হয়, তাহলে আর কার জন্য? সুফিয়া! তুমি আমায় এমনি করে উপেক্ষা কর।

না। তুমি জানো, আমি তোমায় কত ভালবাসি! আমি......।'

সুফিয়া রাগে লাল হয়ে বললেন' 'কাসিম! চলে যাও। এখনও তোমার মাথায় রাতের বেলার শারাবের নেশা রয়ে গেছে।'

কাসিম রাগ চাপা দিয়ে বললেন ঃ 'সুফিয়া! তুমি জানো, শারাব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু যদি আমার কোন বদ অভ্যাস থাকেও, তবু জিন্দেগীর দীর্ঘ সফরের পথে আমরা দু'জন একই কিশ্‌তির আরওহী। তাই আমার দিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে তাকাবার অভ্যাস তোমায় ছাড়তে হবে। তাতে আমাদের দু'জনেরই ভাল হবে।'

সুফিয়া ফুঁসে উঠে বললেন ঃ 'কাসিম, চলে যাও। তোমার সাথে এক কিশ্‌তির আরওহী হওয়ার চাইতে আমি দরিয়ার আবর্তে ডুবে মরাটাই বেশী পছন্দ করব।'

কাসিম দমে গিয়ে বললেন ঃ 'এতটা অবজ্ঞা ভাল নয়, সুফিয়া! আমার হাজারো দুর্বলতা থাকলেও আমি তোমারই। তোমার মুখের এক টুকরা হাসির জন্য আমি মওতের সাথে খেলতে পারি, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, পাহাড়ের সাথে লড়াই করতে পারি। তোমার জন্য....।'

সুফিয়া বললেন ঃ 'আহা! থামলে কেন? বল ঃ আমি তোমার জন্য আসমান থেকে তারা তুলে আনতে পারি, সমুদ্রের অতলে ডুব দিয়ে মুক্তা কুড়িয়ে আনতে পারি, বড় বড় জবরদস্ত শাহানশাহের মাথার তাজ ছিনিয়ে আনতে পারি, ঝড়ের সাথে লড়াই করতে পারি, তুফানের সাথে খেলতে পারি, কিন্তু সত্যিকার মানুষ হতে পারি না। কাসিম! তুমি এক শায়ের, এ ভুল ধারণা করে তোমার মাথায় ঢুকলো?'

কাসিম তাঁর দুর্বলতা সংযত করে বললেন ঃ 'সুফিয়া! তুমি আমার মনোভাবের অবমাননা কর না। আমি শায়ের নই।'

ঃ 'তোমার মনোভাব! তা অবমাননারও যোগ্য নয়। তুমি যদি এখানে থাকতেই চাও, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার পিছু পিছু এলে আমি সোজা চাচার কাছে চলে যাব।'

সুফিয়া এই কথা বলে কাসিমের দিকে ক্রোধ ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে কামরা থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মহলের বাগিচা থেকে কয়েকটি ফুল তুলে নিয়ে তিনি গাছগাছড়ার এক ঝোঁপের কাছে পৌঁছলেন। গাছের শাখা থেকে টুপটুপ করে শিশির বিন্দু ঝরে পড়ছে, কিন্তু তিনি যেন সকল অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছেন। এইখানেই তাহিরের সাথে নির্জনে তাঁর প্রথম মোলাকাত হয়েছিল। যেদিন তাহির খলিফার পয়গাম নিয়ে কারাকোরামের পথে রওয়ানা হলেন, সেদিন থেকে তাঁর দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত হল বাগিচার এই কোণে। এই গাছগুলোর পাতা, ফুল-ফল যেন তাঁর চোখে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল।

আজ কাসিমের সাথে দেখা হবার পর দীলের মধ্যে একটা ভারী বোঝা নিয়ে তিনি এখানে এসেছেন। প্রভাত সূর্যের কিরণ যেন গড়িয়ে পড়ছে গাছের পাতার উপর দিয়ে। সুফিয়া আসমানের দিকে চোখ তুলে সীমাহীন বেদনায় ভারাক্রান্ত আওয়াজে বলে উঠলেন ঃ

'তাহির! তুমি হয়ত আজ জান না, আমি কে আর তুমি আমার কত আপনার হয়ে গেছ।'

## সংঘাত
### সাত

খারেযমের সীমানা অতিক্রম করার পর তাহির ও তাঁর সাথীদের তাতার সাম্রাজ্যের সীমান্তে এক চৌকিতে কিছুকাল দেরী করতে হল। চৌকির অফিসার তাঁদেরকে যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য দেবার চেষ্টা করলেন। তথাপি তাহিরের মনে হতে লাগল যে, তিনি ও তাঁর সাথীরা এক খিমার মধ্যে রয়েছেন নজরবন্দী। আশেপাশে কত পাহাড়, কিন্তু সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখবার এজাযত নেই তাঁদের। তাহির ভাঙা ভাঙা তাতারী ভাষায় সিপাহীদের কাছে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোন জওয়াব দেয় না তারা। যা কিছু বলবার, বলতে হবে চৌকির অফিসারকে; আর কারুর সাথে আলাপ করবার এজাযত নেই তাঁদের। তাতারী গোয়েন্দা অনবরত তাদের পাশে পাশে ঘুরছে ছায়ার মত। চৌকির অফিসারকে তাহির বারংবার বুঝাতে চেষ্টা করেন, তিনি বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে চেংগিস খানের নামে এক জরুরী পয়গাম নিয়ে এসেছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই জওয়াব আসে ঃ 'খানে আজমের কাছে পয়গাম পাঠানো হয়েছে। তাঁর নির্দেশ এলেই আপনাদেরকে রওয়ানা করে দেওয়া হবে এখান থেকে।'

প্রায় তিন হফ্‌তা কেটে গেল। তারপর একদিন কয়েকজন সিপাহী সাথে নিয়ে সেই চৌকিতে এসে হাজির হলেন এক তাতারী অফিসার। তাহিরের গত কয়েকদিনের তকলীফের জন্য তিনি তাঁর কাছে মাফ চেয়ে বললেন যে, খানে আজম তাঁদেরকে তাঁর দরবারে হাজির হবার সম্মান দান করেছেন।

কয়েক হফ্‌তা তাঁরা সেই অফিসারের অনুসরণ করে দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে চললেন। তারপর তাহির ও তাঁর সাথীরা একদিন এসে পৌঁছলেন কোহে কারাকোরামের উপত্যকাভূমিতে। যতদূর নজর চলে, শুধু দেখা যায় চেংগিস খানের সেনাবাহিনীর অগুণতি খিমা। উপত্যকার চারদিকেই দেখা যায় উঁচু পাহাড়।

বাগদাদ থেকে উজিরে আজম তাহিরের সাথে পাঠিয়েছেন তিনজন লোক। দু'জন ইরানী-কামাল আর আবু ইসহাক। তৃতীয় ব্যক্তির নাম জামিল। সে ইরাকী। সফরের মধ্যে তিনজনই নেহায়েত আনুগত্য সহকারে তাহিরের হুকুম তামিল করে চলেছে। পথের মধ্যে কয়েকবার তাদের তালাশী নেওয়া হয়েছে। তাই তাহিরের মনে বিশ্বাস জন্মেছে, যদি তাদের মধ্যে কেউ খলিফা অথবা উজিরে আযমের তরফ থেকে কোন গোপন পয়গাম নিয়ে এসে থাকে, তাহলেও চেংগিস খানকে তার সত্যতার প্রমাণ দিতে পারবে না।

কিন্তু তাতার মুলুকে ঢুকেই একটি ব্যাপারে তাহিরের মনে যথেষ্ট পেরেশানি পয়দা হল। তিনি দেখলেন, সাথীদের মধ্যে আবু ইসহাক তাতারী জবানে যথেষ্ট দখল রাখে। সে চেংগিস খানের বাসভবনে পৌঁছতে পৌঁছতে তাতারী অফিসারের সাথে যথেষ্ট দীল-খোলা আলাপ জমিয়েছে। সফরের মধ্যে কয়েকবার এগিয়ে গিয়ে অথবা পিছিয়ে থেকে তাতারী অফিসার ও আবু ইসহাক গোপনে গোপনে আলাপ করেছে।

চেংগিস খান ও তাঁর সেনাবাহিনী যেখানে দুনিয়া জয়ের আয়োজনে ব্যস্ত, সে ছিল খিমায় ভরা এক শহর। সেই শহরে প্রবেশ করে তাতারী অফিসার এক প্রশস্ত খিমার সামনে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তাহিরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'আপনি এই খিমার মধ্যে

আরাম করুন। আমি খানে আজমকে খবর দিচ্ছি।' কয়েকজন সিপাহী খিমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের পথ চেয়েছিল। অফিসারের ইশারা পেয়ে তারা এগিয়ে গিয়ে তাহির ও তাঁর সাথীদের ঘোড়ার বাগ ধরলো। তাঁরা ঘোড়া থেকে নামলে আর একজন অফিসার তাঁদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন খিমার মধ্যে। খিমাটি মখমলের পর্দা ও ইরানী গালিচা দিয়ে সাজানো।

তাহির ও তাঁর সাথীরা আসরের নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষ হলে দোআ করার পর তাহির আবু ইসহাককে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি রাস্তায় তাতারী অফিসারের সাথে কি কথা বলছিলে?'

আবু ইসহাক অর্থপূর্ণ হাসি সহকারে তার সাথীদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জওয়াব দিল ঃ 'কিছু না। উনি আমায় চেংগিস খানের কথা বলছিলেন আর আমি ওঁকে আমাদের খলিফার কথা বলছিলাম।'

ঃ 'তুমি যে তাতারী জবান জান, তামাম রাস্তা এ কথাটি আমার কাছে গোপন করলে কেন?'

ঃ 'আপনি জিজ্ঞেস করলেই আমি বলে দিতাম।'

ঃ 'তুমি তাতারী জবান জান, একথা উজিরে আজমের জানা আছে কি?'

ইসহাক পেরেশান হয়ে জওয়াব দিলঃ 'আমার মত মামুলী লোক সম্পর্কে অত বেশী জানবার প্রয়োজন উজিরে আযম করেই বা অনুভব করেন। এখানে কারুর সাথে আলাপ করায় আপনার আপত্তি থাকলে ভবিষ্যতে আমি আর কিছু বলব না।'

ঃ 'তোমার আলাপ করায় আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু বাগদাদ সম্পর্কে কেউ তোমায় কোন প্রশ্ন করলে বুঝে শুনে জওয়াব দিও।'

আবু ইসহাক বললেন ঃ 'আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমি সচেতন।'

খানিকক্ষণ পর তাতারী অফিসার তাঁদের খিমায় প্রবেশ করলেন। তিনি তাহিরকে বললেন ঃ 'খানে আজম কাল আপনাদের সাথে দেখা করবেন। আমি আপনাদের দেখা শোনার ভার এক ইরানী কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করেছি। সে আপনাদের মুসলমান ভাই। আপনাদের কোন রকম তকলীফ হবে না।'

তাহিরের সাথে তাতারী অফিসার যখন আলাপ করছেন, তখনও আবু ইসহাক উঠে বাইরে চলে গেল। অফিসার বিদায় হয়ে গেলে তাহির উঠলেন এবং খিমার দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, কয়েক কদম দূরে আবু ইসহাক তাতারী অফিসারের সাথে কথা বলছে।

সন্ধ্যাবেলায় তাহিরের তিনটি সাথীই উপত্যকায় বেরিয়ে আসার বাহানা করে বাইরে চলে গেল। তিনি যখন এশার নামাজ পড়ে ঘুমোবার ইরাদা করছেন, তখনও তারা ফিরে এল।

তাহির তাদের সাথে কঠোর হয়ে উঠলে আবু ইসহাক বললঃ 'আমি আপনার কাছে মাফ চাই। ভবিষ্যতে এ ক্রটি আর হবে না। এ তাতারীরা বড়ই বর্বর। আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। এক খিমার কাছে কয়েকজন সিপাহী আমাদেরকে ঘিরে ফেললে। তারা জবরদস্তি করে আমাদের তিনজনের মাথা মুড়ে দিয়ে তালুর উপর কালি লেখে দিয়েছে। আল্লার শোকর, আপনি আমাদের সাথে ছিলেন না।' এই কথা বলে আবু ইসহাক মাথার পাগড়ী খুলে বলল ঃ 'দেখুন, তারা আমাদের কি দশাটা করেছে।'

আবু ইসহাক আর তার সাথীদের মাথা সত্যি সত্যি মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর চুলের জায়গায় চমকাচ্ছে কালো রঙের তেল।

তাহির বললেন ঃ 'আজব ধরণের আহ্‌মক এরা সব। চেংগিস খানের কাছে এর প্রতিবাদ জানাব আমি।'

আবু ইসহাক বললো ঃ 'এখানে মাথা মুড়ানো নতুন কথা নয়। এক অফিসার বলছিলেন যে, মেহ্‌মানদের মাথা মুড়ানো নাকি এখানে মেহ্‌মান-নেওয়াজীর শামিল। আল্লাহর শোকর, আমাদের মাথার চুলের উপর দিয়ে ওরা ওদের খনজরের ধার পরীক্ষা করেছে, নইলে এক তাতারীর হাত শাহরগের এত কাছাকাছি আসাটা কম বিপজ্জনক নয়।'

●

পরদিন ভোরে তাহির চেংগিস খানের দূতের সাথে শাহী তাঁবুর দিকে চললেন। শাহী মহল সেই উপত্যকার এক প্রান্তে এক পাহাড়ের উপর কয়েকটি খুবসুরত তাঁবুতে সীমাবদ্ধ। পাহাড়ের উপর যে সড়ক চলে গেছে, নীচের দিকে তার ডানে বায়ে তৈরী করা হয়েছে মানুষের মুন্ড দিয়ে গড়া দু'টি মিনার। সড়কের দুই দিকে সারি সারি মানুষের মুন্ড সাজানো। তাহিরের মুখের উপর এই দৃশ্যের প্রভাব লক্ষ্য করতে করতে তাতারী বলল ঃ 'এগুলো সব বড় বড় সরদারের মাথার খুলি। তাদেরকে পদমর্যাদা অনুযায়ী জায়গা দেওয়া হয়েছে। নীচু স্তরের লোকদের মাথা এখানে আনা হয়নি। উপরে খানে আজমের খিমার সামনে আপনি দেখতে পাবেন সেই সব শাসক ও ফৌজী নেতার মাথার স্তূপ, যাঁরা আমাদের শক্তির সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিলেন। উঁচু ঘরের যেসব সুন্দরী বেগম খানে আজম ও শাহজাদাদের খেদমত করতে অস্বীকার করেছেন, তাঁদের মাথা দিয়ে তাতার সম্রাজ্ঞীর খিমার সামনে তৈরী হয়েছে একটি ছোট্ট মিনার।'

পাহাড়ের উপর উঠতে উঠতে তাতারী ডানদিকে আর একটি পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বলল ঃ 'ওই দেখুন, ওই পাহাড়ের উপর তৈরী হচ্ছে খানে আজমের আলীশান মহল। এসব পাহাড়ে কোন ভাল জাতের পাথর পাওয়া যায় না। শুনেছি, বাগদাদ, বোখরা ও সমরকন্দের ইমারতগুলোতে খুব ভাল জাতের লাল ও সাদা পাথর লাগানো হয়।'

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'কিন্তু ওসব পাথর খুবসুরত ছাড়া শক্তও বটে। আপনাদের খানে আজম মানুষের মাথা দিয়ে মহল তৈরী করেন না কেন?'

ঃ 'যদি মানুষের মাথা দিয়ে ইটের কাজ হত, তাহলে আমাদের তাতে কোন মুশকিল হত না। উত্তর, পশ্চিম ও পূবের শহরগুলোতে মানুষের মাথার কত স্তূপ বেকার পড়ে রয়েছে।'

পাহাড়ের চূড়ায় এক বিস্তীর্ণ সমতল ময়দানে বহু দামী গালিচা বিছানো। ময়দানের তিনদিকে খিমার সারি। জায়গায় জায়গায় পাহারাদার নাংগা তলোয়ার হাতে দন্ডায়মান। দূত মাঝখানের এক খিমার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং তাহিরকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে চলে গেল। খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে সে তাহিরকে ভিতরে নিয়ে গেল।

দু'টি বিস্তীর্ণ কামরা পার হয়ে তাহির তৃতীয় ও অপেক্ষাকৃত ছোট্ট একটি কামরায় প্রবেশ করলেন। কামরায় একদিকে প্রায় দু'হাত উঁচু চাতাল। তার উপর বিছানো বহু দামী গালিচা। চাতালের নীচ এক কাতারে কয়েকটি তাঁজ।

কামরার মধ্যে এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান। তাঁর জুব্বা ও পাগড়ী দেখে তাঁকে মনে হয় এক মুসলমান আলেম। তিনি এগিয়ে এসে তাহিরের দিকে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ 'আমি তাতারে খানে আজমের সাম্রাজ্যে আমার এক মুসলমান ভাইকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছি।'

তাহির তার সাথে মোসাফেহা করতে গিয়ে তাঁর দেহে বিচিত্র কম্পন অনুভব করলেন এবং কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন ঃ 'আপনি এখানে কি করছেন?'

ঃ 'আমি খাকানে তাতারের দরবারে আরবী ও ফারসীর মোতরজেম।'

ঃ 'আপনি এখানে কি করে এলেন?'

ঃ 'খাকানে তাতার যেমন গুণগ্রাহী, তেমনি মহানুভব। আমি এখানে সওদাগরদের এক কাফেলার সাথে এসেছিলাম। খাকানে তাতারের একজন মোতারজেম প্রয়োজন। তিনি আমায় কয়েক মাসের জন্য তার কাছে রাখলেন, কিন্তু, তাঁর গুণগ্রাহিতা আমায় চিরকালের জন্য খরিদ করে রেখেছে। খাকানে আজম এখনওই তশরীফ আনবেন। আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলা জরুরি মনে করছি। তিনি বেশী খোশামোদ পছন্দ করেন না, স্পষ্টভাষিতা ও গোস্তাখীকেও তিনি মনে করেন অমার্জনীয়। আপনি তাতারী জবানে কথা বললে তিনি আপনার উপর খুব খুশী হবেন। তাতারী জবান না জানলে তিনি চীনা জবানও পছন্দ করেন। এই দুই জবানের পর তিনি স্থান দেন ফারসীকে। তিনি ফারসীর কতক শব্দও শিখে নিয়েছেন, কিন্তু আরবী জবানে তিনি খুবই অসুবিধা বোধ করেন।'

তাহির বললেন ঃ

'পরামর্শের জন্য শোকরিয়া, কিন্তু তাতারী ও চীনা যবান আমার জানা নেই। ফারসী আমি জানি, কিন্তু বিপদ হচ্ছে, তিনি আপনার তরজমা সত্ত্বেও নিজস্ব দূরদর্শিতা প্রয়োগ করে আমার মতলব বুঝতে ভুল না করেন। যদি আরবী থেকে আপনার তরজমা করতে অসুবিধা হয়, সে কথা আলাদা, নইলে মনোভাব প্রকাশের জন্য আমি আরবীকেই বেশী সুবিধাজনক মনে করি। আর তিনি যদি তুর্কী জবান ভাল করে বোঝেন, তাহলে আমি তাও জানি।'

ঃ 'এ ব্যাপারটি কখনও করবেন না। খারেযম শাহ্ যখন খানে আজমের দূতকে কতল করলেন, তখনও থেকে তুর্কীর উপর তার বিদ্বেষ। কথাবার্তার সময়ে খেয়াল রাখবেন, যেন আপনার গলার আওয়াজ খাকানে আযমের আওয়াজ থেকে উঁচু না হয়। আপনি খোশনসীব, খাকানে আজম আপনাকে একাকী মোলাকাত করবার সম্মান দিয়েছেন। দরবারের তুলনায় একাকী থাকলে তাঁর দস্ত মোবারক বেশী খোলসা হয়ে থাকে।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনার সৎপরামর্শের জন্য শোকরিয়া। কিন্তু আমার সম্পর্কে আপনি ভুল ধারণা পোষণ করবেন না। আমি পেটের তাকিদে এখানে আসিনি।'

●

মোতারজেম তাঁর লজ্জা ঢাকবার জন্য আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে চাতালের পিছন দিকের দরজার পর্দা উঠল। তিনি তাহিরের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন ঃ 'খানে আজম তশরীফ আনছেন।'

মুহূর্তকাল পরে তাহির চাতালের উপর দেখতে পেলেন সেই শক্তিমান নিষ্ঠুর মানুষটিকে,

যাঁর নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার কাহিনী মশহুর হয়ে গেছে পূর্ব-পশ্চিমের সর্বত্র। মোতারজেম দু'হাত বুকে বেঁধে নুয়ে দাঁড়ালেন রুকুতে যাওয়ার মত। চেংগিস খান একবার বাঁকা চাউনীতে তাকালেন তাহিরের দিকে। তারপর বসে পড়লেন চাতালের উপর। মোতারজেম এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাহির চেংগিস খানের সামনে তাঁর অনুকরণ করেননি, তার জন্য তাঁর দৃষ্টি ব্যথাতুর। তাহির রীতিমত সোজা হয়ে তাকিয়ে আছেন চেংগিস খানের দিকে। খানে আজমের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে থাকা এক অতি বড় গোস্তাখী এবং ভরা দরবারে তাতারী সরদার তা হয় তো মোটেই বরদাশ করতেন না। একাকী সাক্ষাতকারেও তা মোতারজেমের মোটেই বরদাশত হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি চাপা আওয়াজে বললেন, 'নযর নীচু করুন।'

এ হুঁশিয়ারীতে তাহিরের ভিতরে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। মুহূর্তের নীরবতার পর বাগদাদের খলিফার দূত ও তাতারীর শাহানশাহের মধ্যে শুরু হল আলাপ-আলোচনা।

মোতারজম ঃ (চেংগিস খানের উদ্দেশ্যে) 'যে খাকানে আজম শাহানশাহে তাতারের উদার হস্ত বন্ধুদের প্রতি রহমত স্বরূপ এবং যাঁর তলোয়ার দুশমনের উপর বজ্রপাতের মত নেবে আসে, বাগদাদের খলিফার দূত সেইখানে আজমকে নেহায়েৎ আদব ও বিনয় সহকারে সালাম আরয করছেন।'

চেংগিস খান ঃ 'আমি বাগদাদের খলিফার দূতকে দেখে খুবই খুশী হয়েছি। তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হোক যে, এখানে তার জানের উপর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।'

মোতারজেম ঃ (তাহিরের উদ্দেশ্যে আরবী যবানে) 'প্রবল প্রতাপশালী শাহানশাহ আপনার আগমনে আনন্দ প্রকাশ করছেন এবং আরও বলছেন যে, এখানে আপনার ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। প্রচুর পরিমাণে শাহী ইনাম দিয়ে আপনাকে এখান থেকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে।'

তাহির ঃ 'আমি ইনামের লোভ নিয়ে এখানে আসিনি। যদি তাতারের শাহ্ এতটা মেহেরবান হন, তাহলে যেন খলিফার চিঠি পেশ করবার পর আমায় ইসলামের তবলীগ করবার মওকা দেন। তাই হবে আমার জন্য সব চাইতে বড় ইনাম।'

মোতারজেমঃ 'খলিফার কাসেদ খাকানে তাতারের দর্শনলাভের জন্য শোকরিয়া জানাচ্ছেন। তিন বাগদাদের খলিফার চিঠি পেশ করবার এযাজত চাচ্ছেন।'

চেংগিস খান ঃ 'এযাজত রয়েছে।'

মোতারজেম ঃ 'খাকানে আযম হুকুম দিচ্ছেন যে, খলিফার লিপি তাঁর সামনে পেশ করা হোক।'

তাহির এগিয়ে গিয়ে রেশমী কাপড়ে ঢাকা লিপি পেশ করলেন। চেংগিস খান চিঠি হাতে নিয়ে খুললেন এবং মোতারজেমকে তা পড়ে শোনাবার হুকুম দিলের। আরবী ভাষায় লিখিত পত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল এই ঃ

'তাতারীদের বাদশাহ চেংগিস খানকে জানানো হচ্ছে যে, আল্লাহ্ ও রসুলের তরফ থেকে আমাদের উপর আলমে ইসলামের তামাম মুসলমানের ইযযত, আবরু ও আযাদী হেফাজত করবার কর্তব্য ন্যস্ত রয়েছে। খারেযম শাহের সাথে আমাদের কিছু কিছু বিরোধ রয়েছে। কিন্তু আলমে ইসলামের উপর বাইরের কোন বিপদ ঘনিয়ে এলে আমরা যে কেবল

আত্মরক্ষার জন্য খারেযম শাহের সাহায্যের সিদ্ধান্ত করতেই বাধ্য হবো, তা নয়; বরং তাঁর ঝাণ্ডাতলে মামুলী সিপাহী হিসাবে লড়াই করা নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করব। তাতারের শাহ খারেযম সীমান্তে সেনাবাহিনী জমা করছেন, এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা তাঁকে হুঁশিয়ারী জানাচ্ছি যে, খারেযমের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণা আলমে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমার্থক হবে। এই চিঠির জওয়াবে আমরা তাতারের শাহের কাছ থেকে এই ঘোষণা শুনতে চাচ্ছি যে, তাঁর সেনাবাহিনী খারেযমের উপর হামলা করবে না।'

খলিফাতুল মুসলেমিন আবুল আব্বাস আহমদ

আন-নাসিরুদ্দীনিল্লাহ্- এর তরফ থেকে।'

মোতারজেম বিশেষ কিছু রদ বদল না করে চিঠিখানি তাতারী জবানে তরজমা করে শোনালেন। তাহির হয়রান হয়ে লক্ষ্য করলেন, চিঠির মর্ম শুনে চেংগিস খানের কপালে মামুলী ধরণের কুঞ্চনও দেখা গেল না। তিনি বরং এক অর্থপূর্ণ হাসি সহকারে স্বস্তির সাথে তাকিয়ে আছেন তাহিরের মুখের দিকে। তাঁর দৃষ্টিই যেন বলছে, চিঠিখানি তাঁর কাছে এক চিত্তাকর্ষক তামাশার কিছু নয়।

চেংগিস খান ঃ 'আপনাদের খলিফাকে আমাদের তরফ থেকে জানিয়ে দেবেন যে, আলমে ইসলামের সাথে আমাদের কোন দুশমনি নেই। খারেযম শাহ আমাদের সাথে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করছেন। তা সত্ত্বেও আমরা তাঁর উপর হামলা করবার ইরাদা রাখি না।'

মোতারজেম ঃ 'আপনি খলিফার কাছে খাকানে তাতারের এই পয়গাম নিয়ে যাবেন যে, তাঁর সুপারিশ খাকানে আযম খারেযম শাহের অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন, আর আলমে ইসলামের উপর হামলা করার ইরাদাও তিনি বর্জন করেছেন।'

তাহির ঃ 'আমি এ পয়গাম খলিফার কাছে পৌছে দেব। তাছাড়া আমি এ কথা জানিয়ে দেওয়া জরুরি মনে করি যে, খলিফার লিপি বাগদাদের আওয়ামেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি। আপনাদের সম্পর্কে এ কথা মশহুর হয়ে গেছে যে, আপনাদের ফৌজী কুওৎ দেখানোর আকাংখা সাধারণভাবে প্রত্যেক ওয়াদা ও প্রত্যেক চুক্তির উপর জয়ী হয়ে থাকে। যদি আপনারা এ ওয়াদা ভংগ করেন এবং খারেযমের উপর হামলা করেন, তাহলে সারা বাগদাদ ও তার সাথে সাথে পূর্ব ও পশ্চিমের অন্যান্য ইসলামী সালতানাত আপনাদের বিরুদ্ধে মরু-সাইমুমের বেগে নেবে আসবে।'

মোতারজেম ঃ 'খলিফার দূত নেহায়েৎ আদব ও শ্রদ্ধা সহকারে খানে আজমের খেদমতে আরয করছেন যে, হুজুরের পয়গাম খলিফার কাছে পৌছে দেওয়া হবে। আপনার এ ওয়াদা ইসলামী দুনিয়ার আশ্বাসের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যদি আপনি খারেযমের উপর হামলা করেন, তাহলে বাগদাদে ও অন্যান্য ইসলামী সালতানাতের আওয়াম নিজ নিজ হুকুমাতে খারেযমের পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য করবে এবং তাদের সবাইকে তাতারী সেনাবাহিনীর প্রবল বন্যাবেগের সামনে ভয়াবহ ধ্বংসের মোকাবিলা করতে হবে।'

চেংগিস খান ঃ 'আমরা কাউকেও দোস্ত বলে স্বীকার করার পর তার তরফ থেকে কোনরূপ অবিশ্বাস পছন্দ করি না।'

মোতারজেম ঃ (তাহিরের দিকে ফিরে) 'কোনরূপ অবিশ্বাস প্রকাশ করলে খানে আজমে রেগে যান। তাই মেহেরবানী করে চুপ করুন।'

তাহির ঃ 'এখনও আমি খানে আজমের সামনে তবলীগে ইসলামী সম্পর্কে কিছু বলবার এজাযত চাই।'

মোতারজেম ঃ (খানিকটা ইতস্তত করে) 'খলিফার দূত তাতারীদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলবার এজাযত চাচ্ছেন।'

চেংগিস খান ঃ 'তাঁকে আমাদের তরফ থেকে আশ্বাস দেয়া হোক যে, কোন অনুগত মুসলমানের উপর আমাদের বিদ্বেষ নেই।'

মোতারজেম ঃ (তাহিরের উদ্দেশ্যে) 'খানে আজম খুবই ব্যস্ত। তিনি আপনাকে বিদায়ের এজাযত দিচ্ছেন এবং আরও বলছেন যে, অনুগত মুসলমানদের উপর তাঁর কোন বিদ্বেষ নেই।'

তাহির পেরেশান হয়ে মোতারজেমের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন ঃ 'যদি তিনি এখনও ব্যস্ত থাকেন, তাহলে আর কোন সময় আমায় তবলীগের মওকা দিতে পারেন।'

চেংগিস খান প্রশ্ন করলেন ঃ 'খলিফার দূত কি বলছেন?'

মোতারজেম বললেন ঃ 'তিনি হুজুরের শোকরিয়া আদায় করছেন আর আবেদন করছেন যে, হুজুর কোন কথায় রাগ করে থাকলে যেন তাঁকে মাফ করে দেন।'

চেংগিস খান বললেন ঃ 'আমার আফসোস, ব্যস্ততার জন্য আমি বেশী সময় বসতে পারছি না। নইলে খলিফার দূতকে অতি চমৎকার লোক মনে হচ্ছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হোক, তিন কবে রওয়ানা হচ্ছেন।'

মোতারজেম তাহিরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'খানে আজম বলছেন, তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। তাই দ্বিতীয়বার মোলাকাত করা হবে না। শীতের মওসুম এসে যাচ্ছে। আপনার শিগগিরই বাগদাদ রওয়ানা হওয়া ভাল। এখানে বহু মুসলমান ওলামা রয়েছেন। তাঁরাই সব সময়ে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ করছেন।'

চেংগিস খান পিছনের কামরায় চলে গেলেন।

●

খিমার বাইরে চেংগিস খানের পুত্রেরা কয়েকজন তাতারী সরদার গালিচার উপর রৌদ্রে বসে আলাপ-আলোচনা করছে। এক নওজোয়ানের প্রশ্নে মোতারজেম তাহিরকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিলেন। তাহিরকে তারা ডেকে বসালো তাদের কাছে। তারপর শুরু হল বাগদাদ সম্পর্কে কত প্রশ্ন। তাহির নানারকম প্রশ্নের জবাব দিলেন।

কিন্তু যখন বাগদাদের ফৌজের সংখ্যা ও কেল্লাগুলোর মজবুতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল, তখনও তিনি, বললেন ঃ 'আমি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।'

চেংগিস খানের এক পুত্র বললঃ 'সম্ভবত আপনার কিছুটা ভুল ধারণা হয়েছে। আমরা কোন খারাপ ইরাদা নিয়ে এসব প্রশ্ন করছি না। বাগদাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আমাদের বন্ধু দেশ সম্পর্কে জরুরি জ্ঞান হাসিল করা আমরা কর্তব্য মনে করি। আমি আপনাকে এ আশ্বাসও দিচ্ছি যে, বাইরে দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান একেবারে নগণ্য নয়। এই যে দেখুন।'

চেংগিস খানের পুত্র পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে তাহিরের সামনে রাখল। বলল : 'সম্ভবত আপনি বাগদাদে এর চাইতে নিখুঁত কোন নকশা আগে কখনও দেখেননি।'

রুমালে তোলা নকশা এত বেশী নিখুঁত যে, তা দেখে তাহিরের হয়রানির অন্ত থাকল না।

এক তাতারী সরদার তাহিরের দিকে অর্থপূর্ণ হাসি সহকারে তাকিয়ে বললেন : 'এখনও তো আপনি আমাদের সাথে দীল খুলে আলাপ করতে পারেন।'

তাহির তখনও নকশার দিকে তাকিয়ে আছেন। ইতিমধ্যে এক খাদেম এসে তাতারী জবানে কি যেন বলল, আর তারা সবাই উঠে চলল খিমার দিকে। তাহির যখন রুমালটা ফেরত দিতে যাচ্ছেন, তখনও চেংগিস খানের পুত্র বলল : 'নকশাটা আপনার পছন্দ হয়ে থাকলে রেখে দিতে পারেন। আমার কাছে আরও নকশা রয়েছে।'

তাহির বললেন : 'না, বাগদাদের নকশা আমার দীলের মধ্যে আঁকা রয়েছে।'

লোকগুলো যখন খিমার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও মোতারজেম বললেন : 'আপনি অবাক করলেন। যারা মানুষের মাথা দিয়ে তৈরী করে মিনার, তাদের মধ্যে ইসলামের জায়গা কোথায়?'

তাহির বললেন : এদের অমনোযোগের জন্য আমার আফসোস নেই, কিন্তু নিজের ফরজ পুরা করবার মওকা মিলল না, এই আমার আফসোস।

মোতারজেম বললেন : আমার প্রতি শোকরগুজারী করা আপনার উচিত। আপনার অনেক কথার তিক্ততা আমি খানে আজমের কাছে প্রকাশ করিনি।

তাহির চমকে উঠে বললেন : আপনি আমার কথার তাৎপর্য বদলে দিয়েছেন, এই আপনার কথার অর্থ?

মোতারজেম মোনাফেকের হাসি হেসে জবাব দিলেন : না, আমি আপনার কোন কোন ধারণা কিছুটা বিনয়নম্র পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছি।

তাহির বললেন : বিনয়নম্র পদ্ধতির অর্থ আপনার কাছে আত্মসমর্পনের মত কিছু নয় কি?

মোতারজেম বললেন : বিনয়নম্র পদ্ধতি বলতে আমি বুঝি সেই পদ্ধতি, যার বদৌলতে আমায় এখনও এখান থেকে ধাক্কা মেরে দরজার বাইরে বের করে দেয়া হয়নি। আপনার উপর হয়ত অত কঠোর ব্যবহার নাও হতে পারত। কিন্তু রাগটা আমার উপর এসে পড়তে দেরী হত না মোটেই।

তাহির বললেন : আমি যখন বলছিলাম যে, মুসলমানেদের কোন সালতানাতের উপর হামলা হলে তাতারীদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার মুসলমান এক হয়ে দাঁড়াবে, তখনও চেংগিস খানের মুখে হাসি দেখে মনে হয়েছে, হয় তিনি তাঁর ফৌজী কুওতের জন্য গর্বিত, অথবা আমার কথাগুলোকে তিনি শূন্যগর্ভ আস্ফালনের বেশী কিছু মনে করেননি।

মোতারজেম বললেন : খানে আজম মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে হাসবার হিম্মৎ রাখেন। তাছাড়া তিনি জানেন, জাতির ভাগ্য নির্ধারণ কথায় হয় না কাজে। আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তাহলে বাগদাদে ফিরে গিয়ে তাতারীদের ফৌজী কুওৎ সম্পর্কে খলিফার

ভুল ধারণা দূর করা আমি কর্তব্য মনে করতাম। আপনি এখনও কিছুই দেখেননি, আমার সাথে আসুন।

তাহির মোতারজেমের সাথে পাহাড়ী পথে ঘুরতে ঘুরতে অপর একদিকে এসে পড়লেন। এ দিকেও পাহাড়ের এক বিস্তীর্ণ উপত্যকায় ছোট ছোট বেশুমার খিমা দাঁড়িয়ে আছে। মোতারজেম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খিমাগুলোর দিকে ইশারা করে বললেন ঃ পাহাড়ের বিস্তার কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, তা আপনি জানেন না। তাতারীদের পংগপালের মত অগুনতি আরও কত সিপাহী পাহাড়ী উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে, তা আমারও জানা নেই। এ সেনাবাহিনী খারেযমের উপর হামলা করবে কি না, তা আমি বলতে পারি না। আমি শুধু একটুকু বলতে পারি যে, খানে আজম খারেযম শাহের উপর প্রতিশোধ নেবার ফয়সলা করে থাকলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁর ইরাদা বদল করতে পারবে না। আর খারেযম শাহের সাহায্যের জন্য ইসলামী দুনিয়া এক হয়ে নেমে এলেও তারা তাতারী সয়লাবের সামনে বন্যাবেগের মুখে তৃণগুচ্ছের মত ভেসে যাবে। তারা হবে পাহাড়ী নদীর সয়লাবের সামনে বালুর ঢিবির মত। বাগদাদের জন্য যদি আপনার সমবেদনা বোধ থাকে, তাহলে এমনি এক ব্যক্তিত্বের সাথে কলহ বাধাবার পরামর্শ খলিফাকে দেবেন না। চেংগিস খান তাঁর দুশমনের উপর খোদার গজব হয়ে নাজিল হন।

তাহির বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন ঃ আপনি চেংগিস খানের নেমকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হক আদায় করছেন। চেংগিস খান তাঁর দুশমনকে ভয় দেখানোর জন্য যেসব তরিকা অবলম্বন করে থাকেন, তা আমার জানা আছে। আমি মানি যে, ভিতরকার বিরোধের জন্য আলমে ইসলাম অনেকখানি কমজোর হয়ে পড়েছে, কিন্তু সে কমজোরী সত্ত্বেও তারা পংগপালের মত অগুনতি পশ্চিমা নাসারা সেনাবাহিনীকে বারংবার পরাজিত করেছে। চেংগিস খানের সেনাবাহিনী তাদের চাইতে বেশী শক্তিমান নয়। খারেযম ও বাগদাদের সৈন্যসংখ্যা মিসর ও সিরিয়ার সেনাবাহিনীর চাইতে কম হবে। পশ্চিমের অগুনতি সেনাবাহিনীর মোকাবিলার জন্য সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরের কোন ময়দানে পঞ্চাশ হাজারের বেশী সৈন্য আমরা হাজির করতে পারব না, কিন্তু তাতারীদের মোকাবিলার জন্য বাগদাদ থেকে তিন লাখ ও খারেযম থেকে চার লাখ সিপাহী ময়দানে নেমে আসবে। আপনি যদি আমায় খলিফার শুভাকাঙ্খী মনে করে তাঁকে তাতারী শক্তির ভয় দেখাবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তাহলে আমিও আপনাকে চেংগিস খানের অনুগত মনে করে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আলমে ইসলামের আত্মরক্ষার শক্তি সম্পর্কে আপনি তাঁর ভুল ধারণা দূর করবার চেষ্টা করুন।

মোতারজেম জবাব দিলেন ঃ চেংগিস খান নিজকে ছোট মনে করবার লোক নন, কিন্তু বাগদাদের খলিফা যে নিজেকে হীন মনে করেন, তার প্রমাণ আগেই দিয়ে বসে আছেন। খলিফা শুধু এইটুকুই জানেন যে, খারেযম শাহ খানে আজমের হামলার সামনে টিকে থাকতে পারবেন না, তিনি আরও জানেন যে, তিনি তাঁর কোন সাহায্যই করতে পারবেন না। তা না হলে তিনি খারেযম ও বাগদাদের ফৌজী কুওতের উপর বিশ্বাস রাখতেন এবং আপনার মারফতে চেংগিস খানের কাছে খারেযম আক্রমণে বিরত থাকবার আবেদন জানাতেন না।

কোন শক্তিমান লোক কখনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলেন না ঃ তুমি আক্রমণ কর না। করলে তার ফল খারাপ হবে। তার সব সময়ই বিশ্বাস থাকে যে, ইটের জবাব পাথর মেরে দেয়া যাবে।

তাহির বললেনঃ আব্বাসীয় খিলাফত খারেযম শাহের বিরুদ্ধে তাতারীদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছেন, খারেযম শাহ ও বাগদাদের আওয়ামের মন থেকে এই ভুল ধারণা দূর করে দেয়াই ছিল খলিফার পয়গামের উদ্দেশ্য।

মোতারজেম আর একবার মোনাফেকী হাসি হেসে বললেন ঃ খারেযম শাহর ভুল ধারণা দূর হল কিনা, আমি বলতে পারি না। তবে আপনি খানে আজমের একটা ভুল ধারণা দূর করে দিয়েছেন। চলুন, এবার আপনাকে আপনার খিমায় রেখে আসি।

তাহির অবিলম্বে প্রশ্ন করলেন ঃ আগে বলুন, যে ভুল ধারণাটা আমি দূর করেছি, তা কি?

মোতারজেম বললেন ঃ ভাবীকালের অবস্থা এ প্রশ্নের জবাব দিবে।

ঃ না, না, আপনাকেই বলতেই হবে।

ঃ না, আপনি বলেছেন, আমি চেংগিস খানের একান্ত অনুগত এবং সেই আনুগত্যের তাগিদেই আমি এসব কথা প্রকাশ করতে পারি না। এই পর্যন্ত তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে চাপা আওয়াজে বললেন ঃ আপনার অনেক কথাই আমার কাছে অসহনীয়, তবু আমি জানি না, আপনার জন্য আমার দীলের মধ্যে কেন এতটা হামদর্দী জেগে উঠছে। আপনাকে আমার শেষ পরামর্শ, আপনি এখানে আর কারুর সাথে দীল খুলে আলাপ করার চেষ্টা করবেন না, আর যথাসম্ভব শিগগির এখান থেকে রওয়ানা হয়ে চলে যাবেন। আমায় আর কোন প্রশ্ন করবেন না, আসুন।

## আট

ফেরার পথে তাতার সাম্রাজ্য অতিক্রম করার পর তাহির ও তাঁর সাথীরা এসে হাজির হলেন খারেযম সীমান্তের একটি ছোট্ট শহরে। শহরটি কোকন্দ থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রায় একশ' মাইল দূরে। বেশ সচ্ছল চাষী ও সওদাগরের বাসভূমি এ শহরটি। আশপাশের সীমান্ত চৌকিগুলো হেফাজত করবার জন্য শহরে রয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার সিপাহী।

বাগদাদ থেকে কারাকোরাম যাবার পথেই তাহিরই এই শহরটির উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। শহরের হাকীম ছাড়া আরও গণমান্য লোকের সাথে এরই মধ্যে হয়েছে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। শাসনকর্তা আগের বারের মত এবারেও তাঁকে থাকতে দিয়েছেন নিজের বাড়িতে। তাতারী হামলার ভয়ে শহরের বাসিন্দারা খুবই পেরেশান। তাই তাহিরের আগমনের খবর শুনেই শহরের কয়েক জন উচ্চপদস্থ ফৌজী অফিসার ও সওদাগর হাকীমের বাড়ীতে এসে মওজুত হলেন।

তাহির তাঁদের সামনে অবস্থান সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে আশ্বাস দিলেন যে, খলিফার পয়গাম সত্ত্বেও যদি তাতারীরা খারেযম সালতানাতের উপর হামলা করে, তাহলে বাগদাদ সর্altogether বিধ খারেযমের সাহায্য করবে।

এক সওদাগর প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি চেংগিস খানের ওয়াদা বিশ্বাস করেন?

তাহির জবাব দিলেন ঃ না, আর সেই কারণেই আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বাগদাদের লোককে অবহিত করবার জন্য আমার খুব শিগগিরই সেখানে পৌঁছা দরকার।

হাকীম বললেন ঃ আপনি কিছু মনে না করলে আমি একটি কথা বলতে চাই।

ঃ বলুন।

ঃ কোন কোন লোকের খেয়াল, মুশকিলের সময়ে খলিফা আমাদের জন্য নেক দোআর বেশী কিছু করবেন না। আমাদের জন্য তাঁর তরফ থেকে এও একটি বড় সাহায্য। কিন্তু এমন কতক লোক রয়েছে, যারা সন্দেহ করে যে, খলিফা চেংগিস খানকে খারেযম আক্রমণ করবার মন্ত্রণা দিয়ে যে চিঠি লিখলেন, তা ধরা পড়ে গেছে বলেই তিনি চেংগিস খানের নামে এ নতুন পয়গাম পাঠিয়েছেন। খলিফা ভয় করেন যে, সেই চিঠির খবর মশহুর হয়ে গেলে কেবল আলমে ইসলামেই তার বাকী ইজ্জত খতম হয়ে যাবে না, বাগদাদের আওয়ামের মধ্যেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। তাই তিনি বাগদাদে খারেযমের দূত ও আপনার মত নওজোয়ানদের খুশী করার জন্য আপনাকে এই দ্বিতীয় পয়গাম নিয়ে পাঠিয়েছেন। আবার হয়ত মওকা পেলে চেংগিস খানকে এ খবরও পাঠাবেন যে, তিনি অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে তাঁকে ধমক দিয়েছেন। চেংগিস খান যেন তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিত থাকেন।

তাহির জবাব দিলেন ঃ খলিফার বিরুদ্ধে এই ধরণের সন্দেহ প্রকাশ আপনাদের পক্ষে শোভন নয়। তথাপি খোদা না খাস্তা যদি আপনাদের সন্দেহ সত্য হয়, তাহলেও আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে, পরিস্থিতি খলিফাকে তাঁর কথায় অবিচলিত থাকতে বাধ্য করবে। কারাকোরামে আমি দেখে এসেছি মুনষ্য-মুন্ডের স্তূপ। এখনও বাগদাদের মসজিদে মসজিদে লোকের কাছে বলে বেড়াতে আমার মুশকিল হবে না যে, তাতারীরা মানবতার অতি বড় দুশমন। খারেযমের উপর কোন সয়লাব নেমে এলে তার ঢেউ বাগদাদের গায়ে অবশ্যি লাগবে। যদি খলিফা অথবা উজিরে আজমের সংকল্প সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহের কারণ ঘটে, তাহলে বাগদাদের জামে মসজিদে লোক আমার মুখ দিয়ে এলান শুনতে পাবে যে, তাদের রক্ষকরা তাদের মান-ইজ্জত চেংগিস খানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি অতদূর গড়াবে না বলেই আমার নিশ্চিত আশ্বাস। খারেযমের প্রতি খলিফার সহানুভূতি না থাকলেও বাগদাদকে বাঁচাবার জন্য তাঁকে অবশ্যি খারেযম শাহর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

পরদিন তাহির রওয়ানা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু শহরের হাকীম বললেন ঃ আজ জুমার দিন। শহরের লোকদের ইচ্ছা, আপনি আজ জুম্মা'র নামাজ পড়াবেন। তাই আজকের দিনটা আপনাকে দেরী করতে হবে। এর মধ্যে রাস্তার চৌকিগুলোয় আপনাদের সফরের জন্য ঘোড়া তৈরী রাখবার নির্দেশ পৌঁছে যাবে।

হাকীমের অনুরোধে তাহির একদিন দেরী করে যেতে রাজী হলেন। জুম্মার নামাজের পর হাকীম তাহিরের সাথে পরম উৎসাহে মোসাফেহা করতে গিয়ে বললেন ঃ আপনার মুখে জাদু রয়েছে। আহা! বোখারা ও সমরকন্দের মসজিদের খতিবরা যদি আজ এখানে হাজির থাকতেন।

শহরের আওয়াম তাদের মনোভাব জানাবার জন্য এক শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে এল হাকীমের বাসভবন পর্যন্ত।

তাহির আসরের নামাজের পর মসজিদ থেকে হাকীমের মহলের দিকে যাচ্ছিলেন। শহরের কোতওয়াল পথের মধ্যে তাঁর সাথে দেখা করলেন। কোতওয়াল বললেন ঃ আমি হাকীমের বাড়ি থেকে আপনাকে খুঁজে এসেছি।

তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ খবর ভাল তো?

কোতয়াল বললেন ঃ বিশেষ কিছু নয়। আপনার তকলিফ না হলে আমার সাথে একবার চলুন।

তাহিরের যে সব ভক্তরা তাঁর সাথে আসছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি কোতওয়ালের সাথে চললেন। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ এমন কোন কথা আছে, যা এখানে বলা যায় না?

ঃ লোকের সামনে কথা বলাটা আমি ভাল মনে করিনি। এই কথা বলে কোতওয়াল পকেট থেকে একটা রেশমী কাপড়ের থলে বের করে তাহিরের হাতে দিয়ে বললেনঃ আপনি এটা চিনতে পারেন?

তাহির জবাব দিলেন ঃ না, এর মধ্যে কি?

কোতওয়াল বললেনঃ ওটা খুলে দেখুন। হয়ত আপনার পরিচিত কোন জিনিসই ওতে পাবেন।

তাহির থলেটা খুলে দেখলেন। তার ভিতর তিনটি হীরা চকচক করছে। তাহির জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন কোতওয়ালের দিকে। তাহিরের পেরেশানি লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ এ হীরা আপনার এক নওকরের কাছে পাওয়া গেছে। তাহির আরও পেরেশান হয়ে বললেন ঃ আপনি কি তার তালাশী নিয়েছিলেন?

কোতওয়াল জবাব দিলেন ঃ আপনি কিছু মনে করবেন না। আমায় কর্তব্য পালন করতে হয়েছে। আপনার নওকর একটু আগে এখানকার এক ব্যবসায়ীর দোকানে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছ থেকে এ হীরার দাম জানবার চেষ্টা করছিল। ব্যবসায়টি কাল আপনার সাথে মোলাকাত করে আর আজ আপনার বক্তৃতা শুনে আপনার খুব বড় ভক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের কাছে এত দামী হীরা থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি এসে আমায় জানিয়েছেন যে, আপনার নওকর হয়ত আপনারই জিনিস চুরি করেছে। তাই আমি তাকে খুঁজে গেলাম। তখনও লোকটি আর এক ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়ে হীরার দাম জিজ্ঞেস করছিল। হীরার দাম জানবার চেষ্টা করতে গিয়ে তার ভিতরে যে ব্যস্ততার ভাব দেখা যাচ্ছিল, তাতেই বোঝা যাচ্ছিল যে, সে হালে কোন জায়গা থেকে এ হীরা সংগ্রহ করেছে। তাই আমি তাকে ধরে কোতওয়ালীতে নিয়ে গেলাম। সেখানে তালাশী নিতে গিয়ে এই থলেতে আরও দুটি হীরা পাওয়া গিয়েছে।

তাহির বললেন ঃ এ হীরা সে কোত্থেকে পেল, জিজ্ঞেস করেছিলেন?

কোতওয়াল বললেন ঃ সে এখনও কোন জবাব দিচ্ছে না। ব্যাপারটা আপনাকে জানাবার আগে তার উপর কোন কঠোর ব্যবহার করাটা আমি ভাল মনে করিনি।

তাহির খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

কোতওয়ালের কাছ ঘেঁষে তাহির বললেন ঃ আপনি তার নাম জানতে চেয়েছিলেন?

কোতওয়াল জবাব দিলেন ঃ সে নিজের নাম বলছে কামাল।

তাহির বললেন ঃ আমি একা একা তার সাথে খানিকটা কথা বলতে পারলে ভাল হয়।

কোতওয়াল বললেন ঃ বেশ তো চলুন। আপনি আমার কামরায় বসবেন। আমি ওকে এনে দেব। তাহিরকে এক কামরায় বসিয়ে রেখে কোতওয়াল কামালকে এনে তাঁর কাছে রেখে চলে গেলেন।

তাহির কামালের দিকে তাকালেন। কোন সওদাগরের মালপত্র লুট হয়ে গেলে তার যে অবস্থাটা হয়, কামালের অবস্থাটাও তাই। সে মুহূর্তের জন্য ফ্যালফ্যাল করে তাহিরের দিকে তাকিয়ে কাঁপা আওয়াজে বলল ঃ ও হীরা আমার!

তাহির উঠে থলেটা তার হাতে দিয়ে বললেন ঃ ঘাবড়িয়ো না। আমি শুধু জানতে চাই, এ হীরা তুমি কোথায় পেলে?

ঃ আমি......আমি....আমি এ থলেটা....তাতারীদের খিমায় পেয়েছিলাম।

ঃ তাহলে ওগুলো আমার কাছে দিয়ে দাও। তাতারীদের জিনিস তাদেরই কাছে পাঠিয়ে দেয়া যাবে।

ঃ না, না, এ আমার - এ আমার।

ঃ তাহলে তোমার বলতে হবে, কার কাছ থেকে তুমি এগুলো পেয়েছিলে?

তাহির এক হাতে তার গলা চেপে ধরে, আরেক হাতে তার মুখের উপর জোরে এক চড় মেরে বললেন ঃ সত্যি কথা বল, নইলে তোমার জান বাঁচবে না।

কামাল গর্দান ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল ঃ আমি বেকসুর। আমি কিছু জানি না।

তাহির তার মুখের উপর আর এক চড় মেরে বললেন ঃ হীরাগুলো চেংগিস খান দিয়েছেন, তা কেন স্বীকার করছ না।

কামাল চীৎকার করে বলল ঃ আল্লার ওয়াস্তে আমার উপর রহম কর। আবু ইসহাক আমায় মেরে ফেলবে।

তাহির বললেন ঃ এই মুহূর্তে আবু ইসহাকের চাইতে আমারই হাত তোমার শাহ-রগের ঢের কাছে। সত্যি কথা তোমায় বলতে হবে।

ঃ চেংগিস খানের এক নওকর আমায় ওগুলো দিয়েছিল। তাহির তার গর্দান ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি সত্যি নয়, সেদিন রাত্রে তোমরা যখন মাথা মুড়িয়ে ফিরছিলে, তখনও চেংগিস খানের সাথে মোলাকাত করে এসেছিলে?

কামাল মাথার টুপিটা ঠিক করে লাগাতে লাগাতে বলল ঃ না, আমরা তাঁর সাথে দেখা করিনি।

তাহির বললেন ঃ তোমার টুপিটা নামাও।

হুকুম তামিল করার পরিবর্তে কামাল দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। তাহির এগিয়ে এসে তার মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে দুহাত দিয়ে মাথায় টুপিটা চেপে ধরে বলল ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর রহম কর। আবু ইসহাক আমায় মেরে ফেলবে।

তাহির তার মুখের উপর আর একটা চড় মেরে বললেন ঃ চিৎকার কর না। তারপর তার মাথা থেকে টুপিটা দূরে ছুড়ে ফেললেন। কামালের মাথার তালু থেকে কালো রঙের তেলটা অনেকখানি উঠে গেছে। ছোট ছোট চুলের ভিতর দিয়ে তার উপর লাল রঙের কতকগুলো বিচিত্র চিহ্ন তাহিরের চোখে পড়ল। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে সেগুলো তাঁর কাছে কতকগুলো অস্পষ্ট আরবী হরফ বলে মনে হল। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন তাহিরের গায়ের রক্ত জমে যাচ্ছিল। লাল রঙের পুরো লিপি পড়বার আগেই তিনি অনুভব করতে লাগলেন, যেন বাগদাদ থেকে গোটা আলমে ইসলামকে খুনের সমুদ্রে গোসল করাবার চক্রান্ত পূর্ণ হয়ে গেছে এবং সকল সতর্কতা সত্ত্বেও তাকেই বানানো হয়েছে সেই নাপাক মতলব

হাসিলের যন্ত্র। তিনি রাগে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কামালের টুপিটা তার মাথায় রেখে দিয়ে তার বাহু চেপে ধরে বাইরে বিড়ুলেন। কোতওয়াল বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাহির তাঁকে বললেন ঃ আমি আপনার শোকরগুযারী করছি। আপনার আপত্তি না থাকলে আমি ওকে সাথে নিয়ে যেতে চাই।

কোতওয়াল বললেনঃ আপনার অপরাধীকে শাস্তি দেবার অথবা মাফ করবার হক রয়েছে, কিন্তু এই ধরণের সাথী সম্পর্কে আমি আপনাকে হুঁশিয়ার থাকতে পরামর্শ দিচ্ছি। তাহির বললেন ঃ আপনি বিশ্বাস রাখবেন, এই ধরণের অপরাধীকে মাফ করতে আমি অভ্যস্ত নই।

বাইরে বেরিয়ে তাহির শাসনকর্তার মহলের কাছাকাছি এক ছোট্ট নদীর কাছে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কামালকে বললেন ঃ এবার তোমার মাথাটা ধুয়ে সাফ কর।

কামাল কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করল, কিন্তু তাহির খনজর বের করে গর্জন করে উঠলেন ঃ জলদী কর নইলে আমি ওই মূল্যবান লিপি পড়বার জন্য তোমার মাথাটা আলাদা করে নিতে দেরী করব না।

কামাল বসে-যাওয়া গলায় বললঃ এ তেল উঠবে না।

ঃ তাহলে মাথা বালু দিয়ে ঘসে সাফ কর।

কিছুক্ষণ পর তাহির কামালের মাথার উপর অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা লিপিখানি উদ্ধার করলেন। তাতে লেখা রয়েছেঃ

ইসলামী দুনিয়ায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। খারেযম শাহকে প্রস্তুতির সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না। খলিফাতুল মুসলেমিন ও বাগদাদের বাসিন্দাদের দোয়া আপনাদের জন্য রয়েছে। এ পয়গাম পাঠাতে বিলম্বের কারণ দূতের মুখে শুনতে পাবেন। খলিফার তরফ থেকে তাহির যা কিছু বলবেন, তাতে যেন আপনাদের কোন ভুল ধারণা না হয়। তাঁকে কেবল পথের অসুবিধা বিবেচনায় পাঠানো হচ্ছে।

দৌলতে আব্বাসীয়ার অনুগৃহীত ও আপনার খাস খাদেম ওয়াহিদুদ্দীন, উজিরে খারেজা।

তাহির আবার যখন কামালের মাথায় টুপি পরিয়ে তাকে সাথে সাথে চলবার হুকুম দিলেন, তখনও সে অসীম বিনয় সহকারে বলল ঃ আমার মাথার উপর কি লেখা হয়েছে, আমি জানি না। ওরা ভোর থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধারালো সূঁচ দিয়ে এসব লিখেছে। বেদনায় আমি তিন রাত ঘুমাতে পারিনি। ফিরে এলে তারা আমায় ইনাম দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমি বেকসুর, আমার উপর রহম করুন।

তাহির বললেন ঃ তুমি সত্যি কথা বললেই শুধু রহম পাবার হকদার হতে পারবে।

ঃ আমার জান বাঁচাবার ওয়াদা করলে আমি সব কিছুই বলে দেব।

ঃ আমি তোমার জান বাঁচাবার চেষ্টা করব। বল, এ চক্রান্তে কে কে শরীক ছিল?

ঃ তা আমি জানি না। মাহে রমজানের ক'দিন আগে আবু ইসহাক আমার চোখে পট্টি বেঁধে আমায় একটা বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে আমায় রাখা হয়েছিল মাটির নীচের এক কুঠরীতে। জামিলের সাথে ওখানেই আমার দেখা হয়। আমাদের দু'জনেরই মাথা মুড়িয়ে তার উপর কি যেন লেখা হয়। তারপর মাথায় আবার ছোট ছোট চুল গজিয়ে উঠলে আবু ইসহাক বলল ঃ যখন দরকার হবে, আমি তোমাদেরকে এক জরুরি অভিযানে নিয়ে যাব। আপাততঃ তোমাদেরকে উজিরে আজমের বাড়িতে চাকুরীতে বহাল করে দিচ্ছি। তখনও

থেকে আমরা উজিরে আজমের আস্তাবলে চাকুরী করছিলাম। এখানে এসে জানলাম যে, আবু ইসহাক আস্তাবলের দারোগা। আবু ইসহাক আমাদেরকে দিয়েছিল পাঁচশ করে দিনার। অবশ্যি সাথে সাথে ধমকও দিয়েছিল যে, এ রহস্য কারুর কাছে ফাঁস হয়ে গেলে আমাদের দু'জনেরই মাথা কাটা যাবে।

তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ এর মাঝে তোমরা কখনও উজিরে আজমের সাথে মোলাকাত করেছিলে?

ঃ তাঁকে অবশ্যি দেখেছি, কিন্তু কখনও কথাবার্তা হয়নি। কেবল শেষের দিন যখন আপনি উজিরে আজমের কাছে বসেছিলেন, তখনও আবু ইসহাক আমায় তাঁর কাছে নিয়ে যায়। তারপর তিনি আমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা আপনি শুনেছেন।

ঃ আস্তাবলের চাকুরী নেবার আগে তোমায় জমিনের তলায় যে কুঠরীতে রাখা হয়েছিল, তা উজিরে আজমের মহল থেকে কতদূর?

ঃ আমাদেরকে ওখান থেকে রাতের বেলায় চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমি অবশ্যি একটুকু বলতে পারি যে, বাড়িটা দরিয়ার অপর পারে হবে।

ঃ তুমি সাবেক উজিরে খারেজা ওয়াহিদুদ্দীনকে চেন?

ঃ আমি চিনি না, কিন্তু জমিনের নীচের কুঠরীতে যে লোকটি আমাদের মাথার উপর লিখিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্ক জামিলের ধারণা, তিনি উজিরে খারেজার দফতরেই এক বড় কর্মচারী।

ঃ আস্তাবলে চাকুরী নেবার পর তুমি তাঁকে আর কখনও দেখেছ?

ঃ না।

ঃ আবু ইসহাক তোমায় উজিরে আজমের কাছে নিয়ে তোমার মাথার লিপি তাঁকে দেখিয়েছিল?

ঃ আপনি যেদিন ওখানে ছিলেন, সেদিন ছাড়া আর কখনও আমাদেরকে তাঁর সামনে নেয়া হয়নি।

তাহিরের দীল যেন ভারমুক্ত হয়ে আসছিল। কম সে কম তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এ চক্রান্তে উজিরে আজম শরীক নন, বরং তাঁর অজ্ঞাতে উজিরে খারেজার তরফ থেকেই ঘটছে পুরো ব্যাপারটা। উজিরে আজমের আস্তাবলের দারোগা এতে যন্ত্র হিসাবে কাজ করছে। বিদায় বেলায় তাঁকে উজিরে আজম বলেছিলেন ঃ আমি বাইরে কোন লোককে না পাঠিয়ে আমারই দু'তিনটি নওকর আপনার সাথে দিচ্ছি। ওয়াহিদুদ্দীনের প্রথম ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু আত্মগোপন করবার আগেই তিনি আর এক চক্রান্ত তৈরী করে ফেলেছিলেন। খলিফার সম্পর্কেও তাহির তাঁর দীলকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে, তিনিও উজিরে আজমের মত এ চক্রান্তের খবর জানেন না। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটাও ভেসে উঠছে তার মনে। যতই তিনি ভাবেন, ততই পেরেশান হয়ে ওঠেন। তাঁর মনের ভাল ধারণা যখন খারাপ ধারণায় রূপান্তরিত হয়, তখনও তিনি ভাবেনঃ হতে পারে, এসব কিছুই উজিরে আজমের ইশারায় ঘটেছে, আর তিনি হুঁশিয়ার লোক বলেই এ লোকগুলোকে দূরে দূরে রেখেছেন, কেননা যদি এরা প্রথম বারের মত ধরা পড়েই যায়, তথাপি যেন এমন কোন প্রমাণ না থাকে যে, উজিরে আজমও এ চক্রান্তে শরীক ছিলেন। কিন্তু তাঁর দীলের উদারতা উজিরে আজমের বিরুদ্ধে এ সন্দেহের চিন্তায় বাধা দিচ্ছিল। তিনি আবার কামালকে প্রশ্ন করলেন ঃ এর ভিতরে তোমরা

কখনও খলিফার সাথে মোলাকাত করেছিলে?

ঃ না?

ঃ সেদিন সন্ধ্যায় তোমাদেরকে চেংগিস খানের সামনে নেয়া হয়েছিল।

ঃ হ্যাঁ, আবু ইসহাক আমদেরকে চেংগিস খানের মুসলমান কর্মচারীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল এবং সে আমাদের মাথা মুড়িয়ে চেংগিস খানের সামনে পেশ করেছিল?

ঃ তুমি জামিল ও আবু ইসহাকের মাথার উপরে লেখা লিপি পড়ে দেখেছিলে?

ঃ জামিলের মাথায় এরই ফরাসী তরজমা আর আবু ইসহাকের মাথার চীনা ভাষায় কিছু লেখা ছিল। তাও হয়ত এরই তরজমা হবে।

তহির বললেন ঃ তুমি চলে যাও। আমি তোমার পিছু পিছু আসছি। কিন্তু আবু ইসহাককে কিছু বললে অথবা পালাবার চেষ্টা করলে তার পরিণাম তোমার জন্য খুব খারাপ হবে।

কামাল কোন কথা না বলে তাহিরের আগে আগে চলে গেল।

তাহির এক গভীর চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে ধীর পদক্ষেপে চলতে লাগলেন। তারপর এক সময়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন হাকিমে শহরের মহলে। সেখানে তিনি নিজের কামরায় না ঢুকে তাঁর সাথীদের কামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। দরজার একটা দিক বন্ধ ও অপর দিকটা খোলা ছিল। কামাল তাহিরের ইশারা পেয়ে ভিতরে ঢুকলে আবু ইসহাক চিৎকার করে বলল ঃ তুমি তো ভারী বে-অকুফ। আমরা সারা শহর খুঁজে এসেছি। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

কামাল ধরা গলায় জবাব দিল ঃ আমি এখানেই ছিলাম।

ঃ তাহিরকে তুমি দেখেছো?

ঃ তাহিরকে?.....কেন, তিনি এখানে নেই।

ঃ তুমি যেখানে খুশী চলে যাও। আমাদের উপর কোন মুসিবৎ আসলে তোমারই জন্যে আসবে।

তাহির নীরবে কামরায় প্রবেশ করলেন। আবু ইসহাক অমনি বলে উঠল ঃ আমরা আপনারই অপেক্ষা করছিলাম। আপনি কোথায় ছিলেন? আমি বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম।

তাহির তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন ঃ তোমার আর তোমার সাথীদের পরিচ্ছন্ন থাকতে এত আপত্তি কেন? আমার মনে হয়, এখনও তোমাদের মধ্যে কেউ মাথা সাফ করে সেই কালো রঙের তেলগুলো তুলে ফেলার চেষ্টাও করনি।

আবু ইসহাক তার পেরেশানী চাপা দেবার চেষ্টা করে জবাব দিল ঃ তাতারীদের এ তোহফা আমরা বাগদাদে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। ওখানে যদি কোন তাতারী থাকে, তাহলে তাদের সাথেও যাতে এমণি আচরণ করা হয়, বাগদাদের বাসিন্দাদের কাছে আমরা সেই দাবীই করব।

তাহির বললেন ঃ তোমার টুপিটা একটু নামাও।

আবু ইসহাক খানিকটা ইতস্ততঃ করে টুপি নামিয়ে আবার তখুনি সেটা মাথায় রাখতে রাখতে বলল ঃ আমার সতর্কতা সত্ত্বেও তেল উঠে গেছে।

ঃ বাগদাদে কাল রঙের তেলের কমনি নেই। এখানে তোমার মাথা ধুয়ে সাফ করে

ফেল। বাগদাদে গিয়ে না হয় আবার নতুন করে কালি মাখাবে। আর জামিল! তোমার মাথাটাও একবার দেখ।

জামিল আবু ইসহাকের দিকে তাকাল। তার ইশারা পেয়ে সে একবার টুপি নামিয়ে আবার তখুনি মাথায় রাখল।

তাহির বললেন ঃ কামাল, তুমিও বুঝি এখনও মাথা ধোওনি।

কামাল একে একে আবু ইসহাক, জামিল ও তাহিরের দিকে তাকাল। তারপর তাহিরের ইশারায় ঝট করে মাথার টুপিটা খুলে ফেলল।

আবু ইসহাক ও জামিল মুহূর্তের মধ্যে হতভম্ব হয়ে গেল। তাহির বললেন ঃ আবু ইসহাক কামালের মাথার তালুতে কি যেন লেখা দেখাচ্ছে। একবার পড়ে শোনাও না! আবু ইসহাক বলে উঠলঃ তাহলে আপনি সবই জেনে ফেলেছেন।

তাহির জবাব দিলেন ঃ না, এখনওও তোমাদের দু'জনের মাথার তালু আমার দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে।

আবু ইসহাক উঠে দাঁড়াল। তার একহাত তখনও খনজরের হাতলের উপর। তাহির জলদী করে তাঁর খনজর বের করে গর্জন করে বললেন ঃ বিশ্বাসঘাতক বুজদীল হয়ে থাকে, তোমার বীরত্ব দেখানোর চেষ্টায় আমার সে রায় বদলে যাবে না।

আবু ইসহাক এবার তাহিরের পরিবর্তে তার সাথীদের দিকে তাকাতে লাগল। কামালের নির্লিপ্ততা তাকে হতাশ করে দিচ্ছিল। জামিল কয়েকবার উঠবার চেষ্টা করল কিন্তু তাহিরের দৃষ্টির আগুন তাকে বসে থাকতে বাধ্য করল।

তাহির বললেন ঃ সালতানাতে খারেযমের কাছে তোমাদের মাথার দাম অনেক বেশী। যদি তোমাদের মাথা এখানে বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাহলে আমি তোমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি, তোমাদের বাকী দেহ বাগদাদে পৌঁছে দেয়া যাবে।

কামাল বলে উঠল; আমার সাথে আপনার ওয়াদা.......!

তাহির তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন ঃ তুমি চুপ কর।

আবু ইসহাক ধরা গলায় বলল ঃ আপনি আর আমরা সবাই খলিফার খেদমতে লিপ্ত। যেমন নেক নিয়তের সাথে আপনি আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন, আমাদের উপর ন্যস্ত কর্তব্যও আমরা তেমনি নেক নিয়তের সাথেই সম্পন্ন করেছি। এখনও এখানে ঝগড়া না করে বাগদাদে ফিরে সব ঝগড়ার ফয়সলা খলিফার উপর সঁপে দেয়াই কি ভাল নয়?

তাহির বললেন; তুমি মিথ্যা বলছ। খলিফা তোমার ও উজিরে খারেজার নাপাক চক্রান্তে শরীক থাকতে পারেন না।

ঃ এটা কি ভাল নয় যে, আপনি কোন রায় কায়েম করবার আগে বাগদাদে পৌঁছে খলিফার কাছে জিজ্ঞেস করুন। যদি তাঁর সাক্ষ্য.....।

আবু ইসহাক তাহিরের পেছনে আধ-খোলা দরজার বাইরে কোন লোককে দাঁড়ানো দেখে থেমে গেল। তারপর গলায় আওয়াজ পরিবর্তন করে বলল, আপনি খারেযমের ইনাম পাবার লোভে আমাদের ফাঁসীতে দিয়ে নিজেও রেহাই পাবেন না-আপনি খলিফার কাছ থেকে ইনাম পাবার লোভে আমাদেরকে এই নাপাক মতলব হাসিল করবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন। আর এখনও খারেযম শাহের ইনাম পাবার জন্য আমাদেরকে বিক্রি করে দিতে চান। হায়! আমাদেরকে মাথার তালুর উপর কি লিখিয়েছেন, তা যদি আগে জানতাম!

আমাদেরকে আপনি তখনও শুধু এইটুকুই তো বলেছিলেন যে, আমরা বাগদাদের এক অতি বড় খেদমতের জন্য যাচ্ছি, আর তার বিনিময়ে আমরা পাব অজস্র ধনদৌলত।

তাহির এগিয়ে এসে আবু ইসহাকের মুখের উপর এক ঘুষি মেরে বললঃ খামোশ! নীচু শয়তান কোথাকার! কার কাছে তুমি প্রমাণ করবে যে, আমিও তোমাদের নাপাক চক্রান্তে শরীক ছিলাম।

আবু ইসহাক সামলে নিতে নিতে বলল ঃ তোমার কাছে.....তোমারই কাছে, যে অর্থের লোভ দেখিয়ে আমাদেরকে অবমাননার চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে এনেছে। আমি চুপ করে থাকব না। শহরের হাকীমের কাছে গিয়ে আমি কেঁদে বলব যে, মসজিদের এই বক্তা মানুষটিই এ জামানায় ইসলামের সব চাইতে বড় দুশমন।

তাহির বললেন ঃ এসব জঘন্য মিথ্যা বলে তুমি আমায় ভয় দেখাতে পারবে না। তোমার মত বিশ্বাসঘাতককে চরমদন্ড দিতে গিয়ে যদি আমায় শূলের উপর প্রাণ দিতে হয়, তার জন্য আমি পরোয়া করব না।

হঠাৎ কামরার দরজা খুলে গেল। শহরের হাকীম কয়েকজন নওকর সাথে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

এদের সবাইকে পাহারায় রেখে দাও। নওকরদের লক্ষ্য করে হাকীম হুকুম দিলেন। তারপর তাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমি আপনাদের কথাবার্তা শুনেছি। বিশ্বাস করুন, এসব কথাবার্তা সত্ত্বেও আপনার সম্পর্কে আমার রায় বদল করতে কষ্ট হচ্ছে। তথাপি আপনাকে কিছুকাল নজরবন্দি রাখতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

তাহির বললেন ঃ তাহলে ইসহাক আপনাকে দরজার পিছনে দাঁড়ানো দেখেই গলায় আওয়াজ বদল করে ফেলেছিল। আপনি আমায় যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আমার সম্পর্কে রায় কায়েম করার আগে আমায় কিছু বলবার সুযোগ দেবেন।

ঃ যদি আপনার সাথীদের অপরাধের দায় থেকে বাঁচাতে পারেন, তাহলে আমি মনে আনন্দ অনুভব করব। কিন্তু এ ধরণের সঙ্গীন মোকদ্দমার বিচার একমাত্র কোকন্দের হাকীমে আলাই করতে পারেন।

শহরের হাকীম তাঁর নওকরদের তাহিরের সাথীদের হাতে পায়ে বেড়ি পরাবার হুকুম দিয়ে তাহিরকে নিয়ে আর এক কামরায় চলে গেলেন। তাহিরের দীর্ঘ বিবরণ শুনে তিনি কামালকে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। তার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করার পর তিনি তাহিরকে বললেন; আমার দিক থেকে বলতে গেলে আপনার সম্পর্কে আমার সন্দেহ অনেকখানি দূর হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে, হাকীম আলার হুকুম ছাড়া আমি কোন ফয়সলা করতে পারি না। আমি আজই তাঁর কাছে দূত পাঠাচ্ছি। আপনার জন্য আমি এইটুকু করতে পারি যে, আপনাকে বেড়ী পরানো হবে না, কিন্তু কেল্লার ভিতরে আপনাকে নজরবন্দি রাখতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আপনার সাথীদের মাথা পরীক্ষা করে দেখার পর তাদেরকে কয়েদখানায় পাঠানো হবে।

সন্ধ্যা বেলায় হাকীমের দূত তাঁর চিঠি নিয়ে কোকন্দের হাকিমে আলার কাছে রওয়ানা হয়ে গেল। হাকীমে শহর তাঁর পত্রে অপরাধীদের দোষ লাঘব করবার জন্য অনেক কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন।

প্রায় দেড় সপ্তাহ নজরবন্দি থাকার পর তলোয়ারের পাহারায় তাহিরকে হাকীমে শহরের কাছে হাজির করা হলে তিনি তাহিরকে বললেন ঃ কোকন্দের হাকিমে আলা তৈমুর মালিকের জবাব পাওয়া গেছে। আপনাকে ওখানে যেতে হবে।

আর আমার সাথীরা?

হাকীমে শহর জবাবে বললেন ঃ তারা বহুত দূর চলে গেছে।

ঃ আপনার কথার অর্থ?

ঃ এর অর্থ হচ্ছে, তৈমুর মালিক তাদের পরিবর্তে তাদের মাথা চেয়েছিলেন এবং আমি তাঁর হুকুম তামিল করতে বাধ্য হয়েছি।

ঃ না, আপনি এতটা জলদি করবেন না। বাগদাদে এ চক্রান্তের জন্য দায়ী সব ক'টি লোককে ধরবার জন্য তাদের জিন্দাহ থাকার প্রয়োজন আছে।

ঃ আমি তো বললাম, সে হুকুম আমি তামিল করেছি।

ঃ কিন্তু কামাল সম্ভবতঃ জামিলও এ শাস্তির যোগ্য ছিল না।

ঃ আমি তাদের বদলে নিজের মাথাটা তো আর দিতে পারি না। তা ছাড়া এর মধ্যে আপনারও ভালই ছিল। আপনি খামাখা সাথীদের সাফাই দিচ্ছেন। তৈমুর মালিক চোখে দেখার পর কানের সাক্ষ্য নেবার প্রয়োজন অনুভব করতে অভ্যস্ত নন। আপনি যদি মনে করেন, কামাল আপনার পক্ষে সাফাই দিতে পারত, তাহলে আমি সেই ঘাটতি পুরো করে দিয়েছি। আমি তৈমুর মালিককে দ্বিতীয়বার চিঠি লিখে দিয়েছি।

## নয়

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খারেযম শাহ অত্যন্ত একরখা স্বেচ্ছাচারী শাসক। খারেযমের উত্তর ও পূর্ব সীমান্তের তাতারীদের বিক্ষিপ্ত হামলা ও লুটপাটের খবর পেয়েই তিনি তাদের বিরুদ্ধে দু'লাখ সিপাহী নিয়ে এগিয়ে যাবার সংকল্প করলেন। তাঁর কর্মদক্ষ, বুদ্ধিমান, বাহাদুর ও দূরদর্শী পুত্র জালাল উদ্দীন ছিলেন তাঁর এ সংকল্পের বিরোধী। তিনি সাম্রাজ্যের ওমরাহের এ বৈঠকে দাঁড়িয়ে পিতাকে বললেন ঃ আপনার ফৌজের এক সিপাহী হিসাবে যদি আমার কথা বলবার অধিকার থাকে, তাহলে আমি বলবঃ আমাদের সেনাবাহিনী সীমান্তে জমা করে তাতারীদের অগ্রগতির জন্য অপেক্ষা করাই আমাদের উচিত। সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে তাদের সেনাদল যদি কখনও কখনও লুটপাট করে চলে যায়, তার জন্য তাদেরকে কমজোর মনে করবার মত ভুল ধারণা করা আমাদের অন্যায় হবে। তাদের মকসাদ হচ্ছে, আমরা তাদের প্ররোচনায় সীমান্ত পার হয়ে বরফ ঢাকা দুর্গম পাহাড়ী পথের দিকে এগিয়ে যাব। সেখানকার সংকীর্ণ ঘাঁটিগুলো তাদের পক্ষে অপরাজেয় কেল্লার কাজ করবে। ময়দানে আমরা তাদেরকে আবর্তের মুখে তৃণগুচ্ছের মত ভাসিয়ে নিতে পারি, কিন্তু পাহাড়ী এলকার দিকে এগিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক। তারা পিছু হটতে হটতে এমন এক জায়গায় এসে আমাদেরকে ঘিরে ফেলবে, যেখানে আমাদের আগে পিছে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

অভিজ্ঞ ফৌজী অফিসাররা জালালউদ্দীনকে সমর্থন করলেন। কিন্তু খোশামুদে সরদারদের প্রভাবে পড়ে খারেযম শাহ তাঁর সাথে একমত হলেন না। তাঁর প্রথম ও শেষ

যুক্তিঃ তাতারী ডাকাতদের শাস্তি বিধানে আমাদের দিক থেকে কোন রকম দ্বিধার পরিচয় পেলে দুনিয়ার লোক আমাদেরকে বলবে কমজোর। এ যাবত আমরা যে কোন দুশমনকে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমরা কমজোর নই। আমাদের বিশ্বাস, তাতারী পাখা লাগিয়ে হাওয়ায় উড়ে লড়াই করলেও আমরা তাদের উপর হব বিজয়ী।

জালালউদ্দীন পিতার ইরাদা বদল করাতে না পেরে অবশেষে বললেন ঃ এই যদি হয়ে থাকে আপনার ইরাদা তাহলে আমার আরজ, এ অভিযানের ভার আমার উপর ন্যস্ত করে দিন আর বাকী ফৌজ নিয়ে আপনি সাম্রাজ্যের হেফাজত করুন।

খারেযম শাহ্ দূরদর্শী পুত্রের এ প্রস্তাব নামঞ্জুর করলেন। মুলুকের মেহফাজতের ভার পুত্রের উপর সমর্পণ করে তিনি বিরাট ফৌজ নিয়ে এগিয়ে চললেন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দিকে।

জামালউদ্দীনের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল। দু'লক্ষ মুসলিম সেনার সয়লাবের সামনে তাতারীদের বিচ্ছিন্ন সেনাদল চারদিক দিয়ে সরে গিয়ে পিছু হটতে লাগল। খারেযম শাহ শক্তির নেশায় মাতাল হয়ে অভিজ্ঞ সরদারদের পরামর্শ উপেক্ষা করে ক্রমাগত এগিয়ে চললেন। তাঁর উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেবার জন্য কোন কোন জায়গায় তাতারী সেনার মামুলী রকমের বাধা দিয়ে আবার পিছু হটতে লাগল। তাতারীদের চাল খারেযম বাহিনীকে বিপদ সম্পর্কে বেপরোয়া করে তুলল। একদিন ভোরে এক উপত্যকা ভুমিতে তাতারীদের কয়েকটি দলের সাথে হল খারেযমের সংঘাত। উপত্যাকার তিন দিকে উঁচু পাহাড় আর এক দিকে ঘন বন। তাতারী সেনারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে বনের দিকে হটতে লাগল আর তিন দিক দিয়ে পাহাড়ের উপর জমা হতে লাগল। পংগপালের মত অগুণতি তাতারী লস্কর। যখন চারদিক থেকে বর্ষার ধারার মত তীর বৃষ্টি হতে লাগল, কেবল তখনওই খারেযম শাহ তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। সেই সংকীর্ণ ময়দানে তুর্কী নেজাবাজদের বীরত্ব দেখাবার মওকা মিলল না। ঘন বনের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও ছিল না তাদের আশ্রয়স্থল। তীরবৃষ্টি ছাড়াও তাতারীদের বেশুমার দল পাহাড় থেকে নীচে নেমে এসে খারেযম বাহিনীর উপর চালাল ধ্বংস তান্ডব। ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য তুর্কী বাহিনী আশ্রয় নেবার চেষ্টা করল বনের ভিতরে। কিন্তু সেখানেও প্রতিটি গাছের গোড়ায় একটি করে তাতারী তীরন্দাজ তৈরী হয়ে রয়েছে। দিনের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত খারেযম বাহিনী সারাটা বন থেকে তাতারী সৈন্যদের দূর করে দিল। পাহাড়ের উপর থেকেও তাতারী সেনারা ধীরে ধীরে গায়েব হতে লাগল। কিন্তু খারেযম বাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হল যে, সন্ধ্যার দিকে খারেযম শাহের ফৌজী অফিসাররা মৃতদেহ গণনা না করে জিন্দাহ মানুষ গণনা করে দেখতে লাগলেন।

এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর খারেজম শাহ আর বাকী সেনাবাহিনী নিয়ে সামনে পা বাড়াবার হিম্মত করেননি। তিনি যখন ফিরে এসেছেন, তখনও পথে খবর পেলেন যে, উত্তর দিক তাতারী লস্কর এগিয়ে চলেছে কোকন্দের দিকে। কোকন্দের হাকীমে আলা তৈমুর মালিক বাদশার কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে, তাঁর কাছে রয়েছে পাঁচ হাজার সিপাহী। তথাপি তাঁর বিশ্বাস, তিনি কিছু কালের জন্য তাতারী তুফান রোধ করতে পারবেন, কিন্তু সুলতান

যদি তাঁর সাহায্যের জন্য আরও বিশ হাজার সিপাহী পাঠান, তাহলে আলমে ইসলামের বিরুদ্ধে তাতারীদের যুদ্ধসাধ চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দেয়া সম্ভব হবে।

খারেজম শাহ আগের যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ধ্বংস তান্ডবের মোকাবিলা করে এতটা নিরুৎসাহ হয়ে গিয়েছিলেন যে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি তৈমুর মালিকের চিঠি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে দূতকে বলে দিলেন ঃ তৈমুর মালিক আমার তুলনায় নিজেকে বেশী অভিজ্ঞ মনে করলে তিনি এক বে-অকুফ।

কিন্তু কোন কোন অফিসার তাঁকে বুঝিয়ে বললে খারেযম শাহ তৈমুর মালিকের কাছে পয়গাম পাঠালেন ঃ বিশ হাজার সিপাহী পাঠাবার আগে আমি দেখতে চাই, তোমার পাঁচ হাজার সিপাহী নিয়ে তুমি কতদিন তাতারী হামলা রোধ করতে পার।

কোকন্দের কয়েদখানায় তাহিরের দু'সপ্তাহ কেটে গেল। কয়েদখানার দারোগাকে তিনি বারংবার আবেদন জানালেন যে, তাঁকে শহরের হাকীমে আলার কাছে পেশ করা হোক। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি জবাব পেলেন। যখন তাঁর ফুরসত মিলবে তিনি নিজেই ডেকে নেবেন তাঁকে। তাহির দারোগার কাছে চিঠি লেখার এজাযত চাইলে তিনি জবাব দিলেন, গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে ধরা পড়লে তাদেরকে এসব সুবিধা দেয়া হয় না। আর কোন কয়েদীর সাথে দেখা করার হুকুমও তাহিরের ছিল না। কয়েদখানার বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে তিনি ছিলেন বেখবর। সারাদিনে বারবার তিনি মনে করেন ঃ কেন তাঁকে ডাকা হয় না? কয়েদ খানার বাইরে দুনিয়ায় কি হচ্ছে? তাতারীরা কি হামলা করল? হাকিমে আলার কি আমার কথা ভাববারও ফুরসত নেই? আমার কথা না শুনেই কি তিনি আমায় আজীবন কয়েদ থাকার শাস্তি দিয়েছেন?

একদিন কয়েকজন সিপাহী নাঙ্গা তলোয়ারের পাহারায় তাহিরকে বের করে নিয়ে গেল কোকন্দের হাকীমে আলা তৈমুর মালিকের বাসভবনে। তৈমুর মালিক যেমন সুদর্শন পুরুষ, তেমনি মধুর স্বভাবের লোক। তাঁর সাহস ও শরাফতের কাহিনী মশহুর ছিল দূরদারাজ এলাকা পর্যন্ত। তিনি নেহায়েৎ ধৈর্য সহকারে শুনলেন তাহিরের অতীত দিনের কাহিনী। তাহির নিজের কথা শেষ করে তার সামনে পেশ করলেন খারেজম দূতের চিঠি। তাতে প্রকাশ করা হয়েছে তাহিরের নেক নিয়ত সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস আরও লেখা রয়েছে সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ারের কথা।

তৈমুর মালিক কিছুক্ষণ মাথা নত করে চিন্তা করে তাহিরের উপর শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন ঃ ব্যক্তিগতভাবে আমার রায় তোমার খেলাফ নয়, কিন্তু মহিমান্বিত সুলতানের হুকুম, এই ধরণের তামাম মোকদ্দমা তাঁর কাছে পাঠাতে হবে। তোমার গ্রেফতারির খবর তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে এবং আমি তাঁর হুকুমের ইন্তেজার করছি।

তাহির বললেন ঃ কয়েদখানায় আমার দু'মাস কেটে গেছে। দুনিয়ায় কি ঘটছে, তাও আমি জানি না। আমি খুব শিগগিরই বাগদাদে পৌঁছতে চাই। ওখানকার লোকদের সঠিক পরিস্থিতি জানানো প্রয়োজন। আমার দীল সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাতারী বাহিনী যে কোন সময়ে আপনাদের সালতানাতের উপর আচানক হামলা করবে এবং আমার বিশ্বাস বাগদাদ অংশগ্রহণ করলে এ হামলা রোধ করতে পারবে। যদি তা নাও হয়, তথাপি খারেজমের সাহায্যের জন্য বাগদাদের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আমায় মাত্র কয়েকদিনের জন্য ছুটি দিন। আমি ওয়াদা করছি, বাগদাদের লোকদের কাছে এ পয়গাম পৌঁছে দিয়েই আমি

আপনার কাছে এসে হাজির হব। এক কয়েদীর মুখ থেকে এ আবেদন আপনি হয়ত তামাশা মনে করবেন, কিন্তু কি করে আমি আপনার বিশ্বাস জন্মাবো যে, আমি এক মুসলমান, আর মুসলমানের ইজ্জত ও আজাদীকে আমি জানের চাইতে প্রিয় মনে করি? আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার ওয়াদায় বিশ্বাস করুন, নইলে আমায় শিগগিরই খারেজম শাহের কাছে পাঠিয়ে দিন।

তৈমুর মালিক জবাব দিলেন ঃ নওজোয়ান! তাতারীদের সাথে আমাদের লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এতদিনে আমাদের শোচনীয় পরাজয়ের খবর বাগদাদে পৌঁছে গেছে। সম্ভবতঃ ইসলামের উপর কুফরের প্রথম বিজয়ের খবর শুনে খলিফাতুল মুসলেমিনের মহলে আলোকসজ্জাও করা হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমার মনে হয়, তোমার নেক নিয়ত থাকলে বাগদাদের খলিফার মহল তোমার জন্য কোকন্দের কয়েদখানার চাইতেও বেশী বিপজ্জনক হবে। তিনি তোমায় যে কাজ দিয়েছিলেন তা শেষ হয়ে গেছে। এখনও হয়ত তিনি তোমার জিন্দাহ্ থাকার প্রয়োজনও অনুভব করবেন না। মহিমান্বিত সুলতানের মনও মস্তিস্কের উপর পরাজয়ের যে গ্লানি ছেয়ে আছে, তাতে আমার আশঙ্কা তিনি গুপ্তচর কথাটি শোনার পর আর কোন বিবরণ জানতে চাইবেন না।

পরাজয়ের খবর শুনে তাহির মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। একটা ঘুমন্ত মানুষকে সমুদ্রের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিলে তার যা অবস্থা হয়, তাহিরের অবস্থাও তখনও তেমনি। খানিকক্ষণ পর তিনি তাঁর মনোভাব সংযত করে বললেন ঃ মৃত্যুর জন্য আমার কোন ভয় নেই। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী আমি নিরপরাধ। আমায় ধোকা দেয়া হয়েছে। আমি যেন মৃত্যুর আগে ভুলের কাফফারা আদায় করে যেতে পারি, এতটুকুই আমি চাই। বাগদাদে না গিয়ে আমি সে কাফফারা আদায় করতে পারব না। আসল অপরাধী হচ্ছেন সাবেক উজিরে খারেজা ওয়াহিদুদ্দীন তিনি যদি এখনও জিন্দাহ থাকেন, তাহলে আমি ওয়াদা করছি, কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর মস্তিষ্ক নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছাব। নইলে আমার মস্তক আপনার কাছে হাজির হবে।

তৈমুর মালিক বললেন ঃ আমাদের আসল অপরাধী খলিফা আর উজিরে আজম। উজিরে খারেজা কেবল তাঁদের হাতের যন্ত্র হিসাবে কাজ করে থাকতে পারেন। যদি তুমি তাঁদের মস্তক এনে দেবার ওয়াদা করতে পার, তাহলে আমি তোমার মুক্তির কোন উপায় চিন্তা করতে পারি। না, নাঃ তাহির চিৎকার করে বললেন ঃ তাঁরা হতে পারেন না। তাদের সম্পর্কে এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, যেদিন আলমে ইসলামের এ স্তম্ভ এমনি অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাবে, সেদিন দুনিয়ার কোন প্রান্তই আমাদের জন্য নিরাপদ থাকবে না। আপনার ধারণা, ওঁরা এতটুকুও বোঝেননা না যে, খারেজম তাতারী সয়লাবের মুখে শেষ প্রতিরোধ ভূমি, আর এ পাহাড় ভেঙে পড়লে বাগদাদও রেহাই পাবে না ধ্বংসের হাত থেকে?

তৈমুর মালিক বললেন ঃ হয় তুমি বেওকুফ, অথবা আমায় বেওকুফ মনে করছ। তুমি কি জানো না যে, এরই মধ্যে খলিফার কয়েকজন গুপ্তচর ধরা পড়ে গেছে?

তাহির বললেন ঃ এর সব চক্রান্তের মধ্যে ছিল উজিরে খারেজার হাত। আমার বিশ্বাস খলিফা অথবা উজিরে আজম এর কিছুই জানতেন না।

তৈমুর মালিক বললেন ঃ যদি তুমি মহিমান্বিত সুলতানের সামনেও এমনি করে খলিফা ও উজিরে আজমের সাফাই দিতে থাক, তাহলে আমার বিশ্বাস, শিগগিরই তুমি তোমার তিন সাথীর সাথে গিয়ে মিলিত হবে।

তাহির জবাব দিলেন ঃ জানের ভয়ে আমি কারুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারব না।

তৈমুর মালিক এর জবাবে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু এক ফৌজী অফিসার ভিতরে এসে খবর দিলেন যে, মহিমান্বিত সুলতানের দূত তাঁর এজাযতের প্রতীক্ষা করছেন।

তৈমুর মালিক বললেন ঃ তাকে নিয়ে এস।

খানিকক্ষণ পরেই এক তুর্কী অফিসার ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং তৈমুর মালিকের কাছে এক চিঠি পেশ করলেন। তৈমুর মালিক চিঠি পড়ে প্রথমে দূতের দিকে ও পরে তাহিরের দিকে তাকালেন। বেদনাতুর কণ্ঠে তিনি বললেন ঃ তোমার সম্পর্কে মহিমান্বিত সুলতানের হুকুম এসে গেছে। আমার আফসোস, আমার হাতে আর কিছু নেই। তুমি চিঠি পড়ে দেখতে পার।

তৈমুর মালিক চিঠিটা তাহিরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা না ধরেই বললেন ঃ এ চিঠির মর্ম আমি আপনার মুখ দেখেই পড়ে নিয়েছি। আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই, কবে পর্যন্ত আমি জিন্দাহ রয়েছি। 'কাল পর্যন্ত'। ঃ তৈমুর মালিক কথাটি বলে মাথা নত করলেন।

তাহিরের মুখে ফুটে উঠল এক বেদনাদায়ক হাসির রেখা। তৈমুর মালিক একটু পরেই মাথা তুললেন। তাঁর মুখে কোন কথা ফুটল না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিই যেন বলছিল ঃ তোমার জন্য আমার হামদর্দী রয়েছে, কিন্তু আমি অসহায়!

তাহির বললেন ঃ এই ফয়সলাই যদি চূড়ান্ত হয়ে থাকে, তাহলে আমি ইজ্জতের সাথে মরবার আশা করতে পারি?

তৈমুর মালিক জবাব দিলেন ঃ মহিমান্বিত সুলতানের হুকুম, তোমায় জনসাধারণের চোখের সামনে ফাঁসি দেয়া হবে।

তাহিরকে নাংগা তলোয়ারের পাহারায় মহলের বাইরে নেয়া হল। দরজার সিঁড়ির নীচে জনতার ভীষণ ভীড়। লোক তাহিরকে দেখেই অসীম উদ্দীপনায় উচ্চধ্বনি করে উঠল ঃ 'কওমের গাদ্দার' 'খলিফার চর' 'ইসলামের দুশমনকে ধর, মার'। জনতার উত্তেজনা দেখে সিপাহী দরজায় থেমে গেল। ভিড়ের মাঝখান থেকে কয়েকটি নওজোয়ান বেরিয়ে এসে সিঁড়ির উপর উঠতে লাগল, কিন্তু সিপাহীরা তাদেরকে তলোয়ার ও নেজার ভয় দেখিয়ে ফিরাল। তথাপি জনতার উত্তেজনা প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলল। একজন পাথর ছুঁড়ে মারল, কিন্তু সে পাথর তাহিরের গায়ে না লেগে এক সিপাহীকে যখম করল। সিপাহীটি দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর পাথর এসে আরও তিন-চারজন সিপাহীকে ঘায়েল করল। এক ফৌজী অফিসার এগিয়ে গিয়ে বলবার চেষ্টা করছিলেন যে, তাহিরের মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দেয়া হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর আওয়াজ জনতার কোলাহলে ডুবে গেল। আর এক পাথরের ঘা খেয়ে তিনি বললেন ঃ কয়েদীকে মহলের ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও। কিন্তু তাহির পাহারাদারদের নাংগা তলোয়ারের পরোয়া না করে এক কদম এগিয়ে গিয়ে দু'হাত উপরে তুলে জোর গলায় বললেন ঃ মুসলমান ভাইরা! এক গাদ্দার ও গুপ্তচরের বিরুদ্ধে তোমাদের এ তীব্র ঘৃণা জিন্দেগীর পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু তোমরা হয়ত জান না যে, আমার মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দেয়া হয়ে গেছে। কাল আমায় তোমাদের সামনে ফাঁসি দেয়া হবে। এরপর আমার মোকদ্দমা সেই বড় আদালতে পেশ হবে, যেখানে প্রত্যেক মজলুমই ইনসাফের প্রত্যাশা করতে পারে। জনতার কলরব কমে আসছিল। ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের

মনোভাব সত্ত্বেও তারা তাহিরের মুখ থেকে কিছু কথা শুনতে চাচ্ছিল। কিন্তু এক সিপাহী তাহিরের উপর উদ্যত তলোয়ার রেখে বলল ঃ লোকের সামনে বক্তৃতা করবার কোন অধিকার নেই তোমার। পিছন থেকে একটি লোক সিপাহীর হাত ধরে ফেললেন। সিপাহী পিছনে ফিরে দেখল ঃ তৈমুর মালিক দাঁড়িয়ে আছেন। সিপাহীরা আদব ও সম্ভ্রম সহকারে হাকীমে আলার দিকে তাকাল।

মুহূর্তকাল পরে জনতার আওয়াজ আবার উঁচু হতে লাগল। তৈমুর মালিক এগিয়ে গিয়ে হাত তুলে বললেন ঃ মহিমান্বিত সুলতানের হুকুমে কাল এই লোকটিকে তোমাদেরই সামনে ফাঁসি দিয়ে মারা হবে। লোকটি মাত্র একদিনের অতিথি। তোমাদের তরফ থেকে সে এর চাইতে ভাল ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে না?

তৈমুর মালিক পাহারাদারদের তাঁর পেছনে আসবার ইশারা করে সিঁড়ি থেকে নীচে নামলেন। জনতা এদিক ওদিক সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল। সিপাহীরা তাহিরের আশে পাশে দল বেঁধে তাঁর সাথে সাথে চলল। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে তৈমুর মালিক জনতার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। সীমান্ত পারে তাতারী সেনাদল দেখা দিয়েছে। আমার ভয় হয়, দক্ষিণ্যের আর সব শহরের মত তারা কোকন্দের উপরও আচানক হামলা করে বসবে। এখনও ধ্বনি তুলবার সময় নয়, তলোয়ার শানিত করবার সময়। তোমরা আমার দু'জন সিপাহীকে যখম করেছ। তোমরা জান, আমার সিপাহী বড় বেশী নেই। তোমরা যদি এখনও ওয়াদা কর যে, রাস্তার সিপাহীদের বিরক্ত করবে না, তাহলে আমি ফিরে গিয়ে আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজের দিকে মনোযোগ দিতে পারি। নইলে এর সাথে আমার কয়েদখানা পর্যন্ত যেতে হবে।

এক নওজোয়ান জোর গলায় বলল ঃ ভাইরা! একি নির্বুদ্ধিতা! এমনি এক নাজুক মুহূর্তে আমরা আমাদের প্রিয় হাকীমের সময় নষ্ট করছি। অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে, শুনে তোমরা নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হয়েছ। এখনও আর কি চাও তোমরা? চল এখান থেকে। জনতা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল। তৈমুর মালিক তাঁর মহলের দিকে ফিরে যেতে যেতে সিপাহীদের বললেন ঃ কয়েদীর যেন কোন রকম তকলীফ না হয়।

আসমান মেঘে ঢেকে আসছে। উত্তরের ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপছে তাহিরের দেহ। এক সিপাহী নিজের গায়ের চামড়ার দেহাবরণ খুলে চাপিয়ে দিলে তাহিরের কাঁধে। তাহির তার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেহবরণটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ শোকরিয়া! একদিনের মেহমানের এর প্রয়োজন নেই।

পরদিন বরফপাতের ফলে কোকন্দের বাজারের উপর ছড়িয়েছিল এক সফেদ আস্তরণ। তাহির কয়েদখানার বাইরে এক মঞ্চের উপর দন্ডায়মান। তাঁর হাত পিছন দিকে মজবুত রসি দিয়ে বাঁধা। দু'কদম আগে ঝুলছে ফাঁসির রজ্জু। আশে পাশের খোলা ময়দানে বরফপাত সত্ত্বেও অগুণতি মানুষের ভিড়।

মৃত্যুর এতটা নিকটে দাঁড়িয়েও তাহিরের মুখে এক অসাধারণ প্রশান্তি। কয়েদখানার দারোগার ইশারায় জল্লাদ গিয়ে উঠল মঞ্চের উপর। ফাঁসি রজ্জু হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাহিরকে সে কাঠের তখতের উপর দাঁড়াবার ইশারা করল। তাহির তখতের উপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালেন। দর্শকদের মধ্যে তখনও আর আগের সে উৎসাহ উদ্দীপনা নেই। জল্লাদ ফাঁসির রজ্জু তাহিরের গলায় পরিয়ে দিল। কয়েদখানার দারোগা এগিয়ে এসে বলল

ঃ এ তোমার শেষ মওকা! আমরা পূরণ করতে পারি, এমন কোন আকাঙ্ক্ষা থাকলে তুমি বলতে পার।

তাহির জবাব দিলেন ঃ এ প্রশ্নের জবাব আমি আগেও আপনাকে দিয়েছি। এরূপ অবস্থায় কোন খোদাপরস্ত লোক অপর কোন মানুষের কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। আমার যা কিছু চাওয়ার ছিল, আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছি। আমার দোয়া যদি কবুল হয়ে থাকে, তাহলে কোন মানুষের সামনে আমার ভিক্ষার হাত পাততে হবে না। আর যদি তা তাঁর হুজুরে কবুল না হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমার জন্য কিছুই করতে পারবেন না।

দারোগা লা-জওয়াবের মত হয়ে বললেন ঃ তবু যদি তুমি বাগদাদে কোন প্রিয়জনকে পয়গাম পাঠাতে চাও। তাহলে হয়ত আমরা তার বন্দোবস্ত করতে পারব।

তাহির জবাব দিলেন ঃ খোদা-রসূলের নাম নেয় যারা, তারা সবাই আমার প্রিয়জন। আমি তাদের প্রত্যেককে দিতে চাই এক জরুরি পয়গাম। আমাকে কাজে লাগানো যদি আল্লাহ মঞ্জুর করেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমায় সুযোগ দেবেন, নইলে আমার বিশ্বাস, আমার পর আর কোন শ্রেষ্ঠ মানুষকে তিনি সে মকসাদের জন্য বাছাই করে নেবেন।

ঃ সে পয়গাম কি, আমি জানতে পারি?

ঃ সে পয়গাম হচ্ছে ঃ কুফুর আজ ইসলামের বিরুদ্ধে তার পূর্ণ শক্তি সংহত করছে। মুসলমানদের কর্তব্য দীনের হেফাজতের জন্য সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো।

দারোগা বললেন ঃ এখনও আর কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র বাকী। তুমি কোন দোয়া করতে চাইলে করে নাও।

তাহির সফেদ মেঘে ঢাকা আসমানের দিকে মুখ তুললেন। রাতের বেলায় তিনি বার-বার যে দোআ করেছেন, আবার তারই পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ আমার আল্লাহ! আমি কি তোমার দীনের কোন কাজেই লাগতে পারি না? তোর পথে জিহাদ করবার জন্যই তোমার আমি নেয়া আর তলোয়ার নিয়ে খেলতে শিখেছিলাম, কিন্তু আমার ভাগ্যে কি এমনি অপমানজনক মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই? এখনও আমি সালাহউদ্দীন আইউবী রহমাতুল্লাহ আলাইহির তলোয়ারের হক আদায় করতে পারিনি। আমার মওলা! মানুষের ভুল ফয়সলা রদ করে দেয়া তোমার কুদরতের বাইরে তো নয়।

জল্লাদ নীচ থেকে তক্তা টেনে নেবার জন্য দারোগার হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। দর্শকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা ক্রোধ বা অবিশ্বাসের পরিবর্তে তাহিরের দিকে হামদরদীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

আচানক শহরের দিক থেকে এক তীব্র চিৎকার ধ্বনি শোনা গেল। কয়েকজন ঘোড়সওয়ার ছুটে এল ময়দানের দিকে। তাদের মধ্যে একজন জোর গলায় বলল ঃ তাতারী বাহিনী এসে যাচ্ছে। শহরের হেফাজতের জন্য তৈরী হও। এই ঘোষণা মুহূর্তের মধ্যে লোকগুলোকে হতভম্ব করে দিল। পর মুহূর্তেই তারা তাতারী আসছে তাতারী এল বলতে বলতে যার যার বাড়ির দিকে ছুটে চলল।

কিছুক্ষণ পর দারোগার মানসিক অস্থিরতা কেটে গেল এবং তাঁর মন কর্তব্য সচেতন হয়ে উঠল। ময়দান তখনও খালি হয়ে গেছে। মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে তিনি জল্লাদকে তখতা টানবার ইশারা করলেন। অমনি একদিক থেকে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলঃ থামো।

তৈমুর মালিকের আওয়াজ চিনতে পেরে দারোগা পিছু ফিরে তাকালেন। তৈমুর মালিক ছিলেন ঘোড়সওয়ার আর তাঁর সাথে ছিল কয়েকজন সিপাহী। মঞ্চের কাছে এসে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তাহিরের কাছে এলেন। তাঁর গর্দান থেকে ফাঁসির রজ্জু সরিয়ে ফেলে তিনি তাঁর হাতের বন্ধ কেটে দিলেন। তাহির সুধালেন ঃ তাতারী বাহিনী কতদূর?

তৈমুর মালিক জবাব দিলেন ঃ প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। শহর থেকে বেরিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় তুমি পাবে।

'কোথায় যাবার জন্য?' ঃ তাহির স্বস্তির সাথে প্রশ্ন করলেন।

ঃ বাগদাদের দিকে। তুমি বাগদাদ যেতে চেয়েছিলে না?

ঃ না, এখনও বাগদাদের চাইতে এখানেই আমার কাজ বেশী।

'বহুত আচ্ছা! তুমি আমার সাথে চল।' তৈমুর মালিক এই কথা বলে এক সিপাহীকে তার ঘোড়া আর তলোয়ার তাহিরের হাতে সোপর্দ করবার হুকুম দিলেন।

খারেজম শাহের প্রথম পরাজয়ের পর সীমান্তের আর সব শহরের মত কোকন্দের বাসিন্দাদেরও একটা অংশ পশ্চিমের শহরগুলোর দিকে হিজরত করল। সুলতান যখন তৈমুর মালিকের আবেদন যথেষ্টসংখ্যক সিপাহী পাঠাতে অস্বীকার করলেন, তখনও তিনি তাঁর বাকী সাথীদের বাস্তব বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরকে নিজ নিজ পরিবারের বাচ্চা, বুড়ো ও মহিলাদের শহরের বাইরে কোন নিরপদ স্থানে রেখে আসবার পরামর্শ দিলেন। তা সত্ত্বেও শহরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাসিন্দা শহরেই থেকে গেল। তখনও অনেকের মনে ধারণা যে, খারেজম শাহের পরাজয়ের বড় কারণ তাঁর ফৌজের কমজোরী নয়, পাহাড়ী এলাকার পথ ঘাটের সাথে অপরিচয়। তাই তাতারীরা বিজয়ী হয়েও কোকন্দের দিকে এগিয়ে আসতে চাইবে না। কিন্তু যখন তাতারীদের সীমান্ত অতিক্রম করবার খবর এসে পৌঁছল তখনও শহরবাসীদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ বিশৃংখলা। বরফের ঝড় বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা নারী ও শিশুদের সাথে নিয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগল। তৈমুর মালিকের ফৌজ ঘাঁটি পাতলো আশপাশের পাহাড়ে। তিনদিন ধরে তারা তাতারী ফৌজের অগ্রগামী দলকে ঠেকিয়ে রাখল কোকন্দের বাইরে। দিনের পর দিন বেড়ে চলল হামলাদার তাতারীদের সংখ্যা। এই তিন দিনে কয়েকবার তৈমুর মালিকের বীর যোদ্ধারা প্রাণপণ হামলা চালিয়ে তাতারীদেরকে বাধ্য করল পিছু হটতে। কিন্তু বিপুল তাতারী বাহিনীর সামনে টিকে থাকার সাধ্য তাদের ছিল না। চতুর্থ দিনে যখন তৈমুর মালিকের সাথে রয়েছে এক হাজার সিপাহী, তখনও তাঁর চর এসে খবর দিল, চেংগিস খানের পুত্র যোসী তাতারী বাহিনীর এক বড় অংশ নিয়ে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে।

এবার তৈমুর মালিকের শেষ আশ্রয়স্থল হল দরিয়ার মাঝখানে এক দ্বীপ। দ্বীপের হেফাজতের ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছিলেন কয়েক মাস আগে থেকে। কোন এক জামানায় কোকন্দের শাসক ও উঁচু তবকার লোকেরা থাকতেন এই দ্বীপে। তখনও সেখানে রয়ে গেছে এক পুরানো কেল্লা আর কতকগুলো জীর্ণ ইমারত। তৈমুর মালিকের ফৌজ আর শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা তাঁর সাথে বাঁচা-মরা কবুল করে নিয়েছে, রাতের বেলা তাদেরকে কিস্তিতে করে নামিয়ে দেয়া হল সেই দ্বীপে। কয়েকজন সওয়ারকে সাহায্যের শেষ আবেদন নিয়ে পাঠানো হল খারেজম শাহের কাছে।

দ্বীপের কাছ দিয়ে দরিয়া ছিল এত বেশী চওড়া যে, দুই কিনার থেকে হামলাদারদের তীর সেখানে পৌঁছে অতি কষ্টে। তৈমুর মালিক কয়েকমাস ধরে সেখানে জমা করেছেন রসদ সামগ্রী। যোসী দেখল যে, এ দ্বীপ খুব সহজে জয় করা যাবে না। তাই সে এ অভিযান তার এক নায়েবের উপর ন্যস্ত করল এবং অর্ধেক সিপাহী তার হাতে ছেড়ে দিল। বাকী ফৌজ নিয়ে সে নিজে চলে গেল দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে।

তাতারীরা কাছের ও দূরের জনপদগুলোর সব বাসিন্দাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল ভেড়া বকরীর মত। তারপর বুড়ো আর জোয়ান নারী-পুরুষকে তাদের নাংগা তলোয়ারের পাহারায় পাথর টেনে এনে দরিয়ায় ফেলতে বাধ্য করল। এমনি করে দরিয়ার কিনার থেকে দ্বীপের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল এক পাথুরে রাস্তা। তৈমুর মালিক দেখতে পেলেন এক আসন্ন বিপদ। তিনি কয়েকটি বড় বড় কিস্তির সাথে কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী করলেন ঘাঁটি। তারপর তাতে বসিয়ে দিলেন তাঁর সেরা তীরন্দাযদের। তারা এবার হামলা শুরু করে দিল কিনারের তাতারীদের উপর। গোড়ার দিকে তাতারীদের প্রচুর ক্ষতি হল। জানের ভয়ে যারা রাস্তা তৈয়ার পাথর টানছিল, তারা তাতারীদের কখনও কখনও কিস্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে দেখে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করতে লাগল এবং জীবন মরণের পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল দরিয়ার বুকে। কারো জান বাঁচল হামলাদারদের কিস্তির নাগাল পেয়ে, কেউবা সাঁতরে গেল দ্বীপে, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই হল দরিয়ার ঢেউ অথবা তাতারীদের তীরের শিকার।

এই মুস্কিল থেকে বাঁচবার জন্য তাতারীরা এক নতুন পন্থা উদ্ভাবন করল। তারা এবার গরম তেল ও জলন্ত গন্ধক ছুঁড়ে কিস্তিগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিতে শুরু করল। এই নতুন বিপদের মোকাবিলা করার জন্য তৈমুর মালিক কিস্তির উপর ছাদ লাগিয়ে তার উপর দিলেন মাটির আস্তরণ। ভিতরের তীরন্দাজদের দরকার মত রাখা হল ছোট ছোট ছিদ্র। কিন্তু আত্মরক্ষার এত সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও বেশুমার তাতারী ফৌজের সামনে তৈমুর মালিকের টিকে থাকা হয়ে উঠল অসম্ভব। দরিয়ার কিনার থেকে দ্বীপের দিকের রাস্তা ক্রমাগত বেড়ে চলল।

আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খারেজম শাহ তাতারীদের কাছে প্রথম পরাজয়ের পর এমন হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তৈমুর মালিকের বারংবার অনুরোধেও তিনি কোন সাহায্য পাঠালেন না। বরং দ্বীপ রক্ষার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে এসে তাঁর সাথে মিলিত হবার হুকুম দিলেন, কিন্তু তৈমুর মালিকের ব্যক্তিত্ব তাঁর সাথীদেরকে মুসিবতের মধ্যে ফেলে নিজে বাঁচবার পথ দেখতে রাজি হল না। রাস্তা শেষ পর্যন্ত দ্বীপের এত কাছে এসে গেল যে, তাতারীদের পক্ষে তৈমুর মালিকের ঘাঁটিগুলোর উপর পাথর ও আগুন ছুঁড়তে অসুবিধা থাকল না, তখনও দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়া তৈমুর মালিকের আর কোন উপায় রইল না।

এক সন্ধ্যায় তৈমুর মালিক তাঁর সাথীদের দ্বীপ ছেড়ে যাবার জন্য তৈরী হতে হুকুম দিলেন। রাতের বেলা আসমানে দেখা দিলে মেঘের ঘনঘটা। তৈমুর মালিক কিস্তির বহর সাজিয়ে সাথীদের তাতে তুলে দিয়ে বেশী দূরে না যেতেই শুরু হল বর্ষণ। বৃষ্টিপাতের ফলে রাতের অন্ধকার যখন ক্রমাগত বেড়ে চলল, তখনও তৈমুর মালিক অন্ধকারকে তাঁদের পলায়নের অনুকূল মনে করলেন। কিন্তু বর্ষণের সাথে দেখা যেতে লাগল বিজলী চমক।

এবার তার মনে জাগল আশঙ্কা। কিনারে চৌকি থেকে তাতারীরা খবর পেয়ে গেলে তাদেরকে এক শোচনীয় ধ্বংসের মোকাবিলা করতে হবে। অর্ধরাতের পর তিনি বুঝলেন, তাঁর আশঙ্কা অমূলক নয়। বিজলী চমকের আলোয় উত্তর কিনারে দেখা গেল তাতারী সওয়ারের দল কিছুদূর গিয়ে তাদের একই পথে দেখা গেল পদাতিক সৈন্যদের একটি বড় দল। তৈমুর মালিকের কিশ্‌তিতে ছিলেন তাঁর ফৌজের বাছা বাছা কয়েকজন অফিসার। তিনি তাদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। সবাই একমত হয়ে জানালেন যে, ঘন বনের দিকে গিয়ে কিশ্‌তি কিনারে ভিড়ানো হোক। অন্ধকারে যদি তাতারী ফৌজের সাথে মোকাবিলা হয়েও যায়, তাহলে কতক লোক অন্ততঃ পালিয়ে বাঁচবার মওকা পাবে। তৈমুর মালিক তাদের রায় মেনে নিয়ে বললেন ঃ তাহির এখনও চুপচাপ। তাঁর মতও আমি শুনতে চাই।

কিস্তির এক প্রান্ত থেকে জবাব এল আমার মতে আমাদের সামনে রয়েছে দুটি পথ। প্রথমতঃ কিনারের কোন জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যাব। জঙ্গল হোক আর ময়দান হোক, তামাম এলাকায় ছড়িয়ে আছে তাতারী ফৌজ। আমাদের জন্য পালাবার পথ খুব কমই রয়েছে। এ অবস্থায় এক একটি জানের বদলে দুটি না হলে অন্ততঃ একটি জানও তো আমরা নিতে পারব। যদি কোন এক জায়গায় দরিয়ার কিনারে নেমে পালাতে গিয়ে দুশমনদের তীরের শিকার হতেই হয়, তাহলে সে তীর পিঠের উপর না নিয়ে বুক পেতে নেয়াই তো ভাল। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে ঃ এক ক্রোশ পর পর একটি করে কিস্তি পিছনে ছেড়ে দেয়া হবে। বাকী কিস্তিগুলো আগে চলতে থাকবে। তখনও পিছনের কিস্তির লোক কিনারে নেমে যাবে এবং খালি কিস্তিটা পানির স্রোতে ছেড়ে দেবে। তাতারীরা নিশ্চয়ই বহরের সাথে সাথে চলতে থাকবে। পিছিয়ে পড়া কিস্তির আরওহীদের এমনি করে জান বাঁচবার মওকা মিলবে। যে সব তাতারী ফৌজ আমাদের পিছু ধাওয়া করবে, তাদের মনে ভুল ধারণা জন্মাবার জন্য আমারা বহর থেকে বিজলীর আলোয় তীর ছুঁড়তে থাকবো। এমনি ক'রে ভোর হবার আগেই আমাদের এদিক ওদিক পালিয়ে যাবার সময় মিলবে। শেষের দিকে কতক লোক হয়ত সময় পাবে না তাদের কিশ্‌তি কিনারে ভিড়াবার। তাদের খুব ভাল সাঁতার জানা লোক হওয়ার প্রয়োজন হবে।'

তাহিরের দ্বিতীয় প্রস্তাবের সাথে সবাই একমত হলেন। কিন্তু তৈমুর মালিক আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, খালি কিশ্‌তি যখন আবার দরিয়ার মাঝখানে ঠেলে দেওয়া হবে, তখনও তার বহরের সাথে সাথে সোজা হয়ে চলা সম্ভব নয়। অথচ বহরের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য খালি কিশ্‌তিও বহরের শামিল করে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে খালি কিশ্‌তি কিনার থেকে দূরে থেকে যায়। কিন্তু কিশ্‌তি খালি হল দু'টি দিক সামলানো মুশকিল।

খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর স্থির হল, প্রত্যেক কিশ্‌তিতে এমন একজন রেযাকার থাকবে যে খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে। সে আরওহীদেরকে কিনারে তুলে দিয়ে খালি কিশ্‌তি নিয়ে আসবে।

বৃষ্টিপাত তখনও থেমে গেছে। মেঘের কালো চাদর কোথাও কোথাও ফেটে গেছে আর তার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে সিতারার দীপ্তি। বনের কাছে এসে প্রথম কিশ্‌তি পিছনে ছেড়ে দেওয়া হল। খানিকক্ষণ পর যখন কিশ্‌তি খানির আরওহীদের কিনারে তুলে দিয়ে বহরের সাথে এসে মিললো এবং কিশ্‌তির সংগী রেযাকার তার সাথীদের জান বেঁচে গেছে বলে আশ্বাস দিল, তখনও পিছনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় কিস্তি।

রাত্রির শেষ প্রহরে বহরের কিশতিগুলোতে সওয়ার ছিল মাত্র ত্রিশজন রেযাকার। বাকী আরওহীরা ততক্ষণে কিনারে নেমে গেছে। অনুসরণকারী তাতারী সওয়ারদের ঘোড়ার পদধ্বনি তখনও রীতিমত শোনা যাচ্ছে। তৈমুর মালিক রেযাকারদের কিছুটা দূরে একে একে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনারে পৌঁছবার হুকুম দিলেন। তামাম কিশ্‌তি খালি হয়ে গেলে তৈমুর মালিক তাঁর নিজের কিশ্‌তির সর্বশেষ সাথীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন ঃ 'তাহির! এখনও আর সময় নষ্ট কর না। কিশ্‌তিগুলো এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। কোন কিশ্‌তি কিনারে গিয়ে লাগলেই তাতারীরা ব্যাপার বুঝে ফেলবে। এবার জলদী কর। সাঁতার না জানলে একটা কিশ্‌তি কিনারে ভিড়িয়ে নাও।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ সাঁতার কাটতে আমি জানি, কিন্তু আপনি?'

তৈমুর মালিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন ঃ 'আমায় ডুবন্ত জাহাজের মাল্লার শেষ কর্তব্য সম্পাদন করতে দাও। তোমরা সবাই কিনারে পৌঁছে গেলে তখনও আমিও নিজের জান বাঁচাবার চেষ্টা করব।'

তাহিরকে ইতস্তত ঃ করতে দেখে তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'হুকুমের খেলাফ কাজ করাটা আমি পছন্দ করি না। জলদী কর।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'আমি আপনার হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করব না, কিন্তু আমার একটা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।'

তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'কোন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার যোগ্যতা এখনও আমার নেই। তুমি কি বলতে চাও, বল। সময় নষ্ট কর না। ভোর হয়ে এল বলে।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনি ওয়াদা করুন, যদি জিন্দেগীতে কোনদিন আপনার কাছে আমার কোন আবেদন করবার মওকা আসে, আপনি তা উপেক্ষা করবেন না।'

তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'তুমি নিজেকে এমনি ওয়াদা পাবার হকদার প্রমাণিত করেছো। আমি তোমার একটির বদলে দুটি আবেদন কবুল করবার ওয়াদা করছি।'

তাহির 'খোদা হাফিজ' বলে আস্তে পানিতে নেমে গিয়ে কিনারের দিকে সাঁতরে যেতে লাগলেন। সারারাত ঠাণ্ডা ও অস্বস্তি ভোগ করে তাঁর দেহ তখনও জমে আসছে যেন। দারিয়ার পানি অসহনীয় ঠাণ্ডা। কোন রকম কষ্ট করে তিনি যখন কিনারের কাছে পৌঁছলেন, তখনও তাঁর সামনে এল আর এক মুসিবত। কয়েকজন সওয়ার কিনারের রাস্তা অতিক্রম ক'রে চলে যাচ্ছে। তারা চলে গেলে তিনি কিনারে উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এবার দেখা গেল পদাতিক সিপাহীদের কয়েকটি দল। তাহিরের দেহ তখনও সম্পূর্ণ নিঃসাড় হ'য়ে এসেছে। তারাও চলে গেলে আবার কিছুদূরে শোনা গেল ঘোড়ার পদধ্বনি। তাহিরের সহ্য করবার সীমা অতিক্রান্ত হ'য়ে গেছে। তিনি জলদী করে পানি থেকে উঠে এলেন এবং এক বৃক্ষকাণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। দরিয়ার কিনারের ঘন জংগল আর গাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তাতারী সিপাহীরা একে একে বিচ্ছিন্ন ও অসংহতভাবে এগিয়ে যেতে লাগল।

তাহির কিছুটা চিন্তা ক'রে তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন। পনেরো বিশজন সওয়ার চ'লে যাওয়ার পর একদিকে ঘন গাছগাছড়ার ভিতর দিয়ে একটি ঘোড়ার পদধ্বনি শোনা গেল। গাছের শাখাগুলো এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে তিনি নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন। সওয়ার তার সাথীদেরকে আওয়াজ দিচ্ছে। জবাবে তারা তাকে অনুসরণ করবার নির্দেশ

দিচ্ছে। তাহির অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করলেন এবং সওয়ারের গন্তব্য পথের দিকে এগিয়ে এক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে তাহিরের এক হাত গিয়ে ঠেকলো ঘোড়ার লাগামে এবং অপর হাতের তলোয়ারের এক আঘাতে সওয়ার ভূমিশায়ী হল। তাহির তখনি নীচে নেমে মরণোন্মুখ তাতারীর টুপি ও পুস্তিন খুলে নিয়ে নিজের গায়ে লাগালেন। তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে দরিয়ার কিনার ধরে চলতে থাকলেন।

ভোরের আলো দেখা দিতে তখনও কিছুটা বাকী। তৈমুর মালিক কিশ্‌তি ছেড়ে পানির ভিতর দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে দরিয়ার কিনারে পৌঁছালেন। গাছের আড়ালে থেকে তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন ঃ 'তৈমুর!'

তিনি চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন এবং তলোয়ার কোষমুক্ত ক'রে বিপদের মোকাবিলা করবার জন্য তৈরী হলেন।

গাছের আড়াল থেকে আবার আওয়াজ এল ঃ 'ঘাবড়াবেন না। আমি তাহির।'

তৈমুর দ্রুত পায়ে গাছের কাছে পৌঁছলেন। তাহির ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তৈমুর মালিক বল্‌লেনঃ 'ঘোড়া হাসিল করেও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো?'

তাহির স্বস্তির সাথে জওয়াব দিলেন ঃ 'এ ঘোড়া আপনার জন্য। আপনি জলদী করুন।'

তৈমুর জবাব দিলেনঃ 'আমি নিজের ভাগ্য-বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবার জন্য অপরের হাতে লাঠি ছিনিয়ে নিতে চাই না।'

তাহির বললেনঃ 'আপনি আমার আবেদন-মঞ্জুর করবার ওয়াদা করেছেন। এই আমার প্রথম আবেদন।'

তৈমুর মালিক লা-জবাবের মত হ'য়ে বল্‌লেন ঃ 'এখানে কথা কাটাকাটি করা ঠিক নয় এস আমার সাথে।'

তাহির নিজের হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে তৈমুরের সাথে সাথে চল্‌লেন। কিনার থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে গিয়ে তৈমুর থেমে বললেন ঃ 'আমার কাছ থেকে ওয়াদা নেবার বেলায় তোমার মনে এই মতলব ছিল?'

ঃ 'জি হ্যাঁ!'

ঃ 'তোমার বিশ্বাস ছিল যে, তুমি ঘোড়া পেয়ে যাবে আর তা আমায় দেবে?'

ঃ 'তাই ছিল আমার ইরাদা। আল্লাহর শোকর, তা পুরা হয়েছে।'

তৈমুর মালিক তাহিরের কাছ থেকে ঘোড়ার লাগাম নিজের হাতে নিলেন এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বললেন ঃ 'তুমি আমার পিছে বস।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'এমনি করে আমরা দু'জনই পিছনে পড়ে থাকব।'

তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র উপর এমনি করে ভরসা করে যেসব মানুষ, তাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। সম্ভবতঃ তোমার কারণে আমিও বেঁচে যাব। জলদী কর।

তাতারীদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হয়ত তারা এতক্ষণে খালি কিশ্‌তি দেখে ফেলেছে।'

তাহির লাফ দিয়ে তৈমুরের পিছনে বসে গেলেন। প্রায় দু'ক্রোশ জংগল পার হয়ে শুরু হয়ে গেছে পাহাড়ের সারি। তাহির ঘোড়ার ক্লান্তি অনুভব করে কয়েকবার নেমে পড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু তৈমুর মালিক তাঁর কথায় কান দিলেন না।

সূর্যের প্রথম রশ্মি দেখা দেওয়ার সাথে সাথে এক সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে করতে তাহির পিছন দিকে ফিরে দেখলেন, তাতারী সওয়ারদের একটি দল দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

তাহির বললেন ঃ 'ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমায় নামিয়ে দিন। আমি এ পথের উপর আর দেরী করতে পারছি না। আপনার বেঁচে যাবার মওকা মিলবে।

তৈমুর মালিক ঘোড়া না থামিয়েই প্রশ্ন করলেন ঃ 'ওরা ক'জন?'

ঃ 'সাতজন।'

ঃ 'তাহলে আমিও তোমার সাথে নামছি।'

ঃ 'কিন্তু ওদের পিছনে এক লশকর নেই, একথা কে বলবে?'

ঃ 'এই কারণেই আমি তোমায় একা ছেড়ে যেতে পারছি না।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনি আমার দুটি আবেদন মঞ্জুর করবার ওয়াদা করেছেন। আমার দ্বিতীয় আবেদন ঃ আপনি আমায় নামিয়ে দিন।'

ঃ কিন্তু আমার জন্য তোমার এ ত্যাগের কারণ আমি জানতে পারি?'

তাহির বললেন ঃ 'খারেযম হচ্ছে তাতারী সয়লাবের পথে শেষ পাহাড়া আর এ পাহাড়ের হেফাযতের জন্য আপনার মত লোকের প্রয়োজন। আমি আপনার উপকার করছি না, আলমে ইসলামের একটি খেদমত করতে চাই। বুজদীল মন্ত্রণাদাতা খারেযম শাহকে নিষ্কর্মা করে দিয়েছে। আপনি তাঁর ভিতরে জীবন স্পন্দন এনে দিতে পারবেন।'

তৈমুর মালিক জবাব দিলেন ঃ 'আমি এক সিপাহী মাত্র। তলোয়ার দিয়ে আমি কাটতে জানি। কওমের ভিতরে জীবন সঞ্চার করা তোমারই মত লোকের কাজ। তুমি যাও, আমি ঘোড়া থেকে নেমে ওদের পথ রোধ করছি।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনার ওয়াদা ভুলে যাবেন না। আমার ভরসা রয়েছে আল্লার উপর। আবার আমাদের দেখা হবে।' বলে তাহির চলতি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তৈমুর ঘোড়া থামিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমার তূণীরে ক'টা তীর আছে?'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'পাঁচটি?'

তৈমুর মালিক তাঁর তূণীর খুলে তাহিরের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন 'ছ'সাতটি তীর এর ভিতরেও রয়েছে। হায়! খারেযমের ফৌজে তোমার মত পাঁচশ সিপাহী যদি থাকত!'

তৈমুর মালিক আবার দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটালেন। তাহির সেই সংকীর্ণ পথের মোড়ের কাছে পাহাড়ের উপর কয়েক গজ উঠে এক পাথরের আড়ালে বসে পড়লেন।

প্রথম সওয়ার যখন পথের মোড় ছাড়িয়ে কয়েক গজ দূরে চলে গেছে, তখনও তাহির তীর চালিয়ে দিলেন এবং খানিক দূর গিয়ে সে ঘোড়ার নাংগা পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় সওয়ার পথের মোড় ছাড়িয়ে তাহিরের তীরের নাগালের ভিতরে এসে গেছে। তাহিরের দ্বিতীয় তীরটিও ঠিক নিশানায় লেগে গেল। এরপর একই সঙ্গে তিনজন সওয়ার বেরিয়ে এল। তাহির একজনকে তীরের ঘায়ে ফেলে দিলে বাকী দু'জন ঘোড়া থামিয়ে পিছনে ফিরবার চেষ্টা করল, কিন্তু উপর থেকে একে একে দু'টি তীর এসে লাগল। এক তাতারী জখম হয়ে পড়ে গেল এবং অপরটি ঘোড়ার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে জান

বাঁচালো। সে জোর আওয়াজ করে পিছনের সাথীদেরকে হুঁশিয়ার করে দিল। তাহির আর একটি তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাতারী লাফিয়ে এক পাথরের আড়ালে বসে পড়ল। তখনও উঁচু গলায় চীৎকার করে পিছনের সাথীদেরকে ডাকছে।

তাহির তাঁর ঘাটি ছেড়ে দিয়ে পাথরের আড়াল নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে পথের মোড়ের অপর দিকে গিয়ে পৌছলেন। নীচে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ গজ দূরে দ'জন সওয়ার ঘোড়া থামিয়ে মোড়ের অপর প্রান্তের সাথীর কথার জবাব দিচ্ছে। তাহির এক পাথরের আড়ালে বসে পড়লেন।

উভয় সওয়ার পরস্পর তাতারী জবানে কি যেন বলে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। তারা ঘোড়া দু'টিকে এক ঝোপের সাথে বেঁধে পাথরের আড়ালে আড়ালে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। কয়েক কদম উপরে উঠার পর দু'জন পাহাড়ের এক ঢালু জায়গায় পৌছে গেল সেখানে লুকোবার কোন জায়গা নেই। তাহিরের ধনুক থেকে একে একে দু'টি তীর ছুটলো এবং দু'জনই গড়াতে গড়াতে কয়েক গজ নীচে চলে গেল। তাহির পাথরের আড়াল থেকে মাথা বের করে নীচের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সামনে তাঁর নজরে পড়ল একটি চলন্ত ছায়া। ফিরে তাকিয়ে তিনি সারা দেহে এক কম্পন অনুভব করলেন। ডানদিকে চার পাঁচ-কদম দূরে এক তাতারী হাতে তলোয়ার নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করেছে।

তাহির দ্রুত ধনুক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাত তখনও তলোয়ারের হাতলের উপর চলে গেছে। কিন্তু তাতারী আগেই তার উপর হামলা করে বসলো। তাহির চট্ করে একদিকে সরে গেলেন এবং তাতারীর তলোয়ার তাঁর গা ঘেঁষে গিয়ে লাগল পাথরের গায়ে। তাতারী দ্বিতীয়বার আঘাত দেবার আগেই তাহির একদিকে লাফ দিয়ে তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন।

কয়েক বার দু'জনের তলোয়ার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ হল। তাতারী তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপজ্জনক মনে করে পিছু হটতে লাগল। কয়েকবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লড়বার চেষ্টা করেও সে টিকে থাকতে পারলো না। পাহাড়ের শেষ প্রান্তে পৌছে তাহিরের তলোয়ার তার মাথায় লাগল। অমনি সে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচের এক গহ্বরের ভিতরে।

তাহির মুহূর্ত বিলম্ব না করে পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেলেন এবং ঝোপের সাথে বাঁধা ঘোড়ার একটিতে সওয়ার হলেন। তিনি মোড় অতিক্রম করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর তীরের ঘায়ে যখম হওয়া এক মরণোন্মুখ তাতারী পাথরে মাথা ঠুকছে। তাহির ঘোড়া থেকে নেমে তার তূনীর থেকে তীর বের করে নিজের তূণীর ভরে নিলেন এবং আবার গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হলেন।

তাহির দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে কত পাহাড় অতিক্রম করে গেলেন। কোথাও কোথাও দুর্গম পাহাড়ী পথে তাঁর ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিতে হয়। পথঘাট তাঁর কিছুই জানা নেই। পাহাড়ী নদীগুলোতে পানির কমতি নেই। কিন্তু তিনি তখনও ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। সারা রাত্রির ঠাণ্ডা তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিঃসাড় করে দিয়েছে। ভোরের রৌদ্র সত্ত্বেও ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে অসহনীয়। পথের মধ্যে পড়ল এমন কতকগুলো বস্তি, যেখানকার দগ্ধ গৃহ, নারী-পুরুষ ও শিশুদের ছিন্ন ভিন্ন দেহ তাতারী বর্বরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

দুপুর বেলায় তাহির এক বিস্তীর্ণ ময়দানের উপর দিয়ে যাচ্ছেন। আসমানে ছেয়ে যাচ্ছে মেঘে মেঘে। ঠাণ্ডা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তৃতীয় প্রহরে বরফপাত হতে লাগল। তাহিরের

ঘোড়া আর পেরে উঠছে না, গর্দান ঢিলে করে দিয়ে সে আস্তে আস্তে পা ফেলছে। বরফের তুফানের ভিতর দিয়ে তাহির কোথাও কোন্ দিকে চলেছেন, জানেন না। তবু না থেমে চলাই তিনি ভাল মনে করছেন।

আসরের ওয়াক্ত হলে ঘোড়াটি বরফের উপর পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

তাহির সকল মুশ্‌কিল উপেক্ষা করে প্রায় দু'ক্রোশ রাস্তা পায়ে হেঁটে গেলেন। তাঁর ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করে গেছে। বরফের ঝড় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তার উপর নেমে আসছে রাত্রি। তাহিরের মস্তিষ্ক ঝিমিয়ে আসছে। তাঁর মন চাচ্ছে বরফের উপর শুয়ে পড়ে ঘুমোতে, কিন্তু তিনি জানেন, সে ঘুম হবে তাঁর শেষ ঘুম। দীল মযবুত ক'রে তিনি জোর কদমে চলতে লাগলেন। কিন্তু কয়েক কদম চলবার পর যেন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে আসতে লাগল। তিনি নিঃসাড় হ'য়ে বরফের উপর বসে পড়লেন। কিন্তু মানুষের স্বভাবই হচ্ছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। তাহির আর একবার উঠলেন। তিনি আসমানের দিকে মুখ তুলে পূর্ণ আত্মসমর্পনের মনোভাব নিয়ে দো'য়া করলেন : 'ওগো যমিন-আসমানের মালিক! আমার যিন্দেগীর কোন মক্‌সাদ আজ পুরো হয়নি। আমার ভিতরে এগিয়ে চলবার হিম্মৎ আর নেই। আমি তোমারই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করি, তোমারই সাহায্য কামনা করি। কিন্তু আমার তক্‌দীরে যদি মৃত্যু ছাড়া আর কিছু না-ই থাকে, তা'হলে আমায় মোমেনের মনোবল দান কর।

এই দো'য়া ক'রে তাহির নিজেকে মনে করলেন জীবনের ভারমুক্ত। বসতে বসতে হঠাৎ এক আওয়াজ তাঁর কানে এসে তার স্নায়ুর জমাট রক্ত গরম ক'রে দিয়ে গেল। সে ছিল একটি ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি। তাহির এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। প্রায় পঞ্চাশ কদম দূরে এক ঘোড়া কান খাড়া ক'রে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

তাহির ছুটে গিয়ে ঘোড়ার কাছে পৌঁছলেন। ঘোড়াটি দু'এক কদম এগিয়ে এসে তাঁর বুকের সাথে মুখ ঘসতে লাগল। তার পিঠের উপর বরফ-ঢাকা দিয়ে জিন দেখে তাহির বুঝলেন, ঘোড়াটি ছিল এক মুসলিম মুজাহিদের সঙ্গী।

তাহির জিন থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলে তার উপর সওয়ার হলেন। ঘোড়াটিকে তিনি তার মর্জির উপর ছেড়ে দিলেন। ঘোড়াটি কয়েক কদম আগে চলবার পরই আবার এসে নিজের জায়গায় দাঁড়ালো। বরফের মধ্যে একটা উঁচু-হ'য়ে ওঠা জায়গায় সে পা মারতে লাগল। তাহির দ্রুত নেমে এসে দু'পাশে বরফ সরিয়ে দেখলেন একটি মানুষের লাশ। তার পায়ে তখনও দু'টি তীর বিদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। তাহির 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন' বলে লাশটি আবার বরফ ঢাকা দিলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠের উপর চাপড় মেরে আবার সওয়ার হলেন ঘোড়ার পিঠে।

এক নতুন জীবনের উম্মিদ তাহিরের দেহে সঞ্চার করল নতুন উত্তাপ। কিছুদূর গিয়ে তিনি ঘোড়ার যিনের সাথে বাঁধা থলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন গোশ্‌ত ও পনিরের কয়েকটা টুক্‌রা।

পেট পুরে খেয়ে তাহিরের দেহে খানিকটা বল সঞ্চার হল। ঘোড়া তার মর্জির মত চলতে থাকল। তাহির তার গতি বদল করবার বা তাকে থামাবার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না।

## দশ

সন্ধ্যার ম্লান আলোতে তাহির এক বিরান বস্তিতে প্রবেশ করলেন। ধ্বংসাবশিষ্ট বাড়িঘর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ বস্তির উপর দিয়েও ব'য়ে গেছে তাতারী সয়লাবের প্রবল বেগ। ঘোড়ার গতি দেখে মনে হয়, আশেপাশের কোন বাড়ি তার গন্তব্য নয়। কোন বাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে একটুখানি আলোর রেখা আসে কিনা, তারই সন্ধান ক'রে চলেছে তাহিরের চোখ। বেশীরভাগ বাড়ির দরজা পড়ে রয়েছে খোলা। তার সামনে শুধু দেখা যায় বরফ স্তূপ। মনে হয় কোন লোক নেই তার ভিতরে।

একটি বাড়ির বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে তাহির তলোয়ারের অগ্রভাগ দিয়ে দরজাটা ঠেলে দিলেন ভিতর দিকে। অমনি দরজাটা খুঁ'লে গেল' কিন্তু ভেতর থেকে গলিত লাশের অসহনীয় বদবু এসে তাঁর পথ রোধ করল।

ঘোড়া কান খাড়া ক'রে গর্দান হেলিয়ে দিয়ে আগে যাবার ইচ্ছা জানালো। তাহির তার পিঠে চাপড় মেরে তার লাগাম শিথিল ক'রে দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'শোনো দোস্ত! আমার হিম্মৎ নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে। তোমার কোন নিরাপদ গৃহকোণ জানা থাকলে জল্‌দী চল।'

ঘোড়া যখন বস্তি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখনও তাহির শেষ বারের মত ভাবলেন ঘোড়ার বুদ্ধির উপর নির্ভর করা হয়ত সুবুদ্ধির কাজ হবে না। রাতের অন্ধকারে মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে। তাহির আর একবার ঘোড়া থামিয়ে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিলেন ঃ 'কেউ আছে, এখানে কেউ আছে?'

তাঁর আওয়াজ রাতের নির্জনতায় মি'শে যাচ্ছে। তারপর এক দিক থেকে শোনা যাচ্ছে নেকড়ের তীক্ষ্ণ চীৎকার। তাহির মনে মনে আশঙ্কা করছিলেন যে, এর কোন বাড়ির ভেতরে আবার তাতারীদের কোন দল না থাকে। কিন্তু নেকড়ের ডাক তাঁর সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করে দিল। তাঁর ঘোড়া প্রথম বার গা ঝাড়া দিয়ে হিঁ হিঁ করে ডাক ছাড়ল। তাহিরের মনে হল, যেন ঘোড়াটি বলছে ঃ 'হতাশ হচ্ছো কেন? মঞ্জিল এসে গেল।'

তাই আবার ঘোড়াটিকে তার মর্জির উপর ছেড়ে দিলেন। ঘোড়াটি বস্তি থেকে খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে ঘন জংগল অতিক্রম ক'রে এক টিলার উপর চড়তে লাগল। বরফপাত আর অন্ধকারের জন্য তাহির দু'কদম আগের জিনিষও দেখতে পাচ্ছেন না।

টিলার চূড়ার উপর এক পাঁচিলের কাছে পৌঁছে ঘোড়া মোড় ফিরলো এবং পাঁচিলের পাশ দিয়ে এক দিকে চলতে লাগলো। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে সে এক খোলা দরজা পার হয়ে হিঁ হিঁ আওয়াজ করে ভিতরে ঢু'কে গেল।

তাহিরের সামনে এক উঁচু বালাখানা। যে ইচ্ছাশক্তি তাকে সেখানে টেনে এনেছে, তা'ও যেন নিঃশেষ হয়ে এসেছে। জলন্ত আগুনের কুন্ডের পাশে শুয়ে পড়ার চাইতে বড় কোন কাম্য তাঁর নেই।

বাড়িটির দেউড়ির দরজা খোলা, কিন্তু ভিতরে আলোর নাম নিশানা নেই। ঘোড়া দেউড়িতে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেল। তাহির ঘোড়া থেকে নামলেন। তাঁর পা দুটো অসাড় হ'য়ে গেছে। দেহের বোঝা বইতে পাড়ছে না পা দু'টা। তিনি ভাবেন ঃ হয়ত এ বাড়িতেও কেউ

নেই। ঘোড়াটি হয়ত তাঁর শেষ মঞ্জিলের জন্য বস্তির ভাঙা বাড়িগুলোর মধ্যে সব চাইতে ভাল বাড়িটি বাছাই করে নিয়েছে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি চিৎকার ক'রে উঠলেন ঃ 'কোই হ্যায়? কোই হ্যায়?'কিন্তু তাঁর আওয়াজ পাথরের পাঁচিলে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে। ঘোড়াটিকে তিনি ছেড়ে দিলেন। তারপর দু'হাত প্রসারিত ক'রে পাঁচিল ধরে ধরে যথারীতি চীৎকার করতে করতে এগিয়ে গেলেন। দেউড়ি পার হয়ে তিনি এক কামরার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর সেই কামরার দেওয়াল ধরে তিনি আর এক কামরায় পৌঁছলেন, কিন্তু কোনদিক দিয়ে কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি বালুর উপর আশার প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন। এখানে কোন লোক থাকলে দরজাগুলো সব খোলা থাকত না। তখনও আগুনের একটি ফুলকী তাঁর জান বাঁচাতে পারে। কিন্তু আগুন জ্বালবার মত কিছু তো তাঁর কাছে নেই। আচানক তিনি পায়ের নীচে নরম একটা কিছু অনুভব করলেন। নীচু হয়ে হাত দিয়ে দেখলেন একটা পুস্তিন। তিনি মেঝের উপর বসে পুস্তিন গায়ে লাগিয়ে নিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝলেন, ওদিয়ে তাঁর দেহের হারানো তাপ ফিরে আসবে না। খানিকক্ষণ আগে ঘোড়াটিকেই তিনি মনে করেছিলেন বিপদের সহায়। এখনও তাঁর বিবেক সায় দিচ্ছে না যে, আল্লাহতা'আলা তাঁকে একাকীই ফেলে রাখবেন। তাঁর বিশ্বাস, আল্লাহ তাকে তাঁর রহমতের বলেই এখানে নিয়ে এসেছেন। এক অতি বড় মকসাদের জন্য তিনি দো'য়া করেছিলেন আল্লাহর দরবারে। এখানে তো সে মকসাদ পুরা হবে না। এ বাড়ি তাঁর শেষ মঞ্জিল হতে পারে না। আল্লাহ শুধু তাঁকে পরীক্ষা করছেন। মোমেন কখনও হতাশ হতে পারে না। এ অন্ধকার রাত্রি কেটে যাবে। প্রভাত সূর্যের কিরণ তাকে এনে দেবে নতুন জিন্দেগীর পয়গাম। এও তো হতে পারে যে, এই বাড়িরই এক কোণে কোন আল্লাহর বান্দা আগুন জ্বালিয়ে বসে প্রতীক্ষা করছে তাঁরই। এমনি মানসিক সংঘাতে ভিতর দিয়ে তাঁর মনে পড়ল নামাযের কথা। তিনি তখখুনি তায়াম্মুম করে দেহের অবশিষ্ট শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন নামাযের জন্য।

নামাযের নিয়ত করতে গিয়েই তিনি ভাবলেন ঃ হয়ত এই বাড়িরই কোন কোণে কেউ তাতারীদের ভয়ে লুকিয়ে রয়েছে। তিনি উঁচু গলায় আযান দিলেন। তারপর মুহূর্তকাল প্রতীক্ষার পর হতাশ হয়ে নামাযের নিয়ত করলেন।

নামাযে মশগুল হবার পর তাঁর দৈহিক ক্লেশ ধীরে ধীরে কমতে লাগল। নামায খতম করে দো'আ করতে গিয়ে হঠাৎ আলোর ক্ষীণ রশ্মি দেখে তাঁর দীল ধকধক করে কেঁপে উঠল। তখুনি তিনি পিছু ফিরে তাকালেন।

●

আট বছরের এক বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে মশাল হাতে। তার সাথে নাংগা তলোয়ার হাতে এক নওজোয়ান। নওজোয়ানের মুখে এক অসামান্য দীপ্তি। লেবাস দেখে তাঁকে মনে হয় যেন এক তুর্কী সিপাহী। তাহির সারা জিন্দেগীতে কোন মানুষের এমন মুগ্ধকর রূপ তো আর দেখেননি। মুহূর্তের জন্য তিনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ছোট্ট বাচ্চা আর নওজোয়ানের চেহারায় রয়েছে যথেষ্ট সাদৃশ্য।'

তাহিরের মনে হ'ল যেন আল্লাহ তাঁকে পথ দেখাবার জন্য আসমান থেকে পাঠিয়েছেন দু'টি ফেরেশতা। দু'জনেই পেরেশান হয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন। তাহির বললেন 'আস্‌সালামু আলাইকুম।' ছোট্ট বাচ্চা আর নওজোয়ান একই সঙ্গে সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু বালকের চাইতে নওজোয়ানের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে বেশী সময় বাজতে লাগল।

নওজোয়ান আরবী যবানে বললেন ঃ 'আমি যদি ভুল না করে থাকি, তা'হলে আপনি একজন আরব।'

তাহির হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কি করে চিনলেন আপনি?'

ঃ 'আপনার আওয়াজ শুনে। আপনার কণ্ঠস্বর বিলকুল আরবী।'

তাহির বললেন ঃ 'আর আমিও যদি ভুল না করে থাকি, তাহ'লে আপনার কণ্ঠস্বরও আরবদের থেকে খুব আলাদা নয়।'

নওজোয়ানের মুখে এক হাল্‌কা উদাস হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন ঃ 'আমার মা ছিলেন আরবী। কিন্তু এখনও এসব কথার সময় নয়। আপনি বরফের ঝড় পাড় হয়ে এসেছেন। আসুন আমাদের সাথে।'

নওজোয়ানের কণ্ঠস্বরে ছিল সংগীতের মাধুরী। সে সংগীত মাধুরী 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে' পশে যায়।'

তাহির উঠে তাদের সাথে চলবার জন্য তৈরী হলেন। নওজোয়ান দু'তিন কদম চলবার পর থেমে প্রশ্ন করলেন ঃ কিন্তু এ রাতের বেলায় এখানে এলেন কি করে?'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'এখান থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে আমি বরফের উপর পড়ে থাকা এক মুসলমান সিপাহীর ঘোড়া পেয়েছিলাম। সেই ঘোড়াটিই আমায় এখানে পৌঁছে দিয়েছে।'

নওজোয়ানের মুখে শোক ও আফসোসের চিহ্ন ফুঠে উঠল। তিনি বললেন ঃ 'আপনি ভাল করে দেখেছেন, সে সিপাহী জখমী ছিল না বরফের ঝড়ের মুখে মারা গিয়েছে?'

ঃ 'সে জখমী ছিল। সে আপনার কোন আপনার জন হলে আমার আফসোস হচ্ছে।'

নওজোয়ান বললেন ঃ 'সে আমার পুরানো খাদেম ছিল। আমি আজ তাকে এক জরুরি পয়গাম নিয়ে সমরকন্দ রওয়ানা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার ঠোঁট যে নীল হয়ে যাচ্ছে। আসুন আমাদের সাথে। এ জায়গাটা নিরাপদ নয়।'

ছোট্ট বালকটি বাতি ধরে আগে আগে চল্‌ল। দুটি কামরা পার হয়ে তাঁরা এক সংকীর্ণ কুঠরীতে ঢুকলেন। নওজোয়ান কুঠরীর এক কোণে পাথরের মেঝের উপর থেকে এক খন্ড পাথর তুললেন। পাথর খন্ডের নীচে ছিল এক সুরংগপথ। সুরংগপথ দিয়ে কাঠের সিড়ি বেয়ে একটি মাত্র লোক স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে যেতে পারে। প্রথমে বালকটি ও তারপরে তাহির সিড়ি বেয়ে যমিনের নীচের এক কামরায় প্রবেশ করলেন। অবশেষে নওজোয়ান সিড়ির উপর পা রেখে সুরংগপথের মুখ বন্ধ করে দিলেন।

জমিনের নীচের কামরাটির এক কোণে আগুন জ্বলছে। মেঝের উপর বিছানো রয়েছে এক খুবসুরত গালিচা। তার এক ধারে তিন চারটি পুস্তিনে পড়ে রয়েছে। নওজোয়ান তাহিরকে বসবার ইশারা করে বললেন ঃ 'আপনার ক্ষুধা পেয়েছে নিশ্চয়ই। আমার কাছে শুকনো গোশ্‌তের কয়েকটি টুক্‌রা ছাড়া আর কিছু নেই।'

ঃ 'আপনার নওকরের থলে থেকে অনেকখানি খাবার জিনিষ আমি পেয়েছিলাম। এখনও আমার আগুনের চাইতে বেশী প্রয়োজন নেই আর কোন জিনিষের।' এই কথা বলতে বলতে তাহির পায়ের মোজা খুলে আগুনের পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কামরাটা তখনও বেশ গরম। তাহির ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ পরেই তিনি গভীর ঘুমে অচেতন। নওজোয়ান উঠে তাঁর গায়ে পুস্তিন লাগিয়ে দিলেন।

●

এক মিষ্টি ও মুগ্ধকর আওয়াজ শুনে তাহিরের চোখ খুলল। পেরেশান হয়ে উঠে বসতে বসতে তিনি বললেন ঃ 'আমি কোথায়?' তারপর প্রদীপের আলোয় নওজোয়ানকে চিনতে পেরে জবাবের প্রতীক্ষা না করে বললেন ঃ 'ভোর হয়ে গেছে?'

নওজোয়ান জবাব দিলেন ঃ 'এখনও দুপুর হয়ে আসছে। আপনি বড় দেরী করে ঘুমিয়েছেন।

ঃ 'কিন্তু এখনও যে যথেষ্ট অন্ধকার দেখা যাচ্ছে।'

ঃ 'আপনি এই বাড়ির যমিনের নীচের কামরায় রয়েছেন। দিনের আলো এখানে এসে পৌঁছায় না।'

তাহিরের চোখে ঘুমের নেশা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। অতীত কয়েক দিনের দৈহিক ক্লান্তির প্রভাব তখনও কেটে যায়নি। কিছুটা চিন্তা করে তিনি বললেন ঃ 'রাতের বেলা আপনার কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ ঘুম ধরে গেল। আপনি বলুন, এখানে আপনি কি করছেন, আর আপনার নওকর আপনাকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছিল? আমার মতে এখানে থাকা খুবই বিপজ্জনক। আমাদের শীগগিরই এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

নওজোয়ান জবাব দিলেন ঃ 'আমিও আপনার কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তখ্‌খুনি আপনার ঘুম এসে ভালই হল। আমার ওয়ালেদ ছিলেন এই শহরের হাকীম। সুলতানের পরাজয়ের পর আশপাশের বস্তির মত আমাদের শহরেও ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক ও বিপদের ছায়া। এখানকার লোকও বাল বাচ্চা নিয়ে বলখ, বোখরা ও সমরকন্দের দিকে হিজরত করল। আমি আমার বাপের সাথে থাকবার জন্য জিদ ধরলাম, কিন্তু তিনি আমার ছোটভাই ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে আমায় এক কাফেলার সাথে বলখের পথ ধরতে বাধ্য করলেন। বলখে আমার নানা একজন মশহুর সওদাগর। কাফেলায় আমরা দু'শো লোক ছিলাম। তার মধ্যে বেশীর ভাগই নারী ও শিশু। শহর থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে গেলে আমাদের কাফেলার উপর হামলা করল তাতারী বাহিনীর একটি দল। পুরুষরা প্রাণপণে তাদের মোকাবিলা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ফল হল না। তারা সবাই একে একে মারা পড়ল। কোন কোন নারীও লড়াই করে জান দিল। বাকী মেয়েদেরকে তারা জীবিত ধরে নিয়ে গেল। আমার সামনে সব চাইতে বড় সমস্যা ছিল ইসলাইলের জান বাঁচানো। তার ভয়ার্ত চীৎকার ছিল আমার কাছে অসহনীয়। আমার ওয়ালেদ আমায় দিয়েছিলেন তাঁর আস্তাবলের শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। আমি ইসমাইলকে খচ্চর থেকে নামিয়ে নিজের পিছে বসিয়ে নিলাম। তারপর দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। ঘন জঙ্গল ও রাতের

অন্ধকারের দরুণ তাতারী আমাদের পিছু ধাওয়া করতে পারলো না। কিন্তু পালাবার সময়ে আমার বোনদের জিগর ফাটানো যে চিৎকার আমি শুনেছিলাম, তা কোনদিন ভুলবো না।'

নওজোয়ানের বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর বড় সুন্দর চোখ দুটিতে দেখা গেল অশ্রুর ঝলক। তাহির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন তাঁর দিকে। ছোট্ট বালকটি চুপচাপ এক কোণে বসে আছে। তার বিষণ্ণ মুখের উপর ফুটে উঠছে অতীত দিনের স্মৃতির বেদনা। তাহির বসে বসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বালক তাঁর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে উঠে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বুকের ভিতরে। খানিকক্ষণ সে ঠোঁট চেপে চেপে কান্না সংযত করবার চেষ্টা করল। তারপর তাহির তার মাথার উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে গেলে তার কান্নার বাঁধ ভেঙে গেল।

তাহির বললেন ঃ 'কেঁদোনা। শীগ্‌গীরই আমরা কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাব।'

বালক বলল ঃ 'রাস্তায় যদি তাতারী থাকে? ওরা নাকি বাচ্চাদেরকে খেয়ে ফেলে?'

ঃ 'না, না, তোমায় কেউ-ভুল বলে থাকবে?'

নওজোয়ান তাহিরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'এতদিন ইসমাইল আমায় সান্ত্বনা দিয়েছে। খোদা জানে, আজ ওর কি হল।'

তাহির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নওজোয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'যদি আমি ভুল না করে থাকি, তাহলে আপনি ইসমাইলের বোন, ভাই নন।'

তাহির বললেনঃ 'ঘাবড়াবেন না। আপনার ইজ্জত ও হেফাজত আমার কর্তব্যের শামিল। আপনার অতীত কাহিনী এখনও শেষ করেননি।'

বালিকা যখন দ্বিতীয়বার তাহিরের দিকে তাকালেন, তখনও তাঁর চোখে দেখা যাচ্ছে অশ্রুর ঝলক। আস্তিনে চোখ মুছে তিনি বললেনঃ 'হায়! এই বিপদ ও হতাশার জামানায় যদি আল্লাহ তা'আলা কওমের সব মেয়েকে পুরুষ বানিয়ে দিতেন। তাতারীদের কবল থেকে বেঁচে আমরা আবার ফিরে এলাম ঘরে। তৃতীয় দিন আব্বাজান খবর পেলেন, তাতারীরা শহরের উপর হামলা করবে! আব্বাজানের সাথে ছিল মাত্র চারশ' সিপাহী। কোন কোন অফিসার তাকে পরামর্শ দিলেন যে, এমনি ছোট ছোট ফৌজ নিয়ে তাতারীদের মোকাবিলা করা হবে আত্মহত্যার শামিল। কিন্তু আব্বা ছিলেন আত্ম মর্যাদার অধিকারী বীরপুরুষ। তিনি শহর ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করলেন না। চরের মারফতে আব্বাজান খবর পেয়েছিলেন যে, এই শহরে হামলাকারী তাতারীদের সংখ্যা খুব বেশী হবে না। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি কয়েকদিন তাদেরকে শহরের বাইরে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন, আর এরই মধ্যে বলখ অথবা সমরকন্দ থেকে অবশ্যি সাহায্য এসে পৌঁছবে, কিন্তু কোকন্দের যেসব গুজব শোনা যাচ্ছিল, তাতে শহরের বাসিন্দারা খুবই নিরাশ হয়ে পড়ল। কোন কোন অফিসার আব্বাকে বললেন যে, সুলতান তৈমুর মালিককে মোটেই সাহায্য করেন নি, এখনও তিনি কি করে তাঁর সাহায্যের আশা করছেন। আব্বাজান শেষ জবাব দিলেনঃ 'আমার কর্তব্য আমি পুরো করব।' সন্ধ্যাবেলায় তিনি ফৌজকে হুকুম দিলেন, ভোরে শহরের বাইরে গিয়ে তাতারী দুশমনের মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু ভোর পর্যন্ত প্রায় দুশ সিপাহী শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। এমন কি, আমাদের মহলের কর্মচারীরাও বেশীর ভাগ তাদের সাথে চলে গেল।

'ভোর বেলা বিদায় নেবার আগে আব্বাজান প্রথমবার আমাদেরকে এই গোপন কক্ষের গুপ্তপথ বাতলে দিলেন এবং আলীকে আমাদের সাথে রেখে গেলেন। আলী ছিল আমাদের পুরানো কর্মচারী। আব্বাজান আমাদের জন্য কয়েকদিনের খোরাক এই গোপন কক্ষে জমা করে রেখে আমায় বলেছিলেন যে, যদি তাঁর পরাজয় ঘটে, তাহলেও যেন আমরা এই গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা না করি, কেন না তাতারীরা কাউকেও পালাবার মওকা দেয় না। তাঁর উম্মিদ ছিল, প্রস্তুতির পর খারেযম বাহিনী অবশ্যি এদিকে আসবে।

'আলী ছাড়া বাকী নওকরদের কারুর এই গোপন কক্ষে এসে গা ঢাকা দেবার হুকুম ছিল না। দু'দিন আমরা এই কক্ষে লুকিয়ে থাকলাম। মহলের বাকী খাদেমরাও তখনও পালিয়ে গেছে। আলী আমাদেরকে বাইরের খবর জানিয়ে দিত। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আব্বাজানের ঘোড়া শূন্য পৃষ্ঠে ফিরে এল। সেই রাত্রেই তাতারী শহরে ঢুকে অবশিষ্ট বাসিন্দাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিল।

দু'দিন তাতারীরা এই মহলকে কেন্দ্র করে আশপাশের বস্তিগুলোতে লুটপাট চালাল আর আলীকে নিয়ে আমরা এখানেই লুকিয়ে রইলাম। এই দুটি দিন ছিল আমাদের কাছে বহু বছরের চাইতেও দীর্ঘ। তৃতীয় দিন তারা শহর খালি করে চলে গেল। মহলে তখনও পরিপূর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করছে, কিন্তু আমরা রাত্রি পর্যন্ত ইনতেযার করলাম। রাত্রিবেলা আলী সুরংগ পথে বাইরে চলে গেল। সে ফিরে এসে আমাদেরকে সান্ত্বনা দিল। অসহনীয় ঠান্ডার মধ্যে আমরা প্রথমবার এখানে আগুন জ্বালালাম। ভোর হলে আলী আবার সুরংগপথে চলে গেল বাইরে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে জানালো যে, আমাদের আস্তাবলে এক ঘোড়া বাইরে চরছিল। সে তাকে ধরে এনে আস্তাবলে বেঁধে রেখেছে। তারপর চারদিন ধরে আমরা এই দোয়া করছি, যেন মুসলমানের কোন ফৌজ এদিকে এসে যায়। পরশু রাত্রে আমরা ফয়সালা করেছি যে, ভোরে এখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বলখের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবো। সম্ভবতঃ রাস্তার কোন ফৌজী চৌকি থেকে আমরা সাহায্য পাবো। কিন্তু গত প্রহরের বরফ পাতের অবস্থা দেখে আমি সমকন্দের হাকীমের কাছে এক আবেদন লিখেছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নিয়ে বলখে পৌঁছে দেবার জন্য একদল সিপাহী পাঠিয়ে দিন। আলী আমার আবেদন পত্র নিয়ে কাল রওয়ানা হয়ে গেল। আপনি যে ঘোড়ায় চড়ে এখানে এসেছেন, তাকে এখানো আমি দেখে এসেছি। আলী ওরই উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছিল। সে হয়ত কোন রক্ত পিপাসু তাতারীর নৃশংসতার শিকার হয়েছে। এখনও হয়ত খোদা আপনাকে আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

তাহির সংক্ষেপে তাঁর অতীতের কথা শোনালেন। কাহিনী শেষ করে তিনি বালিকাকে বললেন ঃ 'আমি একবার বাইরে গিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা দেখতে চাই।'

ঃ 'মহলে সব সময়ই তাতারীদের দিক থেকে বিপদের আশাঙ্কা রয়েছে। তাই বাইরে যাবার নিরাপদ রাস্তা হচ্ছে সুরঙ্গ।' ঃ এই কথা বলে বালিকা গোপন কক্ষের দেওয়ালের সাথে লাগানো একটি চাকা ঘুরাতে লাগলেন। মামুলী ঘর্ঘর শব্দ করে একটি প্রস্তরখন্ড ধীরে ধীরে একদিকে সরে গেল। দেওয়ালের সাথে একটি মানুষ চলার মত সুরঙ্গ পথ দেখা দিল।

বালিকা বললেন ঃ 'চলুন, আমি আপনাকে পথ দেখাচ্ছি।' ইতোমধ্যে ইসমাইল চমকে উঠে বললো ঃ 'আমিও আপনার সাথে বাইরে যাব।'

গোপন কক্ষের তুলনায় সুরঙ্গ অত্যন্ত অন্ধকার। বালিকা ও তাঁর ভাই বিনা অসুবিধায় আগে আগে চলেছেন। কিন্তু তাহিরকে হিসাব করে পা ফেলতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও সুরঙ্গের দু'পাশে যমিন খোদাই করে প্রশস্ত কামরা বানানো হয়েছে। তাহির প্রায় পঞ্চাশ গজ চলবার পর আসল রাস্তা ছেড়ে এক কামরার দিকে ঢুকে গেলেন। এর মধ্যে বালিকা তাঁর ভাইকে নিয়ে বেশ কিছুটা আগে চলে গেছেন। তাহির পেরেশান হয়ে কামরার পাঁচিল হাতড়াচ্ছেন। হঠাৎ বালিকার আওয়াজ শোনা গেল ঃ 'আপনি কোথায়?'

তাহির জবাব দিচ্ছেন ঃ 'আমি রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।'

যুবতী ফিরে এসে ভাইকে বললেন ঃ 'ওর হাত ধরো তো, ইসমাইল।'

ইসমাইল তাহিরের হাত ধরতে ধরতে বল্লেনঃ 'আমার সাথে আসুন, আমি অন্ধকার দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

তাহির বললেন ঃ 'এ কামরার মধ্যে একটা বেশ বড় রকমের ফৌজ থাকতে পারে।'

যুবতী জবাব দিলেন ঃ 'জি হ্যাঁ! কিন্তু হায়! আমাদের কাছে যদি বেশী ফৌজ থাকত।'

এক জায়গায় পৌঁছে যুবতী থেমে গেলেন। তারপর বল্লেন ঃ 'এখনও খানিকটা সামনে চলুন। আগে পানির ঝরণা রয়েছে। ইসমাইল, তুমি আমার হাত ধরো তো।'

তিনজন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সামনে এগিয়ে গেলে অন্ধকার পাতলা হয়ে এল। ডান দিকে ফিরে দু'তিন কদম আগে গিয়ে যুবতী আবার থেমে পড়লেন। এখানে যথেষ্ট আলো। তাহির দেখলেন তাঁরা একটি ছোট জলাশয়ের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। এক পাহাড় থেকে পানির ধারা নেমে আসছে জলাশয়ে। জলাশয়ের ফালতু পানি বেরিয়ে যাচ্ছে সুরঙ্গ পথ দিয়ে। পাঁচ ছ'কদম আগে এ সুরঙ্গ শেষ হয়ে গেছে। সুরঙ্গের এই শেষ ভাগটা খুবই সংকীর্ণ।

পানির গভীরতা অর্ধহাতেরও কম। যুবতীর অনুসরণ করে ইসমাইল ও তাহির উঁচু হয়ে ওঠা পাথরের উপর পা রেখে রেখে আস্তে হেঁটে সুরঙ্গের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের সামনে গাছের ছায়া ঢাকা গভীর ও সংকীর্ণ উপত্যকা। বরফপাত থেমে গেছে, কিন্তু আসমান তখনও মেঘে ঢাকা। গাছ, পাথর আর জমিনের উপরিভাগ তখনও বরফে ঢাকা। সুরঙ্গ পথে বেরিয়ে আসা পানি একটি ছোট্ট নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে এবং সংকীর্ণ প্রবাহ দু'দিক ঘা খেয়ে সৃষ্টি করছে এক মুগ্ধকর সুরলহরী। তারপর সেই অপ্রশস্ত উপত্যকার উপর দিয়ে মিশেছে এক বড় নদীতে। এই মুগ্ধকর দৃশ্য কিছুক্ষণের জন্য তাহিরকে আত্মভোলা করে দিল। কিছুক্ষণ তাঁর সম্বিতহারা দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল যুবতীর মুখের উপর। অপরূপ সুন্দরী যুবতী শিশির ধোয়া ফুলের চাইতেও মুগ্ধকর তাঁর রূপ। শিল্পীর সুদক্ষ হাত যেন বরফ দিয়ে একটি নিখুঁত মূর্তি গড়ে তাতে লাগিয়ে দিয়েছে গোলাবী রঙের আভা। দুঃখ-বেদনার হালকা মেঘের নেকাব টেনে দিয়ে তার মুখখানিকে করে দিয়েছে মেঘাবৃত চাঁদের চাইতেও মুগ্ধকর। যুবতী মুখ ফিরিয়ে অমনোযোগের দৃষ্টিতে তাঁর ভাইয়ের দিকে তাকাতে থাকলেন। তাহিরের মুখ দিয়ে যেন তাঁর নিজেরই অলক্ষ্যে বেরিয়ে এল ঃ 'তোমার নাম কি?'

'সুরাইয়া।' ঃ তিনি জবাব দিয়ে পেরেশান হয়ে তাহিরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি যেন বলছেঃ 'দেখ, আমি তোমার আশ্রিত, কিন্তু আমি এক আত্মমর্যাদাশীল বাপের বেটী।'

তাহির তাঁর দেহে এক অদ্ভুত কম্পন অনুভব করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ মাথা নত করে বললেন ঃ 'আমায় শীগগিরই বাগদাদে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু তার আগে আমি আপনাদেরকে বলখে পৌঁছে দেব। আসমান সাফ হয়ে এলেই আমরা এখান থেকে রওয়ানা হব। এই উপত্যকা থেকে বাইরে যাবার পথ কোন দিকে?'

যুবতী একদিকে ইশারা করে বললেন ঃ 'এই দিক দিয়ে সামনের পাহাড় পার হবার পর।'

তাহির বললেন ঃ 'সূর্য দেখা গেলে আমরা কালই রওয়ানা হব।'

সুরাইয়া আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'এখনওই হয়ত আবার বরফ পড়বে।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনারা কিছুক্ষণ এখানে থাকুন। আমি উপরে গিয়ে দেখে আসবো, সম্ভবতঃ....... ।'

'সম্ভবত ঃ কি' যুবতী প্রশ্ন করলেন।

ঃ কিছু নয়।'

ঃ আপনার খেয়াল হয়ে থাকবে যে, সম্ভবতঃ মুসলমানদের কোন ফৌজ নগরে আসবে এবং আমিও সকাল-সন্ধ্যায় এই আশা নিয়েই পাহাড়ের উপর চলে যেতাম।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনার গোপন কক্ষ যথেষ্ট নিরাপদ, কিন্তু বস্তির লোকেরাও কি তার খবর জানে?'

সুরাইয়া জবাব দিলেন ঃ 'না, উপত্যকার আশেপাশে হামেশা পাহারা রাখা হত। আব্বাজান যখন এই গোপনকক্ষ ও সুরঙ্গপথ দেখালেন, তখনওই আমি এ সতর্কতার কারণ বুঝলাম।'

'বহুত আচ্ছা। আমি এখনওই আসছি।' ঃ এইকথা বলে তাহির বরফের উপর পা রাখতে গেলেন। যুবতী বাধা দিয়ে বললেনঃ না, না, ওদিকে যাবেন না। এই সুরঙ্গের কাছে বরফের উপর পায়ের ছাপ রাখবেন না। ঐ নদীর উপর দিয়ে যান।'

তাহির সুরাইয়ার নির্দেশমতে পানির ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বড় নদী পর্যন্ত গেলেন এবং বড় বড় পাথরের উপর পা রেখে নদী পার হয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিনি চারদিকে নযর ফেললেন,কিন্তু বরফের সফেদ চাদরের উপর কোন গতিশীল জিনিষ তাঁর চোখে পড়ল না। নীচে নেমে যখন তিনি সাথীদের কাছে এলেন, ততক্ষণে আবার বরফ পাত শুরু হয়ে গেছে। তাহিরের পেটে তখনও ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠেছে।'

পুনরায় গোপন কক্ষে ঢুকে সুরাইয়া কয়েক টুকরা গোশত আর কিছুটা শুকনা মেওয়া একটি তশ্‌তরিতে রেখে তাহিরের সামনে দিয়ে বললেন ঃ 'আপনার তো অবশ্যি ক্ষুধা পেয়েছে। রাত্রেও আপনি কিছু খাননি।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'সন্ধ্যাবেলায় আমি আপনার নওকরের থলে থেকে যথেষ্ট খানা পেয়েছিলাম। আমার উদ্বেগ ঘোড়ার জন্য। তাই আমি তাকে সেই অবস্থায়ই ফেলে এসেছি।'

'ভোর বেলা আমি উপরে গিয়ে ওকে আস্তাবলে রেখে এসেছি। ওখানে শুকনো ঘাস যথেষ্ট।' ঃ এই কথা বলে সুরাইয়া তাঁর ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ইসমাইল, তুমি ওর সাথে বসে খাও।'

ইসমাইল তাহিরের সাথে বসলো। তাহির গোশতের টুকরার দিকে হাত বাড়িয়ে আবার হাত গুটিয়ে নিলেন এবং সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ কিন্তু আপনি?'

সুরাইয়া বললেনঃ 'আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি খুব ভোরে খাই। ইসমাইল আজ একটু দেরী করে উঠেছে। তাই সে এখনও ভুখা রয়েছে।'

তাহির একবার কিছু মুখে দিয়ে বালককে বললেন ঃ 'ইসমাইল, খাও। কিন্তু ইসমাইল হতবুদ্ধি হয়ে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরাইয়া একটুখানি এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে বালকের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেনঃ 'ইসমাইল, খাচ্ছোনা কেন, ভাই?'

বালকের চোখ পানিতে ভরে উঠল। সে তার কম্পিত ঠোঁট দুটিকে সংযত করে রাখবার চেষ্টা করতে করতে দু'হাত প্রসারিত করে সুরাইয়ার কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। 'আমি খাব না, আমি খাবো না।' বলতে বলতে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

তাহিরের মনে হ'ল যেন একটা তিক্ত খাদ্য তাঁর গলার ভিতর দিয়ে নেমে গেছে। তিনি তশ্‌তরি তুলে সুরাইয়ার সামনে ধরে বললেন ঃ 'আমার হিস্‌সা আমি খেয়ে নিয়েছি।'

সুরাইয়া বললেন ঃ 'না, না, আপনি ভুখা রয়েছেন।'

তাহির বললেনঃ আরব মায়ের বেটীর কাছ থেকে এই আশাই আমি করেছিলাম, কিন্তু আমি আপনার মেহমান নই, মোহাফেয। সন্ধ্যায় আমি পেট পুরে খেতে পেয়েছি। কিন্তু আপনি হয়ত সন্ধ্যা বেলাও খুব কমই খেয়েছেন।'

তাহির উঠে ধনুক তুলে নিলেন এবং তুণীর গলার সাথে ঝুলাতে ঝুলাতে বললেনঃ 'এগুলো আপনারা খেয়ে নিন। আমি, ইনশাআল্লাহ্, জলদী ফিরে আসবো। বস্তিতে কিছু না পেলেও হয়ত বাইরে কোন শিকার মিলে যাবে।'

সুরাইয়া বললেনঃ 'বস্তির ভিতরে মানুষের লাশ ছাড়া আর কিছুই তাতারীরা বাকী রেখে যায়নি। এ মওসুমে হয়ত শিকারও মিলবে না।'

তাহির বললেনঃ 'আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে ভুখা মরবার জন্য এখানে একত্র করেননি। ইনশাআল্লাহ খালি হাতে আমি ফিরে আসবো না। সন্ধ্যা বেলার জন্য ব্যস্ত না হয়ে আপনারা এ খানা খেয়ে নিন।'

সুরাইয়া বললেনঃ 'আল্লাহর রহমতের উপর যদি এতই ভরসা আপনার, তাহলে নিজের হিস্‌সা কম সে কম খেয়ে নিন।'

তাহির আর এক টুকরা গোশত তুলে মুখে পুরে বললেন ঃ 'বাস, আমার হিস্‌সা আমি নিয়েছি।'

যুবতী বললেন ঃ 'আমি আপনাকে বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

'না, আমি রাস্তা দেখে নিয়েছি।' এই কথা বলে তাহির সুরঙ্গ পথ দিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

তাহির চলে যাবার পর সুরাইয়া বললেনঃ 'ইসমাইল, এবার খেয়ে নাও।'

বালক জবাব দিল ঃ 'তোমায় ছেড়ে আমি একা খাব না।'

সুরাইয়া তশতরির খানা তিন ভাগ করে এক ভাগ আলাদা করে রেখে বললেনঃ 'এটা ওর হিস্‌সা। ওঁর ফিরে আসতে খুবই ক্ষিধা পাবে। আর বাকীটা হচ্ছে তোমার ও আমার হিস্‌সা।'

দুপুর বেলা। আসমান সাফ হয়ে গেছে। বরফের উপর সূর্যের কিরণ মানুষের চোখ ঝলসে দেয়। হাওয়ার বেগ কমে গিয়ে মওসুমের এক আনন্দদায়ক পরিবর্তন এসে যাচ্ছে। সুরাইয়া ও

ইসমাইল সুরঙ্গের বাইরে কতকগুলো গাছগাছড়ার মাঝখানে এক পাথরের উপর বসে তাহিরের ইনতেজার করছেন। বরফ গলে গিয়ে গাছের ডালপালা ধীরে ধীরে আবরণমুক্ত হচ্ছে। সামনের উপত্যকার মাঝখানকার নদীর পানি বেড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

ইসমাইল বল্ল ঃ 'আপা, উনি তো এখনও এলেন না। এমনি রৌদ্র অবশ্যি শিকার মিলে থাকবে।

সুরাইয়া জবাব দিলেন ঃ 'খোদার কাছে দোআ কর।'

ঃ 'উনি বড় ভাল মানুষ। আব্বাজান থাকলে ওকে তাঁর ফৌজের সিপাহসালার বানিয়ে নিতেন। কিন্তু আপা, যদি উনি শিকারের বদলে তাতারীর মোকাবিলা করে থাকেন, তাহলে?'

ঃ 'খোদা ওকে সাহায্য করবেন।'

ঃ 'যদি আমাদেরকে এখানে কোন তাতারী দেখে ফেলে, তখনও?'

ঃ 'এখানে আমাদেরকে উপর থেকে কেউ দেখতে পাবে না।'

ঃ 'ওকে যদি তাতারীরা ধরে নেয় আর উনি জান বাঁচাবার জন্য যদি আমাদের সন্ধান তাদেরকে দেন, তাহলে?'

ঃ 'চুপ কর। মেহমান সম্পর্কে এমন কথা চিন্তা করতে নেই।'

ঃ 'যদি আবার বরফ না পড়ে, তাহলে আমরা রওয়ানা হয়ে যাব-না?'

ঃ 'ইনশা আল্লাহ।'

ইসমাইল চুপ করে গেল, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই সে চেচেঁয়ি উঠল ঃ 'উনি এসেছেন। উনি এসে গেছেন। আপা! আপা!! ওই যে দেখ, এক পাহাড়ী দুম্বা নিয়ে আসছেন। দেখ আপা, কত বড় দুম্বা। ওর চলতে মুশকিল হচ্ছে। আগুন নিবে যায়নি তো?'

সুরাইয়া গাছের আড়াল থেকে এক দিকে সরে দেখলেন, তাহির তাঁর কাঁধের উপর এক পাহাড়ী দুম্বা নিয়ে নদী পার হয়ে আসছেন।

ইসমাইল আবার বললো ঃ 'আপা! আগুন নিভে যায়নি তো? আমার খুবই ক্ষিধা পেয়েছে।'

সুরাইয়া বল্লেনঃ 'তুমি তো বলছিলে, তোমার পেট ভরে রয়েছে।'

ঃ 'আমি একথা না বললে তো তুমি কিছুই খেতে না। কিন্তু এখনও তো আল্লাহ্ দুম্বা পাঠিয়েছেন। আপা, এ লোকটি বড়ই ভাল।

তাহির সুরঙ্গের কাছে এসে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আপনারা শীগ্‌গীর ভিতরে যান। আমার ভয় হয়, আশপাশে হয়ত তাতারীদের কোন দল রয়েছে। এ দুম্বাটি আমার তীরের নিশানা হবার আগেই যখম ছিল।'

খানিকক্ষণ পর যখন গোপন কক্ষে বসে সুরাইয়া গোশত ভুনাছিলেন, তখনও ইসমাইল তাহিরের পাশে আগুনের কাছে বসে অস্থির হয়ে বলছিল ঃ 'এখনও হয়ত রান্না হয়ে গেছে, আপা! জলদী নামাও।'

অতীত দিনের দৈহিক ক্লেশ ও মানসিক পেরেশানির পর তাহির এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার গোপন কক্ষে এক ধরণের প্রাচুর্য অনুভব করছিলেন। তথাপি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক গোপন অনুভূতি কখনও কখনও তাঁকে পেরেশান করছিল। কখনও কখনও তাঁর মনে হত, তিনি সেখান থেকে যদি উড়ে যেতে পারতেন বাগদাদে, আর সেখানকার উঁচু অথচ নিস্তব্ধ বালখানায় আনতে পারতেন রোজ হাশরের কোলাহল, নিশ্চল জলাশয়ের মত গতিহীন

জিন্দেগীতে এনে দিতে পারতেন প্রবল বন্যাবেগে। কল্পনায় তিনি বাগদাদের মসজিদে মসজিদে লাখো মুসলমানের সামনে পূর্ণ উদ্যম নিয়ে বক্তৃতা করেন। কখনও বা বাগদাদের অগণিত ফৌজের সাথে খারেযম শাহের ঝান্ডাতলে তাতারী বাহিনীর মোকাবিলা করেন। খলিফা ও উজিরে আজমকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে তাদের নির্লিপ্ততায় হতাশ হয়ে তাদেরকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। আবার কখনও কল্পনায় খলিফার সামনে আলাহিদ্দুদীনকে কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেন তাঁর অপরাধ।

এমনি করে নানান রকমের ধারণায় ভিড় জমে তাহিরের মনে, আর তারই ভিতরে তিনি ইসমাইলের কোন কথার জবাব শুনতে পান সুরাইয়ার কন্ঠস্বর। সে স্বর বসন্তের পয়গামবাহী পাখীর কলসংগীতের চাইতেও অধিকতর মধুর, মুগ্ধকর ও মনভোলানো। উজ্জ্বল অগ্নিশিখার সামনে তাঁর খুবসুরত মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অন্তরের মধুর অনুভূতি রূপান্তরিত হয় কম্পনে। তাঁর চোখের সামনে আসে এক নতুন দরিয়া। সে এমন এক দুনিয়া যেখানে ঝড়ো হাওয়ার অনুভূতি পাখীদের বাধ্য করে বাসা বাঁধতে, যেখানে চোখ খুলেই প্রত্যেক মানুষ সন্ধান করে একটি নিরাপদ গৃহকোণ। নিজের চাইতে বেশী করে সে সন্ধান করে এমন এক সত্তার, যার একটুখানি হাসির মধ্যে সে খুঁজে পায় জিন্দেগীর ঝড় তুফান থেকে বাঁচবার মত আশ্রয়।

ভোরের কুয়াশা ঢাকা সূর্যের ম্লান রশ্মির মত বেদনার মেঘে সুরাইয়ার মুখখানিকে করে তোলে আরও সুন্দর-আরও মুগ্ধকর। লজ্জার হাজারো পর্দার আড়াল থেকে তাঁর বেদনাতুর দৃষ্টি তাহিরকে দেয় প্রথম ও শেষ পয়গামঃ 'আমরা পরস্পরেরই জন্য। আর একটি অস্পষ্ট ধ্বনি তাঁর দীলের মধ্যে মওজুদ রয়েছে বহু আগে থেকে। এমনি আওয়াজ তিনি আগেও শুনেছেন।

তাহির এসে দাঁড়িয়েছেন জীবন মরুর এমন এক মঞ্জিলে, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ কামনা করে একটি সাথীর অন্তরঙ্গতা। একটি কুমারীর মুখের হারানো হাসি ফিরিয়ে আনা হয়ে ওঠে তাঁর কাছে জীবনের সব চাইতে বড় প্রশ্ন। কিন্তু তিনি সেই দলের লোক, যারা ফুল নিয়ে খেলার চাইতে কাটার ভিতর চলেই অনুভব করেন জিন্দেগীর অমৃত আস্বাদ। দরবারের সুর-লহরীর চাইতে তলোয়ারের ঝংকার যাদের কাছে বেশী মুগ্ধকর, যারা নিজের জন্য বেঁচে থাকার চাইতে পরের জন্য মৃত্যু বরণকেই মনে করেন সৌভাগ্য, যারা কোন একটি ফুলকে ভালোভা না বানিয়ে বুকের খুন দিয়ে হাজারো গুলজকে সজীব করে তোলেন। সুরাইয়ার মত খারেযমের হাজারো যুবতীর অসহায়তার অনুভূতি তাহিরের দেহে এনে দেয় এক কম্পন। খওমের হাজার হাজার মা বোনের ইজ্জতের উপর বর্বর তাতারীদের হামলার ফলে তাদের মুখ থেকে যে জিগর ফাটানো আর্তচীৎকার বেরিয়ে এসেছে, তাই আবার নতুন করে এসে আঘাত দেয় তাহিরের কানে। তারা কি মর্মান্তিক বেদনাতুর দৃষ্টি আসমানের দিকে তুলে ধরে আর্তস্বরে ফরিয়াদ করেছে ঃ 'কোথায় গেল আমদের ইজ্জতের রক্ষকরা? কি হল আমাদের আত্মসমশীল সন্তানদের আর বাহাদুর ভাইদের?'

তাহির চমকে উঠে বললেন ঃ 'কাল শেষ প্রহরে আমরা এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাব?'

সুরাইয়া কিছুক্ষণের জন্য ভাবনায় পড়লেন। তাহির আবার বললেন ঃ 'আমাদের প্রথম দু'তিন মঞ্জিল যা' বিপদ তারপর হয়ত কোন চৌকি থেকে সাহায্য মিলবে।'

সুরাইয়া বললেন ঃ 'আমার কেবল ইসমাইলকে নিয়েই ভাবনা। আমাদের একটিমাত্র ঘোড়া ছিল, আর তাও মরে গেছে।'

ঃ মরে গেছে? আপনি কখন দেখলেন?'

ঃ 'আপনি যখন শিকারে গেলেন, তখনও আমি আবার ওখানে গিয়েছিলাম। ভোরেই মনে হয়েছিল, ওর কোন রোগ হয়েছে।'

তাহির গভীর চিন্তায় পড়লেন। খানিকক্ষণ পর ইসমাইল বললেন ঃ 'আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না আপনারা। আমি আপনাদের সাথে পায়ে হেঁটে চলতে পারব।'

সুরাইয়া বললেন ঃ 'আপনি আশা রাখেন যে, খারেযম সেনাবাহিনী আবার এ দিকে আসবে?'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'যে সেনাবাহিনী তৈমুর মালিকের সাহায্যের জন্য হাজির হল না, তাদের কাছে আমি কিছুই আশা করি না। কিন্তু মুসিবত মানুষকে আল্লাহ্‌র শক্তির মুখাপেক্ষী করে দেয়। আমি খারেযম শাহের সাহায্য সম্পর্কে নিরাশ হয়েছি, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্য সম্পর্কে তো নিরাশ হইনি। আমরা যদি পায়ে হেঁটে পাহাড়ী রাস্তা ধরি, তাহলে খোলা ময়দানের তুলনায় তা হবে অধিকতর নিরাপদ। রাস্তায় কোন জখমী সিপাহীদের ঘোড়া মিলে যাওয়াও অসম্ভব নয়। তাছাড়া আমার ধারণা, তাতারীদের অগ্রগতি উত্তর-পশ্চিম দিকে। দক্ষিণে বলখের রাস্তা হবে নিরাপদ। ইনশাআল্লাহ্‌ কাল শেষ প্রহরে এখান থেকে আমরা রওয়ানা হয়ে যাব।'

●

সন্ধ্যাবেলায় তাহির যখন নামাযের পর দো'য়ার জন্য হাত তুলেছেন, তখনও তাঁর কানে এল উপরের মহলে ঘোড়ার পদধ্বনি। সুরাইয়া জলদী করে উঠে পাথরের সীল দিয়ে জলন্ত আগুনটাকে চাপা দিলেন। দো'আ শেষ করে তাহির সুরাইয়ার দিকে তাকালেন।

ভয়ার্ত সুরাইয়া চাপা গলায় বললেন ঃ 'হয়ত তাতারী এসে থাকবে। কিন্তু ঘোড়া পাঁচ ছটার বেশী হবে না।'

তাহির আস্তে বললেন ঃ 'এও তো হতে পারে যে, ওদের পিছনে কোন ফৌজ আসছে।'

ইসমাইল বিষণ্ন মুখে বলল ঃ 'আমাদের বুঝি বলখ যাওয়া হল না।'

তাহির তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ 'না, ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা নিশ্চয়ই যাব।'

ঃ 'কবে?'

ঃ হয়ত আজই রওয়ানা হয়ে যাব।'

সুরাইয়া চমকে উঠে বললেন ঃ 'আজই?'

ঃ 'হ্যাঁ, আপনি এ গোশত থেকে দুদিন দিনের খোরাক থলের মধ্যে পুরে নিন।'

ঃ 'কিন্তু বরফের রাস্তা দিয়ে রাতের বেলায় পায়ে হেঁটে?'

'আপনি পায়ে হাঁটা নিয়ে অতো ভাবছেন কেন? আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের জন্য কি ঘোড়া পাঠাননি?'

ঃ ওদের ঘোড়া ছিনিয়ে নেওয়া কিছুটা মুশকিল হবে।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'যে কাজটা জরুরি, তা মুশকিল কি সহজ, ভাবতে নেই।'

কিছুক্ষণ পর উপর থেকে ঠকাঠক আওয়াজ শোনা গেল। সুরাইয়া বল্লেনঃ সম্ভবত ওরা মাঝখানের বড় কামরায় আগুন জ্বালবার জন্য দরজা ভাঙছে। ঘোড়াগুলো হয়ত আস্তাবলে বেঁধে রেখেছে। আমি সিঁড়ির উপরে উঠছি। ওদের আওয়াজ শুনে ওদের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাবে।'

ঃ 'কিন্তু উপরের পাথর এখনও সরাবেন না। কেউ হয়ত উপরের কামরায় এসে থাকবে।

'না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।' বলে সুরাইয়া সিঁড়ির উপর উঠে সীলের কাছে কান পেতে উপরের আওয়াজ শুনতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি নীচে নামলেন। তাহিরের প্রশ্নের অপেক্ষা না করে তিনি বল্লেন ঃ 'ওরা ছ'সাত জনের বেশী হবেন না। ওরা তৈমুর মালিকের খোঁজ করছে। হয়ত ভোরের মধ্যে ওদের আরও সাথী এসে পৌঁছবে। আমি ওদের কথা বুঝতে পারিনি। ওদের মুখে বারবার তৈমুর মালিকের নাম শুনে আমার মনে হয়েছে, এখনও ওরা উপরের কামরার ডান দিকের তৃতীয় কামরায় রয়েছে।'

## এগার

গোপন কক্ষের অন্ধকার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তাতারী নিজের ভাষায় কি যেন গান গাইছে। তাহির এশার নামায পড়ে বেশ কিছু সময় বসে কাটিয়েছেন। তাতারীদের গান থেমে গেলে তিনি সুরাইয়া ও ইসমাইলকে তৈরী হবার পরামর্শ দিয়ে সিঁড়ির উপর উঠলেন এবং ছাদের কাছে কান পেতে শুনতে লাগলেন। এক তাতারী কথা বলছে। বাকী সবাই চুপচাপ। তাতারী জবানের কতকগুলো শব্দ আগে তাহির শিখে নিয়েছেন। তিনি বুঝলেন যে, লোকটি তার সাথীদেরকে কোন কাহিনী শোনাচ্ছে। তাহির আস্তে আস্তে সীলটি একদিকে সরিয়ে দিলেন এবং ফাঁক দিয়ে মাথা উপরে তুলে দেখলেন কামরার মধ্যে কেউ নেই। তাই তিনি নিরাপদে উপরে উঠে গিয়ে পাথরের সীলটি দিয়ে গর্তটি আগের মতই বন্ধ করে দিলেন।

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ডান দিকে কয়েক কদম চল্‌বার পর তাহিরের হাত লাগল এক দরজার উপর। তিনি ধীরে ধীরে দরজাটি বাইরের দিকে ঠেলে দিলেন, কিন্তু দরজাটার কড় কড় শব্দ তাকে পেরেশান করে তুল্‌লেন। তিনি দরজাটি দ্রুত বন্ধ করে দিয়ে পাঁচিলের গায়ে লেগে দাঁড়ালেন। বন্ধ হবার সময়ে দরজাটা আরও বেশী আওয়াজ করল।'

কিসসা কথক তাতারী হঠাৎ চুপ করে গেল। পরমুহূর্তে সে তার এক সাথীর কাছে কি যেন বলল। শ্রোতা আধো ঘুমের নেশায় বিড়বিড় করে কিছু বলছে। তাহির বুঝলেন, এই দু'টি লোকের মধ্যে একটি খানিকক্ষণ আগে কিসসা শোনচ্ছিল। তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরে চলল কথা কাটাকাটি। মাঝখানের কামরায় তাদের এক জনের চুকবার আওয়াজ পাওয়া গেল। তখনও সে রীতিমত বকে যাচ্ছে। তাহির তখনি আন্দাজ করে নিলেন যে, এই দু'টি লোক ছাড়া বাকী সব তাতারী ঘুমিয়ে পড়েছে।

তাতারীরা মাঝখানকার কামরা পার হয়ে তাহিরের কামরার দরজা খুলল। মাঝখানের কামরার দু'টি দরজা পরস্পরের মুখোমুখি বলে তৃতীয় কামরার জ্বলন্ত আগুনের হাল্কা আলো তাহিরের কামরায় এসে পড়ছে। তিনি পাঁচিলের গা ঘেঁষে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাতারী

বেপরোয়া হয়ে তাহিরের কামরায় ঢুকল। সে মুহূর্তমাত্র এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে চোখ রগড়ে সাথীকে গাল দিতে দিতে ফিরে চলল। অমনি তাহিরের লৌহ কঠিন হাতখানি গিয়ে তার গর্দানে লাগল। বেঁটে তাতারীর মুখ দিয়ে আহ শব্দটিও বেরুবার অবকাশ পেল না। দেখতে দেখতে তাহির তাকে লাশ বানিয়ে জমিনের উপর ছুঁড়ে মারলেন।

তৃতীয় কামরা থেকে কিসসা কথকের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সে সম্ভবতঃ কিসসার বাকী অংশটা না শুনিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলো না। তাহির দ্রুত তাঁর তলোয়ার কোষমুক্ত করে নিয়ে পাঁচিলের গায়ে লেগে ঘুমের ভিতরে নাক ডাকার মত আওয়াজ করতে লাগলেন।

কিসসা কতক মনে করল যে, তার সাথী তৃতীয় কামরায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। হাসতে হাসতে সে একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে সেই কামরায় পৌঁছালো। কামরার ভিতরটা দেখবার আগেই তাহিরের তলোয়ার তার সিনা পার হয়ে চলে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে মেঝের উপর পড়ে গেল আর তার সাথে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল এক চীৎকারের আওয়াজ।

চীৎকারের আওয়াজে তৃতীয় কামরায় তার সাথীরা জেগে উঠল। একই সঙ্গে তারা ব্যাপারটা বুঝবার ও বুঝাবার চেষ্টা করতে লাগল। তাহির মুহূর্তকাল দ্বিধা না করে মাঝখানকার কামরা পার হয়ে তৃতীয় কামরায় প্রবেশ করলেন। জ্বলন্ত আগুনের আলো সেখানে যথেষ্ট। তাতারীরা উঠে তাদের তলোয়ার গুছিয়ে নিচ্ছিলো। তাহির তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিজলীর মত এবং তাদের দু'জন ছিন্নমুণ্ড হয়ে মেঝের উপর গড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে বাকী তিনজন তাতারী তৈরী হয়ে নিয়েছে।

তাহিরের তলোয়ার কয়েকবার তিন প্রতিদ্বন্দ্বীর তলোয়ারের আঘাত প্রতিরোধ করল। তাতারীরা তাহিরকে বিপজ্জনক দুশমন মনে করে আলাদা হয়ে লড়াই করবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাহির তাদেরকে এক কোণ থেকে এদিক ওদিক সরে যাবার মওকা দিলেন না। কয়েক মুহূর্ত এমনি কেটে যাবার পর তাতারীদের মধ্যে থেকে একজন জখম হয়ে তড়পাচ্ছিলো। তাহিরের বাযুতেও হয়েছে সামান্য যখম। কিন্তু সামনে এক কোণে মাত্র দুটি লোককে আটক করে তিনি পুরা উদ্যমে হামলা না করে স্বস্তির সাথে লড়াই করতে থাকলেন।'

আচানক তাহির পিছন থেকে এক চীৎকার ধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি দ্রুত পায়তারা বদল করে একদিকে সরে দেখলেন, তাঁর বাম পাশে সুরাইয়া দাঁড়িয়ে আছেন এক রক্তাক্ত তলোয়ার হাতে, আর তাঁর সামনে এক তাতারী যখম হয়ে তড়পাচ্ছে। এ লোকটিকে তাহির এতক্ষণ দেখেননি। ইতিমধ্যে তাহিরের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দু'দিক হটে গিয়ে দু'দিক থেকে লড়াই শুরু করেছে। সুরইয়া তাহিরের ইশারার অপেক্ষা না করে একজনের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু তাহির চীৎকার করে বললেন ঃ 'সুরাইয়া। তুমি একদিকে সরে যাও আমার পিছনে।'

তাহির প্রথমবার তাঁর নাম মুখে এনেছেন এবং আপনি না বলে তুমি বলে সম্বোধন করেছেন। সুরাইয়ার কাছে এ একটা অতি বড় ইনাম। তিনি বললেনঃ 'আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমিও এক আরব মাতার দুধ পান করে বড় হয়েছি।'

ঃ 'কিন্তু ইসমাইল একাকী......?'

ঃ 'সেও আমারই ভাই।'

সুরাইয়া পিছিয়ে যাবেন না, তাহির তাঁর সামনে দুশমনের উপর জোর হামলা করে তাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে অপর তাতারীর পাশে আনলেন। সে তখনও সুরাইয়ার সাথে তলোয়ারের শক্তি

পরীক্ষা করছে।

এবার তাহির ও সুরাইয়া পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ালেন। দুই তাতারী এবার এক কোণে সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহিরের তলোয়ার বিজলীর মত বেগে ছুটে গিয়ে সুরাইয়ার সামনের দুশমনের ডান হাত কেটে ফেলল। পর মুহূর্তে সুরাইয়ার তলোয়ার তার সিনা পার হয়ে গেল।

তাহিরের সামনে একজন মাত্র তাতারী রয়েছে, আর সুরাইয়া বেশ স্বস্তির সাথে পড়ে থাকা দুশমনের পোষাকে তাঁর রক্তাক্ত তলোয়ার সাফ করছেন।

তাতারী এখনও জীবন মৃত্যুর পরোয়া না করে আহত হিংস্র জানোয়ারের মত প্রাণপণ হামলা চালাচ্ছে। আচানক তাহিরের ঠোঁটের উপর এক মৃদু হাসি খেলে গেল। মুজাহিদের মুখের এ হাসি তাঁর দুশমনের কানে মণ্ডতের ভয়াবহ অট্টহাস্যের মত বাজতে থাকে। তাঁর তলোয়ার বিদ্যুৎ বেগে তাতারীর মাথায় পড়ে তার সিনা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

সুরাইয়ার ঠোঁটের উপর তখনও খেলে যাচ্ছে এক টুকরা হাসি-যে হাসি সোনালী যুগের ইসলামের গাজীদের উদ্দেশ্যে ছিল মুসলিম বীর কুমারীদের সব চাইতে বড় ইনাম।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহিরের মনে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে গিয়ে ভেসে উঠল সেই অতীতের সুন্দর যুগের স্মৃতি। তখনওকার দিনের সহজ সরল আরব বালিকা ইসলামের মুজাহিদ ফৌজকে তার বস্তির উপর দিয়ে কুচ কাওয়াজ করে যেতে দেখে তাদের উদ্দেশ্যে গেয়ে উঠতঃ

'ওগো কওমের বীর সন্তান!<br>
তোমাদের ওই পথের আগে<br>
ঘোড়ার পায়ের দাপে ওড়ে ধূলি<br>
তাও চোখে মোর মধুর লাগে।<br>
কাহাকাশানের চেয়ে সুন্দর<br>
সে ধূলি মোদের চোখে মনোহর,<br>
চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল ওই<br>
ধূলি মাখা মুখ নয়নে জাগে।'

তাহিরের আস্তিনে রক্তের দাগ দেখে সুরাইয়া তখনি নিজের রুমাল বের করে বললেনঃ 'আপনার হাতে যখম হয়ে গেছে। আসুন আমি পট্টি বেঁধে দিচ্ছি।'

'একটা মামুলী আঁচড় লেগেছে।' বলে তাহির আস্তিন গুটিয়ে তাঁর বাযু সামনে এগিয়ে দিলেন। সুরাইয়া তাঁর যখমের উপর রুমাল বাঁধতে বাঁধতে বললেনঃ 'আমি মনে করেছিলাম, ওরা ছ'সাতজন হবে। অষ্টম লোকটি হয়ত আস্তাবলের পাহারায় ছিল। পিছন থেকে এসে সে আপনার উপর হামলা করতে যাচ্ছিল।'

ঃ 'আমি আপনার শোকরগুযারী করছি। আপনি না এলে ওর হামলা আমার পক্ষে বিপজ্জনক হত।'

ঃ 'আল্লাহর ওয়াস্তে ও কথাটি বলবেন না। আমি কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। আমি ওখানে থাকতে পারিনি। দরজায় এসে দেখি, লোকটি পিছন থেকে এসে আপনার উপর হামলা করতে যাচ্ছে। তখনও আমার মুখ থেকে চীৎকারধ্বনি বেরিয়ে এসেছে। তার জন্য

আমি লজ্জিত।'

ঃ 'সুরাইয়া! আলমে ইসলামে যখন পর্যন্ত তোমাদের মত মেয়ে জন্মাতে থাকবে, ততক্ষণ কোন শক্তিই মুসলমানকে ধ্বংস করতে পারবে না। কয়েক মুহূর্ত আগেও আমি সীমাহীন হতাশায় ডুবে ছিলাম, কিন্তু এখনও আমার দীল সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তোমার মত মেয়ে যে কওম পয়দা করতে পারে, সে কওমের মুখে হতাশা শব্দটিই আসতে পারে না। পাতাললে পৌঁছেও তারা আসমানের তারা ধরবার জন্য ফাঁদ পাততে পারে। ইনকিলাব তাদেরকে দমিত করতে পারে, মুছে ফেলতে পারে না। সাময়িক বিশৃংখলা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে না। তাতারী ঝড় অতি বড় বিপজ্জনক ঝড়, সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ তা আলমে ইসলামের শেষ প্রতিরোধ পর্যন্ত ভাসিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তখনও তুমি ও তোমার মত কওমের বীর নারীরা পাথর কণা সংগ্রহ করে তা দিয়ে গড়ে তুলবে অপরাজেয় পাহাড়।'

সুরাইয়ার চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা উছলে উঠল। তিনি বললেনঃ কয়েক মুহূর্ত আগে আমিও ভাবছিলাম যে, কওমের পুরুষদের রক্ত সফেদ হয়ে গেছে, কিন্তু না, যে কওম আপনার মতই সিপাহী পয়দা করতে পারে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তার ঝান্ডা অবনমিত করতে পারে না।'

ঃ 'কিন্তু তুমি কাঁদছো?'

সুরাইয়া হাসলেন। অশ্রুভেজা সে হাসি শিশির ধোয়া ফুলের হাসি। তার ভিতরে জান্নাতের হুরদের বেশুমার কলহাস্য লুকায়িত। তিনি বললেনঃ 'জানি না, কেন আমি আজ সকল দুঃখ ভুলে গেছি। হয়ত এর কারণ আমি আজ নিজ হাতে অন্ততঃ কওমের একজন দুশমনকে কতল করেছি।'

ঃ 'না, তার কারণ, তুমি তোমার কওমের এক সিপাহীর জান বাঁচিয়েছ। কিন্তু এবার চল, ইসমাইল ব্যস্ত হচ্ছে। হয়ত ঘোড়াগুলোও আমাদের ইন্তেজার করছে।'

তাহির একটা জলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে সুরাইয়ার সাথে গোপন কক্ষের দিকে চললেন। তাঁরা পাথরের সীল সরিয়ে ফেললে নীচে থেকে ইসমাইল চীৎকার করে বললোঃ 'দাঁড়াও। কে তুমি? আমার নিশানা কখনও ভুল হয় না।'

সুরাইয়া বললেনঃ ইসমাইল, আমরা আসছি।'

এজাযত রয়েছে' সে খুশীতে উচ্ছসিত হয়ে বলল।

তাহির ও সুরাইয়া হাসিমুখে নীচে নেমে দেখলেন, ইসমাইল তীর-ধনুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাহির বললেন ঃ ইসমাইল আমরা বলখ যাচ্ছি।'

ঃ 'কখন?'

ঃ 'এখনি। তোমার ঠান্ডা লাগবে না তো?'

ঃ 'জি না, আপাজান বলছিলেন, আপনি গরম মুলুকের বাসিন্দা। ঠান্ডাটা আপনারই বেশী লাগে।'

সুরাইয়া ভুনা গোশতের একটি থলে তাহিরের হাতে দিয়ে গোপন কক্ষের এক কোণের জ্বালানী কাঠ সরিয়ে ছোট একটি চামড়ার থলে বের করলেন। তারপর তাহিরকে বললেন। 'আমি কওমের এ আমানত আপনাকে সোপর্দ করছি। ওয়ালেদ মরহুম তাতারী হামলার

বিপদ সম্ভাবনা দেখেই বায়তুল মালের বেশীর ভাগ অর্থ সমরকন্দে পাঠিয়ে ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে যাবার আগে তিনি বাকি দু'হাজার আশরফী আমার হাতে দিয়ে গেলেন। আশরফী ছাড়া এর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি হীরা। এটি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমার মনে হয়, এতে কওমের বীর শহীদানের লা-ওয়ারিস বাচ্চাদের হক বেশী। আব্বাজান তাঁর নিজের আয়ের বেশীর ভাগ নানাজানের কাছে তেজারতে লাগাবার জন্য পাঠাতেন। তিনি বলখে আমাদের জন্য প্রচুর সম্পত্তি খরিদ করে রেখেছেন।'

তাহির থলে দুটি তুলে নিলেন। সুরাইয়া জলন্ত কাঠ দিয়ে একটি প্রদীপ জ্বালালেন। তারপর তিনজন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে মহলের কামরাগুলো পার হয়ে আস্তাবলে প্রবেশ করলেন।

আস্তাবলে তাতারীদের আটটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। তাহির, সুরাইয়া ও ইসমাইল তিনটি ঘোড়া বেছে নিয়ে সওয়ার হলেন। বাকী ঘোড়াগুলোকে মহলের বাইরে নিয়ে ছেড়ে দিলেন। বাইরের ফটক পার হয়ে কয়েক কদম চলবার পর সুরাইয়া ঘোড়া থামিয়ে তাহিরকে বললেন ঃ 'একটু দেরী করুন। শহর ছেড়ে যাবার আগে আমি একবার দোয়া করতে চাই।' তাহির ও ইসমাইল ঘোড়া থামিয়ে সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুরাইয়া তারা ভরা আসমানের দিকে চোখ তুলে বেদনাতুর কণ্ঠে বলতে লাগলেনঃ 'পরওয়ারদিগারে আলম! আমি তোমার প্রিয় পয়গাম্বরের উম্মতের হাজার হাজার অসহায় বালিকাদের একজন। তাদের হেফাযতের জন্য তুমি কওমের জোয়ানদের ফিরিয়ে দাও পূর্ব পুরুষের সেই শৌর্যবীর্য। তারা যেন এই মহলের উপর আবার উড়াতে পারে ইসলামের গৌরবের ঝান্ডা। গাজীদের ঘোড়ায় পদধ্বনিতে আর একবার মুখর হয়ে উঠুক এই শহরের জনহীন পথ। বিরান মসজিদে মসজিদে আর একবার ধ্বনিত হোক আল্লাহু আকবর আযান ধ্বনি। তোমার দ্বীন জয়ী হোক। আমীন!'

তাহির আর ইসমাইল তাঁর সাথে সাথে বললেন ঃ আমীন! তারপর তিনজনই ঘোড়ার লাগাম শিথিল করে দিলেন। খানিকক্ষণ পর তারা শহরের বাইরে উঁচু নীচু পথ ধরে বলখের দিকে চলতে লাগলেন। আসমান তখনও পরিস্কার। অসহনীয় ঠান্ডা লাগছে। কিন্তু ইসমাইল বার বার বলছে, আজকের আবহাওয়া বেশ ভাল। আমার এ পুস্তিন পরে বিরক্তি লাগছে।'

●

তৃতীয় দিন দুপুর বেলা তাহিরের নজরে পড়ল ছোট খাটো এক মুসলিম ফৌজের তাঁবু। তাঁবুর মধ্যে গিয়ে তাহির এক সিপাহীর কাছে প্রশ্ন করলে সে বলল যে, পূর্ব সীমান্তের চৌকিগুলো খালি করে চার হাজার সিপাহী এখানে জমা করা হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে তারা সমরকন্দের দিকে কুচ করে যাবে।

তাহির ফৌজের বড় অফিসারের সাথে মোলাকাত করতে চাইলেন। সিপাহী জবাব দিল যে ফৌজের প্রত্যেক পঞ্চাশ ষাটজন সিপাহীর এক একটি দলের উপর একজন করে আলাদা অফিসার রয়েছেন, কিন্তু ঠিক আগের দিন একটি লোক সেখানে এসে পৌছেছেন, আর সবাই এখনও তাঁরই হুকুম মেনে চলছে।

তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ 'সে লোকটি কে?'

সিপাহী জবাব দিল ঃ 'তৈমুর মালিক।'

ঃ 'তৈমুর মালিক? কোথায় তিনি?'

ঃ তাকে জানেন আপনি?'

ঃ 'তৈমুর মালিককে কে না জানে?'

সিপাহী তাহিরের ঘোড়ার লাগাম ধরে বলল ঃ 'আসুন, আপনাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। সুরাইয়া ও ইসমাইল তাদের পিছু পিছু চললেন। সিপাহী এক খিমার সামনে পৌঁছে থেমে গেল। তাহির, সুরাইয়া ও ইসমাইল ঘোড়া থেকে নামলেন। সিপাহী ভিতরে গিয়ে খবর দিল। খানিকক্ষণ পরেই তৈমুর মালিক বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাহিরকে দেখেই তিনি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিলেন বুকে।

'আল্লাহ্‌র শোকর, তুমি নিরাপদে রয়েছ' এই কথা বলে তিনি ইসমাইল ও সুরাইয়ার দিকে তাকালেন। সুরাইয়া যথারীতি পুরুষের পোশাক পরেছেন। তাঁর মুখের অর্ধেকটা পুস্তিনে ঢাকা। তৈমুল মালিক প্রশ্ন করলেন ঃ 'ইনি কে?'

তাহির বললেন ঃ 'ইনি আমার সাথী। ওঁর অতীতদিনের কাহিনী আমি আপনাকে বলব, কিন্তু পথে আমাদের আরাম করবার মওকা মেলে নি। ওকে মেয়েদের খিমায় পাঠিয়ে দিন।

'মেয়েদের খিমায়?' তৈমুর মালিক হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

তাহির হেসে জবাব দিলেন ঃ 'ইনি পুরুষ নন।'

তৈমুর মালিক বললেনঃ 'খাতুনে মোহতারাম! আপনার লেবাস দেখে আমি ভুল বুঝেছিলাম, কিন্তু আপনি পেরেশান হবেন না। কওমের পুরুষদের শৌর্যবীর্য যখন লোপ পেয়ে যায়, তখনও কওমের মেয়েদের এই পোষাকেই মানায়।'

সুরাইয়া চোখ নত করে জবাব দিলেন ঃ 'কওমের পুরুষদের শৌর্য সম্পর্কে আমি হতাশ হইনি।'

ঃ 'আপনি কেবল তাহিরকে দেখেছেন। কিন্তু তাতারীদের নাম শুনে যাদের হাত পঙ্গু হয়ে যায়, এমনি বুজদীলের সংখ্যা এ কওমের ভিতরে অনেক বেশী। কিন্তু এখনও এসব কথার সময় নয়। আপনাদের আরামের প্রয়োজন। মেয়েদের খিমা আপনার জন্য ঠিক হবে না। সেখানে প্রত্যেকের খুশীর জন্য আপনাকে বার বার আপনার অতীত দিনের কাহিনী শোনাতে হবে। তাই আমার খিমাই আমি আপনার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি। আমি আর তাহির অপর কোন খিমায় রাত কাটাব।'

তৈমুর মালিক এক সিপাহীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'একে ভিতরে নিয়ে যাও। আর এদের খানার ইন্তেজাম কর।'

সুরাইয়া ও ইসমাইল তৈমুর মালিকের বিস্তীর্ণ খিমার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তৈমুর মালিক তাহিরকে নিয়ে গেলেন আর এক অফিসারের খিমায়।

ভোরবেলায় গভীর ঘুমের মধ্যে সুরাইয়ার কানে এসে পৌঁছল আযানের মন-ভুলানো মধুর আওয়াজ। সারারাত তিনি ঘুমের ঘোরে দেখেছেন কত মিষ্টি মধুর সোনালী স্বপ্ন, আর দেখেছেন কত ভয়ানক স্বপ্ন। আযান-ধ্বনিকেও তার মনে হল সেই রাতের স্বপ্নেরই একটা অংশ। মুয়াযযিনের আযান শেষ হল। তিনি গর্দান উঁচু করে অস্পষ্ট আলোয় দেখলেন এদিক ওদিক তাকিয়ে। তিনি ভীতকণ্ঠে ডাকলেন ঃ ইসমাইল। ইসমাইল!

ইসমাইল তার পাশেই শুয়ে আছে। সে পাশ ফিরল। সুরাইয়া তাকে ঝাঁকুনী দিয়ে জাগালেন। সে উঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল ঃ আমি তৈরী।'

ঃ 'কোথায় যাবার জন্য তৈরী?'

ঃ 'বলখ যাবার জন্য, আর কোথায়?'

ঃ 'বলখ? উহু, সারা রাত আমি কত বিচিত্র স্বপ্নই দেখছি। আমি মনে করেছিলাম। যেন সেই গোপনকক্ষেই এখনও রয়েছি, কিন্তু উনি কোথায়?'

ঃ 'কে? তাহির? তিনি তাঁর দোস্তকে নিয়ে আর এক খিমায় রয়েছেন। আপনি এশার নামায পড়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি এসেছিলেন। বাইরে থেকে তিনি আমায় আওয়াজ দিয়েছিলেন। আমি তখনও জেগেই ছিলাম। তিনি ওখান থেকে জানতে চাইলেন, কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি না। আমি বললাম, নেই। আপনার কথা জানতে চাইলে আমি বললাম আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।'

ঃ 'আমার সম্পর্কে তিনি কি বললেন?'

ঃ 'তিনি বলছিলেনঃ "তোমার বোনের কোন তকলীফ হচ্ছে না তো?"

ঃ 'তুমি কি জবাব দিলে?'

ঃ 'আমি বললামঃ "তিনি এখনও গভীর ঘুমে নাক ডাকছেন"।

ঃ 'ভারী না-লায়েক হয়েছ তুমি। কবে আমি ঘুমের মধ্যে নাক ডাকাই? সত্যি বলতো একথা তুমি বলেছিলে?

ইসমাইল হাসতে হাসতে বলল ঃ 'না, আমি শুধু বলেছিলাম যে, আপনি ঘুমিয়ে আছেন।'

ঃ 'আর কি বললেন তিনি?

ঃ 'তারপর তিনি বললেন ঃ 'তুমি ঘুমাও গে। কাল ভোরে আমরা বলখের দিকে রওয়ানা হয়ে যাব? আচ্ছা আপা, আর একটা কথা। তিনি চলে যাবার পর খিমার মধ্যে কয়েকটি মেয়েছেলে এসেছিলেন। আপনাকে ঘুমে দেখে তাঁরা চলে গেলেন।'

ঃ 'তুমি আমায় জাগালেই পারতে!'

ঃ 'আমি জাগাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরাই নিষেধ করলেন। তাঁরা আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "একথা সত্যি যে, তোমার বোন এক তাতারীকে কতল করেছে?" আমি বললাম, হ্যাঁ! বিলকুল সত্যি কথা। তখনও তারা হয়রান হয়ে বললেনঃ ভোরে এসে তোমার বোনের সাথে দেখা করব আমরা"!

সুরাইয়া বললেনঃ 'তুমি গিয়ে পুরুষদের সাথে নামায পড়ে এস। আমিও নামায পড়ে নিচ্ছি।'

খানিকক্ষণ পর সুরাইয়া নামায পড়ে দোয়ার জন্য হাত তুললেন। দোয়া শেষ করে ফিরে দেখলেন, কয়েকটি মহিলা তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। এক যুবতী বললেন ঃ 'আমরা রাতের বেলায় এসেছিলাম। আপনি তখনও ঘুমিয়েছিলেন, তাই আপনাকে জাগানো ভাল মনে করিনি। আপনার কাহিনী আমরা শুনেছি। আপনাকে নিয়ে আমরা সত্যি গর্বিত।'

সুরাইয়া জওয়াব দিলেন ঃ 'আপনারা আমায় যে উৎসাহ দিচ্ছেন, তার জন্য শোকরিয়া! কিন্তু এটা এমন কিছু বড় কৃতিত্ব নয়।'

একটি মহিলা বললেন ঃ 'এরা তাতারীদের খুবই ভয় করে। আপনি এদেরকে উপদেশ দিন।'

সুরাইয়া বললেন ঃ উপদেশ দিতে তো আমি জানি না। আমিও আপনাদেরই একজন। সে যাই হোক, আপনাদের হুকুম আমি প্রত্যাখান করতে পারি না। আপনারা তশরীফ রাখুন।'

মহিলারা বসে পড়লেন। এক যুবতী বললেন ঃ 'একটু দেরী করুন। আমি সবাইকে ডেকে আনছি।' এই কথা বলে তিনি খিমা থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মহিলারা এসে প্রশস্ত খিমাটি ভরে ফেললেন।'

সুরাইয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করে বলতে শুরু করলেন ঃ 'আমার বিপন্ন বোনেরা। বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম মহিলাদের জীবনে এমন সংকট সন্ধিক্ষণ আর কখনও আসেনি। খারেযমে আজ আমাদের গৌরবের ঝান্ডা ভেঙে পড়ছে। তাতারী নৃশংসতা ও বর্বরতার ভয়াবহ সয়লাব কেবল খারেযমের উপর নয়, প্রত্যেকটি ইসলামী সালতানাতের উপর ফেলছে বিপদের ছায়া।

'ইসলামের সন্তানদের মধ্যে আগেকার সে শৌর্যবীর্য আর অবশিষ্ট নেই, তাই তোমরা এ সংকট পরিস্থিতিতে হতাশ হয়ে পড়েছ। তাদের ভিতরে সোনালী যুগের মুজাহেদিনের মত শাহাদাত বরণের সে উৎসাহ আর নেই, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছিঃ সেই বীর নারীরা আজ কোথায়, যারা একদিন স্বামী অথবা ভাইকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটতে দেখে খিমার খুঁটি তুলে নিয়ে বলতোঃ যদি তুমি বুজদীল বলে পরিচয় দাও, তাহলে তোমার মস্তক নিরাপদ থাকবে না।

'আমার বোনেরা! মনে রেখ, পতনমুখী কওমের শেষ অবলম্বন কওমের নারীরা। তোমরাই এ কওমের শেষ অবলম্বন। যতক্ষণ তোমাদের সিনা ঈমানের নূরে দীপ্তিমান, ততক্ষণ তোমাদের পুত্রদের, স্বামীদের, ভাইদের দুনিয়ার কোন শক্তি পরাজিত করতে পারবে না। যতক্ষণ কওমের মাতাদের পবিত্র দুধ রক্ত হয়ে তাদের সন্তানদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে থাকবে, ততক্ষণ তাদের মধ্যে শাহাদতের গৌরব অর্জনের আকাঙ্খা থাকবে জীবন্ত হয়ে। আর যতক্ষণ ইসলামের বীর সন্তানদের মধ্যে জীবন্ত থাকবে শাহাদতের আকাঙ্খা, ততক্ষণ তারা যে বড় কোন দুশমনের জন্য বয়ে আনবে মৃত্যুর পয়গাম।

'কওম যদি প্রাণহীন মোর্দা হয়েই থাকে, তাহলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করবার মত আবে হায়াত রয়েছে তোমাদেরই হাতে। কওম ঘুমন্ত থাকলে তোমরাই তাকে ঝাঁকুনী দিয়ে ঘুম ভাঙাবে। তোমরা পুরুষদের পায়ের শিকল হয়ো না। স্বামীদের বল ঃ তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে মাথা উঁচু করে ফিরে আসুক, তোমরা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে তাদের ইজ্জত ও আবরু হেফাজত করবে, ভাইদের বলঃ তারা ময়দানে সিনা পেতে দিয়ে তীরের আঘাত গ্রহণ করুক, তোমরা তাদেরকে নিয়ে ফখর করবে; পুত্রদের বলে দাওঃ ময়দানে যদি তারা বুজদীলের পরিচয় দেয় আর পেছন থেকে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে, তাহলে রোজ কিয়ামতে নবী করীম মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হুজুরে তোমরা আরযী পেশ করবে, যেন তিনি আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ না করেন, কারণ তারা তোমাদের দুধের মর্যাদা রক্ষা করেনি।'

সুরাইয়ার আওয়াজ খিমার বাইরে দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। তাহির, তৈমুর মালিক, বহু সিপাহী ও অফিসার খিমার বাইরে জমা হয়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন।

সুরাইয়া তাঁর কথা শেষ করলে তৈমুর মালিক উঁচু গলায় বাইরে থেকে বললেন ঃ 'মোহতারেমা খাতুন! আপনার ভাইরা অনেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এদের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যাঁরা তাতারীদের নাম শুনেই ঘাবড়ে যান। আপনি তাঁদেরকেও কিছুটা উৎসাহ দিন।'

সুরাইয়া কাঁপা গলায় জওয়াব দিলেন ঃ 'তাতারীদেরকে যারা ভয় করেন, তাদেরকে আমি ভাই বলতে রাজী নই। তাদেরকে বলে দিন, মুসলমান মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে, এমন কোন বালিকা এই ধরণের বুজদীল পুরুষকে ভাই বলে স্বীকার করবে না। যদি তাঁরা কর্তব্যে অবহেলা করেন, তাহলে আমরা হাতের কাকন খুলে তাদের হাতে পরিয়ে দেব এবং তাদের জংধরা তলোয়ার হাতে নিয়ে তাতারীদের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবো। আমাদের ভালবাসা ও আনুগত্য বাহাদুর সিপাহীদের জন্য, ভীরু বুজদীলের জন্য নয়। তাঁরা যদি আমাদের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তাহলে রোজ কিয়ামতে আল্লাহর সম্মানিত বান্দাদের কাতারে দাঁড়াবার প্রত্যাশা যেন তাঁরা না করেন। সেদিন ইসলামের বীর নারীরা যদি কাউকেও ভাই বলে স্বীকার করেন, তাহলে সে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা হবেন মুহাম্মদ বিন কাসিমের মত মুজাহিদ, যিনি তার কওমের একটি নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য মাত্র সতের বছর বয়সে একটি রাজ্য জয় করেছিলেন। সেদিন মুসলিম নারী নিজের বুজদীল স্বামীকে ভুলে শাহাদতের খুনে রঙ্গিন পোষাক পরিহিত অপর কোন বোনের স্বামীকে নিয়ে গর্ব করবেন। মুসলমান মায়েরা সেদিন বলবেনঃ 'আমাদের সন্তান সেই বুজদীল মানুষেরা নয়, যারা দুশমনের তলোয়ারের আঘাত বুক পেতে নিতে পারে নি; আমাদের সন্তান সেই বীর মুজাহিদরা, যাদের শৌর্য সাহস মুসলিম নারীকে করেছে দুনিয়ার নারী সমাজের চোখে সম্মানিতা। তাঁরা যদি চান যে, আমরা তাদেরকে ভাই বলে ফখর করি, তাহলে তাদেরকে আমাদের সামনে আসতে হবে খুন রঙ্গিন পোষাক পরে, দেহে জখমের দাগ নিয়ে।'

সুরাইয়া তাঁর কথা শেষ করলেন। মেয়েরা একে একে এগিয়ে এসে তাকে কোল দিতে লাগলেন। খিমার বাইরে তৈমুর মালিক তাহিরের কাছে বললেন ঃ 'যতক্ষণ এ কওমে এই ধরণের নারীর অস্তিত্ব থাকবে, ততক্ষণ আমরা ইসলামের দুশমনের সাথে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লড়াই করেও হার মানবো না। তাহির! খোশনসীব তুমি, আমি দোআ করি, মঞ্জিলে পৌঁছে তোমাদের জিন্দেগীর পথ যেন একে অন্যের থেকে জুদা না হয়ে যায়। তোমার উঁচু ইরাদার পূর্ণতার জন্য যে সাথীর প্রয়োজন ছিল, তা তোমার মিলে গেছে। ওকে চিরদিনের জন্য আপনার করে নেও।'

তাহির নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তখনও তাঁর কানে এসে বাজছে সুরাইয়ার কথাগুলো। কল্পনায় তিনি সুরাইয়াকে সাথে নিয়ে কোন এক উঁচু মিনারের উপর দাঁড়িয়ে নীচে সমাগত লক্ষ লক্ষ মানুষকে শোনাচ্ছেন জিহাদের পয়গাম। কল্পনার পট পরিবর্তন করে তিনি চলে গেছেন এক পাহাড়ের গায়ে, যেখানে আপনি ফোটা বুনো ফুলের দল হেসে হেসে

হাওয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের সুরভি সম্ভার, আর পাহাড়ী নদী গেয়ে চলেছে তার অন্তহীন আনন্দের গীত। সেখানেও সুরাইয়া তাঁর সঙ্গিনী। নদীর কিনারে ফুল শয্যা পেতে তিনি শুনছেন তাঁর মধুর মনভোলানো সঙ্গীত।

কল্পণা আবার তাকে নিয়ে গেল লড়াইয়ের ময়দানে সেখানে সুরাইয়া তাঁর যখমের উপর পট্টি বেঁধে দিচ্ছেন স্নেহ পেলব হাতে। বহুদিন পরে প্রথমবার তাঁর মনে ভেসে উঠছে আর একটি নারীর মুখ। সে মুখখানি সুফিয়ার। হয়ত তার কারণ, সুরাইয়া আর সুফিয়ার মধ্যে কোন বিশেষ দিক দিয়ে রয়েছে হুবহু মিল। হয়ত তার কারণ, সুরাইয়ার আগে তাঁর মনের পটে আঁকা ছিল একমাত্র সুফিয়ার অস্পষ্ট ছবি। সুফিয়া সম্পর্কে তিনি এর বেশী ভাবেননি। যে, তাঁর উপর সুফিয়ার মনে ছিল এক অতি গভীর সহানুভূতি, এমন এক সহানুভূতি, যা কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা করে না। তিনি তাঁর দীলের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য অথবা কম্পন অনুভব না করেও সুফিয়ার কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু সুরাইয়া সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি স্বতন্ত্র। বিজয়িনী সুরাইয়া তাঁর সবটুকু শক্তি দিয়ে যেন তাঁর মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন, তথাপি তাঁর অন্তরে বিশ্বাস রয়েছে, বলখ থেকে তাদের ভবিষ্যতের পথ জুদা হয়ে যাবে, তাঁর দীলের পটে অবশিষ্ট থাকবে শুধু একটি আনন্দপ্রদ স্মৃতি আর, সে স্মৃতিও হয়ত বেশিদিন তাকে পেরেশান করবে না।

তৈমুর মালিক খানিকক্ষণ তাঁর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বললেন ঃ 'কেন পেরেশান হচ্ছো তুমি? তুমি বললে, এ ব্যাপারে আমি তোমায় সাহায্য করতে পারব।'

'না, না' ঃ তাহির চমকে উঠে বললে ঃ 'এখনও নয়। এখনও আমার জীবনে এসব কথা চিন্তা করার সময় আসেনি।'

ভোরে নামাযের পর তাহির, সুরাইয়া ও ইসমাইল সফরের জন্য তৈরী হলেন। তৈমুর মালিক তাদের ক্লান্ত ঘোড়া তিনটির বদলে তিনটি বলিষ্ঠ ঘোড়ার ব্যবস্থা করলেন। তাহির বয়তুল মালের আশরফীগুলো তৈমুর মালিকের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। তৈমুর মালিক পথের বিভিন্ন শহরের হাকীমদের কাছে লিপি পাঠালেন, যেন তাদের যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রথম দু'এক মঞ্জিলে বিপদের আশঙ্কা করে তাদের হেফাজতের জন্য পাঠালেন বিশ সওয়ার।

বিদায় বেলায় তাহিরের সাথে মোসাফেহা করতে গিয়ে তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'আমার চিঠি তোমায় কেবল বাগদাদে পৌঁছতেই সাহায্য করবে না, বরং অবস্থা দেখে তুমি যদি আবার ফিরে আসতে চাও, তখনও তোমার কাজে লাগবে। চিঠিটা সামলে রেখ।' তারপর সুরাইয়ার দিকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ 'বোন আমার! ইনশাআল্লাহ, পথে আপনাদের কোন পেরেশানির কারণ ঘটবে না। আপনার সফরের সাথী এমন এক নওজোয়ান, যিনি একবার আমারও জান বাঁচিয়েছেন।'

'আমি ওকে জানি!' বলে সুরাইয়া তাহিরের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি অবনত করলেন। তাঁর মুখের উপর লজ্জার লালিমা যেন বলছে ঃ 'আপনি ওকে আমার চাইতে বেশী জানেন না।' সারাদিনের সফরের পর সন্ধ্যা বেলায় তারাঁ এক ফৌজী চৌকিতে এসে থামলেন। পরদিন সন্ধ্যায় এক শহরে পৌঁছে তাহির রক্ষী সৈন্যদলটি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। শহরের হাকিম তৈমুর মালিকের চিঠি পেয়ে তাদেরকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করলেন। ভোরে যখন সুরাইয়া

হাকীমের গৃহের মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুলেন, তখনও তিনি পুরুষের পোশাক ছেড়ে রীতিমত মহিলার পোশাক পরে নিয়েছেন।

তারা যখন ঘোড়ায় চড়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখনও সুরাইয়া লজ্জার সাথে বললেন : 'এখনও আর রাস্তায় কোন বিপদ নেই বলেই লেবাস বদল করে নিলাম। শুনলাম, তাতারীরা নাকি এখনও পূর্ণ শক্তিতে সমরকন্দ ও বোখারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

তাহির বললেন : 'সেই জন্যই তো আমি এত দ্রুত বাগদাদে পৌছাতে চাচ্ছি।' সুরাইয়া বললেন : 'আমারই জন্য আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও আর রাস্তায় আমাদের কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। আপনি যদি ভাল মনে করেন, তাহলে সামনের শহরের হাকীমকে বলব, তিনি আমার বলখে পৌঁছবার ইনতেযাম করে দেবেন, আর আপনি ওখান থেকে সোজা বাগদাদে চলে যাবেন।'

ইসমাইল বলল : 'না, না, আমি আপনাকে বলখ যাবার আগে যেতে দেব না।' আসলে সুরাইয়ার দীলের আওয়াজও ছিল তাই। তাহির বললেন : 'হ্যাঁ ভাই, তোমার জন্য আমি গযনী পর্যন্ত যেতেও রাযী।'

ইসমাইল বলল : 'খোদা যেন আমায় বলখের আগে না নিয়ে যান। ঘোড়ার উপর বসে বসে আমার পা নিঃসার হয়ে গেছে। কিন্তু বলকে আপনাকে কয়েকদিন আমাদের মেহমান হয়ে থাকতে হবে।

তাহির জওয়াব দিলেন : 'তা' হবে না। বলখের দরজায় পৌঁছেই আমার আর তোমাদের পথ আলাদা হয়ে যাবে।'

ইসমাইল বলল : 'আপনি আমাদের সাথে নানার বাড়িতে যাবেন না?'

: 'হায়! আমার যদি মত সময় থাকত।'

ইসমাইল হতাশ হয়ে বলল : 'আর কখনও আপনি আসবেন না।?'

ইসমাইলের প্রশ্ন সুরাইয়ার দীলে কম্পন জাগিয়ে তুললো। তাহির খানিকটা ইতস্ততঃ করে জওয়াব দিলেন : 'জীবনে যদি কখনও অবকাশ পাই' তাহলে ইশাআল্লাহ্, আসবো অবশ্যি।'

: তাহলে বলখে এসে অবশ্যি আমাদের ঘরটা দেখে যাবেন।'

: 'তোমার নানার নাম কি?'

: 'আবদুর রহমান।'

তাহির ও ইসমাইল বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে চললেন। সুরাইয়ার কানে তখনও তাহিরের একটি কথা বার বার বাজছে : 'জীবনে যদি কখনও অবকাশ পাই, তাহলে, ইনশাআল্লাহ আসবো অবশ্যি।' তাঁর দীলের মধ্যে বারংবার জাগে জিজ্ঞাসাঃ তিনি কি কথাটা শুধু ইসমাইলের সান্তনার জন্যই বললেন? তিনি কি জানেন যে, ইসমাইল ছাড়া আর কেউ আরও বেশী আগ্রহ নিয়ে বাগদাদের কাফেলার প্রতীক্ষা করবে?'

এখনও তাহিরের মুখ থেকে এমন একটি কথাও সুরাইয়া শোনেননি, যাতে বুঝা যাবে যে, জিন্দেগীর উচ্চ থেকে উচ্চতর মঞ্জিলের দিকে পদক্ষেপ করতে গিয়ে তাঁর ভুলে যাওয়া মঞ্জিলের সাথীর কোন স্মৃতি দীলের মধ্যে সংরক্ষিত থাকবে। তাহিরের উচ্চ আদর্শের জন্য তিনি গর্ববোধ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বকে তিনি সকল দিক দিয়েই শ্রদ্ধার যোগ্য মনে করেন। তাঁর ভিতরকার যাবতীয় বীরোচিত গুণের জন্য তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তাঁর দৃষ্টিতে

রয়েছে নেকী, শরাফত, শৌর্য ও পবিত্রতার ছাপ। কওমের জন্য কল্যাণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় গুণের সমন্বয় হয়েছে তাঁর ভিতরে। একই সাথে তিনি সুরাইয়ার আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ প্রতীক।

●

একটি একটি মঞ্জিল কাছে আসে, আর দু'জনেরই বুকের স্পন্দন বেড়ে চলে। হায় দু'জনেরই মনে আক্ষেপ, কেন তারা এখনও একে অন্যের মনোভাব সম্পর্কে বেখবর রয়েছেন। তাঁরা একে অন্যকে দেখতে চান, কিন্তু চোখ উপরে উঠতে চায় না। তাঁরা কথা বলতে চান, কিন্তু যবান মুক হয়ে যায়।

অবশেষে একদিন তারা এসে দাঁড়ালেন এক চৌরাস্তায়, যেখান থেকে বলখের বাড়ি-ঘর নজরে পড়ে। বাগদাদ ও বলখের রাস্তা সেখানে থেকে জুদা হয়ে গেছে। ইসমাইলের ঘোড়া কয়েক কদম আগে চলে গেছে। সে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'আপনি কেন দাঁড়িয়ে গেলেন? আসুন না!

তাহির বললেন ঃ দাঁড়াও, ইসমাইল।'

'আমি আর ঘোড়ার উপর বসতে পারছি না।' বলতে বলতে ইসমাইল ঘোড়া থেকে নামল এবং তার লাগাম ধরে কয়েক কদম পায়ে হেঁটে গিয়ে এক পাথরের উপর বসে পড়ল।

সুরাইয়া তাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'ওর ধারণা, আপনি আমাদের সাথে শেষ পর্যন্ত যাবেন।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনি আমার তরফ থেকে ওকে বুঝিয়ে বলবেন। এখান থেকে বিদায় নিয়ে গেলে সন্ধ্যার আগেই আমি এক মঞ্জিল অতিক্রম করে যেতে পারব।'

সুরাইয়া বিষন্ন কণ্ঠে বললেন ঃ 'আমি ওকে বুঝিয়ে বলব।'

ঃ 'আচ্ছা খোদা হাফিয।'

সুরাইয়ার ঠোঁট কেঁপে উঠল। তিনি খোদা হাফিয বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর গলা থেকে আওয়াজ বেরুলো না। তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

তাহির ঘোড়ার মুখ ফিরাবার ইরাদা করলেন, কিন্তু তাঁর হাত যেন অসার হয়ে গেছে।

'আচ্ছা আসুন।' বলতে বলতে সুরাইয়ার চোখ ফেটে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল।

'সুরাইয়া!' তাহির বলে উঠলেনঃ 'এই গাছটির দিকে তাকাও। সব গাছেরই পাতা ঝড়ে গেছে কিন্তু এটি এখনও সবুজ রয়েছে।'

সুরাইয়া ফিরে অপর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাহির বললেন ঃ 'এখনও আমার দিকে তাকিয়ো না। আমি তোমার কাছে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

সুরাইয়া বললেন ঃ 'বলুন যদি আপনার মনে আমার চোখের পানি কোন দাগ 'কেটে থাকে, তা'হলে বিশ্বাস করবেন, এ আমার কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আমার উপকারীকে আমি অশ্রু ছাড়া কিই-বা দিতে পারি?'

তাহির বললেন ঃ 'সুরাইয়া! মনে কর না যে, আমি তোমার মনোভাবের সাথে পরিচিত নই। একথাও মনে কর না যে, আমার দীলের মধ্যে তোমার এ অশ্রুর কোন মূল্য নেই। আমার স্পষ্টভাষণ যেন তোমার মনে ভুল ধারণা না জন্মায়। এমনি ভয়াবহ জামানায় বলার আর

শোনার মওকা বারবার আসে না, তাই আমি এ কথাগুলো বলছি। আগামীকাল আবার তোমার সাথে মিলবার প্রত্যাশা নিয়ে আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। হতে পারে, সে কাল খুব শীগগিরই আসবে; হতে পারে, সে কালের প্রতীক্ষায় বছরের পর বছর কেটে যাবে; আর এও সম্ভব যে, সে কাল কখনও আসবে না। যাই হোক, যদি আল্লা তা'আলা, আবার কোনদিন আমাদেরকে জিন্দেগীর চৌরাস্তায় এনে দাঁড় করিয়ে দেন, তাহলে জিন্দেগীর শেষ মঞ্জিল পর্যন্ত তোমার সঙ্গ আমার জন্য তার সর্বশ্রেষ্ঠ দান হয়ে থাকবে। আপাততঃ তোমায় একথা বোঝানো আমি বাহুল্য মনে করি যে, আমার কর্তব্য আমায় টেনে নিচ্ছে বাগদাদে এবং তারপরে তাতারীদের বিরুদ্ধে খারেযমের প্রত্যেকটি ঘাঁটিতে পৌঁছান হবে আমার কর্তব্য। তুমি সেই মুহূর্তের জন্য দো'আ কর, যখন আমি বিজয়ের খবর বয়ে নিয়ে আসবো বলখে, যেদিন আমার দেহাবরণ হবে আমারই খুনে রঙিন, আর আমার মুখের উপর থাকবে জখমের দাগ।'

সুরাইয়া ফিরে তাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আমি আপনার ইন্তেযার করব। হায়! সেই সব ঘাঁটিতে যদি আমি আপনার সাথে থাকতে পারতাম!' তাঁর চোখে ঝলসে উঠল আশার আলো। তাহিরের মনে হল, যেন মেঘের নেকাব ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এল আসমানের চাঁদ। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে সুরাইয়া বললেন 'এখনও আমি আপনার কাছে একটি অনুরোধ করব।'

'বল।'

'আপনি আমাদের সাথে নানার বাড়ি পর্যন্ত আসুন। আমি আপনাকে সেই দরজাটা মাত্র একটি বার দেখাতে চাই। সে দরজাটি আপনার জন্য সব সময়েই খোলা থাকবে। তাই আপনি যখন আবার ফিরে আসবেন বলখে, সেদিন আমাদের গৃহের কেউ যেন আপনাকে আগন্তুক মনে না করে। আপনি নানাজানের সাথে দেখা করলে তিনি খুশী হবেন। আমি ওয়াদা করছি, আজ নইলে কাল ভোরে অবশ্যি রওয়ানা করিয়ে দেব। আমার বিশ্বাস, আপনি একদিনেই দু'দিনের সফর পুরো করতে পারবেন। আমার জন্য.........।'

তাহির বললেন ঃ 'চল।'

ইসমাইল ছোট ছোট কাকর তুলে এক পাথরের উপর নিশানা করছিল। তাহির ও সুরাইয়াকে কাছে আসতে দেখে সে উঠে ঘোড়ায় সওয়ার হল।

## বারো

শেখ আবদুর রহমান দোহারা চেহারার মোটা বুদ্ধির স্বচ্ছল সওদাগর। বলখের স্বল্প সংখ্যক শানদার ইমারতের মধ্যে তাঁর বাড়িটাকে সহজেই ধরা যেতে পারে। তাঁর বিরাট কারবার দূর-দারাজ এলাকার শহরগুলোতে ছড়িয়ে আছে। তাঁর তেজারতী কাফেলা যাওয়া আসা করে বোখারা ও বাগদাদ থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত তামাম বড় বড় শহর বন্দরে। বসতবাড়ির সাথেই আর একটি প্রশস্ত ইমারতে তাঁর দফতর। তাতারী হামলার ফলে তিনি খারেযম থেকে গুটিয়ে এনেছেন তাঁর ব্যবসা। তার কাসেদ বোখারা আর সমরখন্দ থেকে নিয়ে আসছিল উদ্বেগজনক খবর, তাই তিনি বলখকে নিরাপদ মনে করে

কয়েক হফ্‌তা আগে থেকে সেখানে এনে জমা করতে শুরু করেছেন তাঁর মালমাত্তা। এখনও তাঁর বহু দামী আস্‌বাব পাঠাচ্ছেন গযনীতে।'

তাহিরকে যে কামরায় থাকতে দেওয়া হয়েছে, বহু দামী ইরানী গালিচা আর কিংখাবের পর্দা দিয়ে তা' সাজানো। ইসমাইলের সাথে তিনি কাছের মসজিদে মাগরেবের নামায পড়ে শহরের জনবহুল বাজারের দিক থেকে ঘুরে এলেন।

তিনি যখন ইসমাইলের সাথে কথা বলছেন, তখনও কামরার ভিতরে প্রবেশ করলেন এক বর্ষিয়সী মহিলা-হানিফা। ইসমাইল আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল ঃ 'নানীজান এসেছেন।' তাহিরও উঠে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। হানিফার চোখে শোক ও বিষাদের ছায়া। তিনি আসতে আসতে কোন ভূমিকা না করেই বললেন ঃ 'নওজোয়ান। আমি তোমার শোকরিয়া জানাচ্ছি। তুমি আমাদের অতি বড় উপকার করেছো। খোদা তোমার ভাল করুন।'

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'আমি নিজকে শোকরিয়ার যোগ্য মনে করি না। আমি শুধু কর্তব্য করেছি। ইসমাইলের ওয়ালেদ সম্পর্কে আমার আফ্‌সোস্‌ হচ্ছে।'

হানিফা গর্দান তুলে বললেন ঃ 'তিনি মরেন নি, শহীদ হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আমি এই প্রত্যাশাই করেছিলাম। সুরাইয়া আমায় বলেছে যে, তুমি ভোরে বাগদাদ রওয়ানা হয়ে যাচ্ছ। আমি তোমার জরুরি কাজে বাধা দেব না। কিন্তু যদি আবার কখনও এ পথে আস, তাহলে এ ঘরকে নিজের ঘর মনে কর। বলখে এক আরব মা তোমায় নিজের সন্তান মনে করেছে, বাগদাদে গিয়ে তা যেন ভুলে যেও না।' তারপর তিনি ইসমাইলকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'বেটা! তোমার নানা খবর পাঠিয়েছেন যে, তিনি মেহমানের সাথে খানা খাবেন, কিন্তু বেশী সময় তাঁর জন্য ইন্তেজার করবে না। বহু সওদাগর তাঁর কাছে রয়েছে। হয়ত তিনি এখানে আসার কথা ভুলেই যাবেন।' কামরা থেকে বেরুতে গিয়ে হানিফা দরজার কাছে থেমে গেলেন এবং তাহিরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'বেটা! ভোরে বিদায় নেবার আগে অবশ্যি আমার দো'আ নিয়ে যাবে।'

খানিকক্ষণ পর সামনের কামরা থেকে কে যেন ইসমাইলকে আওয়াজ দিলেন। তাহিরের দীলের মধ্যে মৃদু কম্পন অনুভূত হল। সুরাইয়ার গলার আওয়াজ। ইসমাইল দরজার পর্দা সরিয়ে সামনের কামরায় ঢুকলো। খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে সে বলল ঃ 'আপার ধারণা, নানাজানের আসতে হয়ত দেরী হবে। চলুন, আপনি খানা খেয়ে নিন।' আরও কিছুক্ষণ দেরী করলেই কি ভাল হত না? তাহির বললেন। ইসমাইল বলল ঃ 'নানাজানের কিছু ঠিক নেই। নানীজান বলছিলেন, তিনি কখনও আধা রাত দফতরে বসে হিসাব কিতাব দেখে কাটিয়ে দেন।'

বহুত আচ্ছা। বলে তাহির উঠলেন এবং ইসমাইলকে নিয়ে সামনের কামরায় গিয়ে ঢুকলেন।

●

দস্তরখান নানা রকম খানায় সাজানো। এক হাব্‌শী গোলাম এক কোণে আদবের সাথে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। রকমারী খানার দিক দিয়ে এ দস্তরখান

বাপদাদের কোন আমীরের দস্তরখানের চাইতে কোনদিক দিয়ে কম নয়।

তাহির বসতে বসতে ইসমাইলকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আর সব মেহমানও আসবেন?'
সে জওয়াব দিল ঃ 'আর সব মেহমানের জন্য খানা বাইরের মেহমানখানায় পাঠানো হল। আপাজান বলছিলেন, আপনার আরামের প্রয়োজন। ওসব লোক সারারাত আপনাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকবে। তাই আপনার জন্য এখানেই ইন্তেযাম করা হয়েছে।'

খানা খেয়ে তাহির ইসমাইলকে নিয়ে মসজিদে গিয়ে এশার নামায পড়লেন। তারপর কামরায় ফিরে এসে তাকে বললেন ঃ 'তোমার নিশ্চয়ই ঘুম পাচ্ছে, ইসমাইল! এখনও যাও, ঘুমোও গে।'

ইসমাইল উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার কি যেন চিন্তা করে ফিরে এল। তাহির বললেন ঃ 'কি ভাই, কোন কথা আছে?'

ইসমাইল বলল ঃ 'আমার ভয় হয়, আমি ঘুমে থাকতেই আপনি চলে না যান।'
তাহির তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ 'আমি তোমার সাথে দেখা করে তবে যাব। যাও, এখনও আরাম কর গে।'

ইসমাইল আশ্বস্ত হয়ে বাইরে চলে গেল।

নওকর জ্বলন্ত আগুনের উপর কয়েকখানা জ্বালানী কাঠ ফেলে দিল। তাহির কুরসী থেকে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তিনি যখন আধো ঘুমের অবস্থায় শুয়ে আছেন, তখনও ইসমাইল এসে কামরায় ঢুকে বলল ঃ 'নানাজান আপনার সাথে দেখা করতে আসছেন।' তাহির উঠে বসলেন। খানিকক্ষণ পর এক মধ্যমাকৃতি মোটাতাজা বৃদ্ধ এসে কামরায় প্রবেশ করলেন। তাহির জলদী উঠে তাঁর সাথে মোসাফেহা করলেন।'

শেখ আবদুর রহমান দু'তিন বার তাহিরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর কোন ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনার নাম তাহির?'

ঃ 'জি হাঁ।'

ঃ 'আপনি আরব?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'আপনি ওখানে কি করতেন?'

ঃ 'আমি ওখানে তৈমুর মালিকের এক সিপাহী ছিলাম।'

আবদুর রহমান বিষাদ ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন ঃ 'সে বদনসীবও ছিল এক সিপাহী।'
'কে?' তাহির প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'নাসিরউদ্দিন। এই বাচ্চাদের বাপ। আমি আমার বিবিকে অনেক বুঝিয়েছিলাম যে, সিপাহীর সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ভাল হবে না। সে বেচারী যখন মারা গেল, তখনও নাসিরুদ্দীন মিসরে নাসারাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। তারপর তার মনে খায়েয শাহের খেদমত করবার শখ চারা দিয়ে উঠল। এখনও এ বাচ্চাদের নানী কেঁদে কাটাচ্ছেন। এমন জামাইর সম্পর্কে আর কি খবরই বা আসতে পারতো? সিপাহী হয় লড়াই করে মরবে, নয়তো জখম হবে। এখনও আর কেঁদে কি ফায়দা?'

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'মাফ করবেন। কওমের জন্য আত্মদানকারী সিপাহীদের সম্পর্কে আমার রায় আপনার থেকে আলাদা।'

আবুদর রহমান বললেন ঃ 'আপনি কিছু মনে করবেন না। এ বিষয় নিয়ে আমি কথা কাটাকাটি করতে চাই না। তবে হ্যাঁ, আমি এতটুকু জানি যে, আমার বয়স এখনও যাট বছরের কাছাকাছি এসে গেছে, আর আজ পর্যন্ত আমার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগে নি। একবার আমি এক পাগলা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে ঘোড়ার লাগামে হাত লাগাবার আগে আমি তার জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সব খবর জেনে নিই, কিন্তু যেসব নওজোয়ান বারবার জখম হয়েও তলোয়ার নিয়ে খেলতেই ভালবাসে, তাদের কথা ভেবে আমি হয়রান হই।'

তাহির বললেন ঃ 'কওমের ইজ্জত আর আজাদীর কায়েম থাকে এইসব নওজোয়ানদের জন্যই। কওমের তামাম লোক যদি আপনার মত দেহে আঁচড়টি না লাগাতেন, তাহলে তাতারীরা জমিনের উপর আমাদের শ্বাস ফেলবার জায়গাও রাখতো না।'

ঃ 'আপনি ভুল বুঝলেন। সাধারণ সিপাহী সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। আমার নালিশ কেবল সেইসব লোকের বিরুদ্ধে, যাদের ঘরে আরামের সব ব্যবস্থাই রয়েছে, অথচ আপনার জনকে কাঁদাবার জন্যই যারা যুদ্ধের ময়দানে চলে যায়। নাসিরুদ্দীন ছিল সেই ধরণেরই লোক।

তাহির বললেন ঃ 'কওমের ইজ্জত আর আজাদীর জন্য লড়াই করা প্রত্যেকটি মানুষেরই ফরয। এখানে সাধারণ আর অসাধারণের কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। খোদার কাছে গরিব আর আমীরের খুনের মূল্য একই, বরং আমার মনে হয়, কওম আজাদ হলে আমীর-ওমরাহই বেশীরভাগ ফায়দা লুটে থাকেন, তাই কোরবানীর সময়েও তাদের কওমের পিছনে পড়ে না থেকে আগে থাকা উচিত।' আবদুর রহমান লা-জওয়াব হয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু বদলানোর জন্য ইসমাইলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কি বল, ইসমাইল! তুমি সওদাগর হবে, না সিপাহী?

ঃ আমি সিপাহী হব, সওদাগরও হব।'

আবদুর রহমান পেরেশান হয়ে তাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আমি শুনলাম, আপনি ভোরেই যেতে চাচ্ছেন।'

ঃ 'জি হ্যাঁ! আমি আজই যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনার সাথে মোলাকাত করবার জন্য থেকে গেলাম।'

বহুত আচ্ছা, ভোরে আমি অবশ্যি দেখা করব।' বলে আবদুর রহমান ইসমাইলকে বাযু ধরে বাইরে নিয়ে চললেন। বালাখানার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে নানা নাতিকে জোর গলায় বললেন ঃ 'বে-অকুফ! আমি খারেযম শাহকে দু'লাখ দিনার পাঠিয়ে দিয়েছি। তা দিয়ে তিনি অনেকগুলো সিপাহী ফৌজে ভর্তি করতে পারবেন। সিপাহীদেরকে তাচ্ছিল্য করা আমার মতলব নয়। আমি বলতে চাই যে, সওদাগরও নিজের কারবার সামলে নিয়ে কওমের জন্য অনেক কিছু করতে পারে। তোমার বাপ যদি খারেযম শাহের জন্য জান দিতে না গিয়ে আমার তেজারতের সাথী হত, তা হলে আমরা লাখো লাখো দিনারের কারবার বাড়াতে পারতাম, আর খারেযম শাহকেও বহুত বেশী করে সাহায্য দিতে পারতাম।'

ইসমাইল বলল ঃ 'আব্বাজান খারেযম শাহের জন্য জান দেননি, তিনি জান দিয়েছেন আমাদের আযাদীর জন্য–আমাদের ইজ্জতের জন্য।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে নানা বললেন ঃ 'তাইতো তোমাদেরকে একা ফেলে রেখে সে চলে গেছে। আল্লার শোকর কর, তিনি এই নওজোয়ানকে তোমাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন, নইলে জানি না, তোমাদের পরিণাম কে হত! কিন্তু তোমায় এমনি করে কথা বলতে কি শিখিয়েছে? চল!'

সিঁড়ির উপর আবার তাদের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। তাহির হাসতে হাসতে বিছানার উপর গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

●

ভোরবেলা তাহির মসজিদে নামায পড়ে কামরায় ফিরে এসে দেখলেন, ইসমাইল সেখান বসে আছে। সে বলল ঃ 'অপর কামরায় নাশতা তৈরী রয়েছে।'

তাহির নাশতা শেষ করলে এক নওকর এসে বলল ঃ 'মনিব আপনাকে যেতে বলেছেন।' তাহির ইসমাইলের সাথে কামরা থেকে বেরিয়ে এসে এক প্রশস্ত বারান্দার উপর দিয়ে কয়েক কদম চলবার পর এক সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় গেলেন। উপর তলার একটি মনোরম কামরায় ঢুকে দেখলেন, আবদুর রহমান তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে এক রূপার থালায় রয়েছে একটি থলে। তিনি উঠে তাহিরের সাথে মোসাফেহা করে তাঁকে নিজের পাশে বসাতে বসাতে বললেন ঃ 'আপনার ঘোড়া তৈরী। সুরাইয়া বলছিল যে, আপনার একটা দিন অপচয় হয়েছে। তাই আমি আপনাকে আমার আস্তাবলের শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটি দিচ্ছি। শহরের হাকীমের সাথে আমি দেখা করেছি। তিনি রাস্তার চৌকিগুলোর জন্য এই চিঠি লিখে দিয়েছেন। এই নিন।'

তাহির আবদুর রহমানের হাত থেকে হাকীমের লিপি নিয়ে বললেন ঃ 'শোকরিয়া। কিন্তু আমার কাছে তৈমুর মালিকের চিঠি রয়েছে।'

ঃ 'সুরাইয়া আমায় তা বলেছে। কিন্তু এখনও তৈমুর মালিকের সৌভাগ্যের সিতারার বিপর্যয় ঘটেছে। তাই আমার ভয় হল যে, হাকীমের সিপাহীরা তাঁর চিঠিকে অতটা গুরুত্ব নাও দিতে পারে। সুরাইয়া আরও আশঙ্কা প্রকাশ করছিল যে, তৈমুর মালিকের সাথী মনে করে চৌকির অফিসাররা আপনার কাছে হয়ত নানারকম প্রশ্ন করে আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করবে।'

তাহির উঠতে উঠতে বললেন ঃ 'আমি এ তকলীফের জন্য আপনার শোকরগুযারী করছি। এবার আমায় এজাযত দিন।'

'একটু দেরী করুন।' আবদুর রহমান রূপার থালা হাতে মোটাতাজা দেহটা সামলে নিয়ে উঠে বললেন ঃ 'আপনার তকলীফের বদলা দেওয়া আমার সাধ্যতীত। আমার তরফ থেকে এ সামান্য নযরানা আপনি কবুল করুন।

তাহিরের সুন্দর প্রশান্ত কপালে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দিল। তিনি আবদুর রহমানের হাত থেকে নিয়ে নীচে রেখে দিলেন। তারপর থলের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ 'এর ভিতরে কি?'

ঃ 'দু'হাজার আশরফী। আপনি এটাকে যদি কম মনে করেন, তাহলে আমি একে দ্বিগুণ করে দিতেও তৈরী।'

'আমার সম্পর্কে আপনি ভুল ধারণা করেছেন। আমায় এজাযত দিন।' বলতে বলতে তাহির মোসাফেহার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু আবদুর রহমান পেরেশান হয়ে দু'হাত দিয়ে নিজের পিরহানের নিচের দিকটা কচলাতে লাগলেন।

ঃ 'তুমি ক্ষেপে গেছ। কিসের ভুল ধারণা? তুমি যত বড় আশাই কর না কেন, তা আমি পূরণ করতে রাজী। আমি সুরাইয়া ও ইসমাইলকে হীরা দিয়ে ওজন করে তোমায় দিতে পারি। উপকারের বদলা উপকার। তুমি দীল খুলে আমার কাছে চাও, আমি দীল খুলে তোমায় দেব। আল্লাহর কসম, যে লোক সুরাইয়া ও ইসমাইলের জান বাঁচিয়েছে, সে আমার ঘর থেকে নারায হয়ে ফিরে যাবেন না। আমি এক আরব।'

তাহির বললেন ঃ 'আমি আপনাদের জন্য কিছুই করিনি। যা কিছু করেছি, তা আমার কর্তব্য হিসাবে করেছি। আপনি যদি আরব হয়ে থাকেন, আমিও এক আরব। কিন্তু আরব হবার আগে আমরা দু'জনই মুসলমান। মুসলমান কারুর আন্তরিকতাকে অর্থ দিয়ে পরিমাপ করে না।'

আব্দুর রহমান আরও কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু পিছনের কামরার দরজার পর্দা সরিয়ে সুরাইয়া আচানক কামরায় ঢুকে আবদুর রহমানের হাত ধরলেন।

'নানাজান!' সুরাইয়া কাঁপা আওয়াজে বললেন ঃ 'নানীজান আপনাকে ডাকছেন।' আবদুর রহমান কিছু না বলে সুরাইয়ার সাথে পিছনের কামরার দিকে চললেন। সুরাইয়া তাকে দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে তাহিরের দিকে নজর দিলেন। মুহূর্তকাল নির্বাক থেকে তিনি তাহিরকে দেখতে লাগলেন। পর্দার পিছনে যখন দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা গেল, তখনও বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে মার্জনা ভিক্ষার স্বরে তিনি তাহিরকে বললেন ঃ 'আমি আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি। আমি আপনাদের কাছে মাফ চাচ্ছি। আমি আপনাদের সব কথা শুনেছি। আমি আশা করছি, নানাজানকে আপনি একজন সাদাসিধা সওদাগর মনে করে তার ত্রুটি মাফ করবেন। তিনি তেজারত ছাড়া আর কিছুই জানেন না। সারাটা দুনিয়া তাঁর চোখে এক বাজার। রাতের আসমানে দীপ্তিমান সিতারাগুলোর দিকে তাকিয়েও তিনি মনে করেন, তারা পরস্পর লেনদেন নিয়ে আলাপ করছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এখান থেকে রাগ করে যাবেন না। এ সব আমারই ভুল। আমি জানতাম না, নইলে আমি ওকে বুঝিয়ে দিতাম। আপনি ওর দোষ মাফ করলেন কিনা বলুন। - আমার জন্য?'

তাহির হাসলেন। সুরাইয়া ভাবলেন, তার আসমান থেকে বিষাদের মেঘ কেটে গেছে। তাহির বললেন ঃ 'সুরাইয়া! কেন তুমি এত পেরেশান হচ্ছো? তোমার জন্য আমি বিষ মাখা তীর বুক পেতে নিতে পারি। তোমার নানা তো আমায় এমন কিছু বলেননি। তার জন্য আমার অন্তরে রয়েছে অশেষ ইজ্জত। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি আমায় অন্যায় কিছু বলেননি। ধরে নেও, যদি আমার কিছু না থাকত, তাহলে আমার প্রয়োজন উপলব্ধি করা কি তাঁর কর্তব্য হত না?'

সুরাইয়া হাসলেন। হাসির সাথে সাথেই তার চোখে উছলে উঠল অশ্রুধারা। তাহির একই সঙ্গে তাঁর মুখের হাসি আর চোখের অশ্রুধারা দেখে হয়রান হয়ে গেলেন। তিনি

ভোরের সূর্য কিরণে ফুলের জাগরণ দেখেছেন, আরও দেখেছেন গোলাপ পাপড়ির উপর মুক্তার মত শিশির বিন্দু। কিন্তু সুরাইয়ার চোখ দুটি যেন শিশির ধোয়া ফুলের চাইতে বেশী সুন্দর-মুগ্ধকর। তাঁর অধর যুগল সূর্যের সোনালী কিরণে হেসে ওঠা ফুলকলির চাইতেও বেশী চিত্তাকর্ষক।

এক বাহাদুর নারী মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হাসতে পারে, চরম দুঃখের ভিতরেও সংযত করতে পারে চোখের উছলে ওঠা অশ্রুধারা। কিন্তু আকস্মিক আনন্দের বার্তা শুনে যখন তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, তখনও তার চোখ অলক্ষ্যে লুটিয়ে দেয় চেপে রাখা অশ্রুভান্ডার।

সুরাইয়া বললেন ঃ 'আপনি আর একটুখানি দেরী করুন। নানীজান আপনাকে 'খোদা হাফিয' বলতে আসছেন। ইসমাইল, ওকে যেতে দিও না।'

সুরাইয়া বারান্দা পার হয়ে কাছের কামরায় ঢুকে তারপর পিছনের কামরায় গিয়ে পৌঁছলেন। সেই কামরাটির একটি দরজা এ কামরার দিকে খোলা। সেখানে তার নানী আর নানা পরস্পর আলাপ করছেন। আধা খোলা দরজার পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি খানিকক্ষণ তাদের আলাপ শুনলেন। তার বুক কাঁপতে লাগল। গালে আর কানে তিনি যেন এক অদ্ভুত উষ্ণতা অনুভব করলেন।

শেখ আবদুর রহমান বলছেন ঃ 'তাহলে সুরাইয়াও এই-ই চায়?'

সুরাইয়ার নানী জওয়াবে বলছেন ঃ 'সুরাইয়া যদি না চাইতো তাহলে আমি ওকে বে-অকুফ মনে করতাম। ভেবে দেখ, তুমি নিজে যদি সুরাইয়া হতে, তাহলে এমনি এক নওজোয়ানের জন্য তোমারও দীলের মধ্যে এক অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা কিনা জেগে থাকত? আবদুর রহমান খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠলেন ঃ 'সে যে সুদর্শন নওজোয়ান, তাতে সন্দেহ নাই। আর সে যে শরীফ, তাতেই বা সন্দেহ কি? উঁচু খান্দানের ছেলে বলেও তাকে মনে হয়। বেশ বুদ্ধিমানও বটে। তবু সুরাইয়া হলে শাদীর জন্য এ ধরণের নওজোয়ান বেছে নেবার মত বোকামী আমি করতাম না। আট প্রহরই তো ওদের মাথা থাকে তলোয়ারের মুখে। সে যাই হোক, আমি বুঝে নিয়েছি, তুমি আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু সুরাইয়া সম্পর্কে তোমার মতামত আমায় মানিয়ে নেবেই। তাই আমি আগেই হাতিয়ার সমর্পণ করছি। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, আমি এক্ষুণি তার সাথে কথা বলব। তবে সে চলে না গিয়ে থাকলেই হয়। ইসমাইল! ইসমাইল!!'

ঃ তিনি উঁচু গলায় হাঁক ছাড়লেন।

'জি' ঃ ইসমাইলের আওয়াজ শোনা গেল।

ঃ 'মেহমান ওখানে আছেন?'

ঃ'জি হ্যাঁ।'

ঃ তাকে একটুখানি দেরী করতে বল। আমি এখুনি আসছি।'

হানিফা বললেন ঃ 'আল্লাহর ওয়াস্তে আবার কোনরকম বোকামী করে বসো না।'

তিনি রেগে বললেন ঃ 'তুমি এখনও বলছ, ওকে আশরফী দিতে যাওয়াটা আমার বোকামী হয়েছে?'

হানিফা জওয়াবে বললেন ঃ 'বোকামী না তো কি?'

ঃ 'খোদার কসম, আমার বুদ্ধি হবার পর এই একটি মাত্র লোকই দেখলাম, যার ধন-দৌলতে অরুচি।'

ঃ 'আচ্ছা, এবার আল্লার দিকে চেয়ে যাও, কিন্তু বুঝে সুঝে কথা বল।'

ঃ 'তাহলে তোমার ধারণা, আমি না বুঝে সুঝেই কথা বলে থাকি। আল্লাহর কসম, দুনিয়ার একমাত্র তোমাকে আমি আমার বুদ্ধি স্বীকার করাতে পারলাম না, নইলে বলখ, সমরকন্দ আর বোখারায় এমন কোন শায়ের নেই, যিনি আমায় নিয়ে কাসিদা না লিখেছেন।'

ঃ 'আজ যদি তুমি কোন ভুল না কর, তাহলে আমিও চিরদিনের জন্য তোমার আকলমন্দি স্বীকার করে নেব।'

ঃ 'তাহলে তুমি দরজার কাছে বসে মনোযোগ দিয়ে আমার কথাবার্তা শুনতে থাক।'

সুরাইয়া যতটা প্রত্যাশা করেছিলেন, তার চাইতে বেশী শুনে ফেলেছেন। বনা হরিণীর মত তিনি কামরা থেকে ছুটে পালালেন এবং কয়েকটা কামরা পার হয়ে গিয়ে পৌঁছলেন নিজের কামরায়। বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের মুখ দেখলেন। তাঁর গাল লাল হয়ে উঠছে। তিনি জলদী করে কাগজ কলম তুলে নিয়ে গালিচার উপর বসে গেলেন লিখতে। তিনি চিঠি লিখছেন-
তাঁর পহেলা চিঠি।

●

আবদুর রহমান আর এক কামরায় তাহিরের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ইসমাইলকে বললেন ঃ 'বেটা! তুমি কিছু সময়ের জন্য বাইরে যাওতো।' ইসমাইল উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালো। আবদুর রহমান তাহিরকে বললেন ঃ 'বসে পড়, বেটা। তোমার দেরী তো হচ্ছেই, কিন্তু আমি একটা জরুরি কথা বলবো। বেশী সময় আমি নেব না।'

দু'জন সামনা সামনি বসে পড়লেন। আবদুর রহমান বললেন ঃ 'এ ধরণের কথা বলতে গিয়ে লোকে লম্বা চওড়া ভূমিকা করে থাকে। কিন্তু তোমায় জলদী যেতে হবে, আর আমি বড়ই ব্যস্ত। মেহমানখানায় অনেক সওদাগর আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের সাথে আমায় জরুরি কথা বলতে হবে। তাই এ কিস্সা আমি সংক্ষেপে সারবো। তোমার সামনে আমি দৌলত পেশ করেছি, আর তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছ। তাই আমার মনে বড়ই দুঃখ লেগেছে।'

তাহির হাসতে হাসতে জওয়াব দিলেন ঃ 'আপনি যদি এখনও তা নিয়ে পীড়া পীড়ি করেন, তাহলে আমার আরয, যে অর্থ আপনি আমায় দিতে চাচ্ছেন, তা খারেযম শাহের বায়তুল মালে পাঠিয়ে দিন। কওমের এর চাইতে বড় প্রয়োজনের সময় হয়ত আর আসবে না।'

ঃ 'তোমার আকাঙ্খা আমি প্রত্যাখ্যান করব না। এ অর্থ সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্ত এই মুহূর্তে আমি অপর কিছু বলতে চাচ্ছি।'

ঃ 'বলুন।'

ঃ 'তোমার দীলের মধ্যে এমন একটা আকাঙ্খা রয়েছে, যা তুমি এখনও আমার কাছে প্রকাশ করনি।'

আবদুর রহমানের বিবি তখনও পর্দার আড়ালে থেকে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন।

তাহির বললেন ঃ 'সেটা কোন আকাঙ্খা, আপনিই বলে দিন।'

ঃ 'কথাটা হচ্ছে, তুমি তোমার আখলাক আর শরাফতের পরিচয় দিয়ে একটা অতি বড় ইনামের দাবীদার হয়েছ।'

তাহির বললেন ঃ 'সে ইনাম যদি সোনা চাঁদি না হয়, তাহলে আমি তা হাসিল করে নিজকে খোশনসীব মনে করব।'

ঃ 'নওজোয়ান! কেন তুমি এ কথাটা সাফ বলতে পারছো না যে, সুরাইয়াকে ছাড়া তুমি আমার কাছে আর কিছুই চাও না।'

তাহির দৃষ্টি অবনত করলেন।

ঃ 'কথা বলছ না কেন?'

ঃ 'শরীফ নওজোয়ান এ ধরণের ব্যাপারে কথা বলে না।' এই কথা বলে হানিফা দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। তাহির আদব সহকারে উঠে দাঁড়ালেন। বুড়ি তাহিরের মাথায় স্নেহের সাথে হাত দুখানি রেখে বললেন ঃ বেঁচে থাক, বেটা! সুরাইয়া তোমারই। এখনও যাও, আবার জলদী ফিরে আসবার চেষ্টা কর।'

●

বিদ্যুৎগতি ঘোড়া প্রতি পদক্ষেপে দূরে আরও দূরে চলে যাচ্ছে, বলখের জমিন থেকে যেখানকার প্রতি বালুকণায় তাহির অনুভব করছেন মুহাব্বতের স্পন্দন। শেখ আবদুর রহমানের মহল আর বলখের বাজার অতিক্রম করে তিনি মনে করেছেন, এ শহরে তিনি অজানা-অচেনা নন। বুলবুল যেমন একটি মাত্র ফুলের প্রেমে আত্মভোলা হয়ে সারা বাগিচাকে আপনার করে নেয়, তেমনি বলখের প্রত্যেকটি জিনিস তাহিরের কাছে অন্তরঙ্গ অতি আপনার। তিনি যেন যুগ যুগ ধরে বাস করেছেন এই শহরে। বছরের পর বছর উড়ে বেড়িয়েছেন এই আবহাওয়ায়।

সুরাইয়াকে প্রথমবার ভাল করে দেখে নেবার পর তাঁর মনে হয়েছে, যেন তাঁর তস্বীর আগে থেকেই আঁকা ছিল তাঁর দীলের পর্দায়। তাঁর আওয়াজ বহু বছর আগে থেকেই গুঞ্জরণ করেছে তাঁর কানে কানে। তারা কতকালের সাথী, কেউ জানে না।

তাহিরের মনে কি এক চিন্তা জাগলো। এক হাত দিয়ে তিনি তার পিছনে জিনের সাথে বাঁধা সুন্দর থলেটা অনুভব করলেন। তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হতে গিয়ে থলেটা দেখেছিলেন। ইসমাইল বলেছিল ঃ 'আপাজান এতে খানা বেঁধে দিয়েছেন।' শহর থেকে বেরিয়ে তিনি এক কল্পনার দুনিয়ায় আপন ভোলা হয়ে গেলেন। কয়েক ক্রোশ এগিয়ে যাবার মধ্যে থলের কথা আর তাঁর মনে এল না।

থলে জিনের সাথে বেশ মজবুত করে বাঁধা রয়েছে, এই আশ্বাস মনে নিয়ে তিনি আবার ফিরে গেলেন কল্পনার রাজ্যে। এক নদীর কিনারে এসে ঘোড়া থেকে নেমে তিনি বসলেন এক পাথরের উপর।

পানি পান করে ঘোড়া কিনারের ছোট ছোট ঘাসের শীষ কেটে খেতে লাগল। তাহিরের ক্ষুধা পেয়েছে। তিনি থলে নামিয়ে আবার পাথরের উপর বসে গেলেন। থলে খুলেই তাঁর নজরে পড়ল এক রেশমী রুমাল। রুমাল বের করতে গিয়ে তাতে জড়ানো কাগজ আর তার খোশবু তাহিরের দীলে জাগিয়ে দিল অপূর্ব স্পন্দন। তিনি রুমালে জড়ানো কাগজ বের করে খুললেন। কালো অক্ষরগুলো রং বেরঙের ফুল হয়ে নাচতে লাগল তাঁর দৃষ্টির সামনে। তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে এল। আকাশে বাতাসে বেজে উঠল এক অপূর্ব সুর। সে সুরের তান বড়ই মর্মস্পর্শী। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল সে সুর। নৃত্যপর ফুলগুলো আবার রূপান্তরিত হল কালো অক্ষরে। তিনি সুরাইয়ার চিঠি পড়তে লাগলেন। একবার দুবার তৃতীয়বার তিনি উঁচু গলায় পড়লেন ঃ

'মোহসিন আমার! তুমি বলেছিলে, এমনি ভয়াবহ জামানায় শোনার আর বলার মওকা বার বার আসে না। সেই অনুভূতি নিয়েই আমি লিখছি এ কটি পংক্তি। নানাজান আর নানীজান আমার স্থায়ী হেফাজতের জন্য তোমায় নির্বাচন করেছেন। আমার ভয় হয়, আমার মনের অস্থিরতা প্রকাশ করে আমি নিজেকে এক মুজাহিদের খাদেমা হবার অযোগ্য প্রমাণ না করি।

তুমি যখন বলখ থেকে কিছুদূরে আমায় 'খোদা হাফিয' বলতে চেয়েছিলে, তখনও আমার চোখে দেখা দিয়েছিল অশ্রুধারা, তখনওকার অনুভূতি ছিল আমার জন্য অসহনীয়রূপে পীড়াদায়ক যে, আমরা দু'জন আলাদা হয়ে জিন্দেগীর কিতাবের নতুন পৃষ্ঠা উল্টাতে যাচ্ছি। তখনও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, সময়ের হাত আর একবার আমাদেরকে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে একই রাজপথে।

'এখনও আমি দীলের মধ্যে এ আশ্বাস অনুভব করছি ও তোমায় একিন দিচ্ছি যে, আর কোনদিন তুমি আমার চোখে অশ্রু দেখবে না।

আমি একথা অবশ্য বলবো যে, বাগদাদের মত বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ শহরে গিয়ে এই ছোট শহরটিকে তুমি ভুলো না, এর সাথে সাথে এ দো'আও আমি করব যে, আমার খেয়াল যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তোমার উঁচু ইরাদার পথে। আমার স্মৃতি যেন তোমার পায়ের শিকল না হয়। সম্ভবতঃ নানা ও নানীজান তোমার কাছে খুব শীগ্‌গীরই বলখে ফিরে আসার দাবী জানাবেন, কিন্তু আমি বলবো, বাগদাদে তোমার মকসুদ পুরো না করে তুমি ফিরে আসার ইরাদা কর না। আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আমি হামেশা তোমারই আছি। যতদিন সূর্য দুনিয়ায় আনতে থাকবে প্রভাতের পয়গাম, আর নিশীথে রাতের আসমানে জ্বলতে থাকবে সিতারার মালা, ততদিন আমি তোমারই ইন্তেযার করব। তুমি যেখানেই থাক, এই আশ্বাসই আমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি আমারই'।
সুরাইয়া

তাহির চিঠিখানা পকেটে পুরলেন। তাঁর ক্ষুধা যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। সামান্য নাশতা খেয়ে থলেটা জিনের সাথে বেঁধে নিয়ে তিনি তাতে সওয়ার হলেন। তখনও তাঁর কানে সংগীত সুরের মত বাজছে সুরাইয়ার শেষ কথাটিঃ 'তুমি যেখানেই থাক, এই আশ্বাসই আমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি আমারই।'

## তেরো

যায়েদ প্রতিদিনকার অভ্যাস মত এশার নামাযের পর আস্তাবলের দিকটা একবার ঘুরে এল। নওকরদের খানিকক্ষণ শাসিয়ে বাড়ির এক কামরায় এসে শুয়ে পড়ল সে। খানিকক্ষণ পর সে বাতি নিবিয়ে দেবার জন্য উঠল। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বিছানার তলায় হাত দিয়ে লোহার মজবুত সিন্দুকটা অনুভব করতে লাগল। সে বেশ জোরে জোরে সিন্দুকের তালাটা টেনে দেখল। তারপর আশ্বস্ত হয়ে বাতি নিবিয়ে দিল। এই সিন্দুকটার ভিতরে তাহিরের বাকী দৌলত আর সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার রাখা হয়েছিল। তাহির যায়েদের কাছে প্রাণের চাইতেও বেশী প্রিয়। তাহির চলে যাবার পর সে ঘরের বাইরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। নাঙ্গা তলোয়ার সাথে নিয়ে সে ঘুমায়, রাতের বেলা একটুখানি মামুলী শব্দ শুনে সে চমকে ওঠে, আর তলোয়ার হাতে নিয়ে সে বাগদাদের বেশুমার চোর ডাকাতদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তৈরী হয়ে থাকে। তার মনে হয়, যেন তাহিরের চলে যাবার পর তারা সবাই এই সিন্দুকটার উপর তাক লাগিয়ে বসে আছে। গোড়ার দিকের কয়েক হফ্‌তা সে সারারাত বসে থাকত তলোয়ার হাতে নিয়ে। তারপর পালংকের উপর না শুয়ে সে বিছানা পাতলো সিন্দুকটারই উপরে, কিন্তু সিন্দুকটা লম্বা চওড়ায় ছোট। কয়েকবার সে পাশ ফিরতে গিয়ে নীচে পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে তার আশঙ্কা কমে এল। সে সিন্দুকটাকে টেনে নিয়ে এল পালংকের তলায়। এ বাড়ির নওকররা বলে, ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে বকবার ব্যারামটা তার সেরে এসেছে।

তখনও যায়েদের ভাল করে ঘুম আসেনি। ফটকের দিক থেকে একটা খটখট আওয়াজ তার কানে এল। তারপর চৌকিদারের আওয়াজ, আবার ফটক খোলার চড়চড় শব্দ। সে তলোয়ার হাতে নিয়ে উঁচু গলায় চীৎকার করলে ঃ 'কে ওখানে?'

প্রশ্নের কোন জওয়াব না পেয়ে সে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে পথ দেখে কামরার দরজার কাছে এসে কান পেতে শুনলে, একটা ঘোড়া ফটক পার হয়ে ভিতরে আসছে, আর নওকররা একে অপরকে জাগাচ্ছে।

যায়েদ কোথায়?' কে যেন ঘরের কাছে এসে প্রশ্ন করলেন। যায়েদের মন খুশীতে উছলে উঠল। তাহিরের গলার আওয়াজ। চৌকিদার যখন জওয়াব দিল যে, সে ঘুমিয়ে আছে, তখনও আর তার তর সইলো না। সে ঝট করে দরজা খুলে ছুটে গিয়ে তাহিরকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

ঃ 'কিন্তু তোমার হাতে নাঙ্গা তলোয়ার যে?'

ঃ 'উহু, আমার কিছু মনে নেই। আমি আপনাকে ডাকাত মনে করে এমনি উঠে এসেছি।' তাহির হেসে উঠলেন। যায়েদের মনে হল, তাহিরকে শোনাবার মত যে হাজারো নালিশ তার মনে ছিল, সব ভুল হয়ে গেছে। প্রতীক্ষার দীর্ঘ রাত বসে বসে সে সব কথা সে কত বার মনে করছে। সে কেবল বলতে পারলো ঃ 'আপনি ভাল ছিলেন তো? যখম তো হননি? আমি বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম।

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'আমি বিলকুল ভাল আছি।'

ঃ 'আমি কালই এক নজজুমীর কাছে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

ঃ 'সে কি বললে?'

ঃ 'এবার ওকে পেলে ওর কিতাবপত্র ছিনিয়ে দরিয়ায় ফেলে দেব। মিথ্যুক, ফেরেববাস, শয়তান।'

ঃ 'তবু সে কি বলেছিল তোমায়?'

ঃ 'খোদা ওকে নিপাত করুন। সে বলছিল ঃ 'আপনার কিসমৎ খারাপ, আপনি তাতারীদের হাতে কয়েদ রয়েছেন। যতদিন সিতারার গর্দেশ না কাটবে, আপনি ফিরে আসতে পারবেন না। কিন্তু সিতারার গর্দেশ এক বছরের মধ্যেই কেটে যাবে। বেঈমানকে খামখা আমি পাঁচটি দিনার দিয়েছি। লোকটা আপনার সম্পর্কে আরও কত বাজে কথা বলেছে।'

তাহির হেসে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তা আবার কি?'

নওকররা তার কথা কান পেতে শুনছে দেখে যায়েদ চুপি চুপি বলল ঃ 'চলুন ভিতরে।' তাহির বাবুর্চিকে খানা তৈরী করবার হুকুম দিয়ে যায়েদের সাথে ভিতরে চলে গেলেন। কামরায় ঢুকে যায়েদ মশাল জ্বালালো। মশালের আলোয় সে তাহিরকে ভাল করে দেখলো। তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ 'সে বাজে কথাগুলো কি?'

ঃ 'লোকটি বলছিলঃ এক তাতারী শাহ্‌যাদী আপনার উপর আশিক হবে। তারই বদৌলতে আপনি কয়েদ থেকে খালাস পাবেন। কাল যদি ওকে পাই, তাহলে এমন গুতো লাগাবো, যা আজীবন মনে থাকবে।'

তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ 'মদীনার কোন চিঠি এসেছে?'

ঃ 'আহমদ বিন হাসান নিজেই এসে দু'হফ্‌তা থেকে গেছেন। বাগদাদে ফিরেই আপনাকে সব খবর লিখে জানাতে বলে গেছেন।'

তাহির তাঁর দোস্তদের খবর সুধালেন। যায়েদ জওয়াব দিল ঃ 'মোবারক রোজই আপনার খবর নিতে আসে। আজীজ আর আব্দুল মালিক আসেন দু'তিন দিন পর পর। আর সবাইও আসে কখনও কখনও। হ্যাঁ, এক বুড়োও কয়েকবার এসে আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছে।'

ঃ 'কে হতে পারে লোকটা?'

ঃ 'তা আমি জানি না। তবে একদিন আমি তার পিছু পিছু গিয়েছিলাম। দরিয়ার পুল পার হয়ে সে ঢুকলো উজিরে আযমের মহলে।'

তাহির বললেন ঃ 'এখনও আমি তোমায় একটা জরুরি কাজের ভার দিচ্ছি। এখুনি তুমি আব্দুল আজীজের কাছে চলে যাও। আমার তরফ থেকে তাঁকে বলবে, তিনি যেন আবদুল মালিক ও আর সব নির্ভরযোগ্য দোস্তকে নিয়ে শিগ্‌গিরই এখানে চলে আসেন। যদি তারা ঘুমে থাকেন, তবু বলে আসবে যে, খুবই জরুরি কাজ। আমার চিঠি নিয়ে যাও।'

●

তাহির খানা খেয়ে সুস্থ হবার মধ্যেই যায়েদ আবদুল আযীয, আবদুল মালিক ও মোবারককে সাথে নিয়ে এসে হাজির হল। যায়েদ আর এক কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তাহির বহুক্ষণ ধরে আলাপ করলেন বন্ধুদের সাথে। আবদুল আজীজের মতে এই ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছেন খলিফা, উজিরে আজম ও ওয়াহিদুদ্দীন। মোবারকের নিজের কোন মতামত নেই। সে শুধু আবদুল আজীজের কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছে।

আবদুল মালিক কিছু বলছেন না, চিন্তা করছেন। তাহির তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ 'আপনার সাথীদের মধ্যে যে এর সাক্ষ্য দিতে পারতো, সে মারা গেছে। ওয়াহিদুদ্দীন এখনও লুকিয়ে রয়েছেন। তাঁর জায়গায় কাজ করছেন তাঁর নায়েব মুহাল্লাব বিন-দাঊদ। আমরা যতক্ষণ ওয়াহিদুদ্দীনের কোন খোঁজ না পাচ্ছি, ততক্ষণ কারুর উপর অপরাধ প্রমাণ করতে পারব না। তিনি যদি মরে থাকেন, অথবা কোন অজানা কয়েদখানায় আটক থাকেন, তাহলে কম সে কম আমি তাঁর সম্পর্কে বলতে পারি যে, ষড়যন্ত্রের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।'

আবদুল আযীয প্রশ্ন করলেন ঃ 'তা কি করে?'

আবদুল মালিক জওয়াব দিলেন ঃ 'পর্দার আড়ালে মেরে ফেলার অথবা কয়েদ করার গরজ কেবল এমন লোকেরই থাকতে পারে, যে ভয় করে যে, তাকে আওয়ামের সামনে আনলে গোটা চক্রান্তের রহস্যটা ফাঁস হয়ে যাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ খলিফা অথবা উজিরে আজম অথবা আর কোন লোক-যিনিই তাঁর নাম দিয়ে এ চক্রান্ত গোপন করুন না কেন,-যদি তাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের মর্জি মোতাবেক কোথাও গোপন করে থাকেন তাহলে সাক্ষ্য প্রমাণের বেলায় এই কথাই ধরা হবে যে, তিনি একাই সব কিছুর জন্য দায়ী। তাই যতক্ষণ আমরা ওয়াহিদুদদীনের অদৃশ্য হয়ে যাবার রহস্য উদঘাটন করতে না পারবো, ততক্ষণ আমাদের পক্ষে এ সব ঘটনা নিয়ে কারুর সাথে আলোচনা করাই ঠিক হবে না।'

তাহির বললেন ঃ 'এ রহস্য কেবল তিনটি লোকের কাছ থেকে জানা যেতে পারে-খলিফা, উজিরে আজম আর মুহাল্লাব-বিন-দাউদ। মুহাল্লাবকে আমি এতে শরীক মনে করছি এইজন্য যে, ওয়াহিদুদ্দীনের গায়েব হয়ে যাবার পর সাধারণ অবস্থায় খলিফার পক্ষে তার নায়েবের উপর ভরসা করা মোটেই সংগত হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর সরাসরি একদম উজিরে খারেযা বনে যাওয়াতেই সন্দেহ পয়দা হয়েছে। এখনও প্রশ্ন হচ্ছে, তিন জনের মধ্যে আগে কার সাথে দেখা করা যায়?'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'সবার আগে আপনি উজিরে আযমের সাথে দেখা করুন। খলিফার প্রশস্ত মহলে এসব রহস্য ও রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত লোকেরা হামেশা দাফন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু উজিরে আযমের মহলে কম সে কম এমন একটি সত্তা রয়েছে, যাকে আপনি আপন জন বলতে পারেন।'

তিনি কে'? ঃ তাহির প্রশ্ন করলেন।

আবদুল মালিক হাসতে হাসতে বললেন ঃ 'আপনি ভুলে গেলেন? আমি তো আপনারই খাতিরে দু'তিন দিন পর পর আমার বিবিকে ওখানে পাঠিয়েছি সুফিয়াকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।'

তাহির বললেন ঃ 'আমার প্রতি আপনার হামদর্দী স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে যায়নি তো?'

ঃ না, আমি কেবল এক দোস্তের কর্তব্য পালন করেছি। তিনি বাস্তবিকই আপনার সম্পর্কে খুব পেরেশান ছিলেন।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনাকে বড় ভাই বানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জেনে রাখুন, সে যুবতীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

ঃ সে যাই হোক, তার আর আপনার মধ্যে রয়েছে আকর্ষণ। আকর্ষণ নয়, মুহব্বত। তিনি তার যোগ্য বলে আমি আনন্দিত। আমার বিবিও তাঁর বহুত তারিফ করেন।' চার দোস্ত আবার ফিরে এলেন তাদের আলোচনায়। বহু সময় আলোচনার পর ফয়সালা হল, তাহির সবার আগে উজিরে আজমের সাথে দেখা করবেন। আবদুল আজীজ সেখানেই ঘুমিয়ে থাকলেন। আবদুল মালিক ও মোবারক নিজ নিজ ঘরে চলে গেলেন।

●

ভোরবেলা নামাযের পর তাহির উজিরে আজমের মহলে গিয়ে পৌঁছলেন। বাগিচার ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে তিনি দু'ধারের সুদৃশ্য ফুলের কেয়ারীর দিকে তাকাতে তাকাতে পথ চলছিলেন। আচানক তিনি সেই ফুলের মাঝখানে দেখতে পেলেন এক খুবসুরত যুবতীর মুখ। তিনি ধীরে ধীরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। তার হাতে কতকগুলো ফুল। তিনি একটি ছোট গাছের কাছে গিয়ে থামলেন। তারপর নীচের দিকে ঝুঁকে একটি ফুল তুলবার জন্য তিনি হাত বাড়ালেন, কিন্তু তাহিরের পায়ের আওয়াজে তার নজর পড়ল তার দিকে। তাহির প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে চিনলেন। দজলার কিনারে দেখা সেই সুন্দর ডাগর চোখ। চাঁদের রোশনীতে এই বাগিচারই এক কোণে দেখা অপরূপ সুন্দর সেই মুখ। সুফিয়া-সেই সুফিয়া!

তাহিরকে দেখেই তার মুখে দেখা দিল এক আনন্দের দীপ্তি। এক মুহূর্তের জন্য তাহির থমকে দাঁড়ালেন। তারপরই দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।

উজিরে আজম খবর পেয়েই তাহিরকে ভিতরে ডেকে নিলেন। পরম উৎসাহে মোসাফেহা করে বললেন ঃ 'তুমি বড়ই দেরী করেছ। আমি হতাশা হয়ে গিয়েছিলাম। কবে এলে এখানে?'

তাহির কিছুটা বিস্তৃত বিবরণসহ প্রশ্নের জওয়াব দিবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর বুঝতে দেরী হল না যে, উজিরে আজমের মন রয়েছে অন্যত্র। তিনি যতটা হতাশ হয়েছেন, তার চাইতে বেশী হয়েছেন পেরেশান। তিনি মনে করেছিলেন, উজিরে আযম তখনি আবু ইসহাক, কামাল ও জামিলের কথা জানতে চাইবেন, কিন্তু মনে হল, যেন তাদের কথা তাঁর মনেই নেই।

তাহির তখনও কারাকোরাম পৌঁছবার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে উজিরে আজম তাঁর কথায় বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'খলিফার চিঠি পড়ে চেংগিস খান কি বলেছিলেন?

ঃ তিনি বলেছিলেন, খারেযমের উপর হামলা করবার ইরাদা তিনি বর্জন করেছেন।

'মিথ্যাবাদী! ফেরেববায!! ঃ তিনি ঠোঁট কামড়ে বললেন।

তাহির কিছুটা চিন্তা করে বললেন ঃ 'কিন্তু চেংগিস খানের কথায় বুঝা গিয়েছিল যে, তিনি খলিফার নিরপেক্ষ থাকা সম্পর্কে আশ্বাস পেয়েছেন। কারাকোরামে হয়ত এমন লোক মওজুদ ছিল, যে চেংগিস খানকে জানিয়েছে যে, খারেযম শাহের ব্যাপারে খলিফার যাহের-বাতেন মনোভাব এক নয়।

ঃ 'মত যে কোন আহমক বুঝতে পারে। চেংগিস খানকে আমরা অন্ততঃ আহমক মনে করি না। যা হোক, তোমায় ওখানে পাঠানো হয়েছিল, তার জন্য আমি দুঃখিত। এখনও দুনিয়াকে বলা যাবে যে, আমরা পর্দার আড়ালে থেকে চেংগিস খানকে উৎসাহ দিয়েছিলাম। সিপাহসালারের ইস্তাফার পর এ ধরণের সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে।

ঃ 'সিপাহসালার ইস্তাফা দিয়েছেন?'

উজিরে আজম প্রশ্ন শুনে চমকে উঠে বললেন ঃ 'এখনও এ খবর কারুর কাছে প্রকাশ কর না। তিনি যাতে তাঁর ইস্তাফাপত্র ফেরত নেন, আমি তার চেষ্টা করছি। এখনও তাঁকে আমাদের খুবই প্রয়োজন।

তাহির প্রশ্ন করলেনঃ 'ওয়াহিদউদ্দীনের কোন খবর পাওয়া গেল?

ঃ 'না। আমার এখনও ওসব ব্যাপার নিয়ে কোন মাথা-ব্যাথা নেই।

ঃ 'আমি খলিফার সাথে মোলাকাত করতে চাই। আপনি এ ব্যাপারে আমায় সাহায্য করবেন?

উজিরে আজম বেপরোয়া হয়ে জওয়াব দিলেন ঃ 'নওজোয়ানদের মনোভাবের প্রতি খলিফার কোন শ্রদ্ধা নেই। তুমি তাঁকে বলবে, এখখুনি খারেযম শাহের সাহায্যের সিদ্ধান্ত করা উচিত। যে জওয়াবের জন্য সিপাহসালার ইস্তাফা দিতে চাচ্ছেন, সেই জওয়াবই তুমি পাবে। সে জওয়াবটি হচ্ছেঃ 'তোমায় আমি কবে উপদেষ্টা বানিয়েছি?

ঃ 'সম্ভবতঃ আমি খলিফার কাছে আসন্ন বিপদের সঠিক নক্সা পেশ করতে পারতাম। এবং....।

উজিরে আজম বাধা দিয়ে বললেন ঃ 'বাছা! বাগদাদের পরামর্শ দেবার লোকের অভাব নেই। তুমি যাও, সময় হলে আমি তোমায় ডেকে আনবো। তোমার জন্য কোন উপযুক্ত পদের ব্যবস্থা করার চিন্তা আমি করছি। কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি খবর পাবে। তাহির বললেন ঃ 'আমি বুঝে নিয়েছি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সালতানাতের কোন পদে বহাল থেকে কেউ কওমের সত্যিকার খিদমত করতে পারে না। তথাপি আমি আপনাকে একিন দিচ্ছি যে সময় হলে আপনি আমায় কওমের জন্য জান দিতে তৈরী সিপাহী হিসাবে পাবেন।

●

সুফিয়া একটি ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে বাগিচার ভিতর দিয়ে প্রবাহমান নহরের কিনারে দাঁড়িয়ে একটি ফুল স্বচ্ছ পানির স্রোতে ছুঁড়ে ফেলছেন। ফুলটি কিছুদূর চলে গেলে আবার ছুঁড়ে ফেলছেন আর একটি ফুল। এমনি করে একটি তোড়া শেষ হয়ে গেলে আবার পাশের কেয়ারীতে গিয়ে নতুন ফুল তুলে আবার তৈরী করছেন তোড়া। তারপর ফিরে এসে আবার মশগুল হচ্ছে একই খেলায়। সুফিয়ার তৃতীয় তোড়াটি যখন শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে দেখা গেল, তাহির দেউড়ী থেকে বেরিয়ে দরজার সিঁড়ি

বেয়ে নেমে আসছেন। অমনি তিনি জলদী করে পার্শ্ববর্তী মর্মরের পুলের উপর দিয়ে নহর পার হয়ে গেলেন। তারপর পাশের কেয়ারী থেকে ফুল তুলতে লাগলেন। তাহির নিকটে আসছেন। সুফিয়া এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন। আশেপাশে কেউ নেই। তবু তার বুক কেঁপে উঠল। কম্পিত পদক্ষেপে তিনি কেয়ারী থেকে বেরিয়ে এলেন। নহর পার হয়ে আবার সড়কের উপর পৌঁছবার জন্য পা রাখলেন মর্মরের পুলের উপর, কিন্তু তার চোখের সামনে এসে বাঁধা দিল লজ্জার পর্দা। তার পা কেঁপে যাওয়ায় আচানক হোঁচট খেয়ে পানির কাছেই পড়ে গেলেন। তাহির জলদী করে এগিয়ে তার সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন। সুফিয়া হকচকিয়ে তার হাত ধরলেন। তার মুখের উপর লজ্জার লাল ও সাদা আভা খেলে গেল।

'শোকরিয়া।' উঠে এসে মানসিক চাঞ্চল্য সংযত করবার চেষ্টা করতে করতে সুফিয়া বললেন।

'বহুত আফসোস, আপনার চোট লাগেনি তো?' তাহির বললেন।

ঃ না।

তাহির দ্বিধাকুণ্ঠিত অবস্থায় পা ফেললেন। সুফিয়া জলদী করে বললেন ঃ 'আমি এই ফুল তুলছিলাম। এই যে নিন।' ফুলগুলো তিনি তাহিরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বিস্মিত তাহির ফুলগুলো হাতে নিলেন।

সুফিয়া বললেন ঃ 'বাগদাদে আপনার প্রতীক্ষা করা হয়েছে। আপনি বড্ড দেরী করেছেন?

ঃ 'হ্যাঁ, অমনি একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।'

তাহির আর কিছু না বলে চলতে শুরু করলেন। সুফিয়া কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কেয়ারীতে ফুলগুলো হাসছে, আর নহরের স্বচ্ছ পানি ছলছল কলকল অট্টহাস্য করে চলেছে। আরও কয়েকটি ফুল তুলে মর্মরের পুলের উপর দাঁড়িয়ে সুফিয়া একটি একটি করে ফুল ভাসাতে লাগলেন নহরের পানিতে।

'সুফিয়া! সুফিয়া!! তুমি আজ ঘরে আসবে না?' সকিনা দেউড়ীর কাছে মর্মরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ডাকলো।

'যাই, সকিনা।' জলদী করে পা ফেলতে ফেলতে সুফিয়া বললেন।

মহল থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাহির দরিয়ার পুলের উপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে ফুলগুলো দেখলেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে নিচে প্রবাহমান পানির দিকে তাকালেন। গভীর চিন্তার আবেশে ফুলগুলোর উপর তাঁর হাতের চাপ ঢিলে হয়ে গেল। ফুলগুলো দরিয়ার পানিতে পড়ে ভেসে ভেসে তাঁর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। 'সুরাইয়া! সুরাইয়া!! আমি তোমারই কেবল তোমারই! বলতে বলতে তিনি চলে গেলেন তাঁর নিজের পথে। প্রতি পদক্ষেপে তাঁর গতি হচ্ছে দ্রুত থেকে দ্রুততর।

তাহিরের গৃহে আবদুল আজীজ, আবদুল মালিক, মোবারক ও আফজল তাঁর জন্য ইন্তেজার করছেন। তাঁরা তাহিরকে দেখেই ক্রমাগত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তাহির বেশ স্বস্তির সাথে বসতে বসতে বললেন ঃ 'আমি হয়রান হচ্ছি এই ভেবে যে, এখনও এই কথাটা কেন আমার মাথায় আসেনি যে, এই মুহূর্তে আমরা এই চক্রান্তের আসল অপরাধীকে ধরতে বা ধরাতে পারলেও তাতে খারেযমের মুসিবতের

কোন ব্যতিক্রম ঘটছে না। হতে পারে, উজিরে আজম এর জন্য দায়ী; হতে পারে, খলিফারও এতে হাত রয়েছে; আর এও সম্ভব যে, দু'জনের কেউ এর জন্য দায়ী নন, কিন্তু এখনও অপচয় করবার মত যথেষ্ট সময় নেই। তাতারী সয়লাব প্রলয়ংকর বেগে এগিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে সব চাইতে বড় প্রয়োজন বাগদাদের বাসিন্দাদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে তোলা। তাদের গাফিলতির নিদ ভেঙে দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে তাদেরকে। বাগদাদে প্রত্যেক ফেরকা অপর ফেরকার বিরুদ্ধে, প্রত্যেক দল অপর দলের বিরুদ্ধে ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছে। তাদেরকে এখনও বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, এমনও এক ময়দান রয়েছে, যেখানে কুফরের সকল শক্তি সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানের সকল শক্তি সংহত করবার আহবান জানাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, এক সার্বজনীন বিপদ আমাদেরকে সম্মিলিত সংগ্রামের পথে চালিত করবে। এমনি অবস্থা এলে যেসব লোক চুপিচুপি তাতারীদের সাহায্য করে যাচ্ছে, তারা প্রকাশ্যে ধরা পড়ে যাবে। আমি চাই বাগদাদের প্রত্যেকটি মসজিদ থেকে একই আওয়াজ তুলতে। সে আওয়াজ হবে ঃ তাতারীদের মোকাবিলায় আমরা সবাই এক। সবার আগে আমি বাগদাদের জামে মসজিদ থেকে তুলবো এ আওয়াজ।'

আফজল বললঃ 'খোদা করুন, আপনি কামিয়াব হন, কিন্তু গত দু'তিন শতাব্দী ধরে বাগদাদের মুসলমান একে অপরের মাথা ভাঙতেই শিখেছে। সুন্নী শিয়ার দুশমন আর শিয়া সুন্নীর রক্তের জন্য পাগল। হানাফী, মালিকী ও শাফায়ী পরস্পর লড়াই করে যাচ্ছে। আপনি যে মসজিদে যাবেন, যে বৈঠকেই বক্তৃতা করবেন, আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন আসবেঃ হযরত, আপনি কোন ফেরকার সাথে যুক্ত রয়েছেন।'

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'সব মুশকিলের কথাই আমার জানা আছে, কিন্তু এহেন পরিস্থিতি যে দীর্ঘকাল কায়েম থাকবে, একথা মানতে আমি রাজী নই। সার্বজনীন বিপদের অনুভূতিই এসব বিভেদ লোপ করে দিতে-পারে।'

আফজল বলল ঃ 'আপনি চলে যাবার পর শিয়া সুন্নী দ্বন্দ্ব কতটা বেড়ে গিয়েছে, তা হয়ত আপনি এখনও শোনেন নি। গত কয়েক মাসে কত বেগুনাহ্ মানুষ অপরের হাতে কতল হয়ে গেছে!'

তাহির বললেন ঃ 'তার জন্য দায়ী আমাদের আরামপিয়াসী ওলামা, যাদের সামনে কোন আদর্শ নেই। কিন্তু আজ তাদেরকে বলে দিতে হবেঃ তোমাদের মোকাবিলা আজ এমন এক কওমের সাথে, যারা প্রত্যেকটি কলেমা পড়া মানুষের দুশমন, তোমাদের আজাদীর চেরাগ নিভিয়ে দেবে তারা। সেই ওলামাদের আমরা বলবঃ তোমরা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেখেছ, আজ কাফেরের দল তোমাদেরকে ময়দানে নামবার জন্য ডাকছে। আমার বিশ্বাস, আওয়াম তাদেরকে তাড়িয়ে ময়দানে নিয়ে আসবে।'

আবদুল আজীজ ও আবদুল মালিকও আলোচনায় অংশ নিলেন। অবশেষে ফয়সলা হল যে, জুমআর দিন তাহির জামে মসজিদে বাগদাদের বাসিন্দাদেরকে খারেযমের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তার আগে শহরে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, একটি লোক বাগদাদের বাসিন্দাদের কাছে খারেযমের মজলুম মুসলমানদের পয়গাম নিয়ে এসেছেন।'

উঠবার আগে আবদুল আজীজ বললেন ঃ 'আমার বিশ্বাস, হুকুমাত আমাদেরকে বেশী দিন এ ধরণের উদ্যোগ আয়োজনের এজাযত দেবেন না। আগামী কয়েক হফতা পর আমাদের মঞ্জিল হবে খারেযমের যুদ্ধের ময়দান, কিন্তু এই সময়টার মধ্যে আমাদের কার্যকলাপ হুকুমাতের কাছে প্রকাশ না হলেই ভাল হত। যারা আমাদেরকে তাতারীদের কাছে বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত করে রেখেছে, তারা তাহিরের বক্তৃতার পর চুপ করে বসে থাকবে না। তখনও পর্যন্ত তাহিরকে আমাদের লুকিয়ে রাখতে হবে, আওয়ামের জোশ যতক্ষণ না তাঁর জন্য এক অপরাজেয় কেল্লা হয়ে উঠছে। উজিরে আজম অথবা খলিফার মতলব খারাপ হলে তাঁরা শীগগিরই তাহিরকে গ্রেফতার করবার চেষ্টা করবেন। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মধ্যে গাদ্দারও কম নেই। তাই আমি আপনাদের সামনে তাহিরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবার কসম করছি। আপনাদেরকেও কসম করবার আবেদন জানাচ্ছি।'

তামাম দোস্ত তেমনি কসম করলেন। তারপর আবদুল আযীয বললেন ঃ 'এখনও আমাদের মধ্যে কেউ গাদ্দার প্রমাণিত হলে বাকী দোস্তদের কতর্ব্য হবে তাঁর গর্দান উড়িয়ে দেওয়া।'

সবাই তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তারপর বৈঠক ভেঙে গেল।

●

জুমআর আগে শহরের প্রত্যেক মুসজিদ মাদরাসার দরজায় ইশতেহার লাগিয়ে জানানো হল যে, জুম'আর নামাযের পর একটি লোক তুর্কীস্তানের মুসলমানের উপর তাতারী যুলুমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। কাজী ফখরুদ্দীন কিছু সংখ্যক সত্যিকার আলেম ও বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্রদের একটি দলকে সংহত করলেন। তারা ইশতেহার লিখে লিখে বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে দিলেন, আর কম বয়সী ছাত্রেরা বাগদাদের অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে লোককে জানিয়ে দিল যে, বাগদাদের মুসলমানদের কাছে তুর্কীস্তানের মুসলমানেরা পাঠিয়েছে এক পয়গাম এবং সে পয়গাম বহন করে এনেছেন সেই নওজোয়ান, যার বাপ ইসলামী হিলাল ও ইসায়ী ক্রুসের মধ্যে লড়াইয়ে জেরুযালেমের উপর উঁড়িয়ে ছিলেন মুসলমানের বিজয় পতাকা এবং ইনাম হিসাবে হাসিল করেছিলেন সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উজিরে আজম তাহিরকে নিজের মহলে ডেকে নিলেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেনঃ 'বাগদাদের লোকদের কি পয়গাম তুমি দিতে চাচ্ছো?'

উজিরে আজম সম্পর্কে তাহিরের সন্দেহ আর একবার নতুন করে জেগে উঠল, কিন্তু কৌশলে কাজ আদায় করাই তিনি ভাল মনে করে জওয়াব দিলেনঃ 'আপনি জানেন, সালতানাতে খারেযম তাতারীদের শেষ মঞ্জিল নয়। খারেযমে তাদের অভিযান সফল হলে পরবর্তী মঞ্জিল হবে ইরাক। সম্ভবতঃ দৌলতে আব্বাসিয়ার সাথে চেংগিস খানের মৈত্রী সম্পর্ক কায়েম থাকবে, কিন্তু কমজোরের পক্ষে শক্তিমানের দোস্তির উপর

ভরসা করা বোকামীরই নামান্তর। এইজন্য আমি চাই, আমরা নিকৃষ্টতম পরিস্থিতির জন্য তৈরী থাকবো। আমি শুধু চাই বাগদাদের ঘুমন্ত মুসলমানদের জাগিয়ে তুলতে, যেন দুশমন এসে গেলে তারা কম সে কম নিজের ঘরের হেফাজত করতে পারে।'

ঃ 'তুমি সেদিন আমায় কেন বললে না যে, তুমি জামে মসজিদে বক্তৃতা করতে চাও?'

ঃ 'তখনও এ ধারণা আমার মাথায় আসেনি। আপনি আমার জায়গায় থাকলে হয়ত এহেন ব্যাপারে কারুর কাছ থেকে পরামর্শ নেবার প্রয়োজন বোধ করতেন না।'

ঃ আমার ভয় হয়, তুমি খলিফার সম্পর্কে কোন গোস্তাখী না করে বস।'

ঃ 'কিন্ত আমার ধারণা, এই বক্তৃতা করে আমি খলিফার ও আপনার অতি বড় খিদমত করতে পারবো।'

উজিরে আজমের অনুরোধে তাহির ওখানেই খানা খেলেন। দস্তরখানে কাসিমও হাজির ছিলেন। তিনি এলএেলভাবে কতকগুলো প্রশ্ন করলেন খারেযম সম্পর্কে। তাহির উজিরে আজমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলে কাসিম বারান্দা পর্যন্ত তাঁর সাথে এলেন। তাহিরের সাথে মোসাফেহা করতে করতে তিনি তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনি এর আগে কোথাও কোন বড় মাহফিলে বক্তৃতা করেছেন কি?'

'আমি একজন সিপাহী মাত্র।' তাহির হেসে জওয়াব দিলেন।

মহলের বাইরে আবদুল আজীজ ও আবদুল মালিক নেহায়ত অস্থির ভাবে তাহিরের ইন্তেজার করছিলেন। আবদুল আজীজ তাকে দেখেই বললেনঃ 'আপনি অতি বড় ভুল করেছেন। আমরা ভয় করেছিলাম, হয়ত উজিরে আযম আপনাকে বিপজ্জনক মনে করে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দেবেন।'

তাহির জওয়াব দিলেনঃ ভয়তো আমিও করেছিলাম। কিন্ত কাল পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কে তাকে ভুল ধারণা করতে না হবে সুবুদ্ধির কাজ, নইলে তিনি মসজিদের দরজায় পাহারা বসাবেন।'

●

জুম'আর নামাযের পর এক নওজোয়ান মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে সমাগত লোকদের কাছে তাহির বিন ইউসুফের পরিচয় দিলেন। তাহির বক্তৃতা করতে উঠলেন। এত বড় জনতার সামনে তিনি এই প্রথমবার দাঁড়িয়েছেন। কোরআনে মজীদের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে তিনি কম্পিত কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করলেন। বাগদাদের বাসিন্দারা অতীতে বিতর্ক সভায় ও বৈঠকে বড় বড় নামজাদা বক্তার বক্তৃতা শুনেছে। খানিকক্ষণ তারা নির্লিপ্তভাবে বসে থাকল। তারপর তারা পরস্পর ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগল। জলসায় এমন লোকও ছিল, যারা বাগদাদের সব চাইতে বড় মসজিদের মিম্বরে কোন আগন্তুকের দাঁড়ানোকেই মনে করত অপমানকর। আওয়ামের ভিতর কেউ কেউ একথাও মনে করত যে, আজ একটা বিতর্ক সভা হলেই ভাল হত।

এক মশহুর আলেম উঠে বললেন ঃ 'আপনি মেহেরবানী করে বসে পড়ুন। যিনি তুর্কীস্তান থেকে এসেছেন, তাঁকে বলবার মওকা দিন।'

কতকলোক তাঁর কথায় হেসে উঠল। কিন্তু এ বিদ্রুপ তাহিরের মনে এক অপ্রত্যাশিত প্রভাব বিস্তার করল। তিনি মুহূর্তকাল চুপ থেকে আবার বক্তৃতা শুরু করলেনঃ

'আমার বন্ধুরা! এটা বিদ্রুপের জায়গা নয়, তথাপি আমি তোমাদের জিন্দাহ্ দীলের প্রশংসা করি। আহা ! যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানেও এমনি যিন্দাহ্ দীলের পরিচয় দিতে পারতে! আমি এখানে বক্তৃতা করে প্রশংসা কুড়াতে আসিনি। আমি বক্তা নই, কিসসা কথকও নই। তোমাদেরকে খুশী করবার মত কোন সামগ্রী আমার কাছে নেই। আমি একজন দূত মাত্র। তুর্কীস্তানের যে মুসলমানদের মস্তক স্তূপীকৃত করে তাতারী ফৌজ তাদের বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করছে, তাদেরই দূত আমি, আমি ইসলামের সেই বীর কন্যাদের দূত, যাঁদের ইজ্জতের রক্ষকরা আজ খাক ও খুনের মধ্যে তড়পাচ্ছে। এখনও তাদের শেষ আশাস্থল তোমরা। আমার কাছে হাসির পশরা নেই, আছে বেদনার অশ্রুধারা। ওগো কথার যাদুকররা! কওমকে ঘুম পাড়ানী গান শুনিয়ে তন্দ্রাতুর করে রাখার জামানা শেষ হয়ে গেছে। আমি তোমাদের মওতের নিদ ভাঙাতে চাই। আমার কথা কান দিয়ে শোন।'

তাহিরের আওয়াজ ক্রমেই বুলন্দ হয়ে উঠছে। থেমে থেমে কথা বলা জবানে এসেছে পাহাড়ী নদীর গতিবেগ। ধীরে ধীরে মানুষ অনুভব করতে লাগল সেই পাহাড়ী নদীর মউজ। সে দরিয়া যেন একে একে বাঁধ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। লোকগুলো যেন ভেসে যাচ্ছে এক সয়লাবের সাথে।

অতীতের নেকাব তুলে ফেলে তিনি ইশারা করছেন এক ভুলে যাওয়া মঞ্জিলের দিকে, যেখান থেকে মরুচারীরা বেরিয়ে এসেছিল দুনিয়া জয়ের ইরাদা বুকে নিয়ে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে তিনি তুলে ধরছেন সেই মুজাহেদিনের কাহিনী, যারা মাশরিক মাগরিবে উড়িয়েছিলেন ইসলামের জয় নিশান। তিনি ইশারা করছেন ভাবীকালের বুকে লুকানো ঝঞ্চার দিকে। জনতা রুদ্ধনিঃশ্বাসে শুনে যাচ্ছে তাঁর কথা। অনেকেরই চোখে পানি। এক নওজোয়ান বহু কষ্টে রুদ্ধ করেছিল কান্নার বেগ। তাহির বলে যাচ্ছেন ঃ

'কওমী জিন্দেগীর দুর্ভাগ্যের কালিমা অশ্রু দিয়ে মুছে ফেলা যায় না, তা মুছে ফেলতে হয় খুন দিয়ে। মনে রেখ, যে যিন্দেগী তোমরা যাপন করছ, তা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতি বিদ্রুপ। প্রকৃতির প্রতি বিদ্রুপ করে যারা, তাদেরকে প্রকৃতি কখনও ক্ষমা করে না। একদিন মুসলমান কাফের বাহিনীর মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে, কিন্তু আজ যখন কাফেররা তাদের সকল শক্তি তোমাদের বিরুদ্ধে সংহত করছে, তখনও তোমাদের আলেম সমাজ তোমাদেরকে বাগদাদের চৌরাস্তায় এনে জমা করে একে অপরের মাথা ভাঙবার পরামর্শ দিচ্ছে।'

বাগদাদের একটি দলের নামজাদা বক্তা বলে পরিচিত এক ব্যক্তি হঠাৎ দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল ঃ 'আমি বহুত আদব ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রশ্ন করছি ঃ আপনি কোন ফেরকায় যুক্ত রয়েছেন?'

তাহির তাকে বসতে ইশারা করে বললেন ঃ 'আমি এক মুসলমান।'

'কোন ধরণের মুসলমান?' লোকটি আবার প্রশ্ন করলেন।

তাহির উঁচু গলায় জওয়াব দিলেন ঃ 'তোমরা তিন শ' বছর ধরে মুসলমানদের ধরণ গণনা করে এসেছ, কিন্তু আজ আসল নকল, সত্য মিথ্যার ফয়সলা হল না। এর একমাত্র কারণ, তোমরা অপরকে ইসলামের কষ্টিপাথরে বিচার কর না, বরং তোমরা প্রত্যেকে নিজের জন্য আলাদা আলাদা কষ্টিপাথর তৈরী করে নিয়েছ, আর সে কষ্টি পাথরের বিচারে একমাত্র নিজে ছাড়া আর কেউ উতরে যেতে পার না। বন্ধুগণ! হতে পারে, আমি স্বল্পশিক্ষিত বলে তোমাদের মত চিন্তা করতে পারবো না। কল্পনার পাখা জুড়ে দিয়ে মুক্ত আসমানে উড়ে বেড়াতে পারবো না। অপরের ঈমান পরিমাপ করবার যে কষ্টিপাথর তোমরা বানিয়েছ, তাতে আমি উতরে যে যেতে পারব না। আমার মত লাখো লাখো মুসলমান হয়ত সে কষ্টিপাথরের বিচারে পুরো উতরে যেতে পারবে না। কিন্তু তোমরা যদি খারেযমের কোন ময়দানে আমার পাশাপাশি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যেতে আর ওখানে প্রশ্ন করতে, আমি কোন ধরণের মুসলমান, তাহলে আমি তোমায় জওয়াব দিতামঃ সামনে কয়েক কদম পরেই মওজুদ রয়েছে মোমেনের ঈমান পরিমাপ করবার কষ্টিপাথর। যদি আমি কাফের বাহিনীর তীর বৃষ্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসতে পারি, যদি তাদের তলোয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে কলেমা পড়তে পারি, যদি আমার শাহরগের কাছে মৃত্যুর মুঠি দেখেও আমার পা না কাঁপে, তাহলে বুঝে নিও যে, আমি এক মুসলমান। যদি আমার দেহ কাফেরদের ঘোড়ার পায়ের তলায় দলিত হয় আর মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্তেও মুখ থেকে দো'আ বেরিয়ে আসেঃ 'ইয়া আল্লাহ! তোমার মাহবুবের উম্মতের ঝান্ডা বুলন্দ রেখ', তাহলে বুঝবে, আমি এক মুসলমান। ভাইরা! আমার কথায় কিছু মনে কর না। তোমরা প্রতিদিন বাগদাদের চৌরাস্তায় যা নিয়ে বসে যাও, তা মোমেনের ঈমানের কষ্টিপাথর নয়। তাদের ঈমানের কষ্টিপাথর হচ্ছে ময়দানে জিহাদ। সেখানে প্রত্যেক মুসলমানের খুনের রঙ একই রকম লাল হোক সে শিয়া, সুন্নী, হানাফী অথবা মালিকী, হোক তোমাদের মত বুদ্ধিদীপ্ত আলেম অথবা আমার মত স্বল্পশিক্ষিত। দারুল আমানে যদি তোমরা হাজার বছর ধরে বিতর্ক করতে থাক, তাহলেও প্রমাণ করতে পারবে না, কে মিথ্যা আর কে সত্য। কিন্তু কোকন্দে আমি নিজের চোখে দেখেছি, এক ফেরকার মুসলমান অপরের জন্য বর্মের মত দাঁড়িয়ে গেছে। হামলার সময়ে তাদের কণ্ঠের ধ্বনি ছিল এক, শাহাদাত বরণের সময়ে তাদের কলেমা ছিল এক। তারা সবাই ছিল একই ধরণের মুসলমান। হ্যাঁ, ময়দানের বাইরে কয়েক ধরণের মুসলমান আমি দেখেছি। আমাদের মধ্যে একথা বলবার লোকও আছে যে, শক্তিমান দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ জায়েয নয়। এমন ধরণের লোকও আছে, যারা দুশমনের নাম শুনেই পালাবার পথ খোঁজে। এমন লোকও দেখা যায়, যারা ব্যক্তি হিসাবে নিজকে চেংগিস খানের করুণা পাবার যোগ্য প্রমাণের জন্য আলমে ইসলামকে তাতারীদের কাছে বিক্রী করে দিচ্ছে। তোমাদের এই শহরে যেখানে প্রত্যেক আলেম অপরের ঈমানের পরিমাপ

করতে ব্যস্ত সেখানে উঁচু বালাখানার বাসিন্দাদের এমন এক জামাআত মওজুদ রয়েছে, যারা তুর্কীস্তানের উপর তাতারী হামলার সাহায্য করছে।

'আমার প্রিয় ও বুজুর্গ বন্ধুগণ! বাগদাদের এত বড় জনসমাবেশে আর একবার বক্তৃতা করবার মওকা হয়ত আর কখনও আসবে না। আমার কথা কটি মনোযোগ দিয়ে কোন এবং যারা কম বেশী করে কওমের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে, তাদের কাছে পৌঁছে দিও আমার এ পয়গাম। তাতারী সয়লাব মামুলী সয়লাব নয়। বর্তমান মুহূর্তে দৌলতে খারেযম হচ্ছে সে সামনে সর্বশেষ প্রতিরোধের পাহাড়। যদি সে পাহাড় ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সে সয়লাব ওখানেই শেষ হয়ে যাবে না। তার উন্মাদ তরংগ দোলা একদিন বাগদাদের উঁচু বালাখানার ভিত কাঁপিয়ে দেবে। আমাদের গাফলত দুনিয়ার বুক থেকে আমাদের নাম নিশানা মিটিয়ে দেবে। আমি একথা বলছি না যে, ইসলাম মিটে যাবে। ইসলাম মিটে যাবার জন্য আসেনি। এ হচ্ছে আল্লার দ্বীন। তোমরা যদি তার হেফাজত করতে নাই পার, তাহলে আল্লাহ আর কোন কওমকে তার হেফাজতের জন্য মনোনীত করবেন। এ হচ্ছে এমন জাহাজ, যার উপর কোন ঝড় তুফান গালিব হতে পারে না। এ জাহাজ চিরকালই থাকবে ভাসমান। যদি তোমরা খোদার এ জাহাজ ছেড়ে আর কোন কিশতিতে সওয়ার হও, তাহলে তোমরাই ডুবে মরবে। আর কোন কওম সওয়ার হবে এ জাহাজে।

'তোমাদের কামিয়াবীর রহস্য হচ্ছে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন বর্তমানের চাইতে বেশী করে কখনও আসেনি। আজ কুফরের যাবতীয় শক্তি দুনিয়ার বুক থেকে তোমাদের নাম নিশানা মিটিয়ে দেবার জন্য সংহত হয়েছে।

'আমি আগেই বলেছি, বাগদাদের উঁচু বালাখানার বাসিন্দারা অনেকেই খারেযমের বিরুদ্ধে তাতারীদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।'

এক ব্যক্তি উঠে বলল ঃ 'আমরা তাদের নাম শুনতে চাই।'

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'আমি কেবল চক্রান্তের খবর জানি। এখনওই আমি কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বের দিকে ইশারা করতে পারছি না কিন্তু এখনও আমাদের জীবনে এমন এক সময় এসে গেছে যে, সকল গোপন মুনাফেকেরই কার্যকলাপ আমাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে। সালতানাতের যেসব ওমরাহ্‌ এখানে হাযির রয়েছেন, তাদের কাছে আমার আরজ, খলিফাতুল মুসলেমিনের সামনে তাঁর বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরুন। বর্তমান মুহূর্তে তাতারীদের মোকাবিলা করার জন্য খারেযমের পক্ষ সমর্থন না করা হবে আত্মহত্যারই শামিল। পরিস্থিতি খলিফাতুল মুসলেমিনের পক্ষ থেকে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার দাবী করছে। এরপর আর মুনাফেকদের খুঁজে বেড়াবার প্রয়োজন থাকবে না। তারা আপনা আপনি ময়দানে এসে যাবে। আমাদের টুটি টিপে আমাদের আওয়াজ দাবিয়ে দেওয়া হবে এবং খারেযমের মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার করা হবে ফতোয়া।

'তোমাদেরকে পথ দেখানো ছিল আমার কর্তব্য। এখনও কর্তব্যের পথে চলা অথবা নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকা তোমাদের কাজ। তোমরা সংঘবদ্ধ হলে আমার বিশ্বাস, খলিফাতুল মুসলেমিন শীগগিরই জিহাদ ঘোষণা করবেন। তিনি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে বেখবর নন। বাগদাদের বাসিন্দাদের মধ্যে কারা তাতারীদের সাথে চক্রান্ত করছেন,

আপাততঃ আমি সে কথা বলবার জন্য তৈরী নই। তার আগে আমি খলিফা ও উজিরে আজমের তরফ থেকে কোন ঘোষণার ইন্তেজার করার প্রয়োজন বোধ করছি। আমি আশা করছি যে, সে ঘোষণা জিহাদ সম্পর্কেই হবে, নইলে আমরা জোরের সাথে বলতে পারবো, বাগদাদে আলমে ইসলামের সব চাইতে বড় দুশমন কারা।

'এখনওক্তার মত আপনাদের মধ্যে যেসব লোক তাতারীদের বিরুদ্ধে খারেযমের মুসলমানের পক্ষ সমর্থন করতে প্রস্তুত,তাঁরা যেন আমায় তাদের একজন সহকর্মী মনে করেন। যদি তাঁরা দেখতে চান, ইসলামের কষ্টিপাথরে তাদের রং কতটা খোলে, তাহলে খারেযমের ময়দানে জিহাদ আমাদের কাছ থেকে সুদূর নয়।'

## চৌদ্দ

কয়েকদিন পর উজিরে আজমের মহলের এক প্রশস্ত কামরায় সালতানাতের ওমরাত নতুন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছেন। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে তাহির বিন ইউসুফের বক্তৃতা। একজন কর্মচারী বললেনঃ 'সে তো এক দেওয়ানা। তাকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর কোন এলাজ নেই। যখন খলিফার হুকুমও তাই, তখনও আমাদের কোন নরম পন্থা অবলম্বন করা উচিত হবে না।'

আর একজন বললেন ঃ 'সে কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর দোষারোপ করেনি। বাগদাদের লোকদের দৃষ্টিতে আমরা সবাই আজ অপরাধী। এর তদারক শীগগিরই হওয়া প্রয়োজন। আমাদের কাছে সব চাইতে তাজ্জবের কথা হচ্ছে, বাগদাদের সব ফেরকার লোকই তার পাশে গিয়ে জমা হচ্ছে। গত চল্লিশ বছরে কখনও শিয়া সুন্নীকে এক সাথে আমরা চলতে দেখিনি, কিন্তু এখনও শুনছি, তার বাড়ির এক দরজায় পাহারাদার শিয়া, আর দরজায় সুন্নী। গতরাত্রে চক মামুনিয়ায় এক বিতর্ক সভা হবার কথা ছিল। আমি নিজে ওখানে ছিলাম। সময়ের আগেই সে ওখানে পৌঁছে বক্তৃতা শুরু করে দিল। গত দু'শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথমবার একই ব্যক্তি সকল ফেরকার লোককে একই দিকে চালিত করল আর শ্রোতারা সব নির্বাক হয়ে থাকল। সে যখন প্রশ্ন করল ঃ তখনও তারা বিতর্ক চালিয়ে যেতে চায় কিনা, তখনও বেশীর ভাগই অনিচ্ছা জানিয়ে জওয়াব দিল। তার বক্তৃতার পর সব চাইতে আজব ব্যাপার হল এই যে, শিয়া-সুন্নী একে অপরের কাছাকাছি হতে লাগল। তাকে দেওয়ানা বললে আমরা নিজেদেরকেই ধোকা দেব। এখনও তাকে গ্রেফতার করলে বাগদাদের জনগণ যুক্তি সংগতভাবে বলতে পারবে যে, আমরা সত্যি সত্যি কোন ষড়যন্ত্রের রহস্য উদঘাটন করতে ভয় পাচ্ছি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, সে হয়ত শান্তিপূর্ণভাবে গ্রেফতার হতে রাজী হবে না। তাই আমাদের সাত তাড়াতাড়ি না করে কৌশলে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হবে।'

নয়া উজিরে খারেজা মুহাল্লাব বিন দাউদ এর আগে ছিলেন ওয়াহিদুদ্দীনের নায়েব। তিনি এক নওজোয়ান। লোক তাঁর জ্ঞানের তারিফ করত। দূরদর্শী বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। উজিরে আযম তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ 'আমার মতে তাঁর প্রথম বক্তৃতার পরই তাকে গ্রেফতার করা আমাদের উচিত ছিল। এখনও তিনি আমাদের ত্রুটির সুযোগ নিয়ে আহমকদের এক বড় জামাআতকে হাত করে নিয়েছেন। এখনও

তাঁর উপর হাত দেওয়া অবশ্যি বিপজ্জনক, কিন্তু বাগদাদকে বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমাদেরকে সে বিপদের মোকাবিলা করতে হবে।'

শহরের নাযিম উঠে বললেন ঃ 'উজিরে খারেজা যদি মনে করেন যে, আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি রয়েছে, তাহলে আমি জানিয়ে রাখা জরুরি মনে করি যে, সেই রাতেই আমরা তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে তাঁর কয়েকটি নওকর ছাড়া আর কেউ ছিল না। পরের রাত্রে গুপ্তচর খবর দিল যে, তিনি শহরের এক মসজিদে রয়েছেন, আপনি আমি সেখানে দু'শ সিপাহী পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু তাঁর হেফাযতের জন্য সেখানে মওজুদ ছিল তিন হাজার নওজোয়ান।' উজিরে খারেজা বললেন ঃ 'কিন্তু আমাদের কাছে সিপাহীর কমতি তো ছিল না।'

উজিরে আজম জওয়াবে বললেনঃ 'আমাদের সিপাহী ও অফিসারের মধ্যে বহুলোক তাঁর পক্ষে চলে গিয়েছে। আমার মহলেও গত কয়েকদিন ধরে যেসব ফয়সলা হয়েছে, যেকোন উপায়ে তা তাঁর কানে গিয়েছে। এক সন্ধ্যায় আমরা খবর পেলাম যে, তিনি এশার নামাযের পর মসজিদে বক্তৃতা করবেন, অমনি আমি পাঁচশ সিপাহীকে সাদা পোষাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বক্তৃতার পর তারা তাঁর চারদিক ঘিরে থাকবে এবং মসজিদ থেকে বাইরে আসা মাত্র তাকে গ্রেফতার করে আনবে, কিন্তু যথাসময়ে খবর পেয়ে তিনি আর মসজিদে এলেন না। এখনও খলিফার হুকুম, তাঁকে যে কোন উপায়ে গ্রেফতার করতে হবে। এ হুকুম তালিম করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। পঞ্চাশ জন মুফতী আজ তাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে ফতোয়া দিয়েছেন। কাল এ ফতোয়া প্রচার করা হবে। তারপর আওয়ামের প্রতিক্রিয়া দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাবে।'

ওমরাহ বৈঠক শেষ করে চলে গেলেন, কিন্তু মুহাল্লাব বিন দাউদ আরও কিছুক্ষণ উজিরে আজমের সাথে আলাপ করলেন। মুহাল্লাব প্রশ্ন করলেন ঃ 'বাগদাদে তাঁর পুরানো দোস্ত কে কে, আপনার জানা আছে?'

উজিরে আযম জওয়াব দিলেন ঃ 'কাসিমের সব কিছু জানা আছে।'

মুহাল্লাবের অনুরোধে উজিরে আজম এক খাদেমাকে হুকুম দিলেন কাসিমকে ডেকে আনতে। কাসিম এলে উজিরে আজম উঠে আর এক কামরায় চলে গেলেন। তারপর কাসিম ও মুহাল্লাবের মধ্যে চলল কথাবার্তা। কাসিম বললেন ঃ 'আমার মতে তাঁর যেসব দোস্ত রয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র আফজলকে দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করা যেতে পারে। তাহিরের সাথে তার ভাব রয়েছে সত্যি, কিন্তু সে আবদুল আজীজ, মোবারক ও আবদুল মালিকের মত চাকুরী থেকে ইস্তাফা দেয়নি।'

মুহাল্লাব প্রশ্ন করলেন ঃ 'কাল আপনি ওকে খাবারের দাওয়াত দিলেও এখানে আসবে?'

ঃ 'গত কয়েক দিন সে আমার সাথে দেখা করেছে। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক তেমন খারপ নয়। এক দিন সে তার অতীতের গোস্তাখীর জন্য মাফও চেয়েছিল। যতক্ষণ সে হুকামাতের কর্মচারী, ততক্ষণ আমরা তাকে নানারকম আশা দিতে পারবো। আপনি ভাল মনে করলে তাকে এখানে নিয়ে আসার ভার নতুন সিপাহসালারের উপর ন্যস্ত করা যাবে।'

মুহাল্লাব উঠে মোসাফেহা করতে করতে বললেন ঃ 'বহুত আচ্ছা, তাহলে কাল আপনারা এখানে আমার, সিপাহসালারের ও আফজলের দাওয়াত রইলো।'

সুফিয়া আজও যথারীতি বারান্দার ছাদে দাঁড়িয়ে জানালায় কান পেতে অনেক কিছু শুনে নিয়েছেন। কাসিম ও মুহাল্লাব বাইরে বেরিয়ে গেলে তিনি নীচে নিজের কামরায় চলে গেলেন। মুখোমুখি কামরার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, সকিনা ঘুমিয়ে রয়েছেন। ঘুমোবার আগে সুফিয়া নতুন নতুন ঘটনার বিবরণ লিখে রাখেন এবং ভোরে তা মহলের দরজার এক পাহারাদারের হাতে পৌঁছে দেন। তিনি যথারীতি কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন, কিন্তু কয়েক পংক্তি লেখার পরেই তার মনে এল এক নতুন ধারণা। সে ধারণা তাঁর মনের নীরব তন্ত্রীতে তুললো এক সুরের ঝংকার। হালকা মধুর সুর মুর্চ্ছনা বুলন্দ হতে লাগল। তার মনে হল, যেন সে মনভোলানো সুর এক গুরু গম্ভীর সংগীত হয়ে কোলে টেনে নিচ্ছে সারা সৃষ্টিকে। এ যেন এক ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক সয়লাব তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে যেন এক ভয়াবহ মেঘগর্জন আর ঝড়ো হাওয়ার প্রচন্ড আওয়াজ। কিন্তু সে ঝড়ে উড়ে যাবার ভয় নেই তাঁর। সে বন্যার তরঙ্গবেগে নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক, তবু তিনি ভেসে যেতে চান তার সাথে। তাঁর শিকড় ছিঁড়ে যাচ্ছে। কয়েদখানার দরজা খুলে যাচ্ছে। বাগদাদের উঁচু ইমরাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাহিরের সাথে সাহারায় আরবের এক মরু বাগিচায়। কল্পনার দোলায় তাঁর হাত থেকে কলম পড়ে গেছে। তাঁর মনে হয় যেন সহসা ছিঁড়ে গেছে তাঁর অস্তিত্বের তন্ত্রী। প্রশস্ত কামরা তার চোখে লাগছে জিন্দানখানার মত। পড়ে যাওয়া কলম তিনি হাতে তুলে নিলেন, কিন্তু না লিখে তিনি কাগজের উপর টানতে লাগলেন সোজা বাঁকা রেখা। তারপর খানিকক্ষণ চিন্তা করে কাগজের খালি জায়গায় লিখতে লাগলেন তাহির বিন ইউসুফের নাম। তারপর কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি বারবার বললেন আপন মনেঃ

'আমি তাঁর সাথে দেখা করব। আমি তাকে বুঝাতে পারবো যে, এখনও বাগদাদে থাকা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক। আমি তাকে বলবো আমায় এ খাঁচার বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে। এখানে আমার আপনার জন্য কেউ নেই। তিনি হয়ত যেতে চাইবেন না, তবু আমি তাকে বুঝিয়ে দেশে ফিরে যেতে রাজী করাবো, আমি চাচাকে বলবো না, সকিনাকে দিয়ে বলাবো, তাহলে তিনি মেনে নেবেন। আর যদি নাই মানেন, তবু আমার পরোয়া নেই। বাগদাদের কোন কাফেলা আমায় পৌঁছে দেবে সে মরু দেশে, কিন্তু এমন অবস্থায় তিনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন না তো? না, না, তিনি তেমন লোক তো নন। তিনি আমার, তিনি আমারই। তাহির! বন্দু!বন্দু আমার!'

তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যেও তার মুখে লেগে রইল এক টুকরা হাসি।

●

পরের রাত্রে কাসিমের দপ্তরখানে নয়া সিপাহসালার, মুহাল্লাব ও আফজল হাযির হয়েছেন। খানা শেষ হয়ে গেলে তাঁরা দরিয়ার কিনারে কাসিমের বসবার কামরায় গিয়ে

পৌঁছলেন। খানার কামরায় কান পেতে সুফিয়া তাহিরের সম্পর্কে বিশেষ কিছু শুনতে পারেন নি। তাঁরা অপর কামরায় যাবার জন্য উঠলে সুফিয়া তাদের আগেই সংকীর্ণ সিঁড়ির পথ বেয়ে বাইরের গ্যালারীতে গিয়ে পৌঁছলেন। কাসিমের বসবার ঘরের একটা জানালা এদিকে খোলা। খানিকক্ষণ এদিক ওদিকের নানা কথা চলল। অবশেষে মুহাল্লাব সিপাহসালারকে বললেন ঃ 'উজিরে আজমের ধারণা, আফজলকে ফৌজে একটা বড় পদ দেওয়া যেতে পারে। কাসিম কাল আমার সামনে তাঁর তারিফ করছিলেন। ফৌজে যোগ্য ও বিশ্বস্ত নওজোয়ানের খুবই প্রয়োজন। উজিরে আজমের খুবই আশা ছিল আবদুল আযিয ও আবদুল মালিকের উপর, কিন্তু আমি শুনলাম তারা চাকুরী ইস্তাফা দিয়ে তাহির বিন ইউসুফের সাহায্য করছে।'

সিপাহসালার বললেন ঃ 'উজিরে আজম ও আপনি চাইলে আমি তাকে উৎসাহ দিতে রাজী।'

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'তাছাড়া মিসরে আমাদের নতুন দূতেরও প্রয়োজন। আবদুল মালিকের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকলে এ কাজের জন্য সে-ই হত আমার মতে সব চাইতে উপযুক্ত লোক। কিন্তু আমার আফসোস, তাহির বিন ইউসুফ ভাল ভাল নওজোয়ানকে গোমরাহ্ করে ফেলছেন। আচ্ছা কাসিম, আপনার ধারণা কি? আমি খলিফার কাছে সুপারিশ করলে আফজল এ দায়িত্ব সামলে নিতে পারবে?'

কাসিম জবাব দিলেন ঃ 'তার যোগ্যতার উপর আমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমার ভয় হয়, আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযের দোস্ত বলে সে হয়ত বাগদাদ ছেড়ে যেতে চাইবে না।'

বাচ্চা ছেলের সামনে খেলনার স্তূপ রেখে দিলে তার যে অবস্থা হয়, আফজলের অবস্থাও হয়েছে তাই। সে উজিরে আজমের মহলে এসে সিপাহসালার ও উজিরে খারেজার সাথে খানা খেয়েছে। বাগদাদে সিপাহসালারের ডান হাত হবার আর মিসরে দূত হয়ে যাবার দরজা তার সামনে খুলে গেছে। জিন্দেগীতে প্রথমবার তার মনে জাগছে তার গুরুত্বের অনুভূতি। সে ঝুঁকে পড়ে বলল ঃ 'আমি যদি বাগদাদের কোন খিদমত করতে পারি, তাহলে কারুর দোস্তি আমার পথে বাধা সৃষ্টি করবে না।'

মুহাল্লাব তখনি জবাব দিলেন ঃ 'বাগদাদের জন্য আপনি অনেক কিছু করতে পারেন। আপনার দোস্তদের জন্যও অনেক কিছুই করতে পারেন। যদি আপনি আবদুল মালিক ও আবদুল আযীযকে দুঃখজনক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চান, তাহলে আপনার সামনে একটি মাত্র পথ রয়েছে।

ঃ সে কি?

ঃ তাদেরকে বুঝিয়ে বলুন।

আফজল জবাব দিল ঃ 'আমার জবান তাহিরের জাদু ভাঙতে পারে না।'

ঃ 'তাহির সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে, তিনি খারেযম শাহের ইশারায় বাগদাদে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। যেদিন তাঁর মকসাদ পুরা হবে, সেদিন তিনি চলে যাবেন খারেযমে, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপের শাস্তি ভুগতে হবে তাঁর দোস্তদের।'

আফজল জানে যে, তাহিরের বিরুদ্ধে এটা মিথ্যা দোষারোপ। কিন্তু মানুষের মনে যখন দুরাকাঙ্খা পয়দা হয়, তখনও সে আত্মাকে প্রবোধ দেবার জন্য কত মিথ্যাকেই না বিশ্বাস করে নেয়। সে বলল ঃ তা-ই যদি, তাহলে আপনারা কি চিন্তা করছেন?

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'তাকে গ্রেফতার করা আমরা জরুরি মনে করছি। কিন্তু আমরা চাই না, যারা তাঁর সত্য মিথ্যা কথায় ভুলে তাঁর সাথে মিলছে, ফৌজের সাথে তাদের কোন সংঘর্ষ হোক। এক অপরাধীকে গ্রেফতার করতে কোন বেগুনাহ্ মানুষের রক্তপাত করতেও আমরা চাই না। তাহিরের সাথেও আমরা কোন কঠোর ব্যবহার করতে চাই না। আমরা শুধু চাই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিতে। তাঁর চলে যাবার পর সব গোলযোগ আপনি ঠান্ডা হয়ে যাবে।'

আফজলের দীল সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কথা মিথ্যা। এরা চান তাহিরের রক্ত। কিন্তু তার আত্মার কাছে এক সান্ত্বনা। সে বলল ঃ 'আপনারা যদি আমায় ওয়াদা দেন যে, তাঁর উপর কোন কঠোর ব্যবহার করা হবে না, তাহলে আমি আপনাদের সাহায্য করতে রাজী।'

মুহাল্লাব বললেন ঃ তাঁর সাথে কঠোর ব্যবহার করবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি এও বিশ্বাস করি যে, তাঁর নিয়ত খারাপ নয়। খলিফা বা হুকুমাতের কোন কর্মচারী সম্পর্কে ভুল ধারণা করে তিনি বাগদাদের লোকদেরকে ক্ষেপিয়ে না তুলে যদি সোজা আমাদের কাছে আসতেন, তাহলে আমরা তার ভুল ধারণা দূর করে দিতে পারতাম, কিন্তু এখনও যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করা না হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর সাথে আমরা কোন কথাও বলতে পারছি না। মত বড় বাহাদুর ও বুদ্ধিমান নওজোয়ান কওমের কাজে না লেগে যে কওমের ভিতরে বিরোধ সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছেন আর তা-ও এক ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে, এটা আমার পক্ষে বড়ই পীড়াদায়ক। আমি তাঁর সাথে মোলাকাত করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাদের গোপন বৈঠকের সন্ধান পাইনি। আপনি যদি আমাদের সাহায্য করেন, তাহলে একটি অতি বড় কাজ হবে।'

সিপাহসালার বললেন ঃ 'আফজল যদি আপনার সাহায্য করতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই করবে।'

কাসিম বললেনঃ 'আপনি বিশ্বাস করুন, যে লোক মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নিজের জান পর্যন্ত কোরবান করবার হিম্মৎ রাখে, সে কারুর দোস্তির জন্য পরোয়া করে না।'

আফজলের মনে গ্লানির বোঝা হালকা হয়ে এসেছে। সে বলল ঃ 'কথা হচ্ছে, আমি এখনও ফৌজ থেকে ইস্তাফা দেইনি বলে তারা আমার উপর বেশী ভরসা করে না। তাহিরের কয়েকটা ঠিকানা আমার জানা আছে, কিন্তু আজ তিনি কোথায় থাকবেন, তা আমি জানি না। তাঁকে কেবল রাত্রের ঘুমের সময় পাওয়া যেতে পারে। দিনের বেলায় তাঁর সাথে থাকে বহুলোক। দু'একদিনের মধ্যে আমি আপনাকে জানাতে পারব তিনি আজকাল কোথায় ঘুমান?'

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'এ অভিযান সফল হল আমার বিশ্বাস, খলিফা ও উজিরে আজম ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে শোকরিয়া জানাবেন। আরও সম্ভব আপনাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য মনে করা হবে।

আফজল বলল ঃ কিন্তু আপনার ওয়াদা মনে রাখবেন যে, তাহিরের সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করা হবে না।

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'আমি ওয়াদায় কায়েম থাকবো।'

মুহাল্লাব উঠতে উঠতে কাসিমকে বললেন ঃ 'আপনি উজিরে আজমকে এসব কথা বলবেন না।'

কাসিম জবাব দিলেন ঃ 'না। আমি নিজেও চাই, যেন আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবার আগে কেউ এর বিন্দু বিসর্গ না জানতে পারে।'

●

কাসিম মেহমানদের বিদায় করবার জন্য তাদের সাথে বাইরের দরজা পর্যন্ত এলেন। দরজায় এসে মুহাল্লাব বললেন ঃ 'কাল উজিরে আজম শেকায়েত করছিলেন যে, ওদের গুপ্তচরের নজর থেকে আপনাদের মহল নিরাপদ নয়। যদি কেউ আমাদের আজকের কথাবার্তাও শুনে থাকে, তাহলে?'

কাসিম হেসে জবাব দিলেন ঃ 'এ কামরার ছাদের উপর শুধু এক জোড়া কবুতর থাকে। তাদের কান আছে, জবান নেই।

কিন্তু ফিরে আসার সময়ে কাসিম কতকটা পেরেশান হয়ে কথাটা চিন্তা করতে লাগলেন। তার মনে আশঙ্কা জাগলো ঃ 'এ ষড়যন্ত্রের খবর তাহিরের কানে গেলে তাঁর পরবর্তী বক্তৃতা হবে আরও কঠোর।

পথে ফুলের কেয়ারী থেকে তিনি কয়েকটা ফুল তুলে নিয়ে নিজের কামরার দরজায় গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন। তারপর হাসিমুখে চললেন সুফিয়ার কামরার দিকে। বারবার তাঁর মন বলতে লাগল ঃ 'খোদা জানেন, কেন আমার উপর ওর এত বিদ্বেষ!'

সুফিয়া ঘুমিয়ে থাকলে কাসিম চুপি চুপি গিয়ে তাঁর বিছানায় রেখে আসবেন ফুলগুলো। কিন্তু তাঁর কামরার আধখোলা দরজা থেকে বেরিয়ে আসছে আলো। তিনি দরজার কাছে থেমে চিন্তা করলেন, তারপর ফিরে চললেন আপন পথে। কিন্তু দু'তিন কদম গিয়েই তাঁর কানে এল কামরার ভিতর থেকে কারুর চাপা আলাপের আওয়াজ।

সকিনা ও সুফিয়া ঘুমোবার সময়ে একে অন্যকে কিসসা কাহিনী শোনান। কিন্তু এ আওয়াজ বেশ কিছুটা মোটা মনে হচ্ছে। সুফিয়া যেন কার সাথে আস্তে আস্তে কথা বলছেন। কাসিম জলদী করে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনলেন ঃ 'দেখ, এখনও কথা বলবার সময় নেই। তুমি এখনি চলে যাও। বার বার আমি তোমায় তকলীফ দেব না। এই লও আমার আংটি। আমি তোমায় আরও অনেক কিছু দেব।'

কাসিম জলদী করে পিছু হটে এক থামের পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। দরজা খুলে গেল। এক বাঁদী দ্রুত পায়ে কাসিমের পাশ দিয়ে চলে গেল।

কাসিম নীরব পদক্ষেপে সেখান থেকে চলে গেলেন। আর এক পথ ধরে তিনি বাঁদীর আগেই গিয়ে পৌঁছলেন মহলের সিঁড়ির উপর। বাঁদী নীচে নামতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো তাকে দেখে।

'এ সময়ে তুমি কোথায় চলেছ?' কাসিম প্রশ্ন করলেন।

'জি, আমি.........আমি।' বাঁদী ভয়ে কাঁপতে লাগল।

কাসিম তাতে শান্ত করার জন্য বললেন : 'আমি ভূত নই। ভয় পাচ্ছ কেন? এস এদিকে?'

কাসিম তার বাযু ধরে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন।

: 'তুই কোথায় চলেছিস বল।'

বাঁদী নানারকম অজুহাত দিতে লাগল, কিন্তু কাসিম এক ঝকঝকে ছুরি বের করলে সে চিৎকার করে বলল : 'আমি সব বলছি। সুফিয়া আমায় চিঠি নিয়ে পাঠিয়েছেন।'

: 'কোথায়?'

: 'দরজার এক পাহারাদারের কাছে।'

বাজে বকছ তুমি! কাসিম ছুরির মাথাটা তার সিনার উপর রেখে বললেন।

: না,না আমি সত্যি বলছি। পাহারাদার এ চিঠি কোথায় নিয়ে যাবে, আমি জানি না।'

: কোথায় সে চিঠি?'

বাঁদী তার আস্তিন থেকে রেশমী রুমাল বের করল। তাতে জড়ানো চিঠিটা বের করে সে কাসিমের হাতে দিল। কাসিম চিঠি পড়লেন। তাতে সংক্ষেপে লেখা রয়েছে : 'আপনার সম্পর্কে এক ভয়াবহ ফয়সলা হয়ে গেছে। আফজল আপনাকে ধরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। আরও অনেক কথা আছে, যা জবানী বলার প্রয়োজন মনে করি। কাসেদ আপনাকে এমন এক জায়গা বলে দেবে, যেখানে কোন বিপদের মোকাবিলা না করে আমরা দেখা করতে পারবো। আল্লাহর ওয়াস্তে অবশ্যি আসবেন।'

রাগে কাসিমের ঠোঁট কাঁপছে। বাঁদী তার আগুনের মত চোখের দিকে তাকাতে না পেরে কেঁদে দিল।

'খামোশ! কাসিম গর্জন করে উঠলেন।

: 'আমি বেকসুর, আমার উপর রহম করুন। আমি এক বাঁদী। সুফিয়ার কথা কি করে না শুনে পারি? আমায় মাফ করুন।'

: 'কোন কথা আমার কাছে গোপন কর না। তোমার বাঁচবার এই একটি মাত্র পথ রয়েছে।'

: 'আমি সব কিছু বলে দিতে রাজী।'

: 'সুফিয়া মোলাকাতের জন্য কোন জায়গা ঠিক করে দিয়েছে? আর যে পাহারাদারকে তুমি চিঠি দিচ্ছো সে কে?

: 'সে সাঈদ। সুফিয়া বলেছেন, সাঈদ যেন তাকে দক্ষিণের দরজায় নিয়ে আসে।'

: 'এর আগে কখনও মোলাকাত হয়েছে কি?'

: 'না।'

: 'খবর আদান প্রদান।'

: 'হ্যাঁ।'

: 'তুমি জানো না, কার কাছে এ চিঠি যাচ্ছে?'

ঃ 'জিনা, কেবল সাঈদ আর দক্ষিণ দরজার পাহারাদারই তা জানে। সুফিয়া আমায় শুধু বলেছিলেন, তিনি একটি বেগুনাহ্ লোকের জান বাঁচাতে চান।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, তুমি চিঠিটা সাঈদের কাছে দিয়ে দাও। কিন্তু আমি যে চিঠি দেখেছি, সে কথা ওকে বললে তোমার হাত পা বেঁধে দজলায় ফেলে দেব। আর ফিরে এসে সুফিয়াকেও কিছু বলবে না। কিন্তু এত দেরী কেন হল,জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দেবে?'

বাঁদী খানিকটা চিন্তা করে বললেন ঃ 'আমি এখনও নামায পড়িনি। নামাযের জন্য দেরী করেছি, বলবো।'

ঃ 'তুমি তো বেশ হুঁশিয়ার! এই লও, পরে আরও অনেক কিছু পাবে।' কাসিম কতগুলো স্বর্ণ মুদ্রা বাঁদীর হাতে গুজে দিলেন।

●

সাঈদ বাগদাদের একটি জনাকীর্ণ মহল্লার গলিপথ পার হয়ে গিয়ে একটা পুরানো বাড়ির দরজায় ঘা মারলো। একটি লোক বেরিয়ে এসে সাঈদকে চিন্তে পেরে আর একটা সংকীর্ণ গলির ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে চলল।

'জরুরি পয়গাম কিছু আছে?' পথ চলতে চলতে সে প্রশ্ন করল।

ঃ নেহায়াৎ জরুরি।

কিছুক্ষণ পর তারা দু'জন এক ত্রিতল বাড়ির দরজায় এসে থাএল। সাঈদের সাথী পাঁচ বার থেমে থেমে দরযার উপর খট খট আওয়াজ করল। ভিতর থেকে একটি লোক দরজার ছোট্ট খিড়কি খুলে বাইরের দিকে দেখলো এবং সাঈদের সাথীকে চিন্তে পেরে দরজা খুলে দিল।

সাঈদের সাথী বলল ঃ 'একে ভিতরে নিয়ে যাও।'

সাঈদ ভিতরে ঢুকলে পাহারাদার আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

খানিকক্ষণ পর তাহির, আবদুল আজীজ ও আবদুল মালিক সুফিয়ার চিঠি পড়ে সাঈদের কাছে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। সাঈদ জানালো যে, আফজল মহলের ভিতরে গিয়েছিল। আরও বলল যে, মুহাল্লাব ও সিপাহসালারকেও সে মহলের ভিতরে আসা যাওয়া করতে দেখেছে। কিন্তু সুফিয়া কেন তাহিরকে তখনি দেখা করতে বলেছেন যে, সে জানে না। তিন দোস্ত খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন। আবদুল আজীজ রায় দিলেন যে, সিপাহসালার, উজিরে খারেজা ও উজিরে আজম আফজলের কাছ থেকে তাদের খোঁজখবর নিয়েই নিশ্চয়ই কোন বিপজ্জনক ফয়সলা করেছেন এবং নারী হিসাবে সুফিয়া নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাহিরের জানকে অত্যধিক মূল্যবান মনে করছেন। সম্ভবতঃ তিনি বলবেন ঃ 'চারদিক থেকে বিপদ ঘিরে আসছে। আপনি এবার নিজের জান বাঁচাবার চেষ্টা করুন।'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'আমি যতটা জানি, তাতে সুফিয়াকে সাধারণ নারীর মধ্যে শুমার করার আমি বিরোধী। ব্যক্তিগত আকাঙ্খা জানাবার গরজ থাকলে তিনি

চিঠির মধ্যে কয়েকটি পংক্তি বাড়িয়ে লিখতে পারতেন।'

আবদুল আযীয বললেন ঃ 'তার সংক্ষিপ্ত চিঠি থেকে বুঝা যায়,তিনি লিখবার মওকা পাননি।'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'তাঁর মানে তাঁর কোন বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল। সেই অসুবিধার কারণেই তিনি তাহিরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখনও যদি তাহির না যান, তাহলে তিনি কি মনে করবেন?'

তাহির উঠে তলোয়ার গুছিয়ে নিয়ে বললেন ঃ 'তিনি আমায় আল্লাহর দোহাই দিয়ে ডেকেছেন। আমি নিশ্চয়ই যাব। একবার তিনি আমার জান বাঁচিয়েছেন। তাঁর এ উপকারের বোঝা আমার মাথায় যদি নাও থাকত, তাহলেও কওমের এক নারীর আওয়াজে আমি অবশ্যি সাড়া দিতাম।'

আবদুল আযীয বললেন ঃ 'তাহলে আমিও আপনার সাথে যাব।'

না। তাহির স্থির নিশ্চয়তার স্বরে বললেন ঃ আমাদের তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা উচিত। যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকত, তাহলে তিনি আমায় একা যেতে বলতেন না।'

●

উজিরে আজমের মহলের দক্ষিণ দিকের ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকে তাহির চাঁদের রোশনীতে সুফিয়াকে দেখতে পেলেন। খোলা জায়গাটা পার হয়ে এসে সুফিয়া এক ঘন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তাহির তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ 'বলুন।'

ঃ 'আমার আফসোস, আপনার এক দোস্ত গাদ্দার বনে গেল।'

তাহির বললেন ঃ সে খবর আপনি আপনার চিঠিতেই লিখেছেন। চিঠিতে আপনি যেসব জরুরি কথা বলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা-ই আমি জানতে চাই। শুকনো পাতার স্তূপ যেমন করে ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি করে সুফিয়ার মনের মধ্যে জমানো কথার ভান্ডার বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। তিনি নিজের দীলের কাছে এখনও প্রশ্ন করছেন ঃ 'কেন আমি ওকে ডেকে আনলাম?'

তিনি মনকে সংযত করবার চেষ্টা করে বললেন ঃ 'আমার একটা আরজ রয়েছে।'

ঃ 'আমার কাছে আপনার যেকোন আরজ হুকুমেরই শামিল। বলুন।'

ঃ 'হুকুমাত আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য তৈরী হয়ে আছে। কয়েকদিনের মধ্যে যদি তারা আপনাকে শান্ত পরিবেশের ভিতর দিয়ে গ্রেফতার করতে না পারে, তাহলে আমার বিশ্বাস, তারা শক্তি প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবে না।'

তাহির স্বস্তির সাথেই বললেন ঃ 'আমি তা জানি।'

ঃ তাহলে খোদার নাম করে এখান থেকে চলে যান। প্রতি মুহূর্ত আপনার বিপদ রয়েছে।

ঃ 'বিপদকে আমি ভয় করি না। কিন্তু আপনার পরামর্শের আগেই আমি এখান থেকে যাবার ইরাদা করে ফেলেছি।'

ঃ 'কখন যাবেন।'

ঃ খুব শীগগিরই।'

ঃ 'তাহলে আমায় আপনার সাথে নিয়ে যান।'

তাহির চমকে উঠে এক কদম পিছু হটে গেলেন। সুফিয়া এগিয়ে গিয়ে তাঁর জামার নীচের দিকটা হাতে চেপে ধরলেন। তিনি বললেন ঃ 'এ মহল আমার কাছে এক কয়েদখানা। দুনিয়ায় আমার আপনার কেউ নেই। যিন্দেগী আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মদীনায় গিয়ে আমি এক পাতার কুটিরে থাকতে ভালবাসবো। বাগদাদের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। এসব বালাখানা আমার ভাল লাগে না। এখানে মানুষের বেশে বাস করে বিষধর সাপ।'

ঃ 'আপনি হয়ত জানেন না যে, আমার মঞ্জিল মদীনা নয়, খারেযম।';

ঃ 'সেখানে যেতেও আমি রাজী।'

ঃ 'কিন্তু ওখানকার অবস্থা আপনার জানা নেই। আগে থেকেই ওখানে রয়েছে কওমের এমন হাজারো নারী, যাদের নিগাহবান কেউ নেই। আমি তাদের সংখ্যায় আর একজন বাড়াতে চাই না।'

ঃ তাহলে আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি ইন্তেযার করব। আপনি ওয়াদা করুন, আপনি আমায় ভুলবেন না।

তাহিরের মনে পড়ল সুরাইয়ার কথা। বিষন্ন কণ্ঠে তিনি বললেন ঃ 'আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলাম, আমার লক্ষ্যের প্রতি রয়েছে আপনার সহানুভূতি।'

সুফিয়া এক কদম পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বেদনাতুর কণ্ঠে বললেন ঃ 'আপনি চলে যান। আমি মনে করেছিলাম, আপনার দীলের মধ্যে মানবতার প্রতি দরদ রয়েছে, কিন্তু আপনি আত্মপ্রেমিক। আপনার মুহাব্বত কেবল আপনার নিজেরই জন্য।

তাহির বললেন ঃ 'হায়! আপনি যদি জানতেন যে কাঁটার উপর দিয়ে চলবার জন্য আমি পয়দা হয়েছি। আপনাকে আমি আমার সাথে জড়িয়ে নিতে পারি না। আপনি আমার জন্য যা কিছু করেছেন, তার বদলা আমি কখনও দিতে পারবো না হয়ত। আমার গর্দান হামেশা অবনত থাকবে। আমি আত্মপ্রেমিক, কিন্তু এক সিপাহীর জিন্দেগীতে এমন পর্যায় এসে থাকে, যখন তাকে নিজের জিন্দেগীর সব চাইতে বড় আকাঙ্খাকেও কোরবান করতে হয়। সে কারুর ঘামের বদলে রক্ত ঝরাতেও তৈরী থাকে। কিন্তু কর্তব্য তাকে যখন বাধ্য করে, তখনও সে তার অশ্রুধারার জন্য পরোয়া না করে চলে যায় যুদ্ধের ময়দানে। এক আলীশান বালাখানায় থেকেও আপনি মনে করেন যে, আপনার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু তুর্কীস্তানে আপনার হাজার হাজার বোন এমন রয়েছে, খোলা আসমানের নীচে যাদের মাথা ঢাকবার জায়গা মিলছে না। বর্তমানে আমি আমার মনোযোগের সব চাইতে বড় দাবীদার তারা। ইসলামের বদনসীব নারীরা আজ ইরাক, আরব ও মিসরের শান্তিপূর্ণ শহরগুলোর বাসিন্দা। তাদের বোনদের উদ্দেশ্যে আর্তচীৎকার করে বলছেঃ যদি তোমাদের ভাই, স্বামী আর প্রিয়জন আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে, তাহলে খোদার দিকে তাকিয়ে তাদের পথে বাধা দিও না।'

সুফিয়া তাঁর চোখের আশু মুছতে মুছতে বললেন ঃ 'যান, খোদা আপনার সাহায্য করুন। আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আমি এক নারী। যান.....।'

তিনি দরজা পর্যন্ত তাঁর সাথে এলেন। সাঈদের ইশারায় পাহারাদার দরজা খুলে দিল। তাহির একবার ফিরে তাকালেন তাঁর দিকে। তাঁর মুখে প্রশান্ত আনন্দ ও ঠোঁটে হাসির রেখা। অশ্রু ধোয়া সুন্দর ও পবিত্র হাসি-যা একাধারে আত্মাকে সজীব করে তোলে, আবার নিরুৎসাহও করে।

'আপনি আমার উপর রেগে যাননি তো?' তাহির কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

না'। তিনি মধুর আওয়াজে বললেন ঃ 'আমায় ভুলে তো যাবেন না?

'কখনও না। তাহির জবাব দিলেন।

তাহির দ্রুত পদে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সুফিয়া দরজার কাছে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি যখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন, তখনও ডানে বায়ে দু'দিক থেকে সিপাহীদের দু'টি দল বেরিয়ে এল। তাহির তলোয়ার বের করবার আগেই পনের বিশ জন সিপাহীর হাতে আটক হয়ে গেলেন।

সুফিয়া জলদী করে বললেন ঃ 'সাঈদ, তুমি পালিয়ে যাও।'

সাঈদ আর অপর পাহারাদারটি পূর্ণশক্তিতে মহলের এক কোণের দিকে ছুটে পালাল। সুফিয়া দরজার বাইরে এলেন, কিন্তু কাসিম এগিয়ে এসে তার বাযু ধরে বললেন ঃ 'সুফিয়া, আজ একটা বড় কাজ করেছ তুমি। যাও, এখনও আরাম করগে।' সুফিয়া তার লৌহ-কঠিন মুঠোর চাপে অসহায় হয়ে সাথে সাথে চলে গেলেন। কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে কাসিম থেমে সিপাহীদেরকে আওয়াজ দিলেন ঃ 'সাঈদ, হয়ত পালিয়েছে। ওকেও গ্রেফতার কর।'

মহলে পৌঁছে কাসিম সুফিয়াকে তার কামরার মধ্যে ঠেলে দিলেন এবং বাইরে থেকে শিকল এঁটে দিলেন।

বাইরে এসে মুহল্লাবের অনুরোধে কাসিম তাহিরকে তাঁর হাতে সোপর্দ করে দিলেন। মহলের আনাচে কানাচে খুঁজেও সাঈদ আর তার সাথীকে পাওয়া গেল না। অবশেষে এক সিপাহী খবর দিল যে, মহলের একখানা কিশতি গায়েব। তখনও হয়ত তারা অপর কিনারে পৌঁছে গেছে।

মধ্য রাত্রে যখন মুহাল্লাব তাহিরকে কয়েদখানার দারোগার হাতে সোপর্দ করছেন, তখনও সাঈদ আর তার সাথী আবদুল মালিক ও আবদুল আযিযকে সেই রাত্রের রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনাচ্ছে।

তাহির বিন ইউসুফ দজলার কিনারের বড় কয়েদখানার জমিনের নীচেকার এক কুঠরীতে আটক হলেন। ভোর হয়ে গেল, কিন্তু কয়েদখানার ভিতরে তখনও অন্ধকার। দু'জন পাহারাদার এসে তাকে ঘুমে দেখে খানা রেখে চলে গেল। তাহির দু'একবার চোখ খুললেন, কিন্তু কামরা অন্ধকার দেখে আবার পাশ ফিরে ঘুমালেন। অবশেষে তিনি অনুভব করলেন, কে যেন ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে জাগাচ্ছে।

'কে? ঃ তিনি হাই তুলতে তুলতে প্রশ্ন করলেন।

ঃ আস্তে কথা বল।'

তাহির ঘাবড়ে গিয়ে চোখ খুললেন। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে আর একটি লোককে দেখে উঠে বসলেন।

আগন্তুক বললেন ঃ 'এই কয়েদখানা তৈরী হবার পর সম্ভবতঃ এখানে এত দীর্ঘকাল

ঘুমাবার লোক আর কেউ আসেনি। এখনও দুপুর হয়ে যাচ্ছে।

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'আমি কয়েক রাত স্বস্তির সাথে ঘুমোতে পারিনি।'

ঃ তাহলে মনে রেখ, বাকী জীবন এখানে তুমি মরণ ঘুম ঘুমোতে পারবে।'

ঃ তুমি কে?'

ঃ 'আমি কখনও কেউ ছিলাম। কিন্তু এখনও এক কয়েদী।'

ঃ 'রাতের বেলা যখন আমায় নিয়ে এল, তখনও তো এখানে কেউ ছিল বলে মনে হয় না। হয়ত তোমায় এখনি এখানে আনা হয়েছে। তাই নয় কি?'

ঃ 'না, আমি কয়েকমাস ধরে শাহী মেহমান। তোমার আর আমার কুঠরীর মাঝখানে শুধু একটা পাঁচিল। মনে হয়, আগে জমিনের নীচের এ কামরা খুবই প্রশস্ত ছিল, কিন্তু পরে কয়েদীদের বাড়তি সংখ্যার জন্যই মাঝানে খাড়া করে তাকে দু'ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।'

ঃ তাহলে আপনি কোন পথে এখানে এলেন?'

আগন্তুক জবাব দিলেন ঃ 'এস, তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। গোড়ার দিকে এখানে দেখতে পাওয়াটা মুশকিল। আমার বাযু ধরে এস। ঘাবড়ে যেও না। কয়েক দিন গেলে আমার মত তোমারও অন্ধকারে দেখবার অভ্যাস হয়ে যাবে।'

তাহির আগন্তুকের সাথে এক মেহরাব অতিক্রম করে যেতে যেতে বললেন ঃ 'এ পথটা তো বেশ প্রশস্ত মনে হচ্ছে।'

আগন্তুক জবাব দিলেন ঃ এখনও তুমি তোমার কামরার হিসাব নিয়ে দেখেনি, এই দরজা তাকে দু'ভাগে ভাগ করে রেখেছে, আমার কুঠরীও এমনি।

আরও কয়েক কদম চলবার পর আগন্তুক ঝুঁকে পড়ে জমিনে দিকে ইশারা করতে করতে বললেন ঃ 'এই যে দেখ! এই সুরঙ্গ আমার কামরায় চলে গেছে। এই পথে যেতে অভ্যাস করা দরকার। তুমি হয়ত যেতেই পারবে না। তুমি খানিকটা মোটা। কিন্তু তুমিও খুব শীগগীরই আমার মত হয়ে যাবে। আমি যখন এখানে আসি, তখনও আমি যথেষ্ট মোটা ছিলাম। প্রায় একমাস পর এখানকার স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় সামান্য জ্বর শুরু হয়ে গেল আর ক্ষুধা নষ্ট হয়ে গেল।'

ঃ 'এ রাস্তাটা কি করে পাওয়া গেল?

ঃ 'আমি যখন এখানে এলাম, তখনও এই কামরার একটি লোক কখনও কখনও পাঁচিলে আঘাত করতেন। দু'তিন দিন আমি সেদিকে আমলই দিলাম না। একদিন তাঁর জবাবে আমিও দেয়ালে খট্ খট্ করতে শুরু করলাম। খানিকক্ষণ পর একটি লোক আমার কামরায় দেয়ালের কাছে এসে সীল উপরে তুললেন। তারপর মাথা বের করে বলে উঠলেন ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্! আমি এমন ভয় পেয়ে গেলাম যে, বাইরে বেরুবার পথ থাকলে আমি হয়ত দরিয়ায় ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা করতাম না। তিনি বললেনঃ "ভয় পেওনা, আমি তোমার প্রতিবেশী।' খানিকক্ষণ ভাল করে দেখে আমি তাঁকে চিনলাম। লোকটি কাজী আবু দাউদ। তিনি এক মোকদ্দমায় সাবেক উজিরে আজমের মর্জি মোতাবেক রায় দিতে অস্বীকার করেছিলেন। আমি এখানে আসার দীর্ঘকাল আগেই তিনি এ সুরংগ খোদাই করেছিলেন। তিনি আমায় বলেছেন যে,

অকাজে বসে না থেকে তিনি এই দেওয়ালের কাছের মেঝের দুটো সীল তুলে ফেলে মেঝের নরম মাটি এক ভাঙা বরতনের টুকরা দিয়ে খুঁড়তে শুরু করে দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি এ সুরংগটা খোদাই করলেন, কিন্তু পাশের কামরায় কাউকেও না পেয়ে তাঁর বড়ই আফসোস হল। প্রথম মোলাকাতের পরই তিনি আমায় তাঁর সাথী বানিয়ে নিলেন। কিন্তু দেড়মাস পরেই তিনি মারা গেলেন। পাহারাদার সকাল সন্ধ্যায় মাত্র দু'বার এখানে আসে। তাছাড়া সারাদিন সারারাত আমরা দু'জন দেখা করতে পারবো। কেবল জুমআর দিন তারা কামরা সাফ করতে আসে। সেদিনটি সুরংগের উপর এই সীল রেখে দেব। আরও ভাল হয়, যদি তোমার বিছানাটা এর উপর ফেলে রাখ। তোমারও তো নিশ্চয়ই আমারই মত অনন্ত কাল কয়েদ থাকতে হবে। আমি জানি, কয়েদখানার এই দিকটাতে কেবল এমন লোকই পাঠানো হয়, যাদের কোন অপরাধ নেই। কিন্তু তুমি নওজোয়ান, হুকমাত তোমায় এতটা গুরুত্ব কেন দিল, তাই ভেবে আমি হয়রান হচ্ছি। আমি হয়ত তোমায় কোথাও দেখেছি। চল, ওদিকে যাই। ওদিকে অন্ধকার কিছুটা কম।

তাহির আগন্তুকের সাথে এসে নিজের জায়গায় বসলেন।

আগন্তুক বললেন ঃ খানা 'খেয়ে নাও।'

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'আমার ক্ষুধা নেই।'

আগন্তুক বললেন ঃ 'আসল কথা হচ্ছে, পহেলা দিন এখানে এসে কেউ খানা খায় না। আমিও দু'দিন কিছু খাইনি। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়। বলতো ঃ তুমি এখানে কি করে এলে? আমি তোমার কোন কাজে আসবো না ঠিকই, কিন্তু নিজ নিজ অতীত কাহিনী বর্ণনা করে একে অন্যের বোঝা তো হালকা করতে পারবো। আমার সন্দেহ হয়, তোমায় নিশ্চয়ই আমি কোথাও দেখেছি। এখানে এসে স্মৃতিশক্তি অনেকটা কমে যায়।

ঃ 'আমার নাম তাহির বিন ইউসুফ।'

ঃ 'তাহির বিন্ ইউসুফ? এ নামও তো শুনেছি আমি। তুমি ফৌজে ছিলে?

ঃ 'না,।

ঃ 'তা' হলে কোন দফতরে ছিলে?

ঃ 'কোন দফতরেই নয়। আমি বাগ্‌দাদে এক বহুত বুলন্দ মকসাদ নিয়ে এসেছিলাম।'

ঃ 'তা' হলে ঠিকই আছে। যাঁরা বুলন্দ মকসাদ নিয়ে বাগ্‌দাদে আসেন, তাদেরই ভাগ্যে এ কুঠরীগুলো পড়ে থাকে। খলিফা আর সালতানাতের কর্মচারীদের রোষ কেবল সেই লোকদেরই উপর নাযিল হয়, যাঁদের উপর আল্লাহ খুশী। আচ্ছা, এবার আমায় শুরু থেকে তোমার নিজের কাহিনী শোনাও।'

তাহির তাঁর বাগ্‌দাদে আগমন ও কাসিমের সাথে তরবারী চালনার শক্তি-পরীক্ষা থেকে তাঁর কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

আগন্তুক তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তাই তো, আমার মনে পড়েছে। তুমি সেই নওজোয়ান? সেদিনও আমি তোমার জন্য দোয়া করছি যেন খোদা

তোমায় বদ নজর থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আচ্ছা, তারপর শোনাও।

তাহির খারেযম শাহের দূতের সাথে মোলাকাতের কথা বললে তিনি চমকে উঠে বললেন ঃ 'আমার দিকে তাকাও। আমিই ওয়াহিদউদ্দীন।

'আপনি? তাহির আচানক প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'হ্যাঁ, আমিই সেই বদনসীব। আমার আর এখান থেকে রেহাই পাবার উম্মিদ নেই। তোমায় আমার নির্দোষিতার প্রত্যয় দিয়েও আমি তোমার কাছ থেকে কোন ফায়দা হাসিল করতে পারবো না জানি। কিন্তু আমরা পরস্পরের সাথী, তাই তোমার সান্ত্বনার জন্য খোদাকে হাযির-নাযির জেনে আমি কসম করে বলছি, আমি চেংগিস খানের কাছে কোন দূত পাঠাই নি।'

তাহির বললেন ঃ 'আপনার উপর আমার একিন রয়েছে। যদি আপনার কোন অপরাধ তাঁরা প্রমাণ করতে পারতেন, তাহলে খোলা আদালতে আপনার বিচার হত। আমি শুধু জানতে চাই, আপনাকে কবে কি করে কয়েদখানায় পাঠানো হল?'

ঃ 'আগে তুমি তোমার কাহিনী শেষ কর। তারপর আমি তোমার তামাম সওয়ালের জবাব দেব।

তাহির তাঁর কাহিনী শেষ পর্যন্ত শুনালেন। ওয়াহিদুদ্দীন গভীর চিন্তাকুল অবস্থায় তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন। অবশেষে তিনি বললেন ঃ 'আমি এখনও তোমার কাছে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। তোমার কাহিনী শুনে আমার সন্দেহ প্রত্যয়ের সীমানায় পৌঁছে গেছে যে, আমি মুহাল্লাবের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছি। এ লোকটি ছিলেন বাগদাদে চেংগিস খানের দূতের কর্মচারী। শাহজাদা মুসতান্‌সিরের সুপারিশে আমি তাঁকে আমার দফতরে নিযুক্ত করি। এলমের কথা বলতে গেলে আমি এখনও তারিফ না করে পারি না। বয়সের দিক দিয়ে তিনি খুবই হুঁশিয়ার। শাহজাদা মুসতানসিরের চেষ্টায় তিনি খলিফা পর্যন্ত গতিবিধির সুবিধা পেয়ে গেলেন। আমি তখনও অনুভব করতে লাগলাম যে, আমি নামে মাত্র উজিরে খারেজা। নইলে সাদা-কালোর আসল মালিক তিনিই। আমার দিন ভাল হলে আমি আগেই চাকুরী ইস্তফা দিতাম, কিন্তু আমার তকদীরে ছিলো এই বিপ্লত। দু'একবার আমি তাকে ইস্তাফা দিতে বলেছি, কিন্তু তিনি গিয়ে খলিফার কাছে নালিশ করলেন। খলিফা আমায় শাসিয়েছেন। তখনও আমি তার দিক থেকে চোখ বন্ধ করে রেখেছি। চেংগিস খানের উত্থানের কাহিনী হয়ে গেল মশহুর। তখনও তিনি আমায় পরামর্শ দিলেন যে, তাঁর সাথে মৈত্রীচুক্তি করে খারেযম শাহের বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত শক্তি গড়ে তোলা হোক। আমি তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে তিনি চুপ করে গেলেন। আমি উজিরে আযমের কাছে কয়েকবার নালিশ করেছি যে, লোকটি বিপজ্জনক, কিন্তু সে কথায় তিনি পরোয়া করেননি। খলিফা একদিন আমায় ডেকে হুকুম দিলেন যে, চেংগিস খানের নামে তিনি বন্ধুত্বের পয়গাম পাঠাবেন। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমাদের কোন দূতের পক্ষে খারেযম সীমান্ত পার হয়ে কারাকোরাম পৌঁছা অসম্ভব। রাস্তায় দূত ধরা পড়ে গেলে দরবারের খেলাফতের বড় বদনাম হবে। খলিফা আমার আপত্তি শুনে সে কথায় আর জোর দিলেন না। কিন্তু কয়েকদিন পর মুহাল্লাব আমায় বললেন যে, সেদিন উজিরে আজম খলিফা কাছে এক চিঠি পেশ করেছেন। হুকুমাতে খারেযম হুকুমাতে বাগদাদের এক দূতের তল্লাশী নিচ্ছে

চিঠিটা উদ্ধার করে বাগদাদে তাঁদের দূতের কাছে পাঠিয়েছেন এবং সে চিঠিতে আমারই দস্তখত রয়েছে। এর জন্য আমার কাছে কতকগুলো সওয়াল করা হবে। আমি আত্ম গোপন করলেই ভাল। কিন্তু আমি তাঁর পরামর্শ কবুল করতে রাজী হই নি। আমি বললাম যে, সে চিঠি আমি লিখিনি, তাই সওয়াল করার জন্য আমি ভয় করি না। তখনওই আমি খারেযমের দূত, উজিরে আজম ও খলিফার সামনে ব্যাপার সাফ করে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু যখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, তখনও আট দশজন সিপাহী ও কোতওয়াল দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। মুহাল্লাবের ইশারায় তারা আমায় গ্রেফতার করল। এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে, আমার দস্তখত জাল করে মুহাল্লাব এসব চিঠি পাঠিয়েছিল। আমার পরেই তাকে উজিরে খারেজা নিযুক্ত করায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এর সব কিছুই খলিফার জানা ছিল। বদনামের ভয়ে তাঁরা আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালান নি। খারেযমের দূতকে আশ্বাস দেবার জন্য তাঁরা আমায় এখানে পাঠিয়ে রটিয়ে দিয়েছেন যে, অপরাধী কোথাও আত্মগোপন করেছে।

ঃ 'তাহলে আপনার ধারণা, উজিরে আজম এ ষড়যন্ত্রের শিকার ছিলেন না?'

ঃ 'না। তিনি শরীক থাকলে আমার সাথে মুহল্লাবকেও এখানে পাঠানো হত। আমি মনে করি, আমার গ্রেফতারের কথাও তিনি জানেন না। নইলে তিনি আমার বিরুদ্ধে খোলা আদালতে মোকদ্দমা চালাতেন। আমি জানি যে, তিনি সব চাইতে বড় খোশামুদে লোক। কিন্তু তাতারীদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ আছে এবং তিনি খারেযমের সাথে বন্ধুত্ব রাখার পক্ষপাতী। তার সব চাইতে বড় কমজোরী হচ্ছে তার নালায়েক ছেলেন জন্য মুহ-ব্বৎ।

তাহির বললেনঃ 'কিন্তু খলিফা চেংগিস খানের কাছে পয়গাম পাঠাতে কেন আপনার নাম ব্যবহার করলেন, তিনি তো অনায়াসেই আপনাকে সরিয়ে মুহাল্লাব আর কাউকে এর যন্ত্র বানাতে পারতেন।

ঃ 'তার কারণ, দূত ধরা পড়ে গেলে এমন একটি লোকের উপর দোষ দেয়া যাবে; ভবিষ্যতে খলিফা যার খেদমতের প্রয়োজন অনুভব করেন না। আমার সম্পর্কে খলিফার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, এ সব ব্যাপারে রহস্য আমি গোপন করব না।'

# পরিনাম

## পনের

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খারেযম শাহ প্রথম পরাজয়ের পর উত্তর পশ্চিম দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেহুন নদীর কিনারে তাঁবু ফেলে দক্ষিণের শহরগুলো থেকে সেনাবাহিনীর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কোকন্দ জয়ের পর চেংগিস খান সেহুন নদীর কিনার দিয়ে উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর না হয়ে তাঁর সেনাবাহিনীর বড় হিস্সা পাঠিয়ে দিলেন দক্ষিণ দিকে। খারেযম শাহের মনোযোগ সেদিক থেকে অপর দিকে আকৃষ্ট করবার জন্য তিনি তাঁর দুই পুত্রকে পাঠালেন উত্তরে আতরারের দিকে। খারেযম শাহ তাঁর নিজের খেয়াল মোতাবেক সেহুনের কিনারে চেংগিস খানের পুত্রদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করবার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আচানক তাঁর কাছে খবর এল যে, চেংগিস খান তাঁর ফৌজ নিয়ে পূর্বদিক দিয়ে জৈহুন নদীর কিনার ধরে সমরকন্দ ও বোখারার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মুহাম্মদ শাহের মনে দেখা দিল একদিকে তাঁর সালতানাতের সব চাইতে মযবুত দু'টি কেল্লা হারাবার আশঙ্কা দেখা দিল, অপর দিকে তাঁর মনে উদ্বেগ জাগলো যে, তাতারী ফৌজ এ শহর দু'টি দখল করে নিলে জৈহুনের কিনার ধরে আরাল হ্রদ পর্যন্ত দেশ রক্ষার তামাম ঘাঁটি তারা সহজেই দখল করে নিতে পারবে এবং দক্ষিণে তাঁর রসদ ও সেনা সাহায্যের তামাম রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এমনি এক পরিস্থিতিতেও মুহাম্মদ শাহ তাঁর পুরানো অভিজ্ঞ সরদারদের পরামর্শ মেনে নিলেন না। তিনি কোন একটি ময়দানেও পূর্ণ সেনাদল নিয়ে তাতারীদের মোকাবিলা না ক'রে ফৌজের বেশীরভাগ পাঠিয়ে দিলেন বিভিন্ন শহর হেফাজত করবার জন্য। চল্লিশ হাজার সিপাহী সেহুন নদীর তীরবর্তী শহরগুলোর হেফাজতের জন্য ছেড়ে দিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন বোখরার পথে। ত্রিশ হাজার সিপাহী সেখানে মোতায়েন ক'রে তিনি বাকী ফৌজ নিয়ে পৌঁছলেন সমরকন্দে।

ইতিমধ্যে চেংগিস খানের এক পুত্র সেহুন নদী পার হ'য়ে হামলা করল আতরারের উপর। শহরের হাকীম আখেরী দম পর্যন্ত লড়াই করলেন। তাতারীরা যখন কেল্লার দরজা ভেঙে তাঁর অবশিষ্ট ফৌজকে তলোয়ারের মুখে নিঃশেষ করল, তখনও তিনি একা এক বুরুজের উপর চড়ে সেখান থেকে তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। তীর ফুরিয়ে গেলে তিনি ছুঁড়তে লাগলেন ইট।

তাঁকে জিন্দাহ গ্রেফতার ক'রে পাঠানো হল চেংগিস খানের কাছে। চেংগিস খান তাঁকে হত্যা করলেন তাঁর নাকে চোখে গলিত রূপা ঢেলে দিয়ে।

চেংগিস খানের আর এক পুত্র দখল করল তাসখন্দ। তারপর তাতারী সেনাবাহিনী বিভিন্ন দলে ভাগ হ'য়ে দখল ক'রে নিল সেহুন নদীর কিনারের আর কতকগুলো ছোট ছোট শহর।

চেংগিস খান তাঁর পুত্র তোলাইকে সাথে নিয়ে বোখরার দিকে এগিয়ে চললেন পথের শহর ও বস্তিগুলোকে রক্ত আর আগুনের পয়গাম দিয়ে। সমরকন্দ থেকে খারেযম শাহ খবর পেলেন তাঁদের অগ্রগতির। ফৌজের সরদাররা এবারও জানালেন যে, চেংগিস

খানের সাথে এক চূড়ান্ত লড়াই করা যাক। কিন্তু খারেযম শাহ্ বোখরার পাঁচিল অপরাজেয় মনে ক'রে তাঁদের মত অগ্রাহ্য করলেন এবং শহরের হেফাজতের জন্য পাঠালেন প্রচুর সৈন্য। তিনি দক্ষিণের শহরগুলির সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন সমরকন্দে আসতে। খারেযম শাহের মনে আশা ছিল, বোখরা জয় করতে তাতারীদের কয়েক মাস লেগে যাবে। ইতিমধ্যে সালতানাতের বিচ্ছিন্ন সেনাদলকে নতুন ক'রে সংঘবদ্ধ করা যাবে।

চেংগিস খান কয়েকদিন অবরোধের পর বুঝলেন, শহর জয় করা সহজ হবে না। আগের বিজয়ের সময়ে তিনি হাতিয়ার তৈরীর বহু দক্ষ কারিগরকে গ্রেফতার করেছেন আর তাদের মধ্যে অনেকে নিযুক্ত হয়েছে তাঁর চাকুরীতে। একজনের পরামর্শ মত চেংগিস খান তাঁর ফৌজকে হুকুম দিলেন শহরের উপর আগুনের তীর বর্ষণ করতে। আতশী তীর বর্ষণের ফলে শহরের এক মহল্লায় লাগল আগুন। তামাম বাসিন্দা হ'য়ে গেল বিশৃংখল।

তুর্ক সেনাবাহিনী বাধ্য হ'য়ে শহরের বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করল, কিন্তু তারা পরাজয় বরণ করল। তাতারী বাহিনী চারদিক থেকে ঘিরে তলোয়ার চালালো তাদের উপর।

ফৌজের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা চেংগিস খানের কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে পাঠাতে চাইলেন এক প্রতিনিধিদল। শহরের বাসিন্দাদের সকলের প্রিয়পাত্র ইমামযাদা রুকনুদ্দীন এ ফয়সলা মেনে নিলেন না। তিনি শহরের সম্মানিত ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণ উদ্যমে বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন ঃ 'আমরা কম-সে-কম ছ'মাস শহরের হেফাজত করতে পারি এবং আমার বিশ্বাস, বর্তমান পরিস্থিতিতে সমরকন্দের সেনাবাহিনী এখানে পৌঁছে যাবে। এই মুহূর্তে শহরের দরজা খোলার জন্য তাতারীরা আমাদের যে কোন শর্ত মেনে নেবে, কিন্তু তাতারীরা কোন চুক্তির সম্মান রক্ষা করে চলবে, মনে করা আত্মপ্রতারণা। তাতারী ফৌজ যখন শহরের ভিতরে ঢুকে যাবে, তখনও তারা তোমাদের সাথে আতরার ও তাসকন্দের মত একই ব্যবহার করবে।'

কিন্তু ইমামযাদা রুকনুদ্দীনের আওয়ায বিরান মুরুবুকে চীৎকারের মতই ব্যর্থ হল। শহরের গণমান্য প্রতিনিধিরা চেংগিস খানের সাথে মোলাকাত করে এসে শহরবাসীদের খোশখবর দিলেন ঃ 'তোমাদের জান, তোমাদের সম্পত্তি, তোমাদের ইজ্জত সব কিছুই নিরাপদ। শহরের নয়া হাকীমও হবেন মুসলমান।'
শহরের দরজা খুলে গেল।

●

রুকনুদ্দীন ঠিকই বলেছিলেন। বোখরার বাসিন্দাদের চোখের সামনে দিয়ে বয়ে চলল বন্য ও বর্বর জুলুমের মর্মস্পর্শী অভিনয়। যে সব মকতব-মাদ্রাসায় কোরআন শরীফ পড়া হত, সেখানে হল তাতারীদের ঘোড়ার আস্তাবল। চেংগিস খান বোখরার আযীমুশশান মসজিদের সিঁড়ির সামনে ঘোড়া থেকে নামলেন।

'এ তোমাদের বাদশাহ্‌র বালাখানা?' ঃ তিনি একটি লোককে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'না, এ খোদার ঘর।'

চেংগিস খান মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে হাজির লোকদের সম্বোধন করে বললেন ঃ 'আমার সিপাহীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের খোরাক আর আরামের প্রয়োজন। তাদের জন্য তোমাদের ঘরের দরজা খুলে দাও। এমনি প্রশস্ত যেসব বাড়ি রয়েছে, তা আমার ঘোড়ার জন্য খালি করে দাও। ঘোড়াগুলোর জন্যও চাই খোরাক। মনে রেখ, খোদার গযবকে তোমরা ভয় কর আর আমি এখানে এসেছি খোদার গযব হয়ে।'

চেংগিস খান এক দোভাষীকে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দিতে হুকুম দিলেন। তারপর তিনি বেরিয়ে এলেন মসজিদ থেকে। এ হল ভূমিকা মাত্র। এরপর বোখারার লোকেরা যা দেখেছে, তা ছিল তাদের কল্পনার বাইরে। রাতের বেলা পুরষদের এজাযত ছিল না নিজের ঘরে ঢুকবার। গলিপথে, চৌরাস্তায় আর সড়কের উপর দাঁড়িয়ে তারা শুনছিল নিজের বাড়িঘরের ভিতরে তাতারীদের বর্বর অট্টহাস্য আর নারী কন্ঠের জিগর ফাটানো আর্ত-চিৎকার। কারুর আত্মসম্মানবোধ যদি তাকে নিজের ঘরে ঢুকবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত করত, তাহলে তাতারী পাহারাদারদের তলোয়ার তাকে খাক ও খুনের ভিতরে শুইয়ে দিত।

ওমরাহের বাসভবনগুলোতে পাহারার কড়াকড়ি ছিল অনেকটা বেশী। তাদেরকে রকমারী দৈহিক নির্যাতন করে তাদের গোপন সম্পদের সন্ধান করা হত। কেউ একটি অর্থভান্ডারের সন্ধান দিলে তাকে বলা হত যে, তিনি আরও বহুত কিছু লুকিয়ে রেখেছেন। সব কিছু দিয়েও তাদের রেহাই ছিল না। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাতারীরা তাদের পিছনে লেগে থাকত। বোখারার বাসিন্দাদের হাতে বেলচা দিয়ে তাদেরকে দিয়ে খোদাই করা হল ওমরাহের বালাখানার বুনিয়াদ। শেষ পর্যন্ত তাতারী ফৌজ যখন নিশ্চিত বুঝলো যে, বোখারার আর কাজে লাগাবার মত কোন জিনিষ অবশিষ্ট নেই, তখনও তারা শহরের তামাম বাসিন্দাকে হাঁকিয়ে নিয়ে এল এক ময়দানে।

এরপর তাদের উপর কি হতে চলেছে, সে সম্পর্কে কারুর কোন ভুল ধারণা ছিল না। সব দিক থেকে নারী ও শিশু কণ্ঠের জিগর ফাটানো আর্তচীৎকার শোনা যেতে লাগল। পুরুষের চোখে বয়ে চলেছে অশ্রুধারা। নারীর আর্তচীৎকার উপেক্ষা করে তাদেরকে টেনে আলাদা করে নেওয়া হল পুরুষের কাছ থেকে জবরদস্তি করে। অগুনতি অসহায় মানুষের দৃষ্টি তখনও আসমানের দিকে। ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের আজাদী। শহরে তাদের ঘর বাড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুনের শিখা। আর এখনও তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের নারীকে। যেসব পর্দানশীল নারী কোন দিন আসমানের সূর্যের দৃষ্টিপথে আসেনি, তাতারীরা তাদের স্বামী পুত্রের চোখের সামনে নষ্ট করছে তাদের ইজ্জত। পুরুষদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাতারী সওয়ারদের নেযার পাঁচিল। তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের হাতিয়ার।

ইমামযাদা রুকনুদ্দীন চীৎকার করে বললেন ঃ 'ওরে বুজদীল! এখনও কি দেখছিস তোরা? অমনি চারদিক থেকে জেগে উঠল আল্লাহু আকবর তকবীর ধ্বনি। বোখারার

বাসিন্দারা তাতারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খালি হাতে শুরু হল তলোয়ারের মোকাবিলা। কয়েক মুহূর্ত তারা মরিয়া হয়ে তাতারীদের সাথে লড়াই করে তাদের নেযা, তলোয়ার ও খনজর ছিনিয়ে নিলো। নারীর ইজ্জত নষ্ট করতে যারা ব্যস্ত ছিল, তারা তলোয়ার সামলে ঘোড়ার উপর সওয়ার হবার মওকা পেলো না। কিন্তু তাতারীদের বেশীরভাগ সিপাহী ছিল ঘোড়ার উপর মজবুত হয়ে বসা। তারা অল্প সময়ের মধ্যে লাশের স্তূপ বানিয়ে ফেলল। তবু দু'হাজার তাতারী মারা পড়ল সেখানে। তাতারীরা গজবের মূর্তি ধরে কয়েক ঘন্টা পাইকারী নরহত্যা চালিয়ে ময়দান সাফ করল। মাত্র কয়েকটি নারীর প্রাণ বাঁচলো। রসি দিয়ে তাদের হাত বেঁধে তাদেরকে যিনের সাথে আটক করে নিয়ে তাতারী ফৌজ রওয়ানা হল সমরকন্দের পথে।

ঘোড়ার সাথে বেঁধে নেওয়া বেশী দূর তাদের দ্রুতগতির ধাক্কা সামলাতে পারলো না। কয়েদী নারীরা যখন এমনি করে লাগল, তাতারী সওয়ার তখনও খঞ্জর দিয়ে তাদের রসি কেটে দিতে লাগল।

চেংগিস খান বোখারা জয় করে যতটা খুশী হলেন, তার চাইতে বেশী তাঁর আফসোস হল দু'হাজার লোক মারা যাওয়ায়।

●

আত্মরক্ষা ব্যবস্থার দিক দিয়ে সমরকন্দ ছিল কারেযম শাহের সব চাইতে মজবুত শহর। শহরের হেফাযতের জন্য মওজুদ ছিল এক লাখ দশ হাজার সিপাহী। কিন্তু তাতারীদের বোখারা জয়ের অপ্রত্যাশিত খবর পেয়ে সুলতানের বাকী আত্মবিশ্বাসটুকুও লোপ পেয়ে গেল। তিনি শহরের নেতৃত্ব কয়েকজন সরদারের উপর ন্যস্ত করে বলখের দিকে চলে গেলেন। সঠিক পথনির্দেশের জন্য ফৌজ যে দুটি বিরাট ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করতে পারতো, তাঁরা কেউ সমরকন্দে নেই। সুলতানের নওজোয়ান বেটা যাকে বলা হত শেরে খারেযম-তখনও সালতানাতের উত্তর পশ্চিম এলাকায় সেনাবাহিনী গঠন করতে ব্যস্ত। তিনি দূত পাঠিয়ে তাঁর একরখা পিতার কাছে সমরকন্দে আসার এজাযত চেয়েছিলেন। কিন্তু সুলতান জবাব পাঠিয়েছেন : 'তুমি আমার চাইতে বেশী অভিজ্ঞ নও। যখন প্রয়োজন হবে, তখনও তোমায় ডেকে আনা যাবে।'

অপর ব্যক্তি তৈমুর মালিক। কোকন্দের লড়াইয়ের সময়ে তিনি সারা তুর্কিস্তানে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সমরকন্দের বাচ্চা বুড়ো সবারই ধারণা, এক লাখ দশ হাজার সিপাহী নিয়ে তিনি তাতারী ফৌজকে প্রত্যেক ময়দানে হার মানাতে পারেন, কিন্তু সুলতান সমরকন্দে পৌঁছেই তাঁকে আশপাশের কলহমান দলগুলোকে সংহত করবার ভার দিয়ে পাঠালেন।

খারেযম শাহ নিজেও যখন সমরকন্দ থেকে চলে গেলেন, তখনও তামার লশকরের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ল নৈরাশ্যের ছায়া। নামজাদা মালিকও সরদাররা আগেই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের দরুণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বিভেদ আরও বেড়ে গেল।

চেংগিস খানের এক পুত্র সেহুন নদীর তীরে বহু শহর জয় করে নিয়েছিল।

সমরকন্দ অবরোধকালে সে বিপুল সংখ্যক কয়েদী নিয়ে এসে পিতার সঙ্গে যোগ দিল। সমরকন্দের পাঁচিল ছিল খুবই মজবুত। বারোটি লৌহ দরজার হেফাজতের জন্য বুরুজের উপর তীরন্দাযদের পাহারা তাকে করে রেখেছিল অপরাজেয়।

চেংগিস খান কয়েদীদের পাঁচিলের আশেপাশে পরিখা খননের কাজে লাগিয়ে দিলেন এবং দীর্ঘ অবরোধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। শহরের রক্ষীবাহিনী বুঝলো যে, দু'এক মাসের মধ্যে তাতারীরা আশেপাশের এলাকায় এমন মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে যে, শহরের বাসিন্দাদের সাহায্যের জন্য কোন সেনাদল পাঠানো হলেও তাদের শহরে পৌঁছা হবে অসম্ভব। ঘাঁটি তৈরী করবার জন্য তাতারীরা আশেপাশে বস্তি থেকে কয়েদীদের নতুন নতুন আমদানী করতে লাগল।

এহেন অবস্থায় ফৌজের সরদাররা শহরের বাইরে বেরিয়ে লড়াই করবার ফয়সলা করলেন। তুর্ক বাহিনী যথেষ্ট বাহাদুরীর সাথে লড়াই করল, কিন্তু যখন তাতারীরা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল, ঠিক এমনি সময়ে যেসব সরদার আগেই চেংগিস খানের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল, গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হল ত্রিশ হাজার সিপাহী নিয়ে। বিজয়ের পর প্রথম দিন তাদেরকে অভ্যর্থনা করলেন। তাদের পরবার জন্য তাতারী সিপাহীর লেবাস দিলেন। তারপর শহরের উপর কতলে আম-পাইকারী হত্যালীলা শেষ করে রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে সরদার সহ ত্রিশ হাজার গাদ্দারকে পাঠালেন মৃত্যুর গহ্বরে। চেংগিস খান দুশমনের গাদ্দারদের কাজে লাগাতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জিন্দাহ্ রাখা ছিল তাঁর নীতির খেলাফ।

সমরকন্দ জয়ের পর চেংগিস খাঁন তার বাছাইকরা সওয়ারদের পাঠালেন খারেযম শাহের পিছু ধাওয়া করতে। চেংগিস খান মনে করলেন, খারেযম শাহকে সুযোগ দিলে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি এক নতুন সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে নেবেন। তাই অনুসরণকারী বাহিনীর সরদারদের তিনি হুকুম দিলেন, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তারা খারেযম শাহের সন্ধান করবে এবং যে শহরেই তিনি থাকুন, তাকে অবরোধ করবে। বাকী সব শহরের দিকে নযর না দিয়ে তারা এগিয়ে যাবে তার সন্ধানে।

খারেযম শাহ জানতে পারলেন য, তাতারীরা তার সালতানাতের শহরগুলো জয় করবার ইরাদা মুলতুবী রেখে তাঁকেই ধরতে চাচ্ছে।

খারেযম শাহ বিভিন্ন শহর অতিক্রম করে নেশাপুর পৌঁছলেন। তাতারীরা পথের আর সব শহর ছেড়ে এসে সেখানে পৌঁছলো। এবার খারেযম শাহ হামদানের দিকে চললেন, কিন্তু তাতারী ছায়ার মত তাঁর পিছু পিছু চলল। পথের মধ্যে এক জায়গায় তাতারীরা তাদেরকে ধরে ফেলল। খারেযম শাহের সাথীদের উপর চলল তাতারীদের তলোয়ার। শাহ নিজ তীরের আঘাতে জখম হয়ে পালালেন। দুনিয়ায় এখনও তাঁর সব চাইতে বড় সমস্যা হল জান বাঁচানো। তার সাথীরা তাঁর প্রতি বিরক্ত হয়ে গেছে।

তিনি চারদিক থেকে হতাশ হয়ে বাহিরায়ে খিযরের কিনারে ডেরা ফেললেন। সকল দলের সরদারের কাছে খবর পাঠিয়েও তিনি কারুর কাছ থেকে সাহায্য পেলেন না।

●

খারেযম শাহের বিশ্বাস নেই দুনিয়ার কারুর উপর। তাতারীদের মত তাঁর নিজের সিপাহীদের দিক থেকেও আসতে পারে তাঁর জীবনের উপর হামলা। নিজের জন্য তিনি কয়েকটি খিমা তৈরী করলেন, কিন্তু দু'একটি গোলাম ছাড়া কেউ জানে না, তিনি রাতের বেলা কোথায় শুয়ে থাকেন। এক রাত্রে তিনি নিজের প্রশস্ত খিমা থেকে বেরিয়ে একটি ছোট খিমায় গিয়ে শুয়ে থাকলেন। ভোরে দেখা গেল, তাঁর খিমাটি তীরের ঘায়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

এক সন্ধ্যায় তিনি সমুদ্রের কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিছুদূরে দেখা গেল ধূলি উড়ছে। তাঁর মনে সন্দেহ হল, তাতারীরা বুঝি আসছে। কিন্তু এক সিপাহী এসে খবর দিল যে, এ মুসলমানদেরই এক ফৌজ আসছে। লশকর কাছে এসে থেমে গেল। মাত্র পাঁচ হাজার সিপাহী তারা। খারেযম শাহ হতাশ হলেন। এক সওয়ার এগিয়ে গিয়ে খারেযম শাহকে দূর থেকে চিনতে পেরে তাঁর কাছে দাঁড়ালেন।

সওয়ারটি জালালুদ্দীন।

মুহূর্তের জন্য পিতাপুত্রের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। খারেযম শাহ বললেন ঃ 'জালাল ঘোড়া থেকে তুমি নামবে না?'

ঃ 'না, আমায় বহুত দূর যেতে হবে। আপনি কেন আমায় ডেকেছেন, শুধু জানতে আমি এসেছি।'

ঃ 'তাহলে তুমি আমায় সাহায্য করতে আসনি?'

ঃ 'এ বিরান জায়গায় আপনার বিপদ কোথায়? আমি চলেছি মওতের সন্ধানে। মওতের ভয়ে পালায় যারা, তাদের কি সাহায্য করা যায়?'

খারেযম শাহ এগিয়ে গিয়ে জালালউদ্দীনের ঘোড়ার লাগাম ধরতে ধরতে বললেন ঃ 'না, না, আমি তোমায় যেতে দেব না। যমিন আমার কাছে ছোট হয়ে গেছে। তুমি আমার শেষ অবলম্বন। চলো, আমি তোমায় আমার খিমা দেখাচ্ছি। তা তীরের ঘায়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। আজ সারা দুনিয়া আমার দুশমন। আমার পুত্রও কি আমায় সাহায্য করবে না?'

জালালউদ্দীন জবাব দিলেন ঃ 'হায়! আপনি যদি দুনিয়ার কোন ভালাই করতেন! আপনারই কারণে মুলুক আজ এক বন্য নীচ দুশমনের গোলামীর শিকলে বাঁধা পড়েছে। কেবল নিজের জানের ভয়ে আপনি সারা মুলুক নেকড়ের হাতে সঁপে দিয়েছেন। আপনার ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে গোটা কওমকে। আপনারই কারণে মুসলমান আজ তাদের স্ত্রী কন্যার বেইজ্জতি দেখতে বাধ্য হচ্ছে। আজ আপনি তাদেরকে পয়গাম পাঠাচ্ছেন, তারা যেন এসে আপনার খিমা পাহারা দেয়। কিন্তু কোন মুখে?'

ঃ 'জালাল! জালাল!! আমি তোমার বাপ!'

ঃ 'হায়! আমি যদি আপনার ঘরে পয়দা না হয়ে এক গরীব অথচ বাহাদুর বাপের ঘরে পয়দা হতাম!'

ঃ 'জালাল! আমার দীলে দুঃখ দিও না।'

ঃ 'হায়! আপনার দেহে যদি দীল থাকত। আল্লাহ তাআলা ওখানে রেখে দিয়েছেন একটা নিস্প্রাণ গোশতের পিন্ড।'

ঃ 'শেষ পর্যন্ত তোমার একথার তাৎপর্য কি?'

ঃ 'কিছু নয়। আপনার সাথে এ আমার শেষ মোলাকাত। আমি এখনও আপনার কাছে আরজ করছি, আপনার কোষাগার আমার হাতে ছেড়ে দিন। বোখারা ও সমরকন্দের কোষাগারের মত তা তাতারীদের হাতে চলে যায়, তা আমি চাই না। নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমার প্রত্যেকটি মুদ্রা কাজে লাগবে।'

ঃ 'তাহলে তুমি মনে কর, তুমি তাতারীদের সাথে লড়তে পারবে?'

ঃ 'গোড়া থেকেই আমার ধারণা ছিল তাই। কিন্তু আপনিই আমার পথ বন্ধ করেছেন।'

ঃ 'জালাল! তাতারীদের সাথে লড়বার খেয়াল এক পাগলামি; এই মুসিবতের দিনে আমি আমার অবশিষ্ট পুঁজি থেকে বঞ্চিত হতে চাই না। খোদার দিকে তাকিয়ে আমার সাথে থাক। আমার নিজের জানের চাইতেও তোমার জান আমার কাছে প্রিয়। এই আসমানের নীচের এমন সব জায়গা রয়েছে, যেখানে আমরা আরামে কাটিয়ে দিতে পারবো বাকী জিন্দেগী। আমরা মিসরে চলে যাব, আন্দালুস চলে যাব।'

ঃ 'যারা বুজদীল হয়ে জিন্দেগী কাটাতে চায়, আমি তাদের সাথী হতে চাই না; আমি চাই তাদেরই সাথী হতে, যারা বাহাদুরের মওত মরতে জানে। যে কওম আপনার তখত তাজের জন্য দিয়েছে বুকের খুন, তাদের আজ প্রয়োজন আমার খুন ও সিনার। তাদের দিকে আমি পিঠ ফিরাতে পারব না।'

ঃ 'কিন্তু পাঁচ হাজার সিপাহী নিয়ে কি করবে তুমি? তাতারীদের সংখ্যা বালুকণার চাইতেও বেশী।'

ঃ 'এমনি অবস্থায় এক সিপাহী জয় পরাজয়ের পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের ময়দানে। আমি আমার কর্তব্য পালন করব। জয় পরাজয় আল্লাহরই হাতে, কিন্তু জিন্দাহ থেকে পরাজয় বরণ মুসলমানের পক্ষে শোভন নয়। আমার আরও বিশ্বাস রয়েছে, যদি আমি এই পাঁচ হাজার সিপাহীকে বাহাদুরের মত মরতে শিখাতে পারি, তাহলে গোটা কওম আবার জেগে উঠবে জিন্দাহ্ হয়ে। আপনি মিসরে চলে যান। আমার কোন সম্পদের প্রয়োজন নেই। আমি পেটে পাথর বেঁধে জীর্ণবস্ত্র পরিধান করে লড়াই করে যাব। আমার বিশ্বাস, গোটা কওম হবে আমার সাথী।'

জালালউদ্দীন লাগাম টেনে দ্রুত ঘোড়া হাঁকালেন।

ঃ 'জালাল! দাঁড়াও। আমায় এখানে ছেড়ে যেয়ো না। এখানে আমার আপনার কেউ নেই। আমায় তোমার সাথে নিয়ে যাও।'

জালালউদ্দীন ঘোড়া থামাতে থামাতে বললেন ঃ 'চলুন।'

ঃ 'কিন্তু কোথায়?'

ঃ 'মওতের পিছনে, আজাদী আর জিন্দেগীর সন্ধানে।'

ঃ 'না, না, বেটা! আমার কথা শোন। তাতারীদের সাথে লড়তে আমরা পারব না।'

ঃ 'খোদা আর রসূলের হুকুমের চাইতে আপনার হুকুম আমার কাছে বড় নয়। আমাদের মঞ্জিল আর পথ তার আলাদা। খোদা হাফিয।'

কয়েকদিন পর খারেযম শাহ্ তাতারীদের আগমনের খবর পেয়ে কতিপয় সাথীকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন বাহিরায়ে খিযরের এক দ্বীপে। সেখানেই লোক চক্ষুর অজ্ঞাতে তাকে মওতের মোকাবিলা করতে হল।

●

তাতারীদের সর্বগ্রাসী প্লাবন এগিয়ে চলল তুর্কীস্তান, খোরাসান ও ইরানের প্রশস্ত ময়দানের দিকে। আগুন আর রক্তের এ তুফানের সামনে পাহাড়, দরিয়া আর কেল্লা কিছুই টিকে থাকল না। উত্তর ও পশ্চিমের তাতারী সয়লাবের গতিবেগ সালতানাতে খারেযমের সীমানা পার হয়ে গিয়ে স্পর্শ করল দানিপারের কিনার। চেংগিস খানের এক পুত্র তখনও আঘাত হানছে রাশিয়ায় মস্কোর দ্বারদেশে, আর এক পুত্র বিপর্যস্ত করছে পূর্ব ইউরোপের ছোট ছোট সালতানাত। কিন্তু খারেযমের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তখনও প্রতিরোধের এক অজেয় পাহাড়। সয়লাবের বলিষ্ঠ ও দ্রুত গতিবেগ কয়েকবার তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে, কিন্তু তখনও তার বুনিয়াদ নড়েনি। খারেযমের ভস্মস্তূপের ভিতর তখনও জ্বলছে আগুনের একটি স্ফুলিংগ। চেংগিস খানের মনে আশঙ্কা ছিল, আগুনের এই শেষ স্ফুলিংগটিকে খতম করে দিতে না পারলে একদিন তা হয়ে উঠবে এক ভয়াবহ অগ্নিগিরি। এই লোহার পাহাড় আর চিরজ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিংগ ছিলেন জালালুদ্দীন। বুজদীল পিতার বাহাদুর পুত্র। তিনি ছিলেন সেই দলের লোক, যারা জিন্দাহ্ থেকে হার মানতে জানেন না, যারা জয় পরাজয়ের পরোয়া না করে লড়াই করে যান, তুফানের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে সমুদ্রের গভীরতা পরোয়া করেন না যারা।

জালালউদ্দীন মুষ্টিমেয় যোদ্ধার একটি ছোট্ট দল নিয়ে ময়দানে নেমে তাতারীদের মোকাবিলা করলেন। এক জায়গায় তিনি পরাজিত হয়ে ফেরেন, আবার পরদিনই শোনা যায়, ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ দূরে তাঁর সালতানাতের একটি হারানো শহর তিনি উদ্ধার করে নিয়েছেন। কখনও তাঁর সাথে থাকে পাঁচ হাজার সিপাহী, কখনও পাঁচশ', আর কখনও পাঁচেরও কম। কিন্তু তিনি লড়াই করে চলেছেন। তিনি ক্ষুধিত বাঘের মত কখনও পেছন থেকে হামলা করেন, কখনও বা ঈগলের মত ঝাপটা মারেন ফৌজের সম্মুখভাগে। দেখতে দেখতে তাতারীরা গা ঢাকা দেয় পাহাড়ে অথবা জংগলে।

রাতের বেলা তাঁর সওয়াররা হামলা করে দুশমনের ছাউনীর উপর। দেখতে দেখতে জ্বলন্ত মশাল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় অগুণতি খিমা। পংগপালের মত অগুণতি তাতারী সিপাহীর সামনে তারা ভয় পান না। বিজিত শহর ও বস্তির উপর তাতারী জুলুমের কাহিনী নিভিয়ে দিতে পারে না, তাদের উদ্দীপনার জ্বলন্ত শিখা।

বোখারা, সমরকন্দ ও আর সব শহরের উপর তাতারী জুলুমের কাহিনী শুনে দক্ষিণের শহরগুলোতে বেশীরভাগ বাসিন্দা আশে পাশের মুলুকের দিকে হিজরত করে চলে গেছে। ইরাক, শাম,আফগানিস্তান ও মিসরের পথে লক্ষ লক্ষ মুহাজির ও নর-নারী

শিশু ক্ষুধায় মরছে। স্বচ্ছল লোকেরা মুহাম্মদ শাহের প্রথম পরাজয়ের খবর পেয়েই অপর রাজ্যে হিজরত করে গেছে, কিন্তু আরও কয়েকটি শহর জয়ের পর সবারই মনে বিশ্বাস জন্মালো যে, তাতারীরা এমন কোন মুসলমান পুরুষকে জিন্দাহ্ ছেড়ে দেয় না, যারা তলোয়ার ধরতে পারে। তাই গরীব ও নিঃস্ব লোকেরাও নিজ নিজ বস্তি ও শহর ছেড়ে চলে যেতে লাগল। কাফেলা ও কাফেলার পথপ্রদর্শকদের মধ্যে অনেকেরই জানা ছিল না, তাদের মঞ্জিল কোথায়। তথাপি তারা চলছে। তাতারী ভীতি তাদেরকে উত্তর পূর্ব থেকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমে।

তাতারীদের সাথে যে সব কাফেলার সংঘাত হত, তাদের ভিতর থেকে কতিপয় খুবসুরত নারী ছাড়া তামাম লোককে কতল করে ফেলা হত।

রোযে আযল থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত দিনের সূর্য আর রাতের তারকারাজি আল্লাহর যমিনের বুকে এমন নৃশংস জুলুমের দৃশ্য আর কখনও দেখেনি।

মুহাজিরেরা বেশীরভাগ চলছে মরভের দিকে। ছয় শতাব্দী আগে এই মরভ ছিল তুর্কীস্থান বিজয়ী কাতিবা বিন মুসলিম বাহলীর আবাসভূমি। এখানেই ছিল সুলতান সানজর সেলজুকীর কবরগাহ।

জালালউদ্দীনের উদ্দীপনার ফলে বেশীরভাগ মুহাজির তাতারীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে মরভে চলে যাওয়ার মওকা পেলো। কয়েক মাসের মধ্যে মরভে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল কয়েক লাখ মুহাজির।

## ষোল

কয়েদখানায় তাহিরের দশ মাস কেটে গেছে। গোড়ার দিকে কয়েক হপ্তা আওয়ামের ভিতরে খুবই চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের উৎসাহ উদ্দীপনার ভাটা পড়ে গেছে। তাদের বিক্ষোভ বন্ধ হয়ে গেছে। হুকুমাত আওয়ামের মনোভাব সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে আবদুল আজীজ, আবদুল মালিক আর তাদের সাথীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী হুকুম জারী করেছেন। তাদের অপরাধ, হুকুমাতের খেলাফ তারা বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন। কিন্তু বিবেচক ও প্রভাবিত লোকদের এক তব্‌কা তখনও তাদের সমর্থক। তাই হুকুমাত তাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে গ্রেফতার করতে পারছেন না।

বোখরা, সমরকন্দ, তুস, তিরমিয ও রায় সম্পর্কে ভয়াবহ খবর পৌঁছে যাচ্ছে বাগদাদে, আর বাগদাদের বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে জাগছে চাঞ্চল্য। তাহিরের সমর্থক সংখ্যা আরও বেড়ে চলেছে। মুহাজিরদের এক কাফেলা এসে পৌঁছে গেছে বাগদাদে। তাদের যবান থেকে শোনা যাচ্ছে তাতারীদের মর্মান্তিক জুলুমের কাহিনী। বাগদাদের হর মাহফিলে চলছে খলিফা ও ওমরাহের কার্যকলাপের সমালোচনা। ক্রমাগত সে সমালোচনার তীব্রতা বেড়ে চলেছে। তাতারীদের ইরানে প্রবেশের খবরে তাদের চাঞ্চল্য রূপান্তরিত হচ্ছে ভীতি ও আতংকে। জনগণ খোলাখুলি দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করছে উজিরে আজম, খলিফা ও ওমরাহের বিরুদ্ধে।

এক রাত্রে বাগদাদের প্রত্যেকটি মসজিদের দরজায় ইশতেহার চাপানো হল ঃ 'গাফলাতের ঘুমে অচেতন মানুষ; জাগো। হত্যা ও বরবাদির তুফান আজ আঘাত হানছে বাগদাদের দরজায়। যাদেরকে তোমরা মনে কর তোমাদের রক্ষক, তারা তাতারীদের

স্বার্থে তোমাদের ইজ্জত ও আযাদীর সওদা করে ফেলেছে। এখনও কি হুকুমাতের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করছে না যে, তাহির বিন ইউসুফ খলিফা ও চেংগিস খানের মধ্যে যে গোপন সমঝোতার সন্ধান পেয়েছিলেন, সত্যিই তা করা হয়ে গেছে? তাহিরের অভিযোগ যদি মিথ্যা হত, তাহলে হুকুমাত কেন খোলা আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাবার সাহস করলেন না? যদি আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খারেযম শাহের সাথে খলিফার কোন দুশমনি থাকত, তাহলে তিনি তো মরেই গেছেন। এখনও তুর্কীস্তান, খোরাসান ও ইরানে তাতারীদের অবর্ণনীয় জুলুমের খবর শুনেও খলিফা কেন ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করবেন না?

'বাগদাদের বাসিন্দাগণ! তোমাদের গাদ্দারদল তোমাদেরকে এমন এক দুশমনের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে, যারা কারুর উপর রহম করতে জানে না। এখনও তোমাদের নিজেদের ফয়সলা করবার সময় এসে গেছে। জামে মসজিদে জুম'আর নামাযের পর এক পয়গাম শোনানো হবে।'

জুম'আর দিন মসজিদে তিল ধারণের স্থান নেই। পয়গাম শোনাচ্ছেন আবদুল মালিক। শ্রোতাদের মনে হচ্ছে, যেন তাহির বিন ইউসুফের রুহ কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এসে অধিষ্ঠান হয়েছে আবদুল মালিকের দেহে। তাঁর বক্তৃতার প্রথম ফল হল, যেসব কাজী তাহির বিন ইউসুফকে বিদ্রোহী বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন,তাদের ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল আগুনের শিখা। সন্ধ্যার দিকে ক্রুদ্ধ জনতা উজিরে আযমের মহলের দরজায় জমা হয়ে তুললো বিক্ষোভের ধ্বনি।

সালতানাতের গণ্যমান্য আমীর ওমরাহ্ এক প্রশস্ত কামরায় খলিফার মসনদের সামনে সুসজ্জিত কুরসীর উপর সমাসীন। নকীব খলিফার আগমন বার্তা ঘোষণা করল। ওমরাহ্ সসম্ভ্রমে কুরসী থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এক সিপাহী মসনদের পিছন দিকের দরজার পর্দা সরিয়ে দিলে খলিফা চারজন হাবসী গোলামের নাংগা তলোয়ারের ছায়ায় মসনদের উপর এসে হাজির হলেন। নকীব আবার ঘোষণা করলেন। ওমরাহ্ নিজ আসনে বসে পড়লেন।

খলিফার হুকুমে শহরের নাযিম উঠে শহরের নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবরণ দান করলেন। তারপর বেশীর ভাগ ওমরাহ্ একে একে নিজেদের মতামত পেশ করলেন।

সবাই একমত হলেন যে, তাহিরের গ্রেফতারীর পর আওয়াম অত্যধিক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শহরের কাযীউল কুযযাতের বাসভবন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু এই জন্য যে, তিনি তাহিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফতোয়া দিয়েছিলেন। আর যেসব ওলামা তাকে বেদ্বীন বলে ঘোষণা, করেছিলেন ক্রুদ্ধ জনতা তাদের বাড়িঘরের উপর হর রোজ পাথর মারছে। শহরের মসজিদগুলোর উপর গোমরাহ্ ধরণের নওজোয়ানরা কব্জা করে নিয়েছে এবং সালতানাতের কর্মচারীরা ভয়ে ভয়ে সেখানে যান। শহরের কোতয়াল খবর দিলেন যে, আবদুল আযীয ও আবদুল মালিকের চেষ্টায় ফৌজে কতক সিপাহী ও অফিসার গোপনে গোপনে বিদ্রোহে উৎসাহ যোগাচ্ছেন। খলিফা সব ঘটনা শুনে অধীরভাবে পাশ ফিরে বললেন ঃ 'বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি। আমি জানতে চাই, এ যাবত তোমরা কি করেছ, কত লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে?'

প্রশ্নটি শুনে কোতয়াল ও শহরের নাজিম উজিরে আজমের দিকে তাকালেন। উজিরে আজম উঠে বললেন ঃ 'আমীরুল মুমেনীনের এজাযত হলে আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে চাই।'

খলিফা মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। উজিরে আজম বললেন ঃ 'জনসাধারণের অসন্তোষের কারণ, আমরা বিনা বিচারে তাহিরকে কয়েদখানায় রেখেছি। তিনি তাঁর বক্তৃতায় হুকুমাতের বিরুদ্ধে কঠিন অভিযোগ এনেছিলেন। তাঁকে আদালতের সামনে আনা হলে, আমার বিশ্বাস, তিনি কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারবেন না। যে জনমত আজ আমাদের বিরুদ্ধে, তার ফলে কাল তা আরও তীব্রভাবে তাঁরই বিরুদ্ধে চলে যাবে। আজ যদি আমরা বাছ-বিচার না করে মানুষকে গ্রেফতার করতে থাকি, তাতে বাগদাদের কয়েদখানা ভরে যাবে, কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা তাতে কমবে না। তাছাড়া তুর্কীস্তানের বিজিত এলাকায় তাতারী জুলুমের কাহিনী আজ কারুর কাছে পুশিদা নেই। ইসলামী রাজ্য সমূহের বাসিন্দারা যখন জানবে যে, বাগদাদের আওয়াম হুকুমাতকে তাতারীদের সাথে চক্রান্ত করার অপরাধে অপরাধী মনে করছে আর হুকুমাত খোলা আদালতে তাদের নেক নিয়তের প্রমাণ দেবার সাহস না করে কঠোর হস্তে তাদের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করছেন, তখনও হুকুমাতকে সত্যি সত্যি অপরাধী মনে করে তাদের পক্ষে অসংগত হবে না। তাহির মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর সাথে যে তিনটি নওকর গিয়েছিল তাদের কামানো মাথার উপর উজিরে খারেজা ও হযরত আমীরুল মুমেনীনের দস্তখতযুক্ত এমন এক লিপি লিখিত ছিল, যাতে তাতারীদের খারেযমের উপর হামলা করবার উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারবো যে, এটা একটা কাহিনী মাত্র। ওয়াহিদুদ্দীন তাঁর প্রথম ষড়যন্ত্র ধরা পড়বার পর আচানক গায়েব হয়ে গেছেন। এখনও তাঁর কোন সন্ধান নেই। তাহির ওয়াহিদুদ্দীনের গায়েব হওয়ার এক দেড় মাস পরে কারাকোরেমের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না যে, তাঁর সাথীরা ওয়াহিদুদ্দীনের কোন লিপি বা নিদের্শ নিয়ে গিয়েছিল।

'তাছাড়া তাঁর নিজের কথা মত তিনটি লোককেই মেরে ফেলা হয়েছে এবং তাদের মাথা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে খারেযম শাহের দরবারে। লিপি সম্পর্কে তাই তিনি কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবেন না। আমার বিশ্বাস, কাজীর আদালতে তাকে হাযির করা হলে বাগদাদের সব চাইতে আহমক লোকও তাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। এর বিপরীতে যদি আমরা তাকে বিনা বিচারে কয়েদখানায় রাখি অথবা কোন শাস্তি দেই, তার ফলে বাগদাদের বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য বেড়েই চলবে।'

বেশীরভাগ ওমরাহ্ উজিরে আজমের কথা সমর্থন করলেন। খলিফা মুহাল্লাব বিন দাউদের দিকে তাকালে তিনি উঠে প্রাঞ্জল ভাষায় বললেন ঃ 'আমরা তাহিরকে মামুলী বুদ্ধির লোক বলে মনে করে ভুল করছি। আমার ধারণা, তিনি বাগদাদের আবহাওয়া অশান্ত করে তোলার ব্যাপারে হুকুমাতে খারেযমের নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর ধন-দৌলতের কথা আগে থেকেই মশহুর হয়ে আছে এবং এবার তিনি এই অভিযান চালাবার জন্য নিশ্চয়ই অনেক কিছু নিয়ে এসেছেন। যে কটি নওকর তাঁর সাথে গিয়েছিল

তারা নেহায়াৎ সাধারণ লোক। সম্ভবতঃ দৌলতের লোভে তারা তার উদ্দেশ্য হাসিল করার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং এও সম্ভব যে, তারা যিন্দাহ্ রয়েছে। তাহির তাদেরকে বাগদাদের কোথাও গোপন রেখেছেন। আমরা তাদের কোন খোঁজ-খবর না করি, এই জন্য তাদের মৃত্যুর খবর রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেবার কেউ নেই, এই ভরসায় আপনারা তাকে আদালতে হাযির করে তাঁর অভিযোগ প্রমাণের মওকা দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু আচানক সেই তিনটি লোক আদালতের সামনে এলে আপনারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে পারবেন না। তাছাড়া এও সম্ভব যে, ওয়াহিদুদ্দীন সেই ষড়যন্ত্র গোপন করবার জন্য গায়েব হয়ে গেছেন। তিনিই সেই তিনটি লোকের মাথার উপর কিছু লিখে তাতে খলিফার জাল দস্তখত লাগিয়েছেন। সাবেক উজিরে খারেজার হাতের লেখা চিনতে পারা কারুর পক্ষে অসম্ভব হবে না। তাহির এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তাদেরকে বাগদাদ থেকে তাহিরের সাথে পাঠাবার কিছুকাল আগেই এসব তৈরী করে রাখা হয়েছিল।

'ওয়াহিদুদ্দীন সাধারণ লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন হুকুমাতের এক জরুরি স্তম্ভ। আদালতে যদি তাঁর ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে আওয়াম আমাদের সবাইকে অপরাধী বলে ধরে নেবে। তাই আমি ওকে আদালতে হাযির করা নিরাপদ মনে করছি না। তথাপি আমি উজিরে আজমের রায় সমর্থন করছি যে, এখনকার মত কোন কঠোর ব্যবস্তা করে আওয়ামকে ক্ষেপিয়ে তোলাও নিরাপদ হবে না। আমরা কৌশলে উদ্দেশ্য হাসিল করলে সকল সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। মহিমান্বিত হযরত আমীরুল মুমেনীন ও মহামান্য উজিরে আজমের এজাযত পেলে আমি গোপনে এক উপায় উদ্ভাবন করে তাদের সামনে পেশ করব।'

খলিফা আসরের ওয়াক্তে উজিরে আজম ও মুহাল্লাবকে হাজির হবার হুকুম দিয়ে মজলিস ভেঙে দিলেন।

আসরের ওয়াক্তে উজিরে আজম যখন খলিফা মহলের দরজায় পৌঁছলেন, তখনও শহরের নাযিম ও মুহাল্লাব মহল থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন। উজিরে আজমের প্রশ্নের জবাবে মুহাল্লাব বললেন ঃ 'সময়ের আগেই খলিফা আমায় ডেকে এনেছেন। আমার প্রস্তাব আমি তাঁর কাছে পেশ করেছি। খলিফা আমার সাথে একমত হয়েছেন যে, তাহিরকে কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যাবার মওকা দেওয়া হোক। তাতারী সেনাবাহিনী মরুভের দিকে হামলা করেছে। তাহির আর তাঁর উন্মত্ত সাথীরা সবাই এবার ওদিকেই ছুটবে। তারপর জনসাধারণ আপনি ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাকে গ্রেফতার করার পরই সরকারী চরের মুখে খবর পাওয়া গেছে যে, গ্রেফতারীর সময়ের দু' একদিনের মধ্যেই তার বাগদাদ থেকে চলে যাবার কথা ছিল। এখনও আমরা তাকে পালাবার মওকা দিয়েই শহরে এলান করে দেব যে, তাকে ধরে দিতে পারলে একটা বড় রকমের ইনাম দেয়া হবে। তার পালিয়ে যাবার দু' একদিন পর আমরা শহরে জানিয়ে দেব যে, তিনি খারেযম শাহের ইশারায় বাগদাদে গোলযোগ সৃষ্টি করতে এসেছিলেন।

উজিরে আজম বললেন ঃ 'আপনি আমাদেরকে এই পথ দেখিয়ে মুলুকের এক অতি বড় খেদমত করেছেন। আমি এখনওই দারোগাকে হুকুম পাঠাচ্ছি। তাঁকে এখনি কয়েদখানা থেকে সরিয়ে ফেলা হবে।'

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'এ কাজটা আমার উপর সোপর্দ করে দিন। নাযিম শহরকে সাথে নিয়ে কাল আমি দারোগার কাছে যাব এবং ওর সাথে কি করতে হবে, তাকে বুঝিয়ে দেব।

উজিরে আজম বললেন ঃ 'আপনি আমায় এক অতি বড় মানসিক অশান্তি থেকে নাজাত দিয়েছেন। আমি আপনার শোকর গুযারী করছি।'

মুহাল্লাব জবাব দিলেন ঃ 'এ আমার কর্তব্য ছিল।'

ঃ 'জনতা খুবই চঞ্চল হয়ে উঠছে। আমার ধারণা, ওকে জলদী কয়েদখানা থেকে বের করে দেওয়া প্রয়োজন।

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। উনি কাল পর্যন্ত আজাদ হয়ে যাবেন।'

সুফিয়া দরিয়ার কিনারে উপর-তলার ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। গোধূলীর ছায়া নেমে আসছে। পশ্চিম আসমানের মেঘরাশি সূর্যকে বুকে টেনে নিয়ে রক্তিম লাল হয়ে উঠছে। পাখীরা আসমানের মশাল গায়েব হতে দেখে উড়ে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তাদের নীড়ে। সন্ধ্যার ম্লানিমা ঘিরে আসার সাথে সাথে আসমানের কোলে দীপ্ত হয়ে উঠছে চাঁদের স্নিগ্ধ মুখ। আসমানের আঁচল ধরে মিটিমিটি তাকাচ্ছে সিতারারাজি। তাদের সাথে সাথে বিষণ্ন সৃষ্টি উঠছে হেসে। আবহাওয়ার শীতলতা বেড়ে যাচ্ছে। সারাদিনের ক্লান্ত মাঝিরা তাদের কিশতি লাগাচ্ছে অপর পারে। মাঝে মাঝে পানির উপর দু'এক হাত পর পর লাফিয়ে উঠছে দু'একটা মাছ, তারপরই তারা আবার গায়েব হয়ে যাচ্ছে।

সুফিয়া নীচে নামবার ইরাদা করছেন। এরই মধ্যে তার কানে এল কারুর পায়ের আওয়াজ। তিনি একবার ফিরে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি কাসিম।

তিনি বললেন ঃ 'সুফিয়া, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। নীচে চলে যাও।'

সুফিয়া কোন জবাব না দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার দরিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ 'সুফিয়া, আল্লাহ্‌র দিকে তাকিয়ে তুমি কথা বল। প্রাণভরে তুমি আমায় অভিশাপ দাও। তোমার এ নীরবতা আমার কাছে অসহনীয়। আমি যদি জানতে পাই যে, এই দরিয়ার গতি ফিরিয়ে দিতে পারলে আমি তোমার মুখে হারানো হাসি ফিরিয়ে আনতো পারবো, তাহলে খোদার কসম, আমি তাতেও রাজী থাকব।

সুফিয়া চিৎকার করে বললেন ঃ 'তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি প্রতারক। আল্লাহ্‌র কসম, এখান থেকে চলে যাও। আমায় পেরেশান কর না।'

'ব্যস, আমি এই কথাই শুনতে এসেছি।' রাগ সংযত করে মুখে হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করে কাসিম বললেন। সুফিয়া আরও তিক্তস্বরে বললেন ঃ 'তুমি জালেম, তুমি কমিনা, তুমি কওমের গাদ্দার। যাও, নইলে আমি এই ছাদ থেকে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

কাসিম এগিয়ে এসে তাঁর বাযু ধরে বললেন ঃ 'সুফিয়া! সত্যিই তোমার এতটা ঘৃণা আমার উপর?

ঃ 'আমি তোমায় ঘৃণা করবারও যোগ্য মনে করি না।' বাযু ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে সুফিয়া বললেন।

এর সব কিছুরই কারণ তাহির-সেই বেআকুব বুদ্দু!' কাসিম রাগে দাঁত পিষতে লাগলেন।

ঃ 'আমি হামেশাই তোমায় ঘৃণার পাত্রে মনে করে এসেছি।'

ঃ 'তুমি মিথ্যা বলছ। আজ তুমি আব্বা, আম্মা ও সখিনার কাছে যা কিছু বলেছ, তা আমি শুনেছি। আমার উপর ঘৃণার কারণ, তুমি সেই জাহেলকে মুহাব্বৎ কর, কিন্তু তোমার সে ফয়সলা বদলাতে হবে। আমার পায়ের উপর মাথা রাখতে তুমি বাধ্য হবে।'

সুফিয়া কাসিমের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ঃ 'মরে যাওয়াই আমি ভাল মনে করব। তাকে আমি ভালবাসি, একথা বলতে আমি শরম অনুভব করব না। আমি যা কিছু চাচা, চাচী ও সকিনার কাছে বলেছি, তামাম দুনিয়ার সামনে তা আমি বলব। সব চাইতে বেশী তোমরা তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারবে, কিন্তু এ মহলের চাইতে আমার কাছে প্রিয়তর হবে তাঁর কবরের মাটি। তোমরা আমার কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে, তাঁর মুহাব্বৎ নিতে পারবে না।'

ঃ 'তোমার কাছে তার কবরের মাটি প্রিয় হবে, কিন্তু আমি তোমায় নিশ্চিত বলছি, কবরের মাটি তার নসীবে জুটবে না।'

ঃ 'তার জন্য আমার পরোয়া নেই। প্রত্যেক জায়গায় আমি তাকে দেখতে পাব। দরিয়ার তরঙ্গে, চাঁদের রোশনীতে, সিতারার ঝলকে তাকে আমি দেখব। তিনি হবেন আমার প্রতি মুহূর্তের সাথী। আমি তার হাসি দেখবো ফুলের মুখে, তাঁর গলার আওয়াজ শুনব হাওয়ার প্রবাহে। আমার কাছ থেকে তোমরা তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে, জুদা করতে পারবে না।'

ঃ তাহলে এর মতলব সে যিন্দাহ্ থাক অথবা মরে যাক তার জন্য তোমার মুহাব্বতের কোন পরোয়া নেই। তার জীবনের উচ্চাকাঙ্খার প্রতি তোমার কোন আকর্ষণ নেই?'

ঃ 'তুমি সেসব উচ্চাকাঙ্খার কি জানবে? এক পূতিগন্ধময় নর্দমায় পালিত কীট আসমানের উচ্চতায় বিচরণকারী ঈগলের ধারণা কি করে উপলব্ধি করবে?'

ঃ 'তাহলে তুমি চাও, তোমারই ঈগলের পাখা তোমারই জন্য কাটা যাক। যদি তুমি চাও যে, সে তার উচ্চকাঙ্খা হাসিল করবার জন্য জিন্দাহ্ থাক, তাহলে তুমি তাকে মওতের মুখ থেকে বাঁচাতে পার। কিন্তু-কিন্তু তোমায় তার জন্য দিতে হবে ছোট্ট একটি কোরবানী।'

ঃ 'তাঁর জন্য আমি সব চাইতে বড় কোরবানী দিতেও প্রস্তুত।'

ঃ কিন্তু ভাল করে চিন্তা করে নাও। তোমার মুহব্বৎ শুধু সেই ব্যক্তির জন্য। তার মকসাদের জন্য কোরবানী দেওয়া তোমার সহজ হবে না। তোমায় সেই মহব্বতের কোরবানী দিতে হবে। বল, তুমি তার জন্য তৈরী? বল, চুপ করে রইলে কেন?-আমি আজ তোমায় পরীক্ষা করবার জন্য এসেছি। কান খুলে রেখে শোন। তাকে কতল করবার ফয়সালা হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার একটি মাত্র ওয়াদা তার জান বাঁচাতে পারে। আমি তাকে কয়েদখানা থেকে ফেরার হবার মওকা দিতে পারি। সে তুর্কীস্তান অথবা আর কোন মুলুকে গিয়ে তার বুলন্দ মকসাদের জন্য জিন্দাহ্ থাকতে পারবে।'

সুফিয়া খানিকটা নরম হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তার বদলে আমার কাছে কি ওয়াদা চাও তুমি?'

ঃ 'আমি চাই, তুমি আমায় শাদী করতে রাজী হবে।'

উভয়ে কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলেন। সুফিয়ার কানে তখনও বাজছে তাহিরের শেষ কথা ক'টিঃ 'এক আলীশান মহলে থেকে আপনি মনে করছেন, আপনার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কিন্তু তুর্কীস্তানে আপনার এমন হাজার হাজার বোন রয়েছে, আসমানের নীচে যাদের মাথা গুজবার ঠাঁই মিলছে না। এখনও আমার মনোযোগের হকদার তারাই। ইসলামের সেই বদনসীব নারীরা আজ তাদের ইরাক, আরব ও মিসরের শান্তিপূর্ণ শহরগুলোর বাসিন্দা বোনদের কাছে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলছেঃ 'যদি তোমাদের ভাই, তোমাদের স্বামী, তোমাদের প্রিয়জন আমাদের সাহায্যের জন্য এখানে এসে পৌঁছতে পারে, তাহলে খোদার দিকে তাকিয়ে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ো না।'

দরিয়ার স্রোতে ভাসমান মানুষ যেমন কিনারের তৃণগুচ্ছের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, তেমনি সুফিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন ঃ 'আমি-আমি ওয়াদা করছি, কিন্তু তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তাকে কয়েদখানা থেকে ছাড়িয়ে আনা তোমার আয়ত্তের ভিতরে নেই।'

কাসিম আশান্বিত হয়ে বললেন ঃ 'তুমি নিশ্চিন্ত থেক। সে খুব শীগগিরই আজাদ হয়ে যাবে।'

দ্বিধাশংকিত সুফিয়া বললেন ঃ 'কাসিম আমায় ধোকা দিও না। আলমে ইসলামের তাকে প্রয়োজন আছে। তুমি যদি আমায় মাফ করতে না পার, তাহলে নিজ হাতে আমার গলা টিপে মেরে ফেল। দুনিয়ায় আমার থাকা না থাকা একই, কিন্তু তাঁর একার মৃত্যু হবে লক্ষ মানুষের মৃত্যুর সমার্থক।'

কাসিম জবাব দিলেন ঃ 'তুমি শীগগিরই শুনবে যে, সে খারেযম চলে গেছে। চল, নীচে যাওয়া যাক।'

সুফিয়া তাঁর সাথে চললেন।

তিনি কামরায় গেলে সকিনা বললেন ঃ 'তুমি কোথায় গায়েব হয়েছিলে। খানা যে ঠান্ডা হয়ে গেল।'

কোন জবাব না দিয়ে সুফিয়া বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সকিনা তাকে তুলে নিজের দিকে ফিরাবার চেষ্টা করতে করতে বললেন ঃ 'সুফিয়া! সুফিয়া!! কি হল তোমার? বল, খোদার দিকে তাকিয়ে বল।'

কিন্তু সুফিয়া তাঁর হাতে ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন ঃ 'সকিনা, যাও। আমায় একা থাকতে দাও।'

●

সন্ধ্যা বেলায় কয়েদখানার চার দেয়ালের ভিতরে দারোগার গৃহের এক কামরায় মুহাল্লাব, নাযিমে শহর ও দারোগা বসে ছিলেন। নাযিমে শহর মুহাল্লাবের কাছে প্রশ্ন

করলেন ঃ 'ধরুন, আজ যদি তিনি খানা না খান, তাহলে?'
ঃ 'তাহলে কাল তো নিশ্চয়ই খাবেন।'
দারোগা বললেন ঃ 'আমার নযরে ওয়াহিদুদ্দীনও কম বিপজ্জনক নন। আমার ভয় হয়, কখনও হয়ত তিনি আমাদের গর্দানের উপর তলোয়ার হয়ে না বসেন। তাই তাকেও কয়েদখানার জিন্দেগী থেকে আজাদ করে দেওয়া ভাল।'
মুহাল্লাব জবাবে বললেন ঃ 'তার সম্পর্কে পরে দেখা যাবে।'
এক সিপাহী ভিতরে এসে খবর দিল ঃ 'কাসিম আপনার সাথে মোলাকাত করতে চান।'
মুহাল্লাব হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কাসিম? নিয়ে এস তাকে!'
কাসিম এসেই অভিযোগ করলেন যে, তিনি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বহুক্ষণ ধরে।
মুহাল্লাব প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনাকে আমার এখানে আসার খবর কে দিয়েছে?'
ঃ 'আপনার বাসভবন থেকে আমি আপনার খবর নিয়েছি। আপনি নাজিমের সাথে বেরিয়েছেন শুনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে এখানকার সন্ধান পেয়েছি। আমি আপনার সাথে গোপনে দুটো কথা বলতে চাই।'
মুহাল্লাব নাযিম ও দারোগাকে ইশারা করলেন। তাঁরা উঠে আর এক কামরায় চলে গেলে কাসিম এক কুরসীতে বসে পড়লেন।
মুহাল্লাব প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনাকে পেরেশান মনে হচ্ছে। বলুন, সব খবর ভাল তো?'
ঃ 'আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'
ঃ বলুন!
ঃ 'আব্বাজানের কাছ থেকে শুনেছি, আপনারা নাকি তাহিরকে ফেরার হবার মওকা দিতে চাচ্ছেন?'
ঃ 'খবর সত্যি, কিন্তু আপনি আর কাউকেও বলবেন না।'
ঃ 'আমি দোস্ত হিসাবে জিজ্ঞেস করছি, খবরটি সত্যি কিনা।'
ঃ 'এ খবর বিলকুল ঠিক। কিন্তু যদি ব্যাপারটা আপনার পছন্দ না হয়, তাহলে এ ফয়সলা এখনও বদল করা যেতে পারে।'
'না, না।' কাসিম জওয়াব দিলেন ঃ 'বরং আমি চাই, এ ফয়সলা যেন বদল করা না হয়।'
মুহাল্লাব হেসে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কেন? আপনি মনের উপর কোন বোঝা অনুভব করছেন না কি?'
কাসিম হাসতে হাসতে জবাব দিলেন ঃ 'বোঝা অনুভব করবার মত মন আমার নেই।'
ঃ 'আমি এ ধরণের মনের তারিফ না করে পারছি না। কিন্তু বলুন তো, এমনি বিপজ্জনক লোককে আজাদ করাবার জন্য আপনার এত মাথাব্যথা কেন? আজাদ হলেও তিনি আমার ও আপনার দুশমন থাকবেন।'
ঃ 'তাহলে এর মতলব, আপনি তাকে....?'
ঃ 'ঘাবড়াবেন না। তাকে আজাদ করাই যদি আপনার ইচ্ছা, তাহলে নিজের ইচ্ছার

বিরুদ্ধেও আমি তাকে পালাবার মওকা দেব।'

কাসিম কিছুটা চিন্তা করে বললেন ঃ 'আমি আপনাকে আর একটা তকলীফ দেব।'

ঃ আমার দোস্তের জন্য কিছু করতে পারলে আমি খুশীই হব।'

ঃ 'আমার কোন কিছু আপনার কাছে পুশিদা নেই। আপনি জানেন, সুফিয়ার সাথে আমার শাদী হবার কথা। আমরা তার সামনে তাহিরকে গ্রেফতার করেছি। তাহির ইসলামের এক বড় খাদেম বলেই তার প্রতি ওর আকর্ষণ। এখনও সে আমার উপর নাখোশ হয়ে গেছে। আপনি আমায় সাহায্য করলে আমি তার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারি যে, তাহিরকে আজাদ করার ভিতরে আমার চেষ্টাও কিছু কাজ করেছে এবং আমার খাতিরেই আপনি খলিফার কাছে এ প্রস্তাব পেশ করেছেন। তাহলে সে আমার কথা বিশ্বাস করবে।'

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'এতটুকু কথা? আমি মনে করেছিলাম, হয়ত আপনি আমায় একটা বড় কাজই করতে বলবেন। কাল ভোরে আমার প্রথম কাজ হবে এই, কিন্তু আমি তাঁর সাথে কথা না বলে আপনার সাথে এমন এক জায়গায় কথা বলব যেখান থেকে তিনি শুনতে পান। তাই ভাল হবে না কি?'

কাসিম জবাব দিলেন ঃ 'তার ইন্তেযাম হয়ে যাবে। সে শুধু জানলেই হল যে, আমি আপনার সাথে কথা বলছি। সে নিশ্চয়ই শুনতে আসবে।'

মুহাল্লাব হাসতে হাসতে বললেন ঃ 'আগামী রাজনৈতিক জিন্দেগীতে এমন হুঁশিয়ার বিবি আপনার জন্য খুব বড় পুঁজি হবেন। আপনার মাথায় আমি দেখতে পাচ্ছি সিপাহ-সালারের শিরস্ত্রাণ।'

ঃ 'শোকরিয়া। আর আপনাদের সম্পর্কে আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমার ওয়ালেদের পর বাগদাদের উজিরে আজমের কলমদান আপনারই হাতে যাবে।'

ঃ 'কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনি একই সঙ্গে দুটি পদই সামলাবার চেষ্টা করবেন।'

ঃ আর আপনার সম্পর্কে আমার আশঙ্কা, আপনি খলিফার তাজ ছিনিয়ে নিতেও দ্বিধা করবেন না।'

মুহাল্লাব হাসতে হাসতে গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ কিন্তু আপনি তো জানেন, আমি খলিফার বিশ্বস্ত।

কাসিম উঠে বললেন ঃ 'আমি ঠাট্টা করছিলাম। আচ্ছা, এখনও আসি তাহলে। ভোরে আসার ওয়াদা মনে থাকবে তো?'

ঃ 'আমি অবশ্যি আসব।'

## -সতেরো-

মাগরেবের নামাযের পর তাহির হাত তুলে দো'য়া করছেন, এমন সময়ে পাহারাদার তাঁর কুঠরীতে ঢুকে খানা রেখে চলে গেল। গত কয়েকদিন ধরে তাঁর তবিয়ত ভাল যাচ্ছে না। তাই দো'য়া শেষ করেও তিনি খানার দিকে মনোযোগ দিলেন না। কুঠরীর মধ্যে খানিকক্ষণ পায়চারী করে তিনি দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে গেলেন। আবার কিছুক্ষণ চিন্তা

করে উঠে গিয়ে কুঠরীর অপর দিকে দাঁড়িয়ে ওয়াহিদুদ্দীনকে আওয়াজ দিলেন ঃ 'আপনি আজ আসবে না?'

'আমি এখনি আসছি।' তিনি জবাব দিলেন।

তাহির কিছুক্ষণ তাঁর ইন্তেজার করে পায়চারী করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এশার নামায পড়তে। ওয়াহিদুদ্দীন তাঁর কামরায় ঢুকে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমার তবিয়ত এখনও কেমন?'

তাহিরের তরফ থেকে কোন জবাব না পেয়ে তিনি কাছে এসে বললেন ঃ 'ওহ্, তুমি নামায পড়ছো?'

খানিকক্ষণ তিনি তাঁর কাছে বসে থাকার পর আচানক বলে উঠলেন ঃ 'তোমার কামরা থেকে পনীরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে যে!'

তাহির সুন্নত নামায শেষ করে তাঁর দিকে তাকালেন। ওয়াহিদুদ্দীন জোরে জোরে শ্বাস টেনে ঘ্রান নেবার চেষ্টা করে বললেন ঃ 'পনীরের গন্ধ আজ আমায় হয়রান করছে।

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'আমার ঘ্রাণশক্তি আজ আর কাজ করছে না। দরজার সামনে আমার খানা পড়ে রয়েছে। ওর ভিতরে পনীর থাকলে আপনি খেতে পারেন।'

ওয়াহিদুদ্দীন আবার জোরে জোরে ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করে বললেন ঃ 'গোশতও রয়েছে। আমি এখানে আসার পর এ কমবখতরা মাত্র দুই ঈদের দিনে গোশত পাঠিয়েছে।

পনীরের কথা তো কল্পনাও করিনি এর মধ্যে। আমার কথা বিশ্বাস কর, পাহারাদারদের মধ্যে অবশ্যি তোমার কোন ভক্ত রয়েছে। আমার গোশত আর পনীরের লোভ নেই। তবু এ রকম অবস্থায় দোস্তদের অবশ্যি মনে রাখা উচিত। ওহ্, তুমি নামায পড়ছ বুঝি?'

তাহির ফরয নামায শেষ করে বললেন ঃ 'আপনি খানা তুলে নিচ্ছেন না কেন? ওতে পনীর থাকলে তার সবটাই আপনার। গোশত থাকলে আধা আমার আধা আপনার। কিন্তু কেবল শুকনো রুটি থাকলে সবটাই আপনাকে খেতে হবে।'

'খোদার কসম, আমার ঘ্রাণশক্তি কখনও আমায় ধোকা দেয় না।' এই কথা বলে তিনি উঠে খানার বরতন তুলে নিয়ে তাহিরের কাছে এসে বসলেন। তারপর বললেনঃ 'খোদা তোমার ভক্তের ভাল করুন। গোশত আর পনীর দুই-ই আছে, দেখছি। রওগনী রুটিও তো রয়েছে।'

তাহির বললেন 'আমার জন্য ইন্তেজার করে কাজ নেই। নামায খতম করে আমি আপনার শরীক হব।'

ঃ 'বেশ, নিশ্চিন্ত মনে নামায পড়। খানা আমাদের দু'জনের প্রয়োজনের চাইতে বেশী রয়েছে। পনীর থেকে আমি শুরু করেছি, কিন্তু তোমার হিস্সা থেকেই যাবে।' খানা চিবুতে চিবুতে তিনি আপন মনে বলছিলেন ঃ 'এ কোন মহৎ লোকেরই কাজ বটে। খোদার কসম, আমি যদি কোনদিন রেহাই পেয়ে উজিরে আজম হতে পারি, তাহলে বাগদাদের সব মহৎ লোককে কয়েদখানার সিপাহী ভর্তি করে হুকুম জারী করব যে, বেগুনাহ কয়েদীদের দু'বেলাই যেন গোশত পনীর খাওয়ানো হয়। আর যেন দেওয়া হয়

দুধ, মধু আর ফল। আমি সরকারী বাগিচার তামাম ফল কয়েদীদের জন্য ওয়াকফ করে দেব।'

তাহির নামায খতম করে দো'য়ার জন্য হাত উঠালেন। ওয়াহিদুদ্দীনের খানা চিবানোর আওয়াজটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আচানক তাঁর মুখের চপাচপ আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর তাহিরের সাথী প্রাণপণ চীৎকার করে বললেন ঃ 'তাহির! তাহির!! এতে হাত দিও না। বিষ! বিষ!!'

তাহির আতঙ্কিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। ওয়াহিদুদ্দীন জবেহ করা জানোয়ারের মত জমিনে লুটিয়ে পড়ে বললেন ঃ 'দোস্ত আমার!.... খোদা হাফিয!'

ওয়াহিদুদ্দীন তখনও অনুভব করছেন, যেন কেউ দুটি বলিষ্ঠ হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরেছে। কয়েকবার এপাশ ওপাশ তিনি হাতে ভর করে মাথাটা উপরে তুললেন, কিন্তু পরক্ষণেই তার মাথা জমিনে লুটিয়ে পড়ল। তাহির তার দেহটা বাহু দ্বারা বেষ্টন করে মাথাটা তুলে নিলেন কোলের উপর। আচানক তার গোটা দেহটা কেঁপে উঠল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন।

আচানক একটা মানুষের দেহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেলে তার যা অবস্থা হয়, তাহিরের অবস্থাও তাই। জিন্দেগীতে কোনদিন তিনি এতটা ভীতিগ্রস্ত হননি। কতক্ষণ তিনি ওয়াহিদুদ্দীনের মাথাটা কোলে নিয়ে অসহায়ভাবে নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছেন তা নিজেই জানেন না। ধীরে ধীরে তাঁর হৃদস্পন্দন ফিরে এল। ভয়ে পাথর হয়ে যাওয়া চোখ দুটো তুলে তিনি আশে পাশে তাকাতে লাগলেন। এবার তার হাত দুটো আবার সচল হয়ে উঠছে। তিনি ওয়াহিদুদ্দীনের দেহে হাত বুলালেন। তারপর তিনি বলে উঠলেনঃ 'মরে গেছে।' তার দীল যেন বলে উঠল ঃ 'না, তুই মরেছিস। এ খানা তোরই জন্য এসেছিল। তাহলে এখনও?'

বিজলী ঝলকের মত একটা ধারণা তার মাথায় এসে গেল। তাঁর শ্বাস প্রশ্বাস হতে লাগল দ্রুততর। তার দীল স্পন্দিত হতে লাগল। তার কানের ভিতর শাঁই শাঁই করতে লাগল। তার হাত পা যেন নিঃসাড় হয়ে গেছে। দরজার বাইরে কয়েকটি লোকের সিঁড়ি থেকে নামবার আওয়াজ পাওয়া গেল। মুহূর্ত মধ্যে যেন তার হারানো সম্বিত ফিরে এল।

তিনি ওয়াহিদুদ্দীনের লাশ তুলে নিয়ে কুঠরীর অপরদিকে গুহাপথে ঠেলে দিয়ে পাথরে সীল চাপা দিলেন। পায়ের আওয়াজ কাছেই শোনা যাচ্ছে। তিনি জলদী করে খানার বরতনের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। লোকগুলো দরজার উপর দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর কে যেন সবল হাতে দরজায় ধাক্কা দিল। একটুখানি বিরামের পর তালায় চাবি লাগানোর আওয়াজ এল। তারপর এল শিকল খুলে ফেলার আওয়াজ। দরজা খোলার চড়চড় শব্দে চোখ মুদে দম বন্ধ করলেন। মুহাল্লাব দারোগা, নাযিমে শহর ও পাঁচজন সিপাহী নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। এক সিপাহীর হাতে মশাল।

তাহিরের দেহে ঠোক্কর মেরে মুহাল্লাব বললেন ঃ 'দেখলে তো, তোমরা বলছিলে, আরও কিছুক্ষণ ইন্তেজার করা যাক। এ যহরের একটা ফোটা একটা হাতীকে মেরে

ফেলার জন্য যথেষ্ট। মশালটা একটু নীচু কর। কতটা খেয়েছে, দেখে নিচ্ছি।'

সিপাহী মশাল নীচু করলে মুহাল্লাব বললেন ঃ 'দেখলে তো, আমি বলেছিলাম না, এ বদ্দু পনীর থেকে খেতে শুরু করবে, কিন্তু তাও অর্ধেকের বেশী খেয়ে নিয়েছে। মনে হয় যেন না চিবিয়েই গিলছে সব। নইলে এর এক লোকমাই যথেষ্ট। বাকী পনীরটা তুলে রাখ।' কাল ওয়াহিদুদ্দীনকে দাওয়া দেওয়াত যাবে। এস, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখনও একে সামলানো সিপাহীর কাজ। দেখ লাশের সাথে অবশ্যি পাথর বাঁধবে, কিন্তু সেটা যেন ওখানেই ডুবে যাবার মত ভারী না হয়, যাতে কাল আবার ভেসে উঠে লোকের চোখে পড়ে। পাথরটা এতটা ভারী হবে, যেন লাশ পানির উপর না উঠে অথচ ভেসে যায়।'

দারোগা বললেন ঃ 'আপনি ব্যস্ত হবেন না। এরা ওরকম বিশটা লাশ এতদিনে সামলে রেখেছে। এরা আমার খাস লোক।'

মুহাল্লাব কয়েকটি সোনার মহর বের করে সিপাহীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে দিতে বললেন ঃ 'এই তোমাদের ইনাম।'

মুহাল্লাব, নাযিম ও দারোগা চলে গেলেন। সিপাহীরা তাহিরকে টেনে বাইরে বের করে কাঁধে নিয়ে চলল। দরিয়ার কিনারে তারা তাকে কিশতির উপর ছুঁড়ে ফেলল। তাহিরের কোমরে খুব চোট লাগল, কিন্তু মুখে আওয়াজ বেরুলো না। তিনজন সিপাহী ফিরে চলে গেল। বাকী দু'জন কিশতি পানির ভিতর ঠেলে দিয়ে তার উপর সওয়ার হল।

এক সিপাহী বলল ঃ 'তুমি এর কোমরে পাথর বাঁধো?'

'যত খারাপ কাজ আমায় করতে দেবে তুমি।'

ঃ 'এখনও আর এর সাথে কি খারাপটা করা যাবে? আজ তুমি কর, কাল আমি করব।'

ঃ 'কালও এমনি দুটো করে আশরাফী মিলবে তো? খোদা করুন, যেন উজিরে খারেজা আরও লোকের উপর এমনি করে জহরের পরীক্ষা চালান। কিন্তু দোস্ত, এ থেকে উজির, নাযিম আর দারোগা যা হাসিল করেছেন, তার হাজার ভাগের এক ভাগও আমাদের নসীবে জোটেনি।'

কিশতির উপর সব জরুরি জিনিস রাখা ছিল। সিপাহী তাহিরের কোমরে রসি বেঁধে তার সাথে একটা পাথর ঝুলিয়ে দিল। মাঝখানে পৌঁছে দু'জন তাহিরের হাত পা ধরে আস্তে আস্তে পানির মধ্যে ছেড়ে দিল।

তাহির কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে পানির সাথে ভেসে চললেন। তারপর তিনি উপরে উঠবার চেষ্টা করলেন। কোমরের পাথরটা আগেই বেশ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। ভিজে গিয়ে তা আরও বেশী করে এটে গেছে। তবু তাঁর মনে হচ্ছে, পাথরের বোঝা নিয়েও সাঁতরাতে পারবেন। কিশতি যতক্ষণ বেশ দূরে চলে না গেছে, ততক্ষণ তিনি শুধু শ্বাস নেবার জন্য মাথাটা উপরে তুলে সাঁতরাতে লাগলেন। কাপড়ে পানি ঢুকে তাঁর মনে হতে লাগল যেন এত বোঝা নিয়ে অপর কিনারে যাওয়া সহজ হবে না। তাঁর গতি অপর পারের দিকে, কিন্তু পানির দ্রুত গতিবেগ ও শীতলতা তাকে কিনারের দিকে এক গজ এগিয়ে যাবার মধ্যে স্রোতের সাথে কয়েক গজ নীচে নিয়ে যাচ্ছে।

তাঁর শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিঃসর হয়ে আসছে। কিন্তু কুদরতের সাহায্যের উপর অটল বিশ্বাস তাঁর উদ্যম অব্যাহত রাখল।

●

রাতের বেলা ঘুমোবার আগে সকিনা কিছুক্ষণ সুফিয়ার কাছে বসে নানা রকমের কথা বার্তা বলছেন। সুফিয়া মনোযোগ না দিয়ে দু'একটা কথার জবাব দিয়ে আবার চুপ করে যাচ্ছেন।

'যাও, সকিনা! শুয়ে পড়।' সুফিয়া এই কথা বলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সকিনা উঠে সামনের কামরার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন। দরজার পর্দা তুলে আবার যেন কি মনে করে তিনি সুফিয়ার দিকে তাকালেন।

তিনি তীক্ষস্বরে বললেন ঃ 'সুফিয়া! আমি তোমায় একটা জিনিষ দেখাব।'

ঃ 'কি জিনিষ?'

ঃ 'এই তো নিয়ে আসছি।'

সকিনা নিজের কামরা থেকে রূপার ছোট্ট একটা কৌটা নিয়ে এলেন। তারপর কুরসী টেনে নিয়ে সুফিয়ার বিছানার কাছে বসে গেলেন।

'বলি, এর ভিতরে কি?' সকিনা সরলভাবে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আমি কি জানি!

'দেখ তো ভাই!' সকিনা কৌটা খুলে সুফিয়ার চোখের সামনে ধরলেন। সুফিয়া গর্দান তুলে একটিবার মাত্র নযর দিয়ে মাথাটা বালিশের উপর ঢেলে দিলেন।

সুফিয়া কৌটা থেকে একটা উজ্জ্বল মোতির হার বের করে দেখিয়ে বললেন ঃ 'এই লও আজই এটা আমি আনিয়েছি। আমার ইরাদা ছিল, তোমার শাদীর দিনে এটা তোমায় দেব। কিন্তু অতো দিনের ইন্তেজার আমার সইছে না। এটা তুমি রেখে দাও। জওহরী বলছিল, এর চেয়ে বড় মোতি নাকি সারা বাগদাদে নেই। আমি তাকে একটা হীরের আংটিও আনতে বলেছি। সে বলছিল, অমন হীরা বাগদাদের কারুর কাছে নেই। লও সুফিয়া, হারটা পরে একবার দেখাও আমায়।'

সুফিয়া নিশ্চল নির্লিপ্ত হয়ে মোতির হারটির দিকে তাকিয়েছিলেন। সকিনা তাকে বাহুবন্ধনে টেনে এনে উপরে তুললেন এবং বাধা সত্ত্বেও তাঁর গলায় হার পরিয়ে দিলেন।

সুফিয়া হারটা খুলে ফেলার চেষ্টা করলেন আর সকিনা তাঁকে বাঁধা দিতে লাগলেন। হারটি নিয়ে দু'জনের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা চলল।

সকিনা বললেন ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে হারটা খুল না। ওটা একটা অশুভ লক্ষণ।'

ঃ না, আমি তোমাদের হীরা মোতিকে ঘৃণা করি। এ মহল্লকেই আমি ঘৃণা করি। আমার জিন্দেগীর উপরই আমার বিদ্বেষ। সকিনা!সকিনা!! আমায় বিরক্ত কর না।'

দু'জনের টানাটানিতে হার ছিঁড়ে গেল। কতক মোতি বিছানার উপর আর কতক মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ল, কান্নাজড়িত কণ্ঠে সকিনা বললেন ঃ 'তুমি বড় যালেম।'

সুফিয়া নরম হয়ে বললেন ঃ 'আমায় মাফ কর, সকিনা। ভোরবেলা আমি মোতিগুলো নিজে হাতে গেঁথে গলায় পরবো। কিন্তু তোমারই জন্য, আর কারুর জন্য নয়।'

ঃ 'কিন্তু তুমি না কাসিমের সাথে শাদীর ওয়াদা করেছ? খাবার সময়ে তুমি না আম্মাজানের কাছে সম্মতি জানিয়েছে? আমি জানি, তুমি শুধু আমায় কাঁদাতে চাও।'

ঃ 'সকিনা! আমার মতলব, যিন্দাহ্ থাকলে আমি কাসিমের সাথে শাদী করব।'

ঃ 'পাগলী, মানুষ যেন মরে গিয়ে শাদী করে থাকে।'

ঃ 'কিন্তু সকিনা, শাদীর আগেই যদি আমার মওত এসে যায়?'

ঃ 'বাজে বকো না। তুমি আশি বছর বেঁচে থাকবে।'

সকিনা মোতি তুলে কৌটায় রাখতে রাখতে বললেন ঃ 'ভোরবেলা আমি নিজে এগুলো গেঁথে তোমার গলায় পরিয়ে দেব-শুধু কাসিম, আম্মা ও আব্বার সামনেই নয়, বরং সখীদের ও সবার সামনে।'

সকিনা তাঁর কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সুফিয়া কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা কিতাব তুলে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কয়েক পাতা উল্টাবার পর সেটা এক পাশে রেখে দিয়ে বাতি নিবিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চোখে তাঁর ঘুম আসে না। কয়েকবার এপাশ ওপাশ করে তিনি কামরার মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন। তারপর গিয়ে এক কুরসীতে বসলেন। বেশীক্ষণ বসে থাকতে না পেরে উঠে দরজা খুলে সন্তর্পণে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দার পথ দিয়ে ধীর পদক্ষেপে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন মহলের অপর প্রান্তে। পথের মধ্যে খেয়াল হল, তাঁর পা খালি, তবু তিনি পরোয়া করলেন না।'

খানিকক্ষণ তিনি কোণার কামরার সামনে উঁচু চাতালের উপর দাঁড়িয়ে চাঁদের রোশনীতে দরিয়ার দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে পানি থেকে অর্ধহাত উপরে শেষ সিঁড়ির উপর বসে পড়লেন। কাসিম তাকে আগেই খোশখবর দিয়েছেন যে, তাহির আজ রাত্রে আজাদ হয়ে যাবেন। আর আজাদ হয়েই হয়ত চলে যাবেন বাগদাদ ছেড়ে। তাঁর আজাদীর জন্য যত আনন্দ তাঁর মনে, বাকী জিন্দেগীতে তিনি আর বাগদাদের সুদৃশ্য আড়ম্বরপূর্ণ শহরের মুখ দেখবেন না বলে তেমনি দুঃখও জাগছে তাঁর সারা অন্তরে। তাঁর জিন্দেগীর হাসি-আনন্দ তিনি ছিনিয়ে নিয়ে যাবেন চিরদিনের জন্য। হায়! আজাদ হয়েও তিনি যদি বাগদাদে থাকতে পারতেন। হায়! তিনি যদি যেতে পারতেন তাঁর সাথে। খানিকটা দূরে একটা মাছ লাফিয়ে উঠল, আবার পানির ভিতরে গায়েব হয়ে গেল। সুফিয়ার মন বলতে লাগল ঃ 'আমার আর এই মাছটার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। মাছটা আসমানকে মনে মনে করছে এক বিরাট সমুদ্র, আর সেখানে পৌঁছতে চাচ্ছে এক লাফে। নিজের ছোট ছোট পাখা দেখে সে মনে করছে, সে হয়ত উড়ে যেতে পারবে, কিন্তু পানির উপর দিকে এক নযরের বেশী দেখাবারও সাধ্য নেই তার। কি করে সে জানবে যে, তার পাখা শুধু সাঁতার কাটারই জন্য উড়বার জন্য নয়। পানির গভীরতায় ডুব দিয়ে সে নীচের স্তরে চলে যেতে পারে, নীল আসমানে উঠে বেড়াতে পারে না। সুফিয়া! এ মহল তোর জন্য এক ঝিল। তুই তার পচা দুর্গন্ধময় পানির উপর সাঁতার কেটে কেটে দেখেছিস আসমানের উচ্চতায়

তুই তার পচা দুর্গন্ধময় পানির উপর সাঁতার কেটে কেটে দেখেছিস আসমানের উচ্চতায় উড়ন্ত এক মুক্তপক্ষ পাখীকে। পানি থেকে লাফিয়ে উঠে তুই তার সাথী হতে চাস, কিন্তু তোর কাছে উড়বার পাখা তো নেই। তোর সাথী আকাশচারী ঈগল নয়, এই দুর্গন্ধময় নাপাক পানির ভিতরে বিচরণকারী কীট। কিন্তু না, তুই ঝিলের মধ্যে পয়দা হয়েও ঈগলের আকাশলোকে বিচরণের সাথী হতে পারিস, কিন্তু শিকারীরা যে তাকে ধরে বন্ধ করে দিয়েছে এক পিঞ্জরে। অবশেষে এক কেঁচো এসে তোকে বলছে, যদি তুই এই কাদার মধ্যে তার সাথে থাকতে পারিস, তাহলে ঈগলকে ছেড়ে দেওয়া হবে পিঞ্জর থেকে। সে ঈগলকে পিঞ্জরমুক্ত করবার ওয়াদা দিয়েছে। তুই খুব ভাল করেছিস, কিন্ত ওই ঘৃণ্য কেঁচোর সাথে কাদার মধ্যে তুই থাকতে পারবি? একমাত্র মওতই তোকে নাযাত দিতে পারে এ সংঘাত থেকে। আত্মহত্যা-না, না, আত্মহত্যা তো বুজদীলের কাজ-আল্লাহ্‌র রহমতকে অস্বীকার করা। সে যে মনুষ্যত্বের অবমাননা।'

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে সুফিয়া আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। দু'হাত প্রসারিত করে উঁচু গলায় বললেন ঃ 'আমার আল্লাহ্‌! আমায় হিম্মৎ দাও। আমায় সবর দাও। এক অসহায় নারী-দুনিয়ায় যার কেউ নেই-তোমারই রহমতের আশ্রয় ভিক্ষা করছে।'

•

সুফিয়া উঠে যাবার ইরাদা করেছেন, এমন সময় তাঁর কাছেই পানির ভিতর একটা হালকা আওয়াজ শোনা গেল। তিনি চমকে উঠে এদিক ওদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। সিঁড়ি থেকে খানিকটা দূরে কে যেন পানির মধ্যে আস্তে আস্তে হাত পা মারছে। ভয়ে তাঁর বুক কাঁপতে লাগল এবং সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপরে উঠে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। একটি লোক পানিতে ডুবে ডুবে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। সুফিয়া অনুভব করলেন, যেন তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কয়েকগজ নীচে তিনি সিঁড়ির কাছে চলে গেলেন। লোকটি দু'বাহু সিঁড়ির উপর প্রসারিত করে মাথাটা তার সাথে ঠেকিয়ে রেখেছে, কিন্তু তার কোমরের নীচের বাকী দেহটা পানির মধ্যে ডুবে রয়েছে। সুফিয়ার একবার পালিয়ে যাবার ইচ্ছা জাগলো, কিন্ত ভীতির উপর হামদর্দী হল জয়ী। তিনি ভয়ে নীচে নামলেন।

'তুমি কে? তিনি ভীতি জড়িত আওয়াজে বললেন।

লোকটির দেহ নড়লো না। লোকটি সাংঘাতিক রূপে হাঁপাচ্ছে। সুফিয়া আরও খানিকটা সাহস করে এগিয়ে গেলেন এবং তার কাছ থেকে দু'টি ধাপ উপরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আমি জানতে চাচ্ছি, তুমি কে, আর এ সময়ে কেনই বা এখানে এসেছ?'

লোকটি মাথা উপরে তুলে এক নজর সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে আবার মাথা নীচু করল। মুহূর্তের মধ্যে সুফিয়ার পায়ের তলা থেকে যেন জমিন সরে গেল। ধরা গলায় তিনি বললেনঃ 'তাহির!.......তাহির!! আপনি...এই অবস্থায়।

দ্বিতীয়বার তাঁর গর্দান জেগে উঠল ঃ 'কে? সুফিয়া?'

সুফিয়া এগিয়ে গিয়ে তাঁর বাযু ধরে উপরে টানলেন। তাহির সিঁড়ির উপর উঠে বসলেন। সুফিয়া তাঁর কোমরে বাঁধা পাথরের সীল দেখে বলে উঠলেন ঃ 'যালেম, দাগাবাজ, কমিনা!'

'কে?......আমি?' তাহির গর্দান খানিকটা তুলে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'না, না, আমি কাসিমের কথা বলছি। সে আপনাকে কয়েদ থেকে ছাড়িয়ে দেবার ওয়াদা করেছে।'

তাহির উঠে মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে সুধালেন ঃ 'এ আপনাদের মহল?'

ঃ 'জি, হ্যাঁ।

ঃ বহুদূর এসে গেছি আমি। এই পাথরটা আমায় কেবলই আর এক দুনিয়ার দিকে ঠেলে নিতে চেয়েছে। আমার ভুল হয়ে গেছে। সেই দুটো লোকের সাথে কিশতির উপরই আমার লড়াই করা উচিত ছিল।'

সুফিয়া বললেন ঃ 'এখানে বিপদ। উঠে আসুন আমার সাথে।'

তাহির কাঁপতে কাঁপতে সুফিয়ার সাথে চললেন। কিনার থেকে খানিকটা দূরে এক ছায়া ঢাকা গাছের নীচে গিয়ে দু'জন দাঁড়ালেন।

সুফিয়া প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনার জখমি তো নেই?'

ঃ 'না, কিন্তু ক্লান্তিতে আমি ভেঙে পড়েছি। কয়েদখানার কাছ থেকে এই পাথরের বোঝা নিয়ে আমি সাঁতরাতে শুরু করেছি। কিন্তু আপনি এখানে কি করছিলেন?'

ঃ 'কিছু না। আসুন, আমি এ পাথরটা খুলে ফেলছি। জিন্দাহ্ মানুষকে পাথরে বেঁধে দরিয়ায় ছুঁড়ে ফেলবার লোক কাসিম ছাড়া আর কে হতে পারে?'

ঃ 'কাসিমকে আমি দেখিনি। আর যারা আমায় দরিয়ায় ছুঁড়ে ফেলেছে, তাদের বিশ্বাস ছিল আমি মরে গেছি।'

ঃ তা কি করে?'

ঃ 'সে কথা আমি আপনাকে বলছিঃ কিন্তু আগে বলুন এ নয়া কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা কোথায়?

ঃ 'ওদিকে তাকান। ওই কিশতি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কিশতি চালাতে জানেন না? না জানলে মহল থেকে এক নওকরকে আমি আপনার সাথে দিতে পারবো।'

ঃ 'না, কিশতি আমি চালাতে জানি। সেদিন আমার মত আপনার নওকর তো গ্রেফতার হয়নি?'

ঃ 'না, আমি ওকে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম। আপনার কোন দোস্তও গ্রেফতার হয়নি। আমার ভয় ছিল, আপনি আমার উপর নাখোশ হয়েছেন। আপনার মনে কষ্ট দেবার জন্যই সেদিন কাসিম আমায় কিছু বলেছিল। কথা হচ্ছে, কাসিম আমার চিঠিটা বাদীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে ফেলেছিল।'

তাহির বললেন, আপনার সাফাই পেশ করবার প্রয়োজন নেই। কাসিমকে আমি ভাল করেই জানি, আর আপনার সান্ত্বনার জন্য একথাও আমি বলবো যে, আপনাকে আমি বাগদাদের যে কোন মহিলার চাইতে বেশী সম্মানের দাবীদার মনে করি। আমাদের এ মোলাকাতের কথা আপনি কাউকেও বলবেন না। আমার দুশমনরা আজ থেকে মনে

করবে, আমি মরে গেছি। হয়ত আমায় আবার বাগদাদে ফিরে আসতে হবে। ওরা আমায় কয়েদখানায় যহর দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আর একটি লোক আমার পরিবর্তে যহর-মাখা খানা খেয়ে নিয়েছেন। তিনি আমার পাশের কুঠরীতে আটক ছিলেন। সংকীর্ণ সুরংগ-পথ দিয়ে আমরা পরস্পরের কাছে যাওয়া-আসা করতাম। রাতের বেলা তিনি আমার কামরায় এলেন। আমার খানা পড়েছিল। তিনি যহর-মাখা পনীর খেয়ে নিলেন এবং তারপরই মারা গেলেন। আমি তাঁর লাশ সুরংগ পথে ঠেলে দিয়ে সীল চাপা দিয়ে রেখেছি। তারপরই আমি দম বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। তাঁরা আমায় মুর্দা মনে করে দরিয়ায় ফেলে দিলেন। আমায় জহর দেবার ষড়যন্ত্রে রয়েছেন শহরের নাযিম, কয়েদখানার দারোগা আর মুহাল্লাব বিন দাউদ। কাসিমের কথা আমি জানি না।'

ঃ 'কাসিমকে ছাড়া এমনি নাপাক ষড়যন্ত্র হতেই পারে না। সন্ধ্যার খানিকক্ষণ পর সে বাইরে যাবার সময়ে আমায় বলেছে যে, মুহাল্লাব ও নাযিমে শহর তাঁর সাথে আপনাকে আযাদ করে দেবার ওয়াদা করেছে। সে হয়ত এখনও ফিরে আসেনি।

তাহির বললেন ঃ 'এ ষড়যন্ত্রের সাথে কাসিমের যোগ থাকাটা আমি অসম্ভব মনে করি না। এখনও একটা কাজ আপনার যিম্মায় থাকল। কাজটা হচ্ছেঃ আপনি আপনার চাচাকে অবস্থাটা জানিয়ে দেবেন।'

ঃ 'আপনার মতলব, আমি তাঁকে আপনার কথাও বলে দেব?'

ঃ 'না, আমার কথা কিছু বলবেন না। তাকে শুধু বলবেন, মুহাল্লাবের দেওয়া যহর খেয়ে সাবেক উজিরে খারেজা ওয়াহিদউদ্দীন মারা গেছেন। তিনি পলাতক ছিলেন না। বরং মুহাল্লাব তাঁকে কয়েদ করে রেখেছিলেন। চেংগিস খানের পয়গাম পাঠানোর ষড়যন্ত্র মুহাল্লাব করেছিলেন এবং এখনও সেই ষড়যন্ত্রের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে দু'টি বেগুনাহ মানুষের জান নিয়েছেন। তার প্রমাণ, ওয়াহিদউদ্দীনের লাশ সেই সুরংগ-পথে পড়ে রয়েছে। ভোর হতেই আপনার চাচাকে কয়েদখানার সেই কুঠরীতে তদন্ত করতে বাধ্য করুন। নইলে কাল রাত্রে তাকেও আমার মত দরিয়ায় ফেলে দেওয়া হবে। আপনার চাচাকে এ সব কথা বিশ্বাস করবার আগে জানতে চাইবেন, কি করে আপনি এসব ঘটনা জানলেন। আপনি জবাবে বলতে পারেন, কয়েদখানার সিপাহী আপনার কোন দোস্তকে এ ঘটনা জানিয়েছে এবং আপনার নওকর সাঈদকে সে মধ্যরাত্রে আপনার কাছে পাঠিয়েছিল। আমার বিশ্বাস, তিনি এ ঘটনা কাউকেও না জানিয়ে কয়েদখানার দিকে নযর দিবেন।'

সুফিয়া বললেন ঃ 'আমি তার বন্দোবস্ত করে নেব। ভোর বেলা আমি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ময়দানে বেড়াতে যাব। ওখান থেকে শীগগিরই ফিরে এসে আমি চাচাকে সব জানাবো। জিজ্ঞেস করলে বলবো, ময়দানে এক আগন্তুক সব ঘটনা আমায় বলে গেছে এবং শীগগিরই তাঁকে জানাতে অনুরোধ করেছে।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, এরপর খলিফার সাহায্য সত্ত্বেও মুহাল্লাবের বাগদাদে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। আপনার চাচাকে আপনি বলবেন, তিনি দারোগা ও নাযিমকে ধমক

দিলেই আসল অপরাধীর খবর প্রকাশ করতে তারা বাধ্য হবে। কিন্তু তার আগে ওয়াহিদউদ্দীনের লাশ বের করে আনতে হবে। আমি এখনও যাচ্ছি, কাল রাত্রেই হয়ত আমি তুর্কীস্তানে রওয়ানা হয়ে যাব। আপনি ওখানকার কোন খবর পেয়েছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, খুবই খারাপ খবর। তাতারীরা বোখরা ও সমরকন্দ ছাড়া উত্তরের আরও কয়েকটি শহর জয় করেছে। এখনও তাদের সেনাবাহিনী পূর্বের শহরগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

ঃ 'বলখের কোন খবর শুনেছেন?'

ঃ 'বলখের উপর হামলার সম্ভাবনা রয়েছে।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। আমি চলে যাচ্ছি।'

সুফিয়া তাঁর পথ রোধ করে বললেন ঃ 'আমার উপেক্ষিত আবেদনের দ্বিতীয় বার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা, কিন্তু মানুষ জিন্দাহ্ থাকতে আশা ছাড়ে না। আমি এখানে থাকতে চাইনা। আমায় এখান থেকে নিয়ে চলুন। আপনার সাথে না হলে মদীনায় পাঠিয়ে দিন। ওখানে আমি আপনার ইনতেযার করতে থাকব।'

ঃ 'না, না, আবার ও কথা নয়।'

ঃ 'কিন্তু কেন? আপনি আমায় এতটা ঘৃণার পাত্র মনে করেন?'

ঃ 'আমি আপনাকে ঘৃণার পাত্র মনে করি না, কিন্তু আমার ভয়, আপনার নযরে আমি ঘৃণার পাত্র না বনে যাই।'

সুফিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দু'জন পাহারাদার কথা বলতে বলতে বারান্দা থেকে বেরিয়ে চাতালের উপর দাঁড়িয়ে গেল।

একজন বললঃ 'কাসিম রাত্র হতেই ওপারে চলে গেছে। এখনও ফিরেনি।'

অপর ব্যক্তি বলল ঃ ভাই, শাদীর আয়োজন চলছে। কোন জওহীর দোকানে লুটতে গেছে হয়ত।'

ঃ 'কার শাদী?'

ঃ 'আরে কাসিমের শাদী।'

ঃ 'কার সাথে?'

ঃ 'আমাদের আস্তাবলের সহীসও জানে সে খবর। সুফিয়ার সাথে।'

ঃ 'বিলকুল বাজে কথা। এ মহলের চামচিকাও জানে, পয়দায়েশের দিন থেকে কাসিমের প্রতি সুফিয়ার বিদ্বেষ।'

ঃ 'রাখ বাজি।'

ঃ 'তুমি আগে কয়েকবার আমার সাথে বাজি হেরেছ। আগের চার দিনার দিয়ে দাও। তারপর বাজি রাখব।'

ঃ 'তো' আমি ভোরবেলা তোমায় দিয়ে দেব। কিন্তু এ মজার ব্যাপারটায় বিশ দিনারের বাজি রাখতে হবে।'

ঃ 'বেশ রাজী।'

ঃ 'কিন্তু এতেই হল না। চল, সাদেকের সামনে দু'জনই কসম খাব।'

ঃ 'চল।'

সিপাহীরা চলে গেল। তাহির আস্তে প্রশ্ন করলেন; 'সত্যি?'

ঃ 'হ্যাঁ কাসিমের সাথে আমি শাদী করতে রাজী হব, এই শর্তেই সে আপনাকে কয়েদ থেকে আজাদ করে দেবার ভার নিয়েছিল। আপনার জন্য আমায় ওয়াদা করতে হয়েছিল। এখনও আসল ঘটনা জানবার পর আমি সে ওয়াদা থেকে মুক্ত হব। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও যদি আপনি মনে করেন যে, আমার কারণে আপনি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবেন, তা' হলে আমায় হুকুম করুন। এ দুনিয়ায় জিল্লতের এমন কোন গহ্বর নেই, আপনার হুকুম পেলে আমি যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারি। এ মহলে আমার সামনে দু'টি পথ-হয় কাসিমের সাথে শাদী করব, নইলে এই দরিয়ায় ডুবে মরব। যদি আমার এ কোরবানী আলমে ইসলামের অসহায় বোনদের কোন ফায়দায় লাগে, তা' হলে আমি তার জন্য তৈরী, কিন্তু খোদা আমার সাক্ষী, আমি একমাত্র আপনাকেই ভালবাসি এবং যতদিন জিন্দাহ থাকব, আপনাকেই ভালবাসব। এ ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তা হলে আমি অপরাধী। এ অপরাধের শাস্তি যদি মৃত্যু হয়, তা' হলে আপনার নিজ হাতে আমার গলা টিপে মেরে ফেলুন। ওই পাথর বেঁধে দিয়ে আমায় দরিয়ায় ঠেলে দিন। আপনাকেই বানাচ্ছি আমার কাযী। আপনার কাছেই আমি চাই বিচার। যদি আমি এই পচা নর্দমার কীটদের পরিবর্তে আমার মুহাব্বতের যোগ্য মানুষের সন্ধান করে অপরাধ করে থাকি, তা' হলে বলুন কি আমার শাস্তি? আপনি বলেছিলেন, তুর্কীস্তানের ময়দান বিপদসংকুল, কিন্তু হায়! আপনি যদি জানতেন যে, নারী যাকে ভালবাসে, তার সাথে সে তীরবৃষ্টিকেও পুষ্পবৃষ্টির মতই আনন্দদায়ক মনে করে, আর তাকে ছেড়ে সোনার মহলও তার কাছে হয় কয়েদখানা।'

সুফিয়া কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

তাহিরের মনে হল যেন দুনিয়ার সকল বিজয়-ক্ষমতা এসে স্থান নিয়েছে এই বিজয়িনী নারীর মধ্যে। তিনি প্রথমবার সেই সুন্দর মুখখানির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। হাজারো ব্যথা-বেদনার প্রতিমূর্তি সে মুখখানি। তাহির আত্মহারা হয়ে গেলেন।

'সুফিয়া! সুফিয়া!! হায়! আগে যদি জানতাম। অপরাধী তুমি নও, আমি। তুমি যে আমায় এতটা ভালবাস, কারাকোরাম যাবার আগে তো আমি তা' জানতে পারিনি। আর সেই সফরেই........' তাহির এ পর্যন্ত বলে নির্বাক হয়ে গেলেন।

সুফিয়া যেন গভীর পানিতে ডুব দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন। তাহিরের মুখ দিয়ে নিজের নাম শুনে তাঁর মনে জাগছে নতুন আশা। তিনি বলে উঠলেন; 'বলুন, সে সফরে কি হল, বলুন।'

ঃ 'আমি এক যুবতীকে শাদী করবার ওয়াদা করে এসেছি।'

তাহির ভেবেছিলেন, একথা শুনে সুফিয়া অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে চলে যাবেন, কিন্তু তাঁর কোন ভাবান্তর হ'ল না। ঘৃণা ও অবজ্ঞার বিনিময়ে তাঁর মুখের উপর ফুটে উঠল এক মুগ্ধকর মনভোলানো হাসির রেখা। তিক্ততার পরিবর্তে এক মধুর প্রাণ-ভোলানো আওয়াজে তিনি বললেন' 'তা হলে তুমি আমায় ঘৃণা কর না?'

ঃ 'তোমায় আমি কি করে ঘৃণা করতে পারি?'

ঃ 'তিনি খুবসুরত-না?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'না, তা' আমি বলতে পারব না।'

ঃ 'যদি আপনি তাঁকে শাদীর ওয়াদা না করতেন, তা' হলেও কি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করতেন, আমায় সাথে নিতে চাইতেন না?'

ঃ 'হ্যাঁ, বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তব্য আমায় তা' উপেক্ষা করতে বাধ্য করত। ময়দানে তোমার হেফাযতে ব্যস্ত থাকার চাইতে সেই শহরও মুলুকের চার-দেয়ালের উপর পাহারায় থাকা আমি অধিকতর সহজ মনে করতাম।'

ঃ 'তাঁর নাম কি?'

ঃ 'সুরাইয়া।'

ঃ 'তিনি কোথায়?'

ঃ 'বলখে।'

ঃ 'তিনি যদি জানতে পারেন যে, তাঁরই মত এক বোন আপনাকে ভালবাসে, তা' হলে তিনি কি সেটা তাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ মনে করবেন না?'

ঃ 'না তিনি ঈর্ষার বহু ঊর্ধ্বে।'

ঃ 'এক নারী অপর নারীর মনোভাব বুঝতে পারে। আপনি তাঁকে শাদী করুন। আমি একদিন তাঁর কাছে করুণা ভিক্ষা করে আপনার কাছে পৌঁছে যাব, এই আশা নিয়েই আমি জিন্দাহ থাকব। আপনার প্রীতির ছায়া আমাদের দু'জনেরই জন্য হবে প্রশস্ত। আমি তাঁর বাঁদী হয়ে সুখে কাটাবো। আমি জানতে চেয়েছিলাম, আপনার কোন ঘৃণা নেই আমার উপর। এই-ই আমার জন্য অতি বড় ইনাম, অতি বড় আশ্রয়। এ মজবুত পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সারা দুনিয়ার সাথে আমি লড়তে পারি। আমি এখনও চাচা, চাচী ও কাসিমকে জবাব দিতে পারবো। কারুর জন্য আমার ভয় নাই।

তাহির বললেন ঃ 'সুফিয়া, আমি ওয়াদা করছি, তুর্কীস্তানে আমার কর্তব্য শেষ করে আমি ফিরে আসব আবার। তখনও পর্যন্ত হয়ত তোমার চাচার মনোভাব বদলে যাবে। তখনও আমি এই অতি বড় ইনামের জন্য প্রার্থী হতে পারবো। আমি তোমায় আশ্বাস দিচ্ছি, আমার মুহাব্বতের আসমানে সব সময়ের জন্য দীপ্তিমান হয়ে থাকবে দু'টি সিতারা। আমার নযরে তোমার আর সুরাইয়ার মর্যাদা হবে সমান।'

ঃ 'আপনার পরিচ্ছেদের ধূলিকণা হয়েও আমি আপনার সাথে থাকব। বলখের বোনকে আমার সালাম দেবেন। তাঁর জন্য আমার একটি নিশানী নিয়ে যান।' সুফিয়া তাঁর হাতের আংটি খুলে তাহিরের হাতে দিতে গিয়ে বললেন ঃ 'আমি আপনাদের দু'জনেরই ইনতেযার করব। আপনার দেরী হলে হয়ত আল্লাহ্‌ আমায় আপনাদের কাছে নিয়ে যাবেন। দুনিয়ায় এমন কোন সাগরের ব্যবধান নেই, মুহাব্বতের কিশ্‌তি যা' অতিক্রম করতে না পারবে।'

পানির ভিতর বৈঠার আওয়ায পেয়ে দু'জনেই দরিয়ার দিকে নযর দিলেন। সুফিয়া বললেন ঃ 'কাসিম আসছে হয়ত।'

দু'জনেই সরে গিয়ে গাছের গুঁড়ির সাথে গা-ঢাকা দিলেন। কিশ্‌তি কিনারে এলে কাসিম আর তাঁর দু'জন সাথী উঠে মহলের দিকে চলে গেলেন।

সুফিয়া বললেনঃ 'হয়ত আমায় খবর দিতে যাচ্ছে যে, আপনি আজাদ হয়ে গেছেন। আপনি যান। যতক্ষণ পর্যন্ত কিশতি নযরে আসবে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবো। কিন্তু একটু দেরী করুন, পাহারাদার আসছে।'

পাহারাদার এসে খানিকক্ষণ চাতালের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলে চলে গেল। তখনও তারা সুফিয়া ও কাসিমের শাদী নিয়েই কথা বলছিল।'

ঃ 'কাসিমের এমন কি দোষ যে, সুফিয়া তাকে বিয়ে করবেন না? সে অন্ধ, খোড়া, কানা না তোমার মত বেওকুফ?'

ঃ 'যা'ই হোক, আমার বিশ্বাস সুফিয়া তার সাথে শাদী করতে পারেন না। তাঁর যোগ্য বর হবেন সালতানাতের ওলী আহাদ।'

সুফিয়া বললেন ঃ 'এবার আপনি চলুন।'

তাহির নেমে একখানি ছোট্ট কিশতি খুলে তার উপর বসে বৈঠা সামলাতে সামলাতে বললেন ঃ 'খোদা হাফিয, সুফিয়া।'

'খোদা হাফিয!' সুফিয়া কিশতি পানির মধ্যে ঠেলে দিলেন।

কিশতি দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি বারবার 'খোদা হাফিয বলতে থাকলেন।

●

ভোর বেলা উজিরে আজম সুফিয়ার সব কথাবর্তা শুনে বললেন ঃ 'এসব ঘটনা সত্য প্রমানিত হলে আমি তোমায় নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমার ভাতিজীর শাদী আমার নালায়েক বেটার সাথে কখনও হতে পারবে না। আমি জানতাম, তাহির বিশ্বস্ত নওজোয়ান। আমি তাঁর গ্রেফতারীর বিরোধী ছিলাম। তাই আমি তাঁকে আর তাঁর সাথীদেরকে পালাবার মওকা দিয়ে এসেছি। আমার এ পয়গাম পাঠিয়ে তার সাথীরা দ্বিতীয়বার তাঁদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন। নইলে হয়ত বেখবর থেকে ওয়াহিদউদ্দীনের পর আমার পালা আসতো। সে বদমাশ আমায় বলেছে যে, খলিফার হুকুমে তাহিরকে আজ কয়েদ থেকে ফেরার হবার মওকা দেওয়া হবে। আমি এখনওই যাচ্ছি।'

সুফিয়া তাঁর কামরায় ঢুকে দেখেন, কাসিম সেখানে বসে সকিনার সাথে কথা বলছেন। তিনি সুফিয়াকে দেখেই বললেন ঃ 'সুফিয়া! আমি একটি অতি বড় খবর নিয়ে এসেছি। মুহাল্লাব এখনওই আমায় খবর দিয়েছেন যে, তাহির কয়েদখানা থেকে পালিয়ে গেছে। আমি তাঁর কাছে থেকে অবশ্যি বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইনি। খবর শুনেই আমি তোমার কাছে এসেছি। এখনওই আমি আবার তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি নীচে দরিয়ার সামনের বারান্দায় বসে আছেন। ফিরে এসে আমি তোমায় সব ঘটনা জানাবো।'

সকিনা বললেন ঃ 'শাহী কয়েদখানা থেকে তাহিরের পালিয়ে যাবার বিবরণ নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক হবে। চল সুফিয়া কামরার পর্দার পিছনে বসে সব শুনব। কেমন, কাসিম তোমাদের কথাবার্তা শুনবার এজাযত আছে তো আমাদের?'

ঃ শর্ত থাকবে যে তোমরা যা কিছু শুনবে তা' আর কারুর কাছে বলবে না। কথা হচ্ছে তাকে পালিয়ে যাবার মওকা দেবার পেছনে আমার কয়েকজন দোস্তের চেষ্টা রয়েছে।'

ঃ 'ওয়াহ্' আমরা আহ্‌মক আর কি!'

কাসিম কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সকিনা সুফিয়াকে বললেন ঃ 'চল সুফিয়া, তাঁর পালানোর কাহিনীটি শুনতে আমার খুবই ভাল লাগবে।'

সুফিয়ার যা' কিছু জানবার ছিল, আগেই জেনেছেন। তবু কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি সকিনার সাথে গেলেন।

দরিয়ার কিনারের কামরায় পৌঁছে তাঁরা পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুহাল্লাব বললেন ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে, তাহির কারো কাছে সব বলে দিলে আমাদের দু'দিন আসবে।'

কাসিম বললেন ঃ 'না, আপনার মত উপকারীকে সে ধোকা দেবে না।'

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'তাঁর উপকারী তো আপনি। আপনার জন্যই তো আমি সব কিছু করেছি। তাঁকে আমি বলেও দিয়েছি যে, কেবল আপনার সুপারিশেই আমি তাঁকে পালাবার মওকা দিয়েছি।'

ঃ 'কিন্তু কি করে সে বেরিয়ে গেল?'

ঃ 'কেন? আপনি যে পাঁচশ দিনার দিয়েছিলেন, কয়েদ খানার পাঁচজন পাহারাদারকে খরিদ করবার জন্য তা' যথেষ্ট নয় কি?'

কাসিম প্রশ্ন করলেন ঃ 'কোথায় তাকে পৌঁছে দিলেন?'

মুহাল্লাব জবাব দিলেন ঃ 'কয়েদখানার বাইরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর দোস্তদের কাছে গেছেন। আশা করি খুব শীগগিরই তিনি বাগদাদ ছেড়ে চলে যাবেন। তিনি আমায় ওয়াদা দিয়েছেন যে, দু'একজন দোস্ত ছাড়া কারো সাথে দেখা করবেন না, আর রাতের বেলাই বাগদাদ ছেড়ে চলে যাবেন।'

ঃ 'তা'হলে এখনও আর তার কথা আমরা শুনবো না, এই তো?'

ঃ 'আমার আফসোস হুকুমাতের কতক কর্মচারী তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন, নইলে তিনি একজন কর্মঠ নওজোয়ান। অবশ্যি আপনার সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা নিয়ে তিনি যান নি।

সুফিয়ার ধৈর্য্য সীমা ছাড়িয়ে গেল। তিনি মুখের উপর নেকাব লাগিয়ে পর্দা সরিয়ে বারান্দায় নেবে বলে উঠলেন ঃ 'তোমরা দু'জন কাকে বেওকুফ বানাবার চেষ্টা করছো। এ খবর এর মধ্যে আধা শহরে মশহুর হয়ে গেছে যে জেলেরা দরিয়া থেকে এক লাশ তুলেছে মধ্য রাত্রে, আর সে লাশ তাহিরের।'

কাসিম আর মুহাল্লাবের চোখের সামনে তখনও হাওয়াই উড়ছে। বোকার মত তাঁরা ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে লাগলেন সুফিয়ার দিকে। সুফিয়া বললেন ঃ 'চাচাজান তৃতীয় প্রহরে খবর শুনেই নিজে চলে গেছেন কয়েদখানার সঠিক খবর জানবার জন্য। সেখানে আর একটি লাশ পাওয়া গেছে তার মুখে ছিল যহর-মিশান পনীর। সাবেক উজিরে

খারেজা ওয়াহিদউদ্দীনের লাশ। জান দারোগা চাচাকে কি বলেছেন? রাতের বেলায় বাগদাদে এক বড় গাদ্দারের হুকুমে দু'টি লোককে যহর দেওয়া হয়েছে। এই মাত্র তোমরা যাঁর কথা বলছিলে, বাগদাদের এক চারণভূমিতে তাঁর লাশ প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে। দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যাঁর কয়েদ হবার খবর তোমার দোস্ত আর তার কয়েকটি সাথী ছাড়া আর কেউ জানে না।'

মুহাল্লাব উঠে দাঁড়ালেন। সুফিয়া চীৎকার করে বললেন ঃ 'জমিনের উপর তোমার মত বদকারের জায়গা থাকবে না। শহরে তোমার তালাশ চলছে। এই মহলের প্রত্যেক দরজায় সিপাহী দাঁড়িয়ে আছে। বাগদাদের বাচ্চারা তোমার দেহের গোশত টুকরা টুকরা করে নেবার জন্য তৈরী।'

কাসিম সুফিয়ার বাযু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন ঃ 'কি বলছ, সুফিয়া? হুঁশ করে কথা বল।'

ঃ 'ছাড় আমায়। আমি তোমায় ঘৃণা করি। কমিনা, প্রতারক।'

কাসিম তাঁর মুখের উপর চাপড় মেরে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। তিনি চীৎকার করে বললেন ঃ 'বুজদীল মানুষ নারীর উপর বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কি করতে পারে?'

সকিনা এগিয়ে এসে বললেন ঃ 'কি হল তোমার, সুফিয়া? ওকে ছেড়ে দাও কাসিম। ওর মাথা ঠিক নেই।

সুফিয়া রাগে লাল হয়ে বললেন ঃ 'এবার বোন বেরিয়েছেন। তুমিও লাগাও এক চাপড় আমার মুখে।'

সকিনা বললেন ঃ 'খোদার কসম, জবান বন্ধ কর, একজন মানী লোক কি মনে করছেন?'

সুফিয়া বললেন ঃ 'চোর, ডাকাত খুনী। সকিনা, খোদার দিকে চেয়ে সিপাহী ডাকো। চাচাজান ওকে তালাশ করছেন। পালায় না যেন।'

কাসিম কামরা থেকে বের করে তাকে টেনে নিয়ে গেলেন মহলের অপর প্রান্তে। নওকর বাঁদীদের জমা হতে দেখে সুফিয়া চুপ করে গেলেন। তারপর নরম হয়ে বললেন ঃ 'আমায় ছেড়ে দাও। আমি আমার কামরায় চলে যাচ্ছি। আমি তোমায় মিথ্যার শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাচাজান আসা পর্যন্ত তোমার দোস্তকে থাকতে দাও।'

কাসিম পেরেশান হয়ে মুহাল্লাবের কাছে মাফ চাওয়ার উপযুক্ত শব্দ যোগাতে যোগাতে ফিরে গেলেন। কিন্তু মুহাল্লাব সেখানে নেই। একখানা কিশতি তখনও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দরিয়ার অপর কিনারে। মুহাল্লাব তাতে সওয়ার হয়ে চলে গেছেন।

দুপুর বেলা উজিরে আজমের হুকুমে ঘোষণা করা হল, মুহাল্লাবের সন্ধান দিতে পারলে তার ইনাম পাঁচ হাজার আশরাফী।

আসরের ওয়াক্তে কাসিম তাঁর বাপের সাথে দীর্ঘ মোলাকাতের পর বেরিয়ে এলে তাঁর মুখ ম্লান দেখা গেল। সকিনা সুফিয়াকে বলছিলেন ঃ 'শুনেছ? আব্বাজান কাসিমকে বলেছেন ঃ 'আমি বাগদাদের উজিরে আজম থাকা পর্যন্ত তোমার এখানে থাকা ঠিক হবে না। সে কাল মিসরে চলে যাবে। ফৌজে একটি মামুলী কাজের জন্য আব্বাজান মিসরের সুলতানকে লিখেছেন। কিন্তু রাগ নেমে গেল আবার ওকে ডেকে আনবেন।'

পরদিন শহরে খবর রটল, রাতের বেলা এক হাজার সওয়ার তাতারীদের বিরুদ্ধে খারেযম শাহের সাহায্যের জন্য বাগদাদ ছেড়ে চলে গেছে।

## আঠার

জালালউদ্দীন আফগানিস্তানের উত্তর-সীমান্ত থেকে মরভের হাকীমের কাছে খবর পাঠালেন যে, তিনি কম-সে-কম চার হপ্তা মরভের হেফাযতের ব্যবস্থা করুন, আর ইতোমধ্যেই তিনি বলখ, হিরাত ও অন্যান্য শহর থেকে সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে তাঁর সাহায্যের জন্য পৌঁছে যাবেন।

মরভের হেফাজতের জন্য নিয়মিত ফৌজের সংখ্যা কম হলেও মুহাজিরদের লাখ তলোয়ার তাঁর সাহায্য করবার জন্য মওজুদ ছিল। বোখারা, সমরকন্দ ও অন্যান্য শহরের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তার জন্য তিনি আগেই ফয়সলা করেছেন। মেয়েরা তখনও রীতিমত তীরন্দাযীর অভ্যাস করছে, বালকেরা বাড়ির ছাদের উপর পাথর জমাচ্ছে। সোজা কথায় মরভের প্রত্যেকটি বাড়ি হয়ে উঠেছে একটি কেল্লা। আওয়ামের মনে আশা তারা কেবল দীর্ঘকাল শহরটির হেফাজতই করবে না, বরং তাতারী ফৌজের উপর অতীত জুলুমের বদলাও নেবে।

মসজিদে মসজিদে প্রত্যেক নামাযের পর শোনা যায় খোতবায়ে জিহাদ, আর প্রতিটি বাসিন্দা তৈরী হয়ে যায় মরভের হেফাযতের জন্য শেষ রক্তবিন্দু দান করতে।

একদিন ভোরে যখন মরভের মসজিদে মুয়াযযিন শহরের বাসিন্দাদের নামাযের আহবান জানাচ্ছে, তখনও শহরের পাঁচিলের সামনে দেখা দিল পংগপালের মত অগুণতি তাতারী ফৌজ। দেখতে দেখতে শহরের পাঁচিলের উপর তীরন্দায দল দাঁড়িয়ে গেল। সেখানে আর তিল ধারণের ঠাঁই থাকল না। তাতারী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়েছিল চেংগিস খানের কনিষ্ঠ পুত্র তোলাইর উপর। তোলাই তার বাহাদুরীর এবং বাহাদুরীর চাইতেও বেশী করে তার প্রতারণা ও দাঙ্গাবাজির কৃতিত্বের বদৌলতে চেংগিস খানের দৃষ্টিতে যথেষ্ট ইজ্জত হাসিল করেছিল, কিন্তু মরভের পাঁচিলের উপর অগুণতি মানুষের ভিড় তাকে পেরেশান করবার জন্য ছিল যথেষ্ট।

তোলাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শহরের একদল গাদ্দার তাদের আগমনের খবর পেয়েই মিলিত হয়েছিল তাদের সাথে। তারা খবর দিল যে, পাঁচিলের উপর পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্যাই বেশী। খবর শুনেই তোলাই তার সেনাদলকে হুকুম দিল তুফানী হামলা চালাতে। কিন্তু পাঁচিলের উপর তীর ও পাথর বৃষ্টি তাতারীদের আশা ভংগ করে দিল। পাঁচিলের নীচে তাতারীদের লাশ স্তূপীকৃত হল। অবস্থা দেখে তোলাই সেনাদলকে পিছু হটবার হুকুম দিয়ে শহরের খানিকটা দূরে তাঁবু ফেলল। পাঁচদিনের মধ্যে তোলাই শহর দখল করবার কোন আশাই দেখতে পেল না। শক্তি প্রয়োগে হতাশ হয়ে সে অভ্যাস মত প্রতারণার পথ ধরল। শহরের এক গাদ্দারের মারফত সে শহরের হাকীমের কাছে তাঁর সাথে মোলাকাত করবার ইচ্ছা জানালো। সে আরও জানাল যে, হাকীমের সাথে কতকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করে খুশী হয়ে দেশে ফিরে যাবে।

কতক দূরদর্শী লোক হাকীমকে তোলাইর কাছে যেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু হাকীম তাঁদেরকে বুঝালেন যে, তিনি তার ধোকায় পড়বেন না। বেশী হলে তোলাই তাঁকে হত্যা করবে। কিন্তু তিনি ফিরে না এলে সেই সব লোকদের চেতনা জাগবে, যারা এখনও মোকাবিলা না করে তাতারীদের সাথে আপসের আশা করছে। যতক্ষণ জালালউদ্দীনের সেনাবাহিনী না এসে যায়, ততক্ষণ তিনি তার সাথে মীমাংসার আলোচনা জারী রাখবার চেষ্টা করবেন।

তোলাই হাকীমকে মহাআড়ম্বর অভর্থনা জানালো। তাঁকে কাছে বসিয়ে সে বলল ঃ 'আমার দীলের মধ্যে বাহাদুরীর ইজ্জত রয়েছে।'

শান্তি আলোচনা শুরু হলে তোলাই বলল ঃ 'আপনার সেনাবাহিনী আমাদের পিছু ধাওয়া করবে না, শুধু এই ওয়াদা নিয়ে আমরা ফিরে যেতে রাজী। তার সাথে আমরা এ ওয়াদা করতেও রাজী যে, জালালউদ্দীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক যা'-ই হোক না কেন মরভের উপর আমরা দ্বিতীয়বার হামলা করব না। তার বদলে আপনার আমাদেরকে দিতে হবে কিছু মামুলী অর্থ।

হাকীম যে কোন মূল্যের বিনিময়ে কিছুটা সময় নেবার চেষ্টা করছিলেন। কিছুটা চিন্তা করে তিনি বললেন, যদিও আমাদের ভান্ডার খালি, তথাপি শহরের বাসিন্দাদের কাছ থেকে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করে আমি আপনাকে দিতে পারব।'

ঃ 'কিন্তু আপনার ফয়সালা শহরের তামাম বাসিন্দা মেনে নেবে তো?'

ঃ 'আমি শহরের হাকীম।'

ঃ 'ঠিক কথা, কিন্তু অর্থ দেওয়ার ভার কেন আপনি একা নিজের মাথায় নিতে যাবেন? তার চাইতে এটা কি ভাল হয় না যে, আপনি শহরের বিশিষ্ট লোকদের এখানে ডেকে নিন। তাঁরা হাযির থাকতে যদি চুক্তিপত্র লেখা হয়, তা'হলে তাদের মধ্যে কারুর কোন আপত্তি থাকবে না। আপনি তাঁদের কাছে হুকুম পাঠিয়ে দিন। আমার বিশ্বাস আমরা শীগগিরই একটা ফয়সলায় পৌঁছব।' মরভের হাকীম দশজন বিশিষ্ট লোকের কাছে এক লিপি পাঠালেন। হাকীমের লিপি পেয়ে তাঁরা অনেকেরই বিরোধিতা সত্ত্বেও তোলাইর কাছে গেলেন। তোলাই তাঁদেরকেও সাদর অভ্যর্থনা জানালো। কিন্তু অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে তাঁরা সবাই বললেন যে, শহরবাসীদের সাথে পরামর্শ না করে কোন ফয়সলা করা যাবে না।

তোলাই বলল ঃ 'আমি আগেই জেনেছি যে, শহরের অর্থভান্ডার খালি। আপনাদের অসুবিধা আমি উপলব্ধি করছি। আপনার যান, কাল আমার মোলাকাত হবে। কাল শহরের প্রত্যেক দলের একজন করে প্রতিনিধি আপনাদের সাথে নিয়ে এলেই ভাল হবে।'

তাতারীর হাকীম ও তার সাথীদেরকে ইজ্জত ও সম্মান সহকারে শহরের পাঁচিল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। পরদিন শান্তিচুক্তি হয়ে যাবে বলে রাতের বেলা শহরে চলল আনন্দোৎসব। তাতারীরা শহর ছেড়ে চলে যাবে, তাই তাদের আনন্দ, কিন্তু তাতারীদের কৌশল সম্পর্কে ওয়াকেফহাল মুহাজিররা শহরবাসীকে হুঁশিয়ার থাকতে অনুরোধ করল। শহরের মানী লোকদের মনে তাতারীদের সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল না, কিন্তু শান্তি-আলোচনা জারী রেখে সময় নেবার ব্যাপারে হাকীমের মনোভাব টললো না। পরদিন

চল্লিশজন লোক হাকীমের সাথে চলে গেলেন তোলাইর তাঁবুতে।

দুপুর বেলা তাতারীরা প্রত্যেকটি লোককে কঠিন দৈহিক নির্যাতন ক'রে শহরের আর সব মানী লোকদের নামে চিঠি লিখিয়ে নিচ্ছিল। গাদ্দারদের মারফতে চিঠিগুলো পাঠানো হল তাঁদের কাছে। আসরের ওয়াক্তের কাছাকাছি আরও সত্তর জন লোক তোলাইর তাঁবুতে এসে হাজির হলেন।

সন্ধ্যাবেলায় তাতারীরা হাকীম, সিপাহসালার ও তাঁদের তিনজন সাথী ছাড়া সবাইকে কতল ক'রে ফেলল।

রাতের বেলা প্রায় একশ' দশজন তাতারী নিহত সাথীদের পোষাক প'রে নিল এবং হাকীম, সিপাহসালার ও তাঁদের তিন সাথীকে খনজর দেখিয়ে আগে আগে শহরের দরজা পর্যন্ত যেতে বাধ্য করল। আগে শহরের একজন গাদ্দারও ছিল। তারা হাকীমের পনেরো-বিশ কদম আগে উঁচু গলায় আরবী-ফারসীতে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। দরজার সামনে পৌঁছে তারা পাঁচিলের পাহারাদারকে শান্তি চুক্তির জন্য মোবারকবাদ দিয়ে দরজা খুলতে বলল।

দরজার পাহারাদারদের মধ্যে একজন জানালা দিয়ে মাথা বের ক'রে বাইরে তাকিয়ে দেখে দরজা খুঁলে দিল। ভিতরে তখনও বেশুমার লোক জমা হ'য়ে আছে। দরজা খোলা মাত্রই একজন লোক বাইরে বেরুতে বেরুতে প্রশ্ন করলেঃ 'বহুত দেরী করলেন আপনারা। কি খবর নিয়ে এলেন? হাকীমে শহর কোথায়?' তারপর অন্ধকারের ভিতরে ভাল করে তাকিয়ে দেখে বলল ঃ তোমরা কারা? শহরে হাকীম কোথায়?

'তিনি আসছেন।' এক গাদ্দার পিছনে ইশারা করে বলল। ইতিমধ্যে আরও পাঁচ ছ'জন লোক বাইরে বেরিয়ে এল।'

হাকীম শহর ছুটে এগিয়ে এসে চীৎকার করে বললেন ঃ 'দরজা বন্ধ কর। তাতারী এসে গেছে। জলদী-!' এক তাতারী তলোয়ারের এক আঘাতে তাকে জমিনে লুটিয়ে ফেলল। আরও তিন চারটি লোকের আওয়াজ শোনা গেলঃ 'দরজা বন্ধ কর। তাতারী হামলা করছে।' কিন্তু তাতারীদের তলোয়ার তাদেরকেও মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিল। মুহূর্তের জন্য পাহারাদাররা হতচকিত হয়ে রইল। তারা দরজার দিকে মনোযোগ দেবার মধ্যেই মুসলমানের বেশে তাতারীদের একটি দল দরজার কাছে এসে গেল। পাহারাদারা বুঝলো যে, তাতারী পিছন থেকে মুসলিম প্রতিনিধিদের উপর তীর বর্ষণ করছে। তাই তাদেরকে ভিতরে ঢুকবার মওকা দিল। মশালের আলোয় অচেনা মুখ দেখে তারা চিৎকার করে উঠল, কিন্তুই এরই মধ্যে তারা দেখতে দেখতে পঞ্চাশ ষাটটি লোককে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিল।

কতক তাতারী ভিতরে ঢুকতে না পেরে পাঁচিলের উপরকার পাথর ও তীরের শিকার হল, কিন্তু অবশিষ্ট তাতারীরা পাহারাদারদের বাড়তি সংখ্যার সাথে তলোয়ারের শক্তি পরীক্ষা করতে লাগল।

আচানক বাইরে অগুনতি ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। পাহারাদারা দরজার ভিতরকার যুদ্ধরত তাতারীদেরকে সাফ করে দিয়ে দরজা বন্ধ করবার চেষ্টা করল, কিন্তুই এরই মধ্যে তাতারী সওয়ারদের একটি দল হামলা করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করল।

খানিকক্ষণ পর শহরের বাসিন্দারা মরভের বাজারের উপর দিয়ে পাথর ও তীর বর্ষণ সত্ত্বেও দুশমনের অগুনতি সওয়ারকে দেখলো ঘুরে বেড়াতে।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শহরে রোজ কিয়ামতের দৃশ্য অভিনীত হল। তৃতীয় প্রহরে তাতারীরা শহরের আরও কয়েকটি দরজা দখল করে নিল। মহলে মহলে আগুন জ্বলে উঠল। ভোর পর্যন্ত আগুনের শিখা এক প্রশস্ত এলাকা গ্রাস করল। আগুনের কবল থেকে বাঁচবার জন্য যারা এল ঘরের বাইরে, তারা হল তাতারী ফৌজের তলোয়ারের শিকার। পাঁচদিন ধরে শহরের বুকের উপর চলল রোজ কিয়ামতের অভিনয়।

ষষ্ঠদিন তাতারী ফৌজ মরভের দরজায় বানাতে লাগল বিজয়ের স্মরণচিহ্ন মানবকুন্ডের মিনার। অতীতের সকল মিনার থেকে উঁচু এ মিনার। কিন্তু তাতারী সেনাদের লাশ গণনা করার পর তোলাই বলল : 'আমরা কোন বড় যুদ্ধেও এত বড় ক্ষতির মোকাবিলা করিনি।' ক্ষতির প্রতিশোধ নেবার জন্য মরভের বুকের উপর জ্বাললো এক বিরাট চিতা। দু'জন করে কয়েদীকে দড়ি দিয়ে এক সঙ্গে বাঁধা হল, তারপর একে একে তাদের হাত পা কেটে নৃশংস নৃত্য ও অট্টহাস্য সহকারে তাদেরকে আগুনের মধ্যে ঠেলে ফেলতে লাগল। মানব মুন্ডের সংখ্যা বাড়াবার জন্য গর্ভবতী নারীদের পেট কেটে ফেলা হল। এক নারী সেই চিতার সামনে পড়ে বাচ্চা প্রসব করল। তোলাই অট্টহাস্য সহকারে বলল : 'ওই দেখ, দুশমন নারী আমাদের মোকাবিলার জন্য এক নতুন ফৌজ তৈরী করছে।'

এক তাতারী এগিয়ে এসে বাচ্চার মাথায় পা দিয়ে পিষে ফেলতে চেষ্টা করল, কিন্তু মওতের মুখে পৌঁছেও মাতৃস্নেহ খামোশ হয়ে থাকতে পারল না। শিশুকে মা কলিজার সাথে লাগিয়ে নিল। বাচ্চা সমেত তাকে ঠেলে ফেলা হল জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সে তার জিগরের টুকরাকে বাহু বন্ধনে লুকিয়ে রেখে অগ্নিশিখার কবল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল।

একটি বার তের বছরের বালক চোখের সামনে বোনের বেহুরমতি বরদাশত করতে না পেরে দুটি তাতারী অফিসারের উপর হামলা করে একজনকে কতল করল। নিহত অফিসার তোলাইর নিজ গোষ্ঠীর লোক। বালককে তোলাইর সামনে হাজির করা হল। চেংগিস খানের মত তোলইও ছিল দুশমনের কমজোরী ও শক্তি যাচাই করতে। বালককে কাছে ডেকে সে বলল : 'এক তাতারী অফিসারের কতলের শাস্তি কি, জানো?'

বালক জবাব দিল : 'আমি জানি, তোমার আদালতে অপরাধী আর বেগুনাহ্ মানুষকে একই চাকায় পিষে মারা হয়।'

: 'তোমায় যদি আমি সাথে নিয়ে যাই, তাহলে বড় হয়ে তুমি সিপাহী হতে রাজী আছ?'

: 'নীচ তোমরা। এখানেই আমি মওত কবুল করব।'

: 'মওত এক পীড়াদায়ক জিনিষ।'

: 'কিন্তু মজলুমের জন্য নয়, যালেমের জন্য।'

তোলাই খান বলল : 'ওকে আমার সামনে ফাঁসিতে লটকে দাও। জানো, ফাঁসি কতটা কষ্টদায়ক?'

বীর বালক জবাব দিলঃ ‘ তুমি আমায় ফাঁসি দিতে পার। আমার কওমকে ফাঁসি দিতে পার না। তোমার নেযাহ্ টুটে যাবে, তোমার তলোয়ার ভোঁতা হয়ে যাবে, তোমার বাযু নিঃসাড় হয়ে যাবে। কিন্তু আমার কওমের শিরায় শিরায় বয়ে চলবে খুনে শাহাদাহ।’

তোলাইর ইশরায় বালককে কঠিনতম দৈহিক যন্ত্রণা দিয়ে জবেহ্ করা হল। সেদিন সন্ধ্যায় তোলা খান কয়েকজন মন্ত্রণাদাতার কাছে বলছিল ঃ ‘আমাদেরকে এক বিপজ্জনক দুশমনের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যে কওমের মায়েরা এই ধরণের বাচ্চা পয়দা করতে পারে, তারা বেশীদিন কারুর গোলাম হয়ে থাকতে পারে না। এই ধরণের বাচ্চাদের আমি জালালউদ্দীনের চাইতে কম বিপজ্জনক মনে করি না।’

মরভের ঘরে ঘরে তালাশী চলল। মাটির নীচের কামরায় লুকানো লোকদের বের করে কতল করা হল। শহরের গাদ্দাররা তোলাইকে দৌলতমন্দ লোকদের তালিকা তৈরি করে দিয়েছিল। তাঁরা জিন্দেগীর আশা হারিয়ে তামাম গোপন ধন-দৌলত তাতারীদের হাতে সোপর্দ করে দিল। আরও বেশী মাল বের করবার চেষ্টা করতে গিয়ে তাতারীরা তাঁদের উপর নানা রকম দৈহিক নির্যাতন চালিয়ে অবশেষে তাঁদেরকে হত্যা করল। তারপর তাঁদের বাড়ি-ঘরের পাঁচিল খুঁড়ে দেখা হল।

মসজিদ, মাদ্রাসা আর কুতুবখানাগুলোতে লাগানো হল আগুন। বাড়িঘর তৈরীর ও অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের চারশ' নিপুন কারিগরকে তাতারীরা জিন্দাহ্ ধরে নিয়ে গেল তাদের সাথে।

চলে যাবার আগে কোন লোক তোলাইকে বলল যে, তখনও কোথাও কোথাও যমিনের নীচের গোপন কক্ষে লুকিয়ে রয়েছে বহু নর-নারী। তোলাই দু' হাজার সিপাহীকে ভাল করে দেখাশুনা করার জন্য মরভে রেখে তাদের অফিসারদের বলল ঃ ‘আমি খানে আজমের কাছে পয়গাম পাঠিয়েছি যে, মরভের কয়জন লোককে আমরা কাজের লোক মনে করে সাথে নিচ্ছি, তারা ছাড়া দুশমনের একজন লোকও জান বাঁচিয়ে পালাতে পারেনি। আমার কথা মিথ্যা, প্রমাণিত হয়, এ আমি চাইনা। তাই যতক্ষণ তোমরা নিশ্চিত না হও, ততক্ষণ তালাশী চালাতে থাক।’

সিপাহীরা এক মসজিদের মুয়াজ্জিনকে যমিনের নীচের এক হুজরা থেকে গ্রেফতার করে আনলো। তারপর তার উপর নির্যাতন চালিয়ে মসজিদে আযান দিতে বাধ্য করল। আযান শুনে মসজিদের নিকটবর্তী গোপন কক্ষগুলো থেকে আত্মগোপনকারীরা বেরিয়ে এল। তারা মনে করল, তাতারী ফৌজ চলে গেছে। তারা বেরিয়ে এলে তাতারীরা তাদেরকে হত্যা করল।

এমনি করে মসজিদে মসজিদে আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করে তারা প্রতারণা করে বাকী লোককে হত্যা করল। পচাগলা লাশের বুদবুদে শহরের হাওয়া এমন বিষাক্ত হল যে, সেখানে কোন মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, মনে করে তাতারীরা চলে গেল।

বাগদাদ থেকে পলায়ন করে তাহির ও তাঁর সাথীরা মরভের দিকে রওয়ানা হলেন। ইরানের শহরগুলোর বাসিন্দারা দীর্ঘকাল পরাজয় স্বীকার করে নির্লিপ্ত জীবন যাপন করছিল। মরভের পথে তাহিরদের দল যখন ইরানে পৌঁছল, তখনও তাদের বক্তৃতার সঞ্জীবনী প্রভাবে তারা উদ্বুদ্ধ না হয়ে থাকতে পারল না। প্রত্যেক নতুন মঞ্জিলে রেযাকার দল তাঁদের সাথে শামিল হতে লাগল। দেখতে দেখতে তাঁদের সংখ্যা তিন হাজারে দাঁড়ালো। মরভ থেকে একশ ক্রোশ দূর থেকে তাহির মরভের ধ্বংসের খবর শুনতে পেলেন। সেখান থেকে জালালউদ্দীনের খবর নিয়ে তাঁরা এগিয়ে চললেন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

একদিন দুপুর বেলা রেজাকারদের ফৌজ পূর্বের দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে চলেছে। অগ্রগামী দলের নেতৃত্বে আবদুল আযীযের উপর। তাকে পথ দেখিয়ে চলবার জন্য এক ইরানী নওজোয়ান তাঁর পাশে পাশে ঘোড়া সওয়ার হয়ে যাচ্ছে।

এক জায়গায় সংকীর্ণ পথের মোড় ঘুরতে ঘুরতে ইরানী নওজোয়ান একহাত দিয়ে থামতে ইশারা করে অপর হাত দিয়ে নীচের উপত্যকার দিকে দেখালো।

আবদুল আযীয নীচের দিকে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলেন; হুসিয়ার।'

সালাররা দেখতে দেখতে এক পয়গাম ফৌজের শেষ সিপাহী পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। তাহির ও আবদুল মালিক ফৌজের কেন্দ্রস্থল থেকে পথের মোড়ে এসে দেখলেন একক্রোশ চওড়া ও তিনক্রোশ দীর্ঘ উপত্যকার মাঝখানে দুই সেনাদলের মধ্যে চলছে তুমুল লড়াই।

এক সিপাহী ভাল করে দেখে বলল ঃ 'তাতারীরা মুসলমানদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ওই যে দেখুন, পিছনের পাহাড় থেকে তাতারীদের প্রচুর ফৌজ নীচে নেমে আসছে। মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচ ছ' হাজারের বেশী হবে না, কিন্তু তাতারী ফৌজ তাদের চাইতে তিন চার গুণ বেশী। পিছনের পাহাড় থেকে প্রচুর সৈন্য নামিয়ে আনা হচ্ছে ময়দানে। আমার মনে হয়, এ হচ্ছে তাতারীদের বিরাট ফৌজের অগ্রগামী দল। এই ছোট্ট সেনাদল নিয়ে যিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি সুলতান জালালউদ্দীন ছাড়া আর কেউ নন।'

তাহির বললেন ঃ 'তাতারীদের উপর তাঁদের পাশে জমাট হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও ফৌজ পৌঁছে গেলে তাঁদের জান নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে' সিপাহী বলল ঃ জালালউদ্দীনের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নই, কিন্তু এবারে তিনি কঠিন হামলার মধ্যে পড়ে গেছেন।'

তাহিরের সাথীরা তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে নীচে নেমে এক ছোট টিলার উপর জমা হল। ময়দানের ভিতর থেকে কোন কোন তাতারী তাদেরকে দেখেতে পেল কিন্তু তারা ভাবল, তাদেরই সাহায্যের জন্য ঝটিকা বাহিনী এগিয়ে আসছে।

ঠিক যে মুহূর্তে তাতারীরা কঠিনতম হামলা করেছে তখনও তাদের এক সালার নতুন দলগুলোকে নির্দেশ দেবার জন্য ময়দান থেকে বেরিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে সেই টিলার দিকে এগিয়ে এল, কিন্তু কাছে এসে তার আওয়াজের জবাবে শুনতে পেল 'আল্লাহু আকবার' তক্‌বীর ধ্বনি। তার সাথে সাথেই একটা তীর এসে লাগল তার সিনায়। লুকিয়ে থাকা ফৌজ দু'ভাগ হয়ে টিলার পাশ ঘুরে ময়দানে হাজির হল। তাতারীরা হুশিয়ার হবার আগেই তিন হাজার সওয়ারের বর্শা তাদের সিনা বিদ্ধ করল।

তাতারী একবার বিচ্ছিন্ন হয়ে আবার সামলে নিতে পারল না।

তার আগেই জালালউদ্দীন চল্লিশ জনকে মওতের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর হাত পা নিঃসাড় হয়ে আসছে। বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তিনি একদিকে সরে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামলেন এবং একটি ছোট পাহাড়ের উপর উঠে এক পাথরের আড়ালে বসে পড়লেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বর্ম খুলে এক পাশে রাখলেন। রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ফেলে ধনুক নিয়ে ছুটে গিয়ে তাতারীদের উপর তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। তখনও তিনি হয়রান হয়ে ভাবছেন, তাঁর এ নতুন সাহায্যকারী কারা!

তাতারী ময়দানে দশ হাজার লাশ ফেলে পালাল। সিপাহীরা তখনও শহীদদের দাফন ও জখমীদের আঘাতের উপর পট্টি বাঁধতে ব্যস্ত।

তাহির ঘোড়া থেকে নেমে বর্ম খুলে ফেললেন। তারপর তিনি এক তুর্কের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সুলতান কোথায়?'

তাঁর প্রশ্নের জবাবে ফৌজের এক অফিসার ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর সাথে আলিঙ্গন বদ্ধ হলেন। 'তাহির! তাহির!! অবশেষে তুমি এসেছ? আমি হয়রান হয়েছিলাম, খোদা আজ আমাদের জন্য কোত্থেকে সাহায্যকারী পাঠালেন! তোমার কাছে থেকে এই প্রত্যাশাই আমি করেছিলাম।'

'তৈমুর মালিক।'ঃ 'তাহির বর্মের ভিতর দিয়ে তাঁর সন্ধানী চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

ঃ 'হ্যাঁ, আমি'। তিনি বর্ম খুলে এক সিপাহীর হাতে দিলেন।

তৈমুর মালিকের নাম শুনে তাহিরের সাথীরা এসে তাঁর চারপাশে জমা হল। তাহির আবদুল আজিজ, আবদুল মালিক, মোবারক ও আর সব ফৌজী অফিসারের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তৈমুর মালিক পরম উৎসাহে তাঁদের সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ 'আমি তোমার সাথীদেরকে খোশ্ আমদেদ জানাচ্ছি।'

আবদুল আজীজ প্রশ্ন করলেন ঃ 'সুলতান কোথায়?'

'সুলতান কোথায়? ঃ তৈমুর মালিক কতিপয় অফিসারকে প্রশ্ন করলেন।

'সুলতান কোথায়? ঃ তাঁরা হয়রান হয়ে একে একে অন্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

এক অফিসার পাহাড়ের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ 'তিনি উপরে এক পাথরের আড়ালে বসে আছেন।'

ঃ 'আসুন, আমি আপনাদের সাথে তাঁর মোলাকাত করিয়ে দিচ্ছি।'

তাহিরের কয়েকজন দোস্ত ও সুলতানের ফৌজের কয়েকজন অফিসার পাহাড়ের উপর চড়লেন। সুলতান এক পাথরের উপর মাথা রেখে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছেন।

তৈমুর মালিক তাঁর বাযু ধরে তাকে জাগাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাহির জলদী করে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন ঃ 'এমনি এক সিপাহীর ঘুম বহুত দামী। খোদা জানেন, কতদিন পর তিনি এতটুকু ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছেন।'

তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'তোলাই খানের ফৌজ এখান থেকে মাত্র চার মঞ্জিল দূরে। আমাদেরকে জলদী এগিয়ে যেতে হবে।'

'আলীজাহ্! -উঠুন-! ঃ তৈমুর মালিক তাঁর বাযু ধরে আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে বললেন।

জালালউদ্দীন চোখ খুললেন এবং উঠে বসতে বসতে বললেন ঃ 'তৈমুর! মাঝে মাঝে আমায় একটুখানি আরাম করতে দিও।

ঃ 'আলীজাহ্! তোলাই খানের লশ্‌কর আমাদের এখান থেকে খুব দূরে নয়।' ঃ 'তাহলে তোমার ধারণা, একথা আমার খেয়াল নেই। কয়েকদিন পর আমার একটুখানি ঘুমের সময় মিলেছে, তাও তুমি নষ্ট করে দিলে। আমায় একটু পানি দাও।'

এক অফিসার তাঁর পানির পাত্র এগিয়ে দিলেন। জালালউদ্দীন খানিকটা পানি ঢক্ ঢক্ করে গিলে উঠে দাঁড়ালেন। তাহির আর তাঁর সাথীরা এমন মহিমাময় দীপ্তিমান ব্যক্তিত্ব, আর কখনও দেখেন নি। এ যেন সত্যি সত্যি এক পাহাড়।

সুলতান প্রশ্ন করলেন ঃ 'এ ফৌজ কোত্থেকে এল।'

তৈমুর মালিক জবাব দিলেন ঃ 'বাগদাদ থেকে।'

ঃ 'বাগদাদ থেকে? তাহলে খোদা আমার দো'য়া কবুল করেছেন। তাহলে আমি এখনও দুনিয়ার যে কোন শক্তির মোকাবিলা করতে পারি। বাগদাদের লোক যদি সচেতন হয়ে থাকে, তাহলে আমার বিশ্বাস, তামাম আলমে ইসলাম জেগে উঠবে এবং দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমি এ বর্বর কওমের পিছু ধাওয়া করতে পারবো। 'সুলতান আসমানের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে উছলে উঠল কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

ঃ 'এ ফৌজের সালার কে?'

তৈমুর মালিক তাহিরের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ 'ইনি। এর নাম তাহির বিন্ ইউসুফ। ইনিই সেই ব্যক্তি, যিনি কোকন্দ থেকে ফেরার হবার সময়ে আমার জান বাঁচিয়ে ছিলেন। আমি আপনাকে বলেছি যে, বাগদাদে এক নওজোয়ান আমাদের জন্য বহুত কিছু করছেন। ইনিই সেই নওজোয়ান।'

জালালউদ্দীন তাহিরের সাথে পরম উৎসাহে মোসাফেহা করতে করতে বললেন ঃ 'লড়াইয়ের দুনিয়ায় আরাম করবার অবকাশ নেই। আমার সাথে থেকে আপনাদেরকে এমনি পাথরের উপর মাথা রেখে ঘুমোবার অভ্যাস করতে হবে। এখানে বসে আমি আপনাদের লড়াইয়ের কায়দা লক্ষ্য করেছি। আপনার কতক সিপাহীকে কঠোরভাবে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন রয়েছে। বেকায়দা উৎসাহ দেখাতে গিয়ে কতকগুলো জান বৃথা

নষ্ট হয়ে গেছে। এক নওজোয়ানের লড়াই আমায় মুগ্ধ করেছে। তিনি বিলকুল এক আরবের মতই লড়াই করছিলেন। তাঁর ঘোড়াটা ছিল আধা সফেদ আধা সিয়াহ। পিছনের পায়ে তীরের আঘাত লাগায় ঘোড়াটা কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। আমি তাঁকে মোবারকবাদ দিতে চাচ্ছি।'

তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'সে নওজোয়ান ইনি। আমি এর ঘোড়াটা দেখেছি।'

জালালউদ্দীন বললেন ঃ 'আমি আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমার তিনটি শ্রেষ্ঠ ঘোড়ার একটি আজ আমি আপনাকে দেব।'

তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'তাহির! তুমি কতটা খোশ্‌নসীব। সুলতান সালাহউদ্দীন তোমার বাপকে দিয়েছিলেন তাঁর তলোয়ার, আর আজ খারেমের মুজাহিদে আযম তোমায় উপহার দিচ্ছেন তাঁর ঘোড়া।'

জালালউদ্দীন বললেন ঃ 'কি বললেন, সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর তলোয়ার?'

ঃ হ্যাঁ, এর বাপকে সালাহউদ্দীন আইউবী তাঁর বাহাদুরীর বিনিময়ে দিয়েছিলেন তাঁর তলোয়ার। তাহির! সে তলোয়ার এবার তুমি সাথে এনেছ, না বাগদাদে রেখে এসেছ?'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'সে তলোয়ার এবার আমার কাছেই রয়েছে। আর আজই আমি প্রথমবার তা' ব্যবহার করেছি।

জালালউদ্দীন বললেন ঃ 'আমি দেখতে পারি কি?'

তাহির তলোয়ার বের করে সুলতানের সামনে পেশ করলেন। তার হাতলের উপর সুলতান সালাহউদ্দীন আউবীর নাম দেখে তিনি তলোয়ারের উপর হাত বুলিয়ে বললেন ঃ 'খোশনসীব সেই বেটা, যাঁর বাপ এত বড় ইনাম হাসিল করেছিলেন। হায়! আমার বাপ যদি খারেযমের শাহান শাহ না হয়ে সেই মহিমান্বিত মুজাহিদের ফৌজের এক সিপাহী হতেন আর আমি যদি আপনার মত এ নিয়ে ফখর করতে পারতাম!'

তাহির বললেন ঃ 'যদি আপনি কবুল করেন, তাহলে আমি এ তোহফা আপনার খেদমতে পেশ করছি।'

'শোকরিয়া! কিন্তু আমি এর যোগ্য নই। আমি আজ দেখেছি যে, আপনি এর হক আদায় করতে জানেন।' এই কথা বলে সুলতান তলোয়ার ফিরিয়ে দিলেন।

●

ফৌজ যখন কুচ করবার তৈরী হয়েছেন, সুলতান বললেন ঃ 'তাহির! আপনি বাগদাদে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'বাগদাদে? ঃ তাহির হয়রান হয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঃ হ্যাঁ বাগদাদ? ঃ খলিফার নীতিতে যে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এসেছে, তাতে আমার কতর্ব্য হচ্ছে, নিজে তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁর বাকী ভুল ধারণা দূর করে দেওয়া। আমার আশা, ওখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আমরা মিসর, শাম ও আরব মুলুক গুলোর সাহায্য নিয়ে এক অতি বড় ফৌজ তৈরী করে নিতে পারবো। আমার বিশ্বাস

হয়ত আপনাদেরকে রওয়ানা করে দেবার আগে খলিফা তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে থাকবেন।'

তাহির বিষণ্ণ আওয়াজে জবাব দিলেন ঃ 'আপনি ভুল ধারণা করেছেন, বাগদাদ থেকে আমার সাথে যারা এসেছে, হুকুমাত তাদেরকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। আমি নিজে কয়েদখানা থেকে ফেরার হয়ে এসেছি। বাগদাদ থেকে আমার সাথে এসেছে মাত্র এক হাজার লোক। বাকী রেজাকাররা পথের শহরগুলো থেকে আমাদের সাথে শামিল হয়েছে।'

সুলতান তার ঠোঁটের উপর এক বিষণ্ণ হাসি টেনে এনে বললেনঃ তাহলে এর অর্থ, আমার দোয়া এখনও কবুল হয়নি, কিন্তু আমি এখনও হতাশ হইনি। আপনার আগমন এই কথাই প্রমাণ করছে যে, বাইরে মুসলমানরা আমাদের মুসিবত সম্পর্কে বেপরোয়া নন। এমন সময় আসবে, যখন তামাম আলমে ইসলাম এই ভয়াবহ বিপদের মোকাবিলা করার জন্য উঠে দাঁড়াবে এবং সেই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমার কর্তব্য পালন করে যাব। যতটা সম্ভব, আমি আলমে ইসলামের হেফাজতের গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নেব। যখন পর্যন্ত তাতারীদের ঘোড়া আমার লাশের উপর দিয়ে চলে না যায়, ততদিন আমি প্রতি প্রদক্ষেপে তাদের মোকাবিলা করতে থাকব। আমি দুনিয়ার কাছে প্রমাণ করে দেখাবো যে, জামায়াত নিজেরা মিটে যাবার ইরাদা না করে, তাদেরকে কেউ মিটিয়ি দিতে পারে না। আমি ইসলামী দেশ সমূহের প্রত্যেক শাসকের মহলের দরজায় আঘাত হানব, ইসলামী দুনিয়ার দূরদারায় মুলুকের ঘুমন্ত সিপাহীদের আমি জাগিয়ে তুলব। আমার বিশ্বাস, আমার আওয়াজ বিরান মরুর বুকে চীৎকারের মত ব্যর্থ হবে না। তৈমুর লশকরকে কুচ করবার হুকুম দাও। আমাদের মঞ্জিলের মকসুদ হচ্ছে আফগানিস্তান।'

তাহির তৈমুর মালিকের মুখে হিরাত ও বলখের শোচনীয় ধ্বংসের কাহিনী শুনেছেন। তৈমুর মালিক তার উদ্বেগের কারণ জেনে তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, শহরের বেশীর ভাগ বাসিন্দা হামলার আগেই হিজরত করে চলে গেছে।

ফৌজে বলখের কিছু লোক ছিল। তাহিরের প্রশ্নের জবাবে তারা বলেছে যে,

শেখ আবদুর রহমান তাঁর মালমাত্তা নিয়ে বলখের উপর হামলার কয়েকদিন আগেই সেখান থেকে চলে গেছেন।

তথাপি তাহির প্রতি মঞ্জিলের পরেই তৈমুর মালিককে বলছেন যে, তিনি অবশ্যি বলখে যাবেন। প্রতিবারেই তৈমুর মালিক জবাবে বলছেন, সেখানে গিয়ে পচা-গলা লাশ আর জ্বালিয়ে দেওয়া বাড়িঘর ছাড়া আর কিছু দেখা যাবে না। শহরের অসহনীয় বদবু দু'ক্রোশ দূর থেকেই তাঁকে ফিরিয়ে আসতে বাধ্য করবে।

জালালউদ্দীন তাহিরের উদ্বেগের কারণ জানতে পেরে বলখের তামাম সিপাহীকে শেখ আবদুর রহমান সম্পর্কে তাদের জানা খবর পেশ করতে হুকুম দিলেন। ঘটনাক্রমে এমন একটি লোক বেরুলো, যার ভাই ছিল শেখ আবদুর রহমানের কর্মচারী। সে জানালো যে, শেখ হামলার চার হপ্তা আগে ঘরের সবাইকে সাথে নিয়ে বলখ ছেড়ে গেছেন। তার ভাই জানিয়েছে যে, ওখান থেকে শেখ গজনী চলে গেছেন। সেখান থেকে তিনি হয়ত আর কোন শহরে গিয়ে থাকবেন।

সুলতান তাহিরকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ 'তকদীরের রাস্তায় কখনও কখনও আচানক একে অপরের সাথে মিলন হয়ে যায়। আমরা মরুভের পথে চলেছিলাম, কিন্তু হয়ত আপনারই জন্য আমাদের মঞ্জিলে মকসুদ হয়েছে এখনও গযনী।'

পথের মধ্যে সুলতানের সন্ধানরত ছোট ছোট তাতারী দিনে রাতে বারংবার তাঁদের পথে বাঁধা সৃষ্ট করল, কিন্তু সুলতান তাদের উপর তলোয়ার চালিয়ে শেষ পর্যন্ত গজনীতে পৌঁছলেন।

গজনীতে আমীন মালিক পঞ্চাশ হাজার সিপাহী নিয়ে সুলতানকে অর্ভ্যথনা করলেন। কযেকদিনের মধ্যেই সায়ফুদ্দীন। আগরাক আরও চল্লিশ হাজার সিপাহী নিয়ে তাঁদের সাথে মিলিত হলেন। এরপর আফগান মালিক ও সরদারকে একে একে দলবল নিয়ে গযনীতে পৌঁছতে লাগলেন।

●

গজনী পৌঁছে তাহির জানলেন যে, শেখ আবদুর রহমান সেখানে দু'হপ্তা থেকে হিন্দুস্তানের দিকে চলে গেছেন। গজনীর এক সওদাগরের সাথে শেখের কারবারী সম্পর্ক ছিল। তিনি বললেন যে, শেখ বর্তমান অবস্থায় মদীনাই নিরাপদ মনে করেন এবং তিনি বাচ্চাদেরকে মদীনায় পৌঁছাবার সংকল্প করেছেন।

তাঁরা বিপজ্জনক এলাকার বাইরে চলে গেছেন, এই আশ্বাসই তাহিরের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাঁর পর মনোযোগ এখনও নিবদ্ধ হয়েছে লড়াইয়ের দিকে। গজনীর মসজিদে কয়েকটি বক্তৃতা করে তিনি সেখানকার লোকদের মধ্যে সঞ্চার করেছেন নতুন জীবন। আফগানিস্তানের ওলামা আগেই জিহাদের ফতোয়া দিয়েছেন। এখনও তাঁরা তাহিরের আবেদনে দূরদারায় এলাকা সফর করে মানুষকে টেনে আনছেন জিহাদের পথে। একদিন জুম'আর সময়ে তাহিরের পর আবদুল মালিকও বক্তৃতা করলেন। তাঁর বক্তৃতা যেমন ছিল সংক্ষিপ্ত, তেমনি হৃদয়স্পর্শী। পরদিন সুলতান গযনীর বাছাই-করা ওলামাদের দু'টি প্রতিনিধিদল তৈরী করে তাহির ও আবদুল মালিককে তাঁদের সাথে আশে-পাশের এলাকায় জিহাদ প্রচার করতে পাঠালেন।

গর্বিত আফগান জিহাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে পরম উৎসাহে দলে দলে সুলতানের ফৌজে শামিল হতে লাগল। এ অভিযানে তাহির আবদুল মালিকের চাইতে বেশী সাফল্য লাভ করলেন। তার কারণ একদিকে তাঁর বক্তৃতা-শক্তি, অপর দিকে তাঁর হাতে ছিল এমন এক মুজাহিদের তলোয়ার, যাঁর বাহাদুরীর কাহিনী আঁকা ছিল আফগানের দীলের উপর। আফগান ইসলামী যে কোন মহিমান্বিত সিপাহীকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির দৃষ্টিতে দেখতো।

সুলতান জালালউদ্দীন নিজের শক্তি যাচাই করে দেখার পর তালকানে অবস্থিত চেংগিস খানের কাছে কতিপয় তাতারী কয়েদীর মারফতে পয়গাম পাঠালেন ঃ 'আমাদের বেখবরীর সুযোগ নিয়ে তুমি আমাদের উপর হামলা করেছ। শক্তির চাইতে বেশী করে ধূর্ততা ও প্রতারণা দ্বারা তুমি আমাদের শহর দখল করেছ। তোমাদের সিপাহী দীর্ঘকাল আমার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। বর্তমানে আমি আফগানিস্তানে রয়েছি এবং তোমার

মোকাবিলার দাওয়াত দিচ্ছি। আমি তোমায় আরও জানিয়ে দিচ্ছি যে, এবার তোমাদের তলোয়ারের সামনে অসহায় নারী ও শিশুদের মাথা থাকবে না, থাকবে সারি সারি তলোয়ার যদি হিম্মৎ থাকে, মোকাবিলার জন্য এগিয়ে এস।'

চেংগিস খান শিগি তোতোকে এক যবরদস্ত ফৌজ নিয়ে জালালউদ্দীনের মোকাবিলা করতে পাঠালেন। সুলতান গজনী থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে তার মোকাবিলা করলেন। তিনদিন ধরে চলল তুমুল যুদ্ধ। তুর্কী আর আফগান প্রতিযোগিতা করে যুদ্ধে তাদের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিল। চতুর্থ দিন তাতারীরা তাদের অবস্থান ছাড়তে বাধ্য হল। সুলতান কয়েক ক্রোশ তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে ঘিরে ফেলে এমন এক এলাকায় নিয়ে এলেন, সেখানকার সংকীর্ণ পাহাড়ী রাস্তায় তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ তীরন্দায মোতায়েন করে রেখেছেন। শিগি তোতোর খুব কম ফৌজই এখান থেকে জান নিয়ে পালাতে পারল, কিন্তু সুলতান তাদের পিছু না ছেড়ে তাড়া করে নিয়ে গেলেন কাবুল নদী পর্যন্ত। শিগি তোতো দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে জান বাঁচালো। তীরবৃষ্টির ভিতর দিয়ে সে যখন অপর কিনারে উঠল, তখনও তার সাথে মাত্র আটজন লোক।

আফগানিস্তানে জালালউদ্দীনের বিজয়ের খবর বিজলীর মত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। চেংগিস খান এই পরাজয়ের খবরের সাথে সাথেই জানালেন যে, কোহে হিন্দুকুশ থেকে মরগাব দরিয়ার উপকূল পর্যন্ত তামাম গোষ্ঠীর লোক জেগে উঠেছে এবং তারা তাতারীদের প্রত্যেক চৌকির সিপাহীদের উপর আঘাত হানছে, চেংগিস খান প্রথমবার কেবল একটিমাত্র ময়দানে তাঁর পুরো শক্তি জমা করবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ব্যাপক প্রস্তুতির পর তিনি বলখ ও হিরাতের মধ্যবর্তী এক বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়ে মরগাব দরিয়ার কিনারে তাঁবু ফেলেছিলেন। তিনি ফরগনা থেকে আযরবাইজানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীর আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। এই প্রথমবার চেংগিস খান নিজের বিজয় সম্পর্কে পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারছিলেন না। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর পরাজয় ঘটলে তাতারী যুলুমের ভয়ে ভীত বিজিত এলাকার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং জালালউদ্দীন জমিনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর পিছু ধাওয়া করবেন।

●

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হয়ত জালালউদ্দীনের উদ্যম ও সহিষ্ণুতার আর এক মহাপরীক্ষা নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। ভবিষ্যতের দিগন্তে সামান্যতম আলোকরশ্মি দেখা দেওয়ার পর আর একবার ঘনিয়ে এল বিপদের ঘনঘটা। একটি দুঃখজনক ঘটনা শেষে খারেযমের গৌরবময় বিজয়কে রূপান্তরিত করল পরাজয়ে। শিগি তোতোর পরাজয়ের পর যে গণিমতের মাল সুলতানের হাতে এল, তার মধ্যে ছিল একটি খুবসুরত ঘোড়া। এই ঘোড়া নিয়ে আমীনউদ্দীন মালিক ও সায়ফুদ্দীন আগরাকের মধ্যে হল বিতর্ক। সায়ফুদ্দীনের মুখ থেকে একটা শক্ত কথা বেরিয়ে এল। আমীনউদ্দীন রাগের মাথায় তাঁকে চাবুক মারলেন। সায়ফুদ্দীনের ভাই তলোয়ার নিয়ে আমীন মালিকের উপর

হামলা করল। কিন্তু আমীন মালিকের ফৌজের এক অফিসার পেছন থেকে তলোয়ার মেরে তার মাথা কেটে ফেলল।

ফৌজের দুই বাহাদুর সরদারের মধ্যে লড়াই অপরিহার্য হয়ে পড়ল। সায়ফুদ্দীন আগ্রাকের চল্লিশ হাজার আর আমিনউদ্দীন মালিকের পঞ্চাশ হাজার সিপাহী সামনা-সামনি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো।

সুলতান তাঁর খিমা থেকে খবর পেয়ে বাইরে ছুটে এলেন এবং তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। উভয় দলকে সমঝাবার চেষ্টা করা হল। আফগানিস্তানের মালিক ও ওলামা দুই সেনাবাহিনীর মাঝখানে কাতার বেঁধে দাঁড়ালেন। সুলতানের হুকুমে আমীনউদ্দীন মালিক মাফ চাইতে রাজী হলেন, কিন্তু সায়ফুদ্দীনের কাছে তাঁর ভাইকে কতল করাটা মামুলী ব্যাপার নয়। তাঁর প্রথম ও শেষ দাবী, আমীন মালিককে তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। সুলতান এক দিকে ভাবলেন যে, আমীন মালিকের উপর কঠোর হলে তাঁর পঞ্চাশ হাজার সিপাহী তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে। অপর দিকে সায়ফুদ্দীন নারাজ হলে চল্লিশ হাজার সিপাহী বিগড়ে যাবে।

শান্তির সকল চেষ্টায় হল ব্যর্থ। সুলতানের মনোভাবের উপর সায়ফুদ্দীনের সন্দেহ হল, কারণ আমীন মালিক তাঁর কন্যাকে সুলতানের কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। এমনি নাযুক পরিস্থিতিতে না কাজে লাগল ওলামার মিনতি, আর না সফল হল আবদুল মালিকের বক্তৃতা।

সায়ফুদ্দীন সরাসরি বলে দিলেন : 'আমরা তাতারীদের মোকাবিলায় সুলতানের সাহায্য করতে এসেছি। সুলতানের শ্বশুরের কাছে বেইজ্জত হতে রাজী নই।' অবশেষে রাতের বেলায় তিনি চল্লিশ হাজার সিপাহী সাথে নিয়ে কিরমানের পথে কুচ করলেন। সুলতানের এক মজবুত বাযু ভেঙে পড়ল।

জালালউদ্দীনের সেনাবাহিনীতে ভাঙনের খবর পেয়েই চেংগিস খান গযনীর দিকে এগিয়ে এলেন এবং দুরন্ত ঝড়ের গতিতে। সুলতান গযনী থেকে কয়েক মঞ্জিল আগে তাঁবু ফেললেন এবং চেংগিস খানের পথের প্রত্যেক নদীর পুলের উপর নৈশ আক্রমণকারী সিপাহীদের পাহারা বসালেন।

চেংগিস খান এগিয়ে এসেছেন অফুরন্ত শক্তি নিয়ে। তিনি পথের সকল বিপদ উত্‌রে, সকল বাধা দূর করে, পায়ে পায়ে তাঁর সিপাহীদের লাশ ফেলে এগিয়ে চলেছেন সামনের দিকে।

জালালউদ্দীনের নৈশ আক্রমণকারীরা আচানক দেখা দেয় কোন পাহাড়ের উপর, তাতারী ফৌজের এক হিস্‌সার উপর তীর আর পাথর বর্ষণ করে তারা গায়েব হয়ে যায়।

চেংগিস খানের পংগপালের মত অগুণতি সেনাবাহিনীর সাথে তুলনা চলে না। জালালউদ্দীনের মামুলী লশকরের, তাই তিনি কোন চূড়ান্ত লড়াই করবার ফয়সলা করতে পারলেন যে, তাছাড়া চল্লিশ হাজার সিপাহী বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর নতুন সাথীদের উৎসাহে পড়েছে ভাটা। মাত্র পনের বিশ হাজার সিপাহী। জয়-পরাজয়ের পরোয়া না করে তারা শেষে নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাবে। বাকী ফৌজ সম্পর্কে তাঁর ধারণা, একবার

পিছপা হলে তারা আর ফিরেও তাকাবে না।

ফৌজের বেশীর ভাগ সিপাহীকে তিনি আমীনউদ্দীন মালিক ও তৈমুর মালিকের হাতে সোপর্দ করে দিলেন এবং তাঁর জীবনপণ যোদ্ধাদের এক ঝটিকা বাহিনী নিয়ে চেংগিস খানের সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দলকে পরাজিত করলেন। প্রায় পাঁচ হাজার সিপাহীকে তলোয়ার চালিয়ে হত্যা করা হল।

চেংগিস খান যখন অগ্রগামী দলের সালারদের তীব্র ভর্ৎসনা করছেন, তখনও খবর এল যে, জালালউদ্দীন ঝটিকা পাহাড়ের পিছন দিয়ে দীর্ঘপথ ঘুরে এসে পিছনের দলের উপর হামলা করেছে। বহু পরিমাণ রসদ তারা লুটে নিয়ে গেছে।

মুষ্টিমেয় সেনাদল নিয়ে জালালউদ্দীন এ অদ্ভুত সাফল্য তাঁর ফৌজের মধ্যে সঞ্চার করল এক নতুন জীবন, কিন্তু তাতারী শক্তির সঠিক খবর নিয়ে জালালউদ্দীন ফয়সলা করলেন যে, তিনি সিন্ধুনদ পর্যন্ত পিছু হটে যাবেন। এর মধ্যে তিনি একদিকে পাবেন ব্যাপক প্রস্তুতির মওকা, অপরদিকে পেছন থেকে হামলাদার ফৌজ দিনের পর দিন তাতারীদের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে অন্তহীন পাহাড় শ্রেণীর ভিতর দিয়ে আরও এগিয়ে যাবার ফয়সলা বদল করে দিতে বাধ্য করবে। তাদের পিছু ধাওয়া করতে গেলে চেংগিস খানের পরিণাম শিগি তোতোর ভাগ্য থেকে আলাদা হবে না।

গোবি মরুর দুরন্ত দস্যু এ বিপদ সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। তিনি জানতেন, শেরে খারেযম তাঁকে তাঁর বিপদসংকুল গুহার মধ্যে টেনে নিতে চাচ্ছেন, কিন্তু পিছু হটে যাওয়া এগিয়ে যাওয়ার চাইতে আরও বেশী বিপজ্জনক মনে করে তিনি প্রতি পদক্ষেপে কঠিনতম ক্ষতির পরোয়া না করে তাঁর গতি অব্যাহত রাখলেন।

জালালউদ্দীন আমীনউদ্দীন মালিক ও তৈমুর মালিককে হুকুম দিলেন তারা যেন কোথাও না দাঁড়িয়ে তাঁদের ফৌজ নিয়ে পূর্বদিকে চলে যান। তিনি নিজে আট হাজার মরণপণ সিপাহী সাথে নিয়ে তাতারীদের গতি শিথিল করবার কৌশল চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন ভোরে তাতারীরা যখন সূর্যের সামনে মাথা নত করে রয়েছে, তখনও জালালউদ্দীন এক পাহাড়ের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে তাদের বাম বাযুর উপর হামলা করলেন। যতক্ষণ অপর উপত্যকা থেকে লশকরের মধ্যভাগের সিপাহীরা বাম বাযুর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল, জালালউদ্দীন ততক্ষণে তিন হাজার তাতারীকে মৃত্যুর খবরে পৌঁছে দিয়ে পাহাড়ের ভিতরে গায়েব হয়ে গেছেন। চেংগিস খান জালালুদ্দীনের পিছু ধাওয়া না করে অগ্রগামী দলগুলোকে আমীন ও তৈমুর মালিকের নেতৃত্বে পিছু হটে যাওয়া ফৌজের অনুসরণ করতে হুকুম দিলেন এবং বাকী তামাম লশকরের গতিও বাড়িয়ে দিলেন। জালালউদ্দীন আবার এক মওকা পেয়ে দুপুর বেলায় পিছন থেকে বেরিয়ে এসে রসদবাহী দলগুলোর উপর হামলা করলেন, কিন্তু পিছনের সেনাবাহিনী মোকাবিলা না করে আত্মরক্ষামূলক লড়াই করতে করতে এগিয়ে চলল। জালালউদ্দীন রসদ-বোঝাই খচ্চরগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বহুদূর তাতারীদের পিছু ধাওয়া করে তীর বর্ষণ করতে থাকলেন। অবশেষে তৃতীয় প্রহরে তিনি ফৌজকে থামবার হুকুম করে এক অফিসারকে বললেন : 'খোদা ভাল করুন। আমার মনে হচ্ছে, আমীনউদ্দীন বোকামী করে বসেছেন। তিনি তাতারীদের অগ্রগামী দলের সাথে আমার হুকুমের

খেলাফ লড়াই শুরু করে দিয়েছেন। নইলে পেছন থেকে আমার হামলা সত্বেও তাতারীরা যে থাএল না। তার আর কি কারণ হতে পারে?'

তুর্ক অফিসার জবাব দিলেন ঃ 'আমীনউদ্দীন এতটা বেকুব তো নন। আর হলেও তাঁর সাথে রয়েছেন তৈমুর মালিকের মত বহুদর্শী সিপাহী।

সুলতান বললেন ঃ 'কিন্তু তাতারী রসদ বোঝাই একটা খচ্চরকে শত সিপাহীর চাইতে বেশী দামী মনে করে। আজ তারা ফিরেও তাকালো না। এর দুটো অর্থ হতে পারে। হয় আমীন মালিক তাদের সাথে লড়াই শুরু করেছেন, নইলে তাদের বেষ্টনীর ভিতরে এসে গেছেন। আমাদেরকে এখখুনি তাঁর সাহায্যের জন্য যেতে হবে।'

●

জালালউদ্দীনের অনুমান সত্যি প্রমাণিত হল। চেংগিস খানের অগ্রগামী বাহিনীর কয়েকটি দল প্রায় বিশ ক্রোশ এগিয়ে যাবার পর আমীন মালিকের লশকরের নাগাল পেল। আমীন মালিক ভাবলেন, তাতারীদের সংখ্যা খুবই কম এবং পেছনে জালালউদ্দীনের হামলার ফলে চেংগিস খান এত বড় সেনাবাহিনী নিয়ে নিতান্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই তিনি তাঁর ফৌজকে দাঁড়াতে হুকুম দিয়ে তাদের উপর হামলা করতে চাইলেন। কিন্তু তৈমুর মালিক তাতে রাজী হলেন না। তিনি বুঝালেনঃ 'অগ্রগামী দলের এতটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না যে, চেংগিস খান এখখুনি আমাদের সাথে লড়াই না করে তাতারীদের বাকী লশ্‌করের পৌছা পর্যন্ত আমাদেরকে ব্যস্ত রাখতে চান। আপনি আমার সাথে দু'হাজার সওয়ার দিয়ে এদের সাথে বোঝাপড়া করবার জন্য। আমাদেরকে পিছনে রেখে বাকী ফৌজ নিয়ে পিছু হটতে থাকুন, তাতেই ভাল হবে।'

আমীন মালিক তাঁর পরামর্শ কবুল না করে পিছন ফিরে তাতারীদের উপর হামলা করলেন। তাতারীরা খানিকক্ষণ তাদের মোকাবিলা করে পালিয়ে গেল। আমীন মালিক আবার লশকরকে কুচ করবার হুকুম দিতে গিয়ে তৈমুর মালিককে বললেন ঃ 'দেখলেন তো, আমার বিশ্বাস ছিল, যে এ চেংগিস খানের অগ্রগামী ফৌজের কোন দল নয়। বরং কোন দিক থেকে আর কোন দল বেরিয়ে এসেছে। চেংগিস খানের দল খুব দ্রুত এগিয়ে এলেও আমাদের থেকে দশ ক্রোশ দূরে থাকত।

তৈমুর মালিক বললেনঃ 'হতে পারে, আপনার ধারণাই ঠিক, কিন্তু আমদের জলদী করা উচিত ছিল।'

আমীন মালিক লশকরকে কুচ করবার হুকুম দিলেন, কিন্তু আচানক প্রায় তিন হাজার তাতারীকে এক পাহাড়ের উপর দিয়ে উপত্যকায় নামতে দেখা গেল। এবার তৈমুর মালিক তাকে দাঁড় করবার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তৈমুর মালিকের মনে সন্দেহ যতটা পাকা হল, তেমনি আমীন মালিকের বিশ্বাসও পাকা হল যে, এ ছোটাখাটো ফৌজ আরও কোন দিক থেকে বেরিয়ে এসেছে। চেংগিস খানের নিয়মিত

বাহিনীর সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর ধারণায় চেংগিস খানের ফৌজ তখনও কয়েক ক্রোশ দূরে। আমীন মালিক তৈমুর মালিকের আশঙ্কা মেনে না নিয়ে আবার তাতারীদের উপর হামলা করলেন এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে বিপর্যস্ত করে দিলেন, কিন্তু তাদের সংখ্যা না কমে বরং বেড়েই চলল। পাহাড়ের উপর দিয়ে নতুন নতুন দল ক্রমাগত নীচে উপত্যকায় হাজির হতে লাগল। প্রায় এক প্রহর লড়াই করবার পর আমীন মালিক দেখলেন, দুশমনের দশ বার হাজার সিপাহী সেখানে জমা হয়ে গেছে। তিনি হয়রান হয়ে তৈমুর মালিককে জিজ্ঞেস করলেন : 'এবার আমরা কী করব?'

তৈমুর মালিক রাগে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললেন : 'এখনও আর আমরা কি করতে পারি? চেংগিস খানের অগ্রগামী তামাম ফৌজ এ উপত্যকার আশে পাশে জমা হয়ে গেছে। আশেপাশের তামাম পাহাড় থেকে তাদেরকে মেরে না ভাগাতে পারলে আর আমরা এগিয়ে যেতে পারব না। হায়! আপনি যদি আমার পরামর্শ কবুল করতেন। কিন্তু এখনও ভুলের জন্য আফসোস করবার সময় নেই, এখনও এর প্রতিকার করতে হবে।'

: 'তাহলে আপনি এবার পথ দেখান। আমায় এখনও এক সিপাহী বলে ধরে নিন।' তৈমুর মালিক আমীনকে ত্রিশ হাজার সিপাহী দিয়ে আশপাশের পাহাড়ী এলাকা দখল করতে বললেন এবং তিনি নিজে বাকী ফৌজ নিয়ে উপত্যকায় নেমে-আসা সেনাবাহিনীর মোকাবিলার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। আসরের কাছাকাছি উপত্যকা ও আশপাশের পাহাড় তাতারীদের থেকে খালি হতে লাগল, কিন্তু এরই মধ্যে চেংগিস খানের নিয়মিত বাহিনী পৌঁছে গেল। আমীন মালিক তার ত্রিশ হাজার সিপাহী নিয়ে এক পাহাড় থেকে আর এক উপত্যকায় নেমে চেংগিস খানের লশকরের ডান বাযুর উপর হামলা করলেন। তার এ হামলার পেছনে বিজয়ের আশঙ্কা যতটা ছিল, তার চাইতে বেশী ছিল ভুলের প্রতিকার।

আর এক উপত্যকায় সেখানে তৈমুর মালিক লড়াই করছিলেন, চেংগিস খান তাঁর বিশেষ সেনাদল নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। তৈমুর মালিক কঠোরভাবে তাঁর মোকাবিলা করলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে চেংগিস খানের আর একটি দল এসে সেই উপত্যকায় হাজির হল। তৈমুর মালিক সন্ধ্যায় অন্ধকারের সুযোগ নেবার আশা নিয়ে লড়াই করে চললেন।

ওদিকে আমীন মালিকের পা টলে গেছে। কিন্তু আচানক জালালউদ্দীন এসে পৌঁছে গেছেন বলে বাকী সিপাহীরা পালিয়ে বাঁচার ইরাদা ত্যাগ করে জীবনপণ হামলা চালিয়ে যেতে লাগল। জালালউদ্দীন কয়েক বার হামলা করে ময়দান সাফ করে ফেললেন। তারপর আমীন মালিকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন : আমায় তোমাদের বোকামীর শাস্তি পেতে হচ্ছে, না খোদা আমার বদ কিসমত বাড়িয়ে দেবার জন্যই তৈমুর মালিকের মত বহুদর্শী সিপাহীর মাথায় পর্যন্ত পাগলামি চাপিয়ে দিয়েছেন?'

আমীন মালিক লজ্জায় মাথা নত করে জওয়াব দিলেন : 'এ অপরাধ আমার। তৈমুর মালিক আমায় মানা করেছিলেন। আমি তার কথা মানি নি। আমি ভেবেছিলাম তাতারীরা বহুত দূরে রয়েছে।'

: 'খোদা সবাইকে তোমার মত আহমকের দোস্তি থেকে নিরাপদ রাখুন। এখনও আমি তোমার উপর একটা কাজ দিচ্ছি। তুমি এখখুনি গযনীর দিকে রওয়ানা হয়ে যাও।

আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও। শহরের বাসিন্দাদের পরামর্শ দাও, তারা যেন হিন্দুস্তানের সীমান্তের দিকে বেরিয়ে যায়।' জালালউদ্দীন উপত্যকার বাকী ফৌজকে সুসংবদ্ধ করে কয়েকটি পাহাড় পার হয়ে তৈমুর মালিকের সাথে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর উপর হামলা করলেন এবং তৈমুর মালিকের চারপাশে বেষ্টনকারী সৈনিকদের সারি ভেঙে দিয়ে ফৌজের সাথে মিলিত হলেন। রাতের অন্ধকারে যখন-দুশমনের ভেদ রইল না, তখনও জালালউদ্দীন একদিকে জোরদার হামলা করে ময়দান খালি করতে করতে প্রায় আট হাজার সিপাহী সাথে নিয়ে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু চেংগিস খানের হুকুমে তাতারীরা তাদের পিছু ছাড়ল না। রাতের বেলায় তাঁর কয়েক জন সিপাহী ঘোড়া যখম হওয়ায় তারা পিছনে পড়েই রইল, কতক পথ হারিয়ে এদিক ওদিকে চলে গেল, আর কতক নিরাশ হয়ে তাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেল। ভোর পর্যন্ত তার সাথে থাকল মাত্র ছ' হাজার সিপাহী। তাহিরের সাথীদের বেশীর ভাগ শহীদ হয়ে গেছেন। আবদুল আজিজ ও মুসাকে তিনি ময়দানে নিজের চোখে দেখেছেন পড়ে যেতে।

কয়েক দিন ধরে তাতারীরা জালালউদ্দীনের অনুসরণ করল ছায়ার মত। এমন কি, তিনি লড়াই করতে করতে সিন্ধুনদের কিনারে এসে পৌঁছালেন।

## উনিশ

একদিন ভোরবেলা জালালউদ্দীন তাঁর ছোটখাট ফৌজ নিয়ে এক পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের তিন দিকে তাতারীরা তাঁদেরকে ঘিরে রেখেছে, আর একদিকে প্রায় ত্রিশ ফিট নীচে সিন্ধুনদ প্রচন্ড গর্জন করে বয়ে চলেছে।

চেংগিস খানের হুকুম, জালালউদ্দীনকে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে জিন্দাহ্ গ্রেফতার করতে হবে। পাহাড়ের আশেপাশে জালালউদ্দীনের অবশিষ্ট সাথীরা জান বাজি রেখে লড়াই করে যাচ্ছে। তাতারীদের অবরোধ আরও জমাট হয়ে আসছে। তাতারী ফৌজের এক সওয়ারের চেহারা ও লেবাসে মনে হচ্ছে কোন মুসলমান আলেম। সফেদ ঝান্ডা হাতে নিয়ে সে এগিয়ে এসে পাহাড়ের কাছে পৌঁছে বুলন্দ আওয়াযে বলল ঃ 'সুলতান মুয়াযযম! যদি আপনি হাতিয়ার সমর্পণ করেন, তা'হলে খানে আযম আপনার জান বাঁচাবার ওয়াদা করছেন।'

সুলতান জওয়াব দিলেন ঃ 'তোমার হাতে সফেদ ঝান্ডা না থাকলে আমি তোমার কথার জবাব তীর দিয়ে দিতাম। যাও, ওই ডাকাতকে বলে দাও, আমি যিল্লাতের জিন্দেগীর চাইতে ইজ্জতের মওত বেশী পছন্দ করি।'

তাহির চেংগিস খানের দূতকে প্রথম দৃষ্টিতে চিনলেন। লোকটি মুহাল্লাব বিন দাউদ।'

চেংগিস খান কয়েকটি দলকে হামলা করবার হুকুম দিলেন। জালালউদ্দীনের সিপাহীদের তীর ও পাথর বর্ষণের ফলে পাহাড়ের নীচে তাতারীদের লাশ স্তুপীকৃত হয়ে গেল। চেংগিস খান অবস্থা দেখে আরও বেশী করে সিপাহী পাঠালেন। জালালউদ্দীনের

সিপাহীরা একে একে মারা পড়তে লাগল। তাঁরা পিছু হটতে হটতে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে এসে গেলেন। সুলতান তৈমুর মালিককে বললেন; "তৈমুর! কুদরত আমাদেরকে আগুন আর পানির মধ্যে একটিকে বাছাই করে নিতে বাধ্য করছেন। তোমার মত কি?'

তৈমুর মালিক জবাব দিলেন ঃ 'আমার বিশ্বাস, পানির তরংগ আগুনের শিখার মত বেরহম হবে না।

ঃ 'বহুত আচ্ছা। আমি পথ দেখাচ্ছি তুমি সিপাহীদের তৈরী হতে হুকুম দাও।'

সুলতান ভারী বর্ম খুলে ছুঁড়ে ফেললেন। তিনি ঘোড়া সামনে এগিয়ে নিলেন। তারপর দরিয়ার তরঙ্গ দোলার দিকে তাকিয়ে দেখে তিন ঘোড়া হাঁকিয়ে দরিয়ার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তৈমুর মালিক কয়েকজন ছাড়া বাকী সিপাহীকে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হুকুম দিলেন।

তৈমুর মালিকের নিজের পালা এলে তাঁর নযর পড়ল তাহিরের উপর। কয়েক কদম দূরে তিনি ঘোড়ার গর্দানের সাথে মাথা ঠেকিয়ে আছেন। তাঁর বর্মের সাথে কয়েকটি তীর আটকে রয়েছে আর তাঁর বিশ্বস্ত নওকর যায়েদ নেযাহ নিয়ে দু'জন তাতারীকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে।

তৈমুর মালিক ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক তাতারীর গর্দান উড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় তাতারীকে যায়েদ ভূপাতিত করল। এরই মধ্যে আর কয়েকজন তাতারী পৌঁছে গেল। তৈমুর মালিক তাহিরকে টেনে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যায়েদ ও বাকী সিপাহীদের দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়বার হুকুম দিলেন। তারপর ঘোড়াটিকে পাহাড়ের প্রান্তে নিয়ে দরিয়ায় ঝাঁপ দিলেন। আবদুল মালিক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দরিয়ার কিনারে। তাহিরকে তৈমুর মালিকের হেফাযতে দেখে তিনিও অবিলম্বে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দরিয়ার ভিতরে।

চেংগিস খান খারেযম শাহকে জিন্দাহ্ ধরে নেবার জন্য মামুলীসংখ্যক সিপাহী পাহাড়ের উপর হামলা করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাতারীরা যখন পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দরিয়ার দিকে ইশারা করে দেখাতে লাগল, তখনও তিনি ছুটে এসে পাহাড়ের উপর উঠলেন। জালালউদ্দীনের বেশীর ভাগ সাথী তাতারীদের তীর আর দরিয়ার প্রচন্ড মউজের শিকার হল, কিন্তু জালালউদ্দীন ততক্ষণে চলে গেছেন, তীরের সীমানা ছাড়িয়ে। তিনি অপর কিনারে গিয়ে এক টিলার উপর বসে ফেললেন স্বস্তির নিশ্বাস।

চেংগিস খান তাঁর পুত্রদের ও সরদারদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'খোশনসীব সেই বাপ, যাঁর পুত্র জালালউদ্দীনের মত বীর পুরুষ, আর মোবারক সেই মা, যিনি এমনি শেরকে দুধ পান করিয়েছেন।'

চেংগিস খানের কোন কোন সিপাহী জালালউদ্দীনের অনুসরণের জন্য দরিয়া পার হয়ে যাবার এজাযত তলব করল। কিন্তু তিনি বললেন ঃ এ দরিয়া তুর্কীস্তানের ছোট ছোট দরিয়ার মত নয়। তা'ছাড়া দুশমনের তুনীরও তীরশূন্য নয়।'

তৈমুর মালিক তাহিরকে দরিয়ার কিনারে তুলে তাঁর বর্ম খুলে ফেললেন। তারপর যখমের উপর পট্টি বেঁধে বললেন ঃ 'তাহির! এখনও তোমার তবিয়ত কেমন?'

তিনি উঠে বসতে বসতে জবাব দিলেন ঃ 'আমি বিলকুল ঠিক আছি। আমি ভোর থেকে একটু পানি গিলবারও মওকা পাইনি। ভূখ-পিয়াসে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আমি প্রাণভরে দরিয়ার ঠান্ডা পানি পান করে নিয়েছি।'

প্রায় সাতশ' সিপাহী দরিয়া পার হয়ে এসে জালালউদ্দীনের সাথে মিলিত হল। সুলতান আশেপাশের কয়েকটি বস্তি দখল করে কিছু রসদ ও কয়েকটি ঘোড়া সংগ্রহ করলেন। তারপর পাহাড়ী মুলুকের একটি ছোটখাট এলাকা দখল করে নিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর ফৌজের আর কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দল এসে মিলিত হল তাঁর সাথে।

চেংগিস খান কয়েক ক্রোশ নীচে গিয়ে কিশতি সংগ্রহ করে তাঁর শ্রেষ্ঠ সওয়ারদের একটি ফৌজ নিয়ে এক অভিজ্ঞ সেনাপতিকে দরিয়ার পারে পৌঁছে দিলেন। জালালউদ্দীন নিরাশ হয়ে দিল্লীর পথ ধরলেন। তাতারী ফৌজ হিন্দুস্তানের অসহনীয় গরমের ভিতর দিয়ে বেশী দূর তাঁর অনুসরণ করতে পারল না। তারা লাহোর, মুলতান ও শাহপুর এলাকায় লুটপাট, নরহত্যা ও ধ্বংসতান্ডব চালিয়ে ফিরে গেল।

ফেরার পথে পেশাওয়ার ধ্বংস ও বিরান করে চেংগিস খান সমরকন্দের পথ ধরলেন। আফগানিস্তানের ধ্বংসীভূত এলাকার উপর দিয়ে যাবার সময় বাকী পুরুষদের হত্যা করে বেশুমার নারীকে নিয়ে গেলেন সাথে করে।

সিন্ধনদ বাহিরায়ে খিযম পর্যন্ত তামাম ইসলামী মুলুকের উপর তখনও তাতারী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফগানিস্তানের উপর প্রতিশোধ নিয়ে তিনি আশ্বস্ত হলেন যে, মুসলমানদের আর মাথা তুলবার হিম্মৎ নেই। তামাম দুনিয়ায় তাঁর একমাত্র বিপজ্জনক দুশমন হচ্ছে জালালউদ্দীন, কিন্তু তাঁরও না আছে রাজ্য, না আছে ফৌজ। ইসলামের আত্মরক্ষার আখেরী কেল্লা মিসমার হয়ে গেছে। তাঁর বিবি বাচ্চারা ছিলেন আমিন মালিকের হেফাযতে পেশোওয়ারের কাছে। তাতারীদের হাতে তাঁরা কতল হয়ে গেছেন। কয়েক বছর আগে যে তকশী খান্দানের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল কোহে আল বুরুয থেকে সিন্দুর উপকূল পর্যন্ত, তার শেষ বংশধর এখনও ঘরছাড়া মুসাফির হয়ে দিল্লীর শাসক সুলতান শামসুদ্দিন আলতামশের সাম্রাজ্যে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু সেখানে তাঁর সাদর অভ্যর্থনার কোন আশা নেই।

জালালউদ্দীন দিল্লীর কয়েক মঞ্জিল দূরে তাবু ফেলে তাঁর অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা আইনুল মুলুক ও তাহির বিন ইউসুফের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পাঠালেন সুলতান শামসুদ্দিন আলতামশের দরবারে।

●

আইনুল মুলক ও তাঁর সাথীদের থাকার ব্যবস্থা হল শাহী মেহমানখানায়। সুলতান আলতামশ তিনবার তাঁদের সাথে মোলাকাত করার পর কয়েকদিনের মধ্যে তাদেরকে জবাব দেবার ওয়াদা করলেন।

উজির নাজির ও ফৌজী অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে সুলতান প্রতিনিধিদল থেকে তাহির বিন ইউসুফকে দাওয়াত দিলেন আলাদা মোলাকাত করতে। দীর্ঘ সময়

আলোচনার পর সুলতান বললেন ঃ 'আমি সুলতান জালালউদ্দীনকে সাহায্য করতে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার অসুবিধা আপনার অজানা নেই। আমার কাছে চেংগিস খানের পয়গাম পৌঁছে গেছে। তিনি লিখেছেন, যদি আমি সুলতান জালালউদ্দীনকে আশ্রয় দেই অথবা তাতারীদের বিরুদ্ধে তাঁর সাথে কোন চুক্তি করি, তাহলে তিনি হিন্দুস্তানের উপর হামলা করবেন। তাঁর হুমকীর পরোয়া করবার লোক আমি নই। তথাপি সুলতান জালালউদ্দীনের বুঝা প্রয়োজন যে, এদেশে মুসলমানদের সংখ্যা অতি সামান্য। তাতারীরা এদেশে এসে ঢুকলে হয়ত বিপদের সময়ে অপর কওমের লোক আমাদের দিকে না থেকে তাদেরই পক্ষ সমর্থন করবে। কয়েকজন হিন্দু রাজা আমায় আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাতারী হামলা হলে তাঁরা নিজেদের ঘরের হেফাজত করবার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন, কিন্তু চেংগিস খান যদি তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তাঁর মতলব শুধু জালালউদ্দীনকে গ্রেফতার করা, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই আমার কাছে দাবী করবেন, যেন আমি এই মেহমানকে আশ্রয় দিয়ে আমি তামাম হিন্দুস্তানের ধ্বংস ডেকে না আনি। আমার কাছে যথেষ্ট সৈন্য থাকলে আমি অর্ধেক লশকর নিয়ে সুলতান জালালউদ্দীনের ঝাণ্ডাতলে হিন্দুস্তানের বাইরে গিয়ে তাতারীদের মোকাবিলা করতাম, আর বাকী অর্ধেক লশকর হিন্দুস্তানের হেফাজতের জন্য এখানে রেখে যেতাম। কিন্তু এখানকার ব্যাপার উল্টো। গত কয়েকদিনে কয়েকটি তাতারী দল সিন্ধুনদ পার হয়ে লাহোর ও মুলতান পর্যন্ত লুটপাট করে চলে গেছে। তখনও তাদের অগ্রগতি রোধ করার চাইতে আমার বেশী উদ্বেগ যেন কোথাও আমার অমুসলিম প্রজারা বিদ্রোহ না করে বসে। আমি তাতারীদের ভয়ে বিব্রত বলে আইনুল মুলুক আমায় নিন্দা করেছেন। একথার জবাব আমি অপরের সামনে দিতে পারি না, কিন্তু আপনাকে আমি বলছি যে, তাতারীদের ভয় করার কারণ এ নয় যে, আমি বুজদীল। তার কারণ শুধু এই যে, আমার প্রজাদের সম্পর্কে আমি আশ্বস্ত নই।'

তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ 'তাহলে আমি সুলতান জালালউদ্দীনের কাছে এই জবাব নিয়ে যাব যে, তাঁর হিন্দুস্তানের থাকা আপনি মঞ্জুর করছেন না।'

ঃ 'না, আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন। আমার তরফ থেকে সুলতান জালালউদ্দীনের লিপির একমাত্র জবাব হতে পারে এই যে, আমার এক বিপন্ন ভ্রাতার জন্য আমি বুকের রক্ত দিতেও রাজী, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে সাহায্য করবার একটি মাত্র পন্থা হতে পারে। তা হচ্ছে, আমি এই সালতানাত হেফাজত করবার সবটুকু দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আমার তামাম ফৌজ সুলতানের হাতে ছেড়ে দেব। তারপর তাতারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াই এমন এক দেশে করা যাবে, যেখানকার আওয়াম আমাদের পক্ষে থাকবে। তখনও আমাদের এ ভয় থাকবে না, যে পেছন থেকে কেউ আমাদেরকে ছুরি মারবে। যদি আমারা জয়ী হই, তাহলে হিন্দুস্তানকে একবার হারালেও আবার ফিরে পাবো। আর যদি পরাজিত হই, তাহলে আর সব দেশের মত আমরা হিন্দুস্তানকেও হারাবো চিরদিনের মত।'

তাহির বললেন ঃ 'আমারা হিন্দুস্তানের প্রসার দেখেই আপনার ফৌজী কুওত আন্দাজ করেছিলাম। সুলতান জালালউদ্দীনের লড়াই তাঁর নিজের জন্য নয়, তামাম ইসলামী দুনিয়ার জন্য। তিনি কখনও এটা চাইবেন না যে, এই দেশ-যেখানে তুর্কীস্তান,

ইরান ও আফগানিস্তানের লাখো লাখো অসহায় মানুষের আশ্রয় মিলতে পারে। মুসলমানের হাত থেকে বেরিয়ে যাক। হিন্দুস্তানের দরজায় তাতরীদের গতি রোধ করবার জন্যই তিনি সিন্ধুনদের কিনারে তাদের সাথে লড়াই করেছেন। খোরাসান ও ইরানে তাঁর যুদ্ধ ছিল ইরাক, শাম ও মিসরের হেফাজতের জন্য। আমাদের মকসাদ এক। তা হচ্ছেঃ আমরা আমাদের হারানো রাজ্যগুলোকে আবার ফিরে পাবো, আর বাকী আজাদ মুলুকগুলোকে তাতারীদের গোলামী থেকে বাঁচাবো। এ মকসাদ হাসিল করবারও রয়েছে একটি মাত্র পথ। তা হচ্ছেঃ আমরা যমুনার কিনার থেকে শুরু করে জাবালুত তারিক পর্যন্ত একই কাতারে দাঁড়িয়ে যাব। আমাদের দেশ এই মিলিত সংগ্রামে যথাসাধ্য হিসসা নেবে। সুলতান জালালউদ্দীনের ধারণা ছিল, তিনি আপনার সাহায্যে হিন্দুস্তানে তাঁর সংগ্রামের কেন্দ্রভূমি করে নিয়ে তামাম ইসলামী সালতানাতকে দেবেন কর্মের আহবান। আলমে ইসলাম যদি তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেয়, তাহলে খুব শীগগিরই এখানে এসে জমা হবে লক্ষ লক্ষ সিপাহী।'

সুলতান আলতামশ বললেন ঃ 'এখানে যে সব সিপাহী আসবে, আমি তাদেরকে সাদরে বরণ করব, কিন্তু এ হলেই কি ভাল হয় না যে, সুলতান জালালউদ্দীন এখানে না থেকে তামাম আলমে ইসলাম সফর করে বেড়াবেন এবং তাঁর আহবানে যারা সাড়া দেবে, তাদের কেন্দ্র হবে হিন্দুস্তান? যত সিপাহী তিনি সংগ্রহ করে পাঠাবেন, তাদের সবরকম প্রয়োজন মিটাবার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। এর কল্যাণকর ফল হবে এই যে, তাতারীদের মনোযোগ হিন্দুস্তান থেকে দূরে থাকবে এবং আমরা প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় পাব। তা না করে সুলতান জালালউদ্দীন যদি হিন্দুস্তানেই থেকে যান, তাহলে তাতারীরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের খবর নেবে। আমাদের তরফ থেকে বিপদ সম্ভাবনা দেখলে তারা হিন্দুস্তানের উপর হামলা করে বসবে। আপনি শান্ত মনে আমার কথাগুলো ভেবে দেখুন, আর সুলতানকে সব বুঝিয়ে বলুন। তারপরও যদি তিনি এখানে থাকা যুক্তিসংগত মনে করেন, তাহলে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমার মহলের এক হিসসা তাঁর জন্য খালি করে দেওয়া হবে। আর যদি আমার মেহমান হিসাবে থাকা তিনি পছন্দ না করেন, তাহলে আমি তাকে এজাযত দেব যে, তিনি এ দেশের অবিজিত অংশ থেকে যে কোন এলাকা জয় করে নিতে পারেন। আমি যবনিকার আড়াল থেকে তাঁকে সাহায্য করব এবং তাতারীদের দূরে রাখার জন্য তাদেরকে জানাব যে, সুলতান আমার ইচ্ছা ছাড়াই এ দেশে প্রবেশ করেছেন।'

তাহির বললেন ঃ 'আমি আজই সুলতানের কাছে রওয়ানা হয়ে যাব। কয়েকদিনের মধ্যেই সুলতানের জবাব আপনার কাছে পৌঁছে দেব।'

শামসুদ্দীন আলতামশ বললেন ঃ 'তার চাইতে ভাল হয়, যদি আপনি এসব কথা এক চিঠিতে লিখে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দেন। আপনার সাথীদের মধ্যে একজনকে পাঠিয়ে দিলে চলবে। আইনুল সুলতানকে লিখুন যে, এখানে তাঁর উপস্থিতি আমাদের উভয়ের জন্যই হবে ক্ষতিকর। তাঁকে এখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে তৈমুর মালিককে এখানে পাঠালেই ভাল হবে। তিনি যেমন নেক নিয়ত, তেমনি দূরদর্শীও বটে। আমার বিশ্বাস শীগগিরই কোন ফয়সলায় পৌঁছাতে পারবো। আপনার যে সাথী এখান থেকে যাবেন, তাঁর জন্য ডাক ঘোড়ার বন্দোবস্ত করা যাবে। খুব বেশী হলে তিন দিনের মধ্যে

তিনি সুলতানের জবাব নিয়ে এখানে ফিরে আসতে পারবেন। তাহিরের মনে সুলতানের সম্পর্কে যে ভুল ধারণার মেঘ জমেছিল, এই মোলাকাতের পর তা কেটে গেল। তিনি মেহমানখানায় ফিরে এসে আইনুল মুলককে সব ঘটনা জানালেন এবং সুলতান জালালউদ্দীনের কাছে এক চিঠি লিখতে বসে গেলেন। পরদিন ভোরে তাহির শহরের এক মসজিদ থেকে নামায পড়ে বেরিয়ে আসছেন, এমনি দরজার সিঁড়ির উপর কে যেন পেছন থেকে তাঁর জামা ধরে টান দিল।

ঃ 'কে?' তাহির পেছনে ফিরতে ফিরতে প্রশ্ন করলেন।

একটি ছোট্ট বালক হাসতে হাসতে বলল ঃ আমায় চিনলেন না?

ইসমাইল! তাহির ঝুঁকে পড়ে তাকে বুকে নিয়ে আবেগ কম্পিত স্বরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন।

ঃ তোমরা এখানে কবে এসেছ? তোমার নানা কোথায়? তোমার নানী কেমন আছেন? তোমার বোন সুরাইয়া কোথায়?'

ঃ চলুন না, তাঁরা সবাই ঘরে রয়েছেন।'

ঃ কোথায়?'

ঃ 'এই শহরে-খুব কাছে।'

তাহিরের বুক কেঁপে উঠল। তিনি বললেন ঃ 'এক হপ্তা হল, আমি এখানে এসেছি। হায়! আমি যদি আগে জানতাম, তোমরা এখানে! বলখের কাছে এসেই আমি খবর পেয়েছি যে, তোমরা গযনী চলে গেছ।'

ইসমাইল বলল ঃ 'কাল রাত্রে আমি আপনাকে এই মসজিদেই দেখেছিলাম, কিন্তু আমি ছিলাম দূরে। ভাল করে চিনতে পারিনি। আমি যখন আপনার কাছে আসছিলাম, এরই মধ্যে আপনি লোকের ভিড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি আপাজানের কাছে বললে তিনি আমায় মসজিদের দরজায় পাহারা দিতে বললেন। চলুন।'

তাহির ইসমাইলের সাথে চললেন। গন্তব্য লক্ষ্যের দিকে তাঁর পা কখনও দ্রুত, কখনও ধীর গতিতে চলতে লাগল।

ইসমাইলের সাথে তিনি এসে পৌঁছলেন এক সুদৃশ্য মহলে।

সুরাইয়া বাড়ির প্রাঙ্গনে আম বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাহির দূর থেকে তাকে দেখেই থামলেন। তাঁর বুকের স্পন্দন দ্রুততর হল। নিজেকে সামলে নিয়ে তাঁর কাছে কয়েক পা দূরে দাঁড়ালেন। মুহূর্তের মধ্যে তাদের দৃষ্টি একে অন্যের দিকে কেন্দ্রীভূত হল। তাদের মুখে ভাষা নেই। ভাষার সেখানে প্রয়োজন নেই। তাদের মন ও মস্তিষ্কের সবটুকু অনুভূতি তখনও কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে। তখনও তারা একে অন্যের মুখের উপর দেখতে পাচ্ছেন ক্রমপরিবর্তনশীল রঙের খেলা। তাদের একের কাছে অপরের অস্তিত্ব ছাড়া দুনিয়ার সব কিছুই যেন মুছে গেছে। তাদের বুকের স্পন্দন ছাড়া দুনিয়ার সব কোলাহল গেছে নির্বাক হয়ে।

ইসমাইল বলল ঃ 'চিনলেন না আপনি? এ যে ভাই তাহির।'

সুরাইয়া হাসলেন এবং মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে এগিয়ে এসে ইসমাইলকে বুকের কাছে নিয়ে বললেন ঃ 'আমার মনে হয়, তুমি ওকে চিনতে ভুল করেছ। ইনি হয়ত আর কেউ হবেন।'

ইসমাইল পেরেশান হয়ে তাহিরের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'খোদার কসম, এ তিনিই।'

সুরাইয়া হেসে তাহিরের দিকে তাকিয়ে আনন্দাশ্রু গোপন করতে করতে বাড়ির দিকে চললেন। বারান্দার সিঁড়ির কাছে গিয়ে তিনি দ্রুত পায়ে ছুটতে লাগলেন।

'নানীজান, উনি এসেছেন।' এক কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন। ইসমাইল তখনও হয়রান হয়ে তাহিরের দিকে তাকাচ্ছে।'

ঃ 'আপনার শরীরটা কিছু শুকিয়ে গেছে। চেহারা তো একই রয়েছে। আজব ব্যাপার, আপা আপনাকে চিনতে পারছে না। আমার সাথে ভিতরে চলুন। নানাজান ঠিকই চিনবেন। ইসমাইল তাহিরের হাত ধরে বললেন ঃ কিন্তু তিনিও যদি না চিনতে পারেন, তাহলে?'

ইসমাইল আর একবার তাহিরের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে বলল ঃ 'আমি ঠিকই বলছি, আপনার মুখের কোন পরিবর্তন আসে নি। কপালে একটা জখমের দাগ রয়েছে বটে, কিন্তু তাতে এমন কি তফাৎ হতে পারে? নানাজান ঠিকই আপনাকে চিনতে পারবেন।'

ইতিমধ্যে শেখ আবদুর রহমানকে বাইরে বেরুতে দেখা গেল। কয়েকজন নওকর তাঁর সাথে। তিনি উঁচু গলায় বলছেন ঃ 'ভারী নালায়েক তোমরা! মেহমান বাইরে দাঁড়িয়ে, আর তোমরা আমায় খবরটা পর্যন্ত দাওনি। আর ইসমাইল তো এক আহামক! কে জানে, উনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন।'

তাহির সামনে এগিয়ে এসে শেখ সাহেবের সাথে মোসাফেহা করলেন। শেখ তখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছেন, যেন মাইল খানেক পথ ছুটে এসেছেন।

তিনি বললেন ঃ 'এস এস, ভিতরে চল। তুমি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?'

ইসমাইল বলল ঃ 'নানাজান, চিনতে পারছেন, এ কে?'

ঃ 'চুপ নালায়েক!'

শেখ তাহিরের বাযু ধরে টানতে টানতে ঘরের ভিতরে চললেন। বারান্দার সামনে মর্মরের সিঁড়ির উপর উঠতে গিয়ে তাঁর পা পিছলে গেল। তাহির যথাসময়ে তাঁকে ধরে ফেললেন। ইসমাইল হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে একটা থামের পিছনে লুকালো।

শেখ সামলে নিতে গিয়ে বললেন ঃ 'এ মর্মরের সিঁড়ি বড়ই বিপজ্জনক। আমি এই নিয়ে চারবার এখান থেকে পিছলে পড়লাম। ইসমাইল! কোথায় গেল? নালায়েক কোথাও লুকিয়ে হাসছে! ওরে সাবের! শওকৎ! আজই এখান থেকে মর্মর তুলে ফেলে আর কোন খরখরে পাথর লাগাও বল মিস্ত্রি ডেকে। আরে থামো, এখনও থাক।'

শেখ তাহিরকে এক সুদৃশ্য কামরায় বসাতে বসাতে বললেন ঃ 'আমি তোমার সম্পর্কে হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তোমায় কয়েকটা কথা বলতে চাচ্ছি। আগে বল, দিল্লীতে তুমি কি করে এলে? তুমি জলদী বলখে পৌঁছবার ওয়াদা করেছিলে না? তারপর এতটা দেরী করলে কেন?

তাহির তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাবে তাঁর এতদিনের কাহিনী বললেন।

শেখ বললেন ঃ 'আবার ভাগবার ইরাদা তো নেই?'

ঃ 'জালালউদ্দীনকে আমি ছাড়তে পারব না। তিনি এখান থেকে চলে গেলেও আমায়ও যেতে হবে। কিন্তু বর্তমানে কম সে কম এক হপ্তা আমি এখানে থাকব।

ঃ 'আমি তো প্রায় দিল্লী ছেড়ে যাবার ইরাদা করেছি?'

ঃ কোথায় যাবেন আপনারা?'

ঃ 'মদীনা, বাগদাদ অথবা দামেশক। সুরাইয়া মদীনা যেতে চায়। কিন্তু আমি কোন ফয়সলা করিনি এখনও। তোমার মতে কোন শহর বেশী নিরাপদ?'

ঃ 'মদীনাই সব দিক দিয়ে নিরাপদ।'

ঃ 'তোমার বাড়িও ওখানেই না?'

ঃ 'জি হ্যাঁ, মদীনার খুব কাছে। যদি আপনারা আমার বাড়ীতে থাকতে রাজী হন, তাহলে আমার নওকরকে আমি আপনাদের সাথে পাঠাতে পারি।'

ঃ 'শোকরিয়া! কিন্তু দু'বছর আগেই আমি মদীনায় এক বাগিচা আর বাড়ি খরিদ করেছি। আমি দু'জন কর্মচারীকে পাঠিয়েছি দামেশক ও বাগদাদে। তারাও ওখানে হয়ত বাড়ী কিনে ফেলেছে। এখনও একটা ব্যাপারের ফয়সালা বাকী রয়েছে। তোমার বিবিকে তুমি সাথে নিয়ে যাবে, না আমাদের কাছেই থাকবে?'

ঃ 'আমার বিবি?' তাহির পেরেশান হয়ে বললেন।

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বিবি। আমার মতলব শাদী হয়ে যাবার পর।

শেখের কথাটা শেষ না হতেই পিছনের কামরার দরজাটা খুলে গেল এবং শেখের বুড়ী বিবি ভিতরে এলেন। তাহির উঠে সালাম করলেন! তিনি সস্নেহে বললেন ঃ 'বস বেটা!'

শেখ বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি কি যেন বলছিলাম?'

হানিফা রেগে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আপনি হয়ত বলছিলেন, আর দেরী না করে এখনি সুরাইয়ার সাথে এর শাদী হয়ে যাক।'

ঃ 'না, আমি বলছিলাম, সুরাইয়া আমাদের সাথে থাকা উনি পছন্দ করবেন, না তাকে সাথে নিয়ে যাবেন?'

ঃ 'বাহ্‌ এটাও কোন প্রশ্ন হল? যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত সুরাইয়া আমাদের সাথে ছাড়া আর কোথায় থাকবে?'

ঃ 'আমিও তো তা বলছিলাম। আমার মতলব, শাদীর পর উনি সুরাইয়াকে সাথে নিয়ে যেতে চাইলে আমি ওর ইরাদা বদলে দেব।'

ঃ 'কিন্তু শাদী কবে হচ্ছে, সে ফয়সলাই তো আপনি করেন নি এখনও।'

ঃ 'ফয়সলা আমি করেছি।'

হানিফা পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'কবে?'

ঃ রাত্রে ইসমাইল যখন বলছিল যে, ওকে মসজিদে দেখেছে, তখনি আমি ফয়সালা করেছি, না-কসম করেছি, ওকে পেলে এখনি ওদের শাদী করিয়ে দেব। ওর আপত্তি না থাকলে আজই আমি কাজীকে ডেকে আনব।'

তাহির লজ্জায় মাথা নীচু করে বললেন ঃ 'বাহ্‌, আমার কি আপত্তি থাকবে?'

হানিফা বললেন ঃ 'তৈরী হতে আর সবাইকে দাওয়াত দিতেও তো দু'দিন সময় চাই।'

শেখ বললেন ঃ দু'দিন? তাহির বলখ থেকে বাগদাদে চলে গেলে সে দিন থেকেই তো তুমি তৈরী হচ্ছ। আর দাওয়াত? তুমি বললে সন্ধ্যার আগেই আমি সারা শহরের লোক এখানে জমা করে দেব।

ঃ 'কিন্তু দু'দিন আগেই তো তাদেরকে খবর দেওয়া চাই। শহরের ওমরাহের যেসব মেয়ে সুরাইয়ার সখী বনে গেছে, তাদেরকে কম সে কম দু'দিন আগে ডেকে আনতে হবে।'

দীর্ঘ বিতর্কের পর শেখ হার মেনে বললেন ঃ 'বহুত আচ্ছা। পরশুই সই। পরশু ভোরেই বিয়ে হয়ে যাবে।'

খানা খাবার পর শেখ তাহিরকে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু তাহির বললেন ঃ 'না, এখনও আমায় এজাযত দিন। শাহী মেহমানখানায় আমার সাথীরা ইন্তেজার করছেন। সন্ধ্যায় আমি আসব আবার।'

শেখের কাছ থেকে এজাযত নিয়ে তাহির কামরার বাইরে এসে দেখলেন, ইসমাইল তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে। সে বলল ঃ 'আপনি চললেন? একটুখানি দেরী করলে আমিও আপনার সাথে যাব। ওস্তাদ বললেন ঃ 'সবক শেষ না হলে ছুটি মিলবে না।'

শেখ ইসমাইলের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে বললেন ঃ 'যাও, বেটা! সবক খতম কর। সন্ধ্যায় উনি আসবেন।'

ইসামাইল বলল ঃ উনি হয়ত রাস্তাই চেনেন না।'

শেখ বললেন ঃ 'দেখলে তো? ও সবাইকে নিজের চাইতে কম বুদ্ধিমান মনে করে।' তাহির হেসে বললেন ঃ 'যাও ইসমাইল! সবক পড়ো গে। আমি সন্ধ্যায় আসব তখনও আমরা দু'জন বেড়াতে যাব কেমন?'

ইসমাইল মুখ ভার করে কামরার ভিতরে চলে গেল। তাহির মহল থেকে বেরিয়ে পাইন বাগিচায় ঢুকলেন। আসমানে মেঘে ঢেকে আসছে। রাস্তায় একদিকে আম গাছের ঘন ছায়ায় ছোট একটি হাউজে ফোয়ারার পানি পড়ছে। পানির মধ্যে এক জোড়া রাজহাঁস সাঁতরে বেড়াচ্ছে। সুরাইয়া বসে রয়েছেন মর্মরের সিঁড়ির উপর। তাহির তাঁর কাছ দিয়ে যেতে যেতে থেমে গেলেন। তাকে দেখে সুরাইয়া উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?' সুরাইয়া লজ্জাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। তাহিরের দিকে না তাকিয়ে তিনি চোখ নীচু করলেন। তাহির রাস্তা ছেড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন ঃ 'শাহী মেহমানখানায় আমার সাথীদের কাছে যাচ্ছি। সন্ধ্যায় আমি আবার আসব।'

ঃ 'ইসমাইলকে আপনার সাথে পাঠিয়ে দেব?'

ঃ 'না। সে এখনও পড়ছে। আপনার কাছে আমি একটা জরুরি কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

ঃ বলুন।

'কথা হচ্ছে.....' তাহির চিন্তায় পড়ে গেলেন।

সুরাইয়া চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'বলুন। আপনি চুপ করে গেলেন কেন?'

ঃ আমি চিন্তা করছি, কি করে কথাটা শুরু করা যায়! আজ সন্ধ্যায় অথবা কাল ভোরে খানিকটা সময় করে নিলেই কি ভাল হয় না এর জন্য যেমন কিছুটা অবকাশ দরকার তেমনি নিরিবিলিও চাই।'

ঃ 'তেমন জরুরি কোন কথা থাকলে তা আমি এখনওই শুনতে চাই। সন্ধ্যার মধ্যে আমার কয়েকজন সখী হয়ত আসবে। তাই আমার তেমনি নিরিবিলি সময় আর মিলবে না।'

ঃ 'আগে ওয়াদা করুন যে, রেগে যাবার আগে আমার কথাগুলো ঠান্ডা মনে ভাববেন।'

ঃ 'যদি এমন কোন কথাই থাকে, যাতে আমি রেগে যাব বলে আপনার আশঙ্কা হয়, তাহলে বিনা দ্বিধায় বলে ফেলুন। আমিও ওয়াদা করছি, রাগবো না।'

তাহির বললেন ঃ 'কথা হচ্ছে, আমি বলখ থেকে বাগদাদ যাবার পর এমন কতকগুলো ঘটনা আমার সামনে এসে গেছে, যা শাদীর আগেই আপনাকে বলে দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করি।'

সুরাইয়া কেমন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ বলুন, বলখ থেকে বাগদাদ যাবার পর কি ঘটলো!'

ঃ 'আমার জানা ছিল না যে,........।'

ঃ 'আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি বুঝেছি। আমি আপনাকে আপনার মরজীর খেলাফ অতীতের কোন ফয়সলা মেনে নিতে বাধ্য করব না।'

ঃ 'দেখলেন, এখনওই আমায় ভুল বুঝলেন। শুধু এই জন্যই আমি আপনাকে কিছু বলতে চেয়েছি। যাতে কাল আপনি অভিযোগ না করেন যে, আপনার অজ্ঞাতে আমি আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভুল ফয়সলা করেছি।'

সুরাইয়া বললেন ঃ 'দুনিয়ায় একমাত্র আপনিই রয়েছেন, যার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ থাকতে পারে না, কিন্তু আপনার দ্বিধা আমায় অস্থির করে তুলেছে। বাগদাদে পৌঁছে আপনার কি ঘটনা ঘটেছে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যা কিছু করে থাকুন, ঠিকই করেছেন। যদি আপনি বলেন যে, আর কাউকে শাদী করতে আপনি বাধ্য হয়েছেন, তাহলেও খোদা সাক্ষী, আমি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব না। আমি শুধু জানি, আপনি আমার। তিনি যদি এমন কেউ হন, যিনি আপনার মুহাব্বতে আর কাউকেও শরীক করতে চান না, তাহলে আমি আপনাকে শাদী করতে বাধ্য করব না। আর যদি আপনার দ্বিধার কারণ এই ধারণায় হয়ে থাকে যে, আমি আপনার মুহাব্বতে আর কাউকে শরীক করতে চাইব না, তাহলে আপনিও আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছেন বলেই আমার আফসোস হবে।'

ঃ 'কিন্তু তুমি কেন ভাবলে যে, আমি শাদী করেছি?'

'আপনি' শব্দটির বদলে তুমি শুনে সুরাইয়ার মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন ঃ তাহলে কি আপনি বলতে চান যে আমি ছাড়া আর কোন মেয়ে আছে, যাকে আপনি হৃত্যশ করতে পারছেন না।'

ঃ 'মনে কর, আমি তাই বলতে চাচ্ছি। তারপর?'

ঃ 'তারপর আর কি?'

ঃ 'আমি কোন জবাব দেয়ার আগে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

ঃ 'কি ধরণের প্রশ্ন?'

ঃ 'আমি প্রশ্ন করছি? তিনি কে, তিনি কেমন? আপনার সাথে তাঁর কবে দেখা হয়েছে, কি করে দেখা হল? তিনি আপনাকে কি বললেন? আপনি কি জবাব দিলেন? আপনি আমার কথা তুললে তিনি কি বললেন? তিনি রহমদীল, না ঝগড়াটে?' সুরাইয়া হাসতে লাগলেন।

'সুরাইয়া, কোন।' তাহির গম্ভীর হয়ে বললেন। সুরাইয়া চুপচাপ দাঁত দিয়ে আঙুল কামড়াতে কামড়াতে হাউজের কিনারে বসে পড়লেন। তাঁর মুখে লেগে রয়েছে দুষ্ট হাসি।

তাহির তাঁর সাথে সুফিয়ার আকর্ষণের সূচনা থেকে শুরু করে শেষ সাক্ষাত পর্যন্ত সব ঘটনা খুলে বললেন। তাঁর কাহিনী শেষ হলে সুরাইয়া অশ্রুসজল চোখে বললেন ঃ 'দিন, তাঁর সে আংটিটি কোথায়?'

তাহির জিব থেকে আংটি বের করে সুরাইয়ার হাতে দিলেন। সুরাইয়া নিজের আংটি খুলে সুফিয়ার আংটি পরে বললেন ঃ 'আমায় মাফ করুন। আমি আপনাকে পেরেশান করেছি। এই নিন, আমার এ আংটি আপনার কাছেই থাক। তাঁর সাথে যখন আপনার দেখা হয়, আমার তরফ থেকে এটি তাকে দিয়ে বলবেন, আমি তাঁর এক আদনা খাদেমা হয়েও মনে মনে ফখর অনুভব করব।'

তাহিরের শাদীর পরদিন তৈমুর মালিক দিল্লীতে পৌঁছলেন। দিল্লীর লোকেরা সিপাহী হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের খবর আগেই শুনেছে। তাই তিনি যখন শহরের দরজায় পৌঁছলেন, তখনও সেখানে ওমরাহে সালতানত ছাড়া আরও হাজির ছিলেন শহরের বহু লোক তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। তিনি যখন শাহী মেহমানখানার দিকে চললেন, তখনও তাঁর পিছু পিছু চলেছিল রীতিমত এক শোভাযাত্রা।

তাহির সুলতানের সাথে তাঁর কয়েকবার মোলাকাতের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ 'আমার আফসোস হচ্ছে, আপনি একদিন দেরী করে এখানে তশরীফ আনলেন, নইলে দাওয়াতে ওয়ালিমায় আপনিও শরীক হতেন।

ঃ 'কার দাওয়াতে ওয়ালিমা?'

ঃ 'আমার। আমার শাদী হয়ে গেছে?'

ঃ 'কবে? কি করে? কোথায়?'

ঃ 'কাল। আপনার মনে পড়ে, বলখের রাস্তায় যখন আপনার সাথে আমার মোলাকাত হল, তখনও আমার সঙ্গিনী ছিলেন এক যুবতী। আপনি তাঁর বক্তৃতা শুনে আমায় এক নসীহত করেছিলেন। আপনার সে নসীহত আমি মেনে নিয়েছি।'

ঃ তাহলে ওরা বলখ থেকে এখানে এসে গেছেন? কি খোশনসীব তুমি?'

ঃ 'আমার ধারণা ছিল, আবদুল মালিকও আপনার সাথে আসবেন আর আপনারা দু'জনই আমার শাদীতে শরীক হবেন।'

ঃ 'আবদুল মালিক বাগদাদ রওয়ানা হয়ে গেছেন।'

ঃ কবে?

ঃ 'তোমার লিপি পেয়েই সুলতান এক পরামর্শ সভা ডাকলেন। আমাদের মিলিত ফয়সলা হয় যে, তামাম ইসলামী সালতানাতের কাছে দূত পাঠিয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে এক মিলিত শক্তি গড়ে তোলার দাওয়াত দেওয়া হবে। সুলতানের ইচ্ছা ছিল, তোমায় বাগদাদে পাঠাবেন, কিন্তু আমি তাকে বললাম যে, দিল্লীতে তোমার থাকা প্রয়োজন রয়েছে।'

তাহির বললেন ঃ 'কিন্তু আমার মতে আবদুল মালিক সম্পর্কেও খলিফার মতামত ভাল নয়। আমার ভয় হয়, যাওয়া মাত্রই ওকে গ্রেফতার না করা হয়।'

তৈমুর মালিক জবাব দিলেন ঃ 'না, তিনি সুলতানের দূত হিসাবে ওখানে গেছেন। খলিফা এতটা নীচতার পরিচয় দেবেন না। সুলতান আর ইসলামী রাজ্যেও দূত পাঠিয়েছেন।'

এক অফিসার ভিতরে এসে খবর দিলেন ঃ 'সুলতান আপনাকে মোলাকাতের জন্য ডেকেছেন।'

তৈমুর মালিক উঠতে উঠতে তাহিরের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'ইনশা আল্লাহ্ ফিরে এসে আমি তোমার শাদী উপলক্ষ্যে এক তোহ্ফা পেশ করব।'

দুপুর বেলা তৈমুর মালিক সুলতানের সাথে মোলাকাত করে ফিরে এসে তাহিরকে নিজের কামরায় ডেকে বললেন ঃ 'আমি তোমায় একটি তোহ্ফা পেশ করবার ওয়াদা করেছিলাম। আমার ওয়াদা আমি পুরা করছি। সে তোহ্ফা হচ্ছে ঃ তুমি দ্বিতীয় হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত দিল্লীতে থাকবে। সুলতান জালালউদ্দীন যতদিন হিন্দুস্তানে আছেন, তোমায় কোন দ্বিতীয় হুকুম দেয়া হবে না। কাল আমি চলে যাচ্ছি। দিল্লীতে তুমি সুলতানের দূত হিসাবে থাকবে। আমার ভয় হচ্ছে, কোন কোন তুর্ক সরদার সুলতান আলতামশকে আমাদের সুলতানের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেবার চেষ্টা করবে, কিন্তু তুমি মোলাকাত করে সুলতানের মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছো, তা দেখে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, এখানে তুমি হাযির থাকলে কোন ব্যক্তি তাঁর ইরাদা বদলে দিতে পারবে না। তোমার কাজ তুমি করে যাও এবং সুলতান ওমরাহ্ ও সাধারণ মানুষকে তাতারীদের বিরুদ্ধে মিলিত শক্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের পক্ষ সমর্থন করবার উৎসাহ দিতে থাকো। তুমি খারেযম শাহের দূত হিসাবে এখানে থাকবে, শুনে সুলতান আলতামশ খুশী হয়েছেন। তোমার নেক নিয়ত ও আন্তরিকতা তাকে মুগ্ধ করেছে।'

সন্ধ্যায় শেখ আবদুর রহমান তৈমুর মালিকের সম্মানার্থে শহরের বিশিষ্ট লোকদের খানার দাওয়া দিলেন। খানা শেষ হবার পর তৈমুর মালিক বললেন ঃ 'তাহির! তোমার বিবির জন্যও আমি এক তোহ্ফা নিয়ে এসেছি।'

উপস্থিত লোকেরা গভীর মনোযোগ সহকারে তৈমুর মালিকের দিকে তাকালেন। তৈমুর মালিক তাঁর গলা থেকে হেমায়েল শরীফ খুলে তাহিরের হাতে দিয়ে বললেন ঃ 'তোমার বিবির জন্য এর চাইতে বড় কোন তোহ্ফা দেবার সাধ্য আমার নেই। এ কোরআন মজীদ আমার ওয়ালেদের নিজ হাতে লেখা।'

দিল্লিতে আরও কিছুদিন থাকার পর তাহির সুলতান আলতামশের পেরেশানির কারণ বুঝতে পারলেন। আলতামশ তাঁর মনিব কুতুবউদ্দীন আইবাকের ওফাতের পর তাঁর অযোগ্য পুত্রের হাত থেকে জবরদস্তি করে দিল্লীর তখত ও তাজ হাসিল করেছেন।

তুর্কী ওমরাহ্‌, বিশেষ করে আইবাক খানদান তাঁর সাফল্যে খুশী ছিলেন না। আলতামশের লৌহ-কঠিন হস্ত দুর্দান্ত ওমরাহকে দমিত করে রেখেছিল, কিন্তু উত্তর পশ্চিম থেকে তাতারী হামলার ভয় ছিল আর দক্ষিণে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল রাজপুত শক্তি। এ অবস্থায় আলতামশের এ আশংকা অমূলক ছিল না যে, তাতারী অথবা রাজপুত শক্তির সাথে লড়াই বাধলে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট কোন কোন তুর্কী সরদার গিয়ে মিলিত হবে দুশমনের সাথে।

আইনুল মুলক যখন দিল্লীতে এসে সুলতানের বিদ্রোহী ওমরাহদের সথে চক্রান্ত শুরু করলেন; তখনও আলতামশের অন্তরে জাগলো এক নতুন বিপদের অনুভূতি। সুলতানের সাথে মোলাকাতের পর তৈমুর মালিক আইনুল মুলুকের সামনে কঠোর হয়ে দেখা দিলেন। বিদায়ের আগে তিনি কতিপয় বিক্ষুব্ধ ওমরাহের সাথে দেখা করে তাদেরকে ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে অবহিত করে মিলে মিশে থাকতে অনুরোধ করলেন।

তৈমুর মালিক চলে যাবার পর তাহির এ ঐক্য চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। কয়েক দিনের মধ্যে সুলতানের বিরোধী ওমরাহ অনেকেই তাহিরের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে হলফ করলেন যে, বিপদের সময়ে তাঁরা সুলতানের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করবেন না। এরপর তাহির আওয়ামের দিকে মনোযোগ দিলেন। দিল্লীর মসজিদে মসজিদে তাঁর বক্তৃতার পর বাকী ওমরাহ্‌ অনুভব করলেন যে, তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে জনমত তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে এবং সুলতান সহজেই তাদেরকে দমন করতে পারবেন। তাই তারা ও সুলতানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবার সংকল্প ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। তাহিরের এসব সাফল্যের এক বড় কারণ ছিল সুরাইয়ার চেষ্টা। দিল্লীতে তাহিরের বিবি হবার আগে ওমরাহ্‌ খানদানের মহিলাদের চোখে তিনি ছিলেন শুধু এক মালদার সওদাগরের সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু তাঁর শাদীতে সুলতান ও বেগম যখন শরীক হলেন, তাতে তামাম বড় বড় খানদানের নযর পড়ল তাঁর দিকে। তাদের চোখে ধরা পড়ল সুরাইয়ার যিন্দেগীর কয়েকটা উজ্জ্বল দিক। চারজন মহিলা একত্র হলেই সেখানে শুরু হত সুরাইয়াকে নিয়ে আলোচনা।

একজন বলেঃ আমি শুনেছি, তাঁর নানা একজন সাধাসিধা সওদাগর। টাকাপয়সা কামাই করা ছাড়া আর কিছু জানেন না।'

আর একজন বলে ঃ 'কিন্তু তার নানী বড়ই হুঁশিয়ার। এখানকার ওমরাহের বিবিরা, এমন কি উজিরে আজমের বিবি পর্যন্ত তাকে ডাকেন 'বড় আম্মা"। কথায় যারা না ভোলেন, তাদেরকে তিনি তোহ্‌ফা দিয়ে খরিদ করেন। আমি শুনেছি, বেগমকে তিনি নাকি জওয়াহেরাতের এক হার পেশ করেছেন।'

ঃ 'তাই তো বেগম সাহেবা সুরাইয়ার শাদীতে জওয়াহের ভরা একটি ছোট্ট সিন্দুক তোহ্‌ফা দিয়েছেন।'

ঃ 'আমি শুনেছি, সুরাইয়ার বাপ ছিলেন এক শহরের হাকীম। তিনি তাতারীদের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন।

ঃ 'ভারী খোশনসীব মেয়ে। তাঁর অফুরন্ত দৌলত; বাপ ছিলেন এক বাহাদুর সিপাহী; আর স্বামী তাঁর সুলতান জালালউদ্দীন শাহের দূত ও আমাদের সুলতানের অতি

বড় দোস্ত। লোকে বলে, সুরতের দিক দিয়ে তিনি নাকি বিলকুল ফেরেশতার মত। আর তাঁর গলার আওয়াজে আছে এক অদ্ভুত যাদু।'

দিল্লীর গণ্যমান্য ওমরাহের মধ্যে ঐক্য কায়েম করার অভিযানে সুরাইয়া তাহিরের সাথে শরীক হয়ে যে কামিয়াবী হাসিল করেছেন, তাতে তাহিরের বিবি ও শেখের ঘরের বেটীর চাইতে তিনি বেশী করে পরিচিত হলেন কওমের এক সুযোগ্য নারী হিসাবে।

একদিন তিনি শহরের রইস খানদানের মহিলাদের খানার দাওয়াত দিলেন তাঁর বাড়িতে। তাদের সামনে তিনি তাতারী যুলুমের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করে তাদের কাছে আবেদন জানালেন, তাঁরা যেন পুরুষদের গাফলতের ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন, নইলে নৃশংসতা ও বর্বরতার তুফান আশেপাশের ইসলামী রাজ্যগুলোকে তাবা ও বরবাদ করে হিন্দুস্তানের দরজায় আঘাত হানবে। সম্মিলিত বিপদের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত সংগ্রামের।'

সুরাইয়া তাদেরকে বুঝালেন যে, কওমের নারীরা কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিলে পুরুষদের মধ্যে কেউ গাদ্দারী করবার সাহস করবে না। স্ত্রী স্বামীকে, বোন ভাইকে আর মা তাঁর সন্তানকে কওমের জন্য লড়াই করতে বাধ্য করতে পারে। কেবল পুরুষদের ঐক্য ও ত্যাগই কওমের স্ত্রী কন্যাদের হেফাযতের যামিন হতে পারে।

সুরাইয়া হিন্দুস্থানের অবস্থা বিশ্লেষণ করে তাদেরকে বুঝালেন যে, সুলতান ও ওমরাহের মতানৈক্যের অবসনা না হলে তাতারীদের প্ররোচনায় দেশের কোটি কোটি অমুসলমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

সুরাইয়ার মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে মহিলারা পুরুষদের বুঝিয়ে পথে আনবার শপথ গ্রহণ করলেন। এ সূচনা ছিল খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এরপর প্রত্যেক মহল্লার নারী-রা সুরাইয়ার তবলীগের দাওয়াত দিতে লাগলেন। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কোন না কোন মহল্লায় মহিলাদের জলসা বসতে লাগল আর সুরাইয়া তাতে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন।

শেখ আবদুর রহমান তাহিরের উপস্থিতির জন্য দিল্লী ছেড়ে চলে যাবার ইরাদা মুলতুবী রাখলেন। সুলতান জালালউদ্দীন খারেযম শাহ সিন্ধুর উপকূল এলাকায় ডেরা ফেলে বাইরের ইসলামী সালতানাত থেকে তাঁর আবেদনের জবাব পাবার জন্য ইন্তেজার করতে লাগলেন। তাহির ও সুরাইয়া কয়েক হপ্তার মধ্যে দিল্লীর মুসলমানদের মধ্যে এক নয়া জিন্দেগী সৃষ্টি করে তুললেন। তারপর তাঁরা সুলতান আলতামশের অনুরোধে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহর সফর করতে শুরু করলেন। যে কোন শহরে পৌঁছবার আগেই তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সেখানে। তাহির মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা করে পুরুষদের মধ্যে জ্বালিয়ে তুলতে লাগলেন ঈমানের অগ্নিশিখা। ফৌজী চৌকিতে গিয়ে তিনি সিপাহীদের কুচকাওয়াজ দেখেন, তলোয়ারের খেলা, তীরন্দাযি নেযাবাযিতে শরীক হন। সুরাইয়া তবলীগ করেন মহিলাদের মধ্যে। যেখানেই তাঁরা যান, সেখানেই হয় তাঁদের বিপুল অভ্যর্থনা।

কয়েক মাস সফরের পর তাহির ও সুরাইয়া যখন দিল্লীতে ফিরে এলেন, তখনও সুলতান আলতামশ তাঁদেরকে শোকরিয়া জানাতে গিয়ে বললেন ঃ 'এখনও আমার বিশ্বাস সিন্ধুনদ থেকে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত সব দুর্দান্ত শক্তিকেই আমি পরাভূত করতে

পারবো। তাতারীরা এখনও হিন্দুস্তানের দিকে এগিয়ে আসার সাহস করলে, ইনশাআল্লাহ্ তাদের মধ্যে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।'

কয়েকদিন পর সুলতান জালালউদ্দীনের দূত এসে তাহিরকে খবর দিল যে, খলিফার তরফ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক পয়গাম পেয়ে সুলতান হিন্দুস্তানের বদলে বাগদাদকেই কেন্দ্র করে যুদ্ধ চালানো ভাল মনে করছেন। এই খবর দিয়ে দূত তাহিরের হাতে তৈমুর মালিকের লিপি পেশ করল। তাতে তিনি লিখেছেন ঃ-

'খলিফার কাছ থেকে তাঁর পয়গামের উৎসাহব্যঞ্জক জবাব পেয়ে বাগদাদে যাবার ফয়সলা করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যে আমরা মুলতান পৌঁছবো। সুলতানের হুকুম, তুমিও ওখানে পৌঁছবে। মহামান্য সুলতান সিন্ধু ও মাকরানের পথে বাগদাদে পৌঁছবেন। সুলতান শামসুদ্দীন আলতামশকে পয়গাম পৌঁছে দেবে যে, বাগদাদ গিয়ে আমরা মিসর, শাম ও আরব মুলুক থেকে সাহায্য হাসিল করে তাকে আমাদের ইরাদা জানিয়ে দেব। তখনও পর্যন্ত তিনি যেন তাঁর প্রস্তুতি চালিয়ে যান।'

তাহির তৈমুর মালিকের লিপি নিয়ে সুরাইয়ার কামরায় ঢুকলেন। সুরাইয়া তাকে দেখেই প্রশ্ন করলেন ঃ 'দূত কি খবর নিয়ে এসেছে?'

তাহির চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে বললেন ঃ 'তুমি নিজে পড়ে দেখ।'

'সুরাইয়া চিঠি পড়ে তাঁর দিকে তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন ঃ 'আপনি কবে চলে যাবার ফয়সলা করেছেন?'

ঃ 'কাল অথবা পরশু।'

ঃ 'কিন্তু আপনাকে কেমন পেরেশান মনে হচ্ছে। আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না।'

ঃ 'সুরাইয়া! তোমার কাছ থেকে জুদা হওয়া আমার পক্ষে মোটেই সহজ নয়, কিন্তু আমার পেরেশানির অন্য কারণ আছে।'

ঃ 'আমি তা জানতে পারি?'

ঃ 'কথা হচ্ছে, খলিফার দিক থেকে আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি। আমার ভয় হচ্ছে, সুলতানের বাগদাদে যাওয়া তাঁর পক্ষে পীড়াদায়ক না হয়। হতে পারে আমি খলিফার সম্পর্কে ভুল ধারণা করে বসেছি, কিন্তু ওমরাহে সালতানাতের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই, যারা যে কোন মুহূর্তে খলিফাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে। আমার মনে হয়, এরই মধ্যে হয়ত তাতারীরা বাগদাদের কতক গণমান্য লোককে খরিদ করে ফেলেছে।'

সুরাইয়া বললেন ঃ 'কিন্তু আবদুল মালিককে তো আপনি খুব হুঁশিয়ার লোক বলেই জানেন। কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকলে তিনি নিশ্চয়ই সুলতানকে বাগদাদে যাবার পরামর্শ দিতেন না।'

তাহির বললেন ঃ 'খোদা করুন, তাদের নেক নিয়ত সম্পর্কে আবদুল মালিকের ধারণা মিথ্যা না হয়।'

সন্ধ্যাবেলায় তাহিরের প্রস্তুতির খবর পেয়ে শেখ বললেন ঃ 'শুধু তোমার জন্য আমি দিল্লীতে থেকে গিয়েছি। এখনও আমি মদীনায় চলে যাব। সেখানে আমি গিয়ে হজ্জের পর দামেশক অথবা আর কোথাও যাবার ফয়সলা করব।'

হানিফা তাহিরকে আশ্বাস দিয়ে বললেন ঃ 'বেটা! যতদিন তুমি ফিরে না আসবে, ততদিন আমরা মদীনায়ই থাকব। তোমার বাড়িও আমরা দেখে নেব।'

তাহির বললেন ঃ 'যায়েদকে আমি আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। সে আপনাদেরকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, আপনারা কিছুকাল তার মেহমান থাকতে রাজী হবেন।'

হানিফা বললেন ঃ 'সুরাইয়া পছন্দ করলে তাকে আমরা ওখানেই রেখে যাব।'

শেখ বললেন ঃ 'সুরাইয়া আমায় বলেছিল যে, সুলতান জালালউদ্দীনের ফৌজের জন্য অর্থের প্রয়োজন। বলখ, সমরকন্দ ও বোখারায় আমার বহু ক্ষতি হয়ে গেছে। তবু আমি এক লক্ষ দিনার দিচ্ছি। এ অর্থ তুমি সুলতানের কাছে পৌঁছে দেবে। সুলতান আলতামশ তাঁর সাহায্যের জন্য আমায় বলেছিলেন।'

বিদায়ের দিন সুলতান আলতামশ জালালউদ্দীনের সাহায্যের জন্য এক আশরফী ভরা সিন্দুক তাহিরের হাতে দিলেন এবং তাহিরকে মুলতানে পৌঁছে দেবার ও সিন্দুকের হেফাযতের জন্য তাঁর সাথে দিলেন একদল ঘোড়সওয়ার সিপাহী।

## কুড়ি

খারেযম শাহের চলে যাবার পথে কিরমান, ইসফাহান ও আরও কয়েকটি জায়গার ওমরাহ তাতারীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসেছেন। সুলতান জালালউদ্দীন ভবিষ্যতের জন্য আনুগত্য ও বশ্যতার ওয়াদা নিয়ে তাঁদেরকে মাফ করে দিলেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতির হুকুম দিয়ে বাগদাদের পথে রওয়ানা হলেন।

বাগদাদ থেকে ফিরে এসে আবদুল মালিক সুলতানকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাতারী হামলার বিপদ সম্ভাবনা বাগদাদের নিকটবর্তী হয়েছে দেখে খলিফা তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন এবং সুলতানের সাহায্যের জন্য ফৌজ তৈরী করছেন। খলিফার চিঠিও খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, কিন্তু তাহির তৈমুর মালিক ও সুলতানের আরও কয়েকজন সাথী পুরাপুরি আশ্বস্ত হতে পারেন নি।

তৈমুর মালিক সুলতানকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি কয়েকদিন বাগদাদের সীমান্তের বাইরে অপেক্ষা করবেন এবং কয়েকজন লোককে বাগদাদে পাঠিয়ে সেখানকার নতুন পরিস্থিতি জেনে নেবেন। খলিফা হয়ত তাঁকে দূরে রেখে সাহায্য করতে চাইবেন, কিন্তু তাঁর বাগদাদে প্রবেশ তিনি পছন্দ করবেন না।

এমনি করে যত আপত্তি উঠল, তার জবাবে সুলতান বললেন ঃ 'খলিফা দুশমনের মোকাবিলা করার জন্য ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। তিনি আমার লিপির জবাবে বলেছিলেন যে, তিনি আর সব শাসককে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখলে তাঁর সেনাবাহিনী আমাদের সাহায্যের জন্য পাঠাবেন। আর সব শাসকরা আমাদের সাহায্যের জন্য শর্ত দিয়েছেন যে, তাঁদেরকে খলিফার তরফ থেকে সাহায্যের আশ্বাস দিতে হবে। এ অবস্থায় আমার সামনে একমাত্র পথ রয়েছে বাগদাদে চলে যাওয়া। খলিফার তরফ থেকে শাম, মিসর ও মারাকেশের সুলতানদের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে তাঁদের সাহায্য চাইতে হবে। খলিফার নিয়ত সাফ না হলেও আমার বিশ্বাস, বাগদাদে তিনি আমাদের

দিয়ে হাত দেবেন না। জনমতের ভয়ে তিনি যদি এক সময়ে তাহির ও তাঁর সাথীদের উৎসাহ উদ্দীপনা উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়ে থাকেন, তা'হলে আমাদের বিরুদ্ধেও তিনি খুব বেশী হলে এই কথাই মনে করতে পারেন যে, আমাদেরকে উত্যক্ত করে বাগদাদ ছেড়ে যেতে বাধ্য করা যাবে। তার জন্য আমরা পরোয়া করি না। কিন্তু আমার মনে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, খলিফার সাথে প্রথম মোলাকাতেই আমরা তাঁর সব সন্দেহ দূর করতে পারব। আমি তাঁকে বলবো যে, আমার বাপের দোষ মাফ করতে না পারলে তিনি আমায় তার শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু মুসলমানদের তিনি যেন তাতারীদের গোলামী থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। আমায় খারেযমের সুলতান মনে না করে তিনি আমায় এমন লোক মনে করতে পারেন, যে ইসলামের ইজ্জতের জন্য তারই ঝাণ্ডাতলে এক সিপাহী হিসাবে লড়াই করে ফখর অনুভব করবে।'

তাহির বললেন ঃ 'এসব কথা সত্ত্বেও আপনি কিছুই মনে না করলে আমার মত হচ্ছে আমায়ও আবদুল মালিককে আপনি বাগদাদে পাঠিয়ে দিন। কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থা দেখে শুনে আমরা আপনার খেদমতে হাজির হব খলিফা আর তাঁর আমীর উজিররা।

আমাদের সাথে যে আচরণ করবেন, তাতেই তাদের নিয়ত বোঝা যাবে। আমরা যদি ফিরে না আসি, তাহলে বোঝা যাবে যে, আপনার পক্ষে থাকার অপরাধে আমাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আর আপনার সম্পর্কেও তাঁর ইরাদা ভাল নয়। আর যদি আমরা ফিরে আসি, তাহলে বাগদাদের সব অবস্থাই আপনি জানবেন।'

সুলতান জালালউদ্দীন তাঁর সাথে একমত হলেন। তাহির, আবদুল মালিক আর মোবারককে এজাযত দেওয়া হল বাগদাদ যেতে। তাহিরের সাথে বাগদাদ থেকে আগত রেযাকার বাহিনীর ত্রিশজন নওজোয়ানের কয়েকদিনের জন্য বাগদাদ যাবার ছুটি মিলে গেল।

●

সন্ধ্যাবেলার বাগদাদের উজিরে আজম সুফিয়াকে ডাকলেন তাঁর কামরায়। তাঁর হাতে একটা চিঠি দিতে দিতে তিনি বললেন ঃ 'বেটী! পুরো দশ বছর খলিফার খিদমত করবার পর আমার আর বিশ্বাস নেই কারুর উপর, আর এ উম্মিদও নেই যে, আমায় কেউ বিশ্বাস করবে। হয়ত আমার সব চাইতে বড় গুনাহ্, কখনও কখনও খোদার মর্জির বিরুদ্ধে আমি খলিফার ইশারায় কাজ করেছি, কিন্তু আলমে ইসলামের শোচনীয় ধ্বংস ডেকে আনবার ব্যাপারে আমি খলিফাকে সমর্থন করতে পারি না। কোন, জালালউদ্দীন খারেযম শাহ্ খলিফার সাহায্য পাবার প্রত্যাশা নিয়ে আসছেন বাগদাদের দিকে। আমার অনুরোধে খলিফা তাকে এক উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি লিখেছিলেন। আমারও বিশ্বাস ছিল, হয়ত এই কাজটিই হবে আমার অতীতের সকল ভুলের কাফফারা, কিন্তু মনে হচ্ছে, আমার ভালাই আল্লাহর মঞ্জুর নয়। আজ সেই মুনাফেক ও গাদ্দার মুহাল্লাব বিন দাউদ বাগদাদে ফিরে এসেছে তাতারীদের বিশেষ দূত হয়ে। তার সাথে এসেছে কয়েকজন তাতারী সরদার। খলিফা আগেই থেকেই তাতারীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। যেটুকু সাহস বাকী

ছিল, তাও শেষ করে দিয়েছে মুহাল্লাব। খলিফাকে তারা বুঝিয়েছে যে, যদি তিনি সুলতান জালালউদ্দীনকে ধরিয়ে তাতারীদের হাতে দিতে পারেন, তাহলে বাগদাদ বেঁচে যাবে ধ্বংসের আগুন থেকে, আর চেংগিস খানের বংশধর তাকে দেখবে ইজ্জত ও শ্রদ্ধার চোখে। খলিফাকে আশ্বস্ত করবার জন্য তাতারীদের ইনামের লোভে কোন মুফতী এরই মধ্যে ফতোয়া দিয়েছে যে, খোদাই তাতারীদের জমিনের এক বিরাট অংশের উপর হুকুমাত করবার অধিকার দিয়েছে, তাদের বিরোধিতা করলে খোদার মর্জির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হবে; আর জালালউদ্দীনের মযহাবী মতামত ঠিক নয়। তাই তাঁর সাহায্য করা হবে বাগদাদের লোকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। মনে হচ্ছে, কিছুদিন আগে থেকেই মুহাল্লাব এখানে কর্মতৎপর রয়েছে, কিন্তু আমি তার আসার খবর কেবল তখনওই পেয়েছি, যখন যে কয়েকজন তাতারী সরদারকে নিয়ে খলিফার দস্তরখানে বসবার সম্মান হাসিল করেছে।

'খলিফাকে আমি বুঝবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মুহাল্লাবের কথার যাদুতে তিনি তাতারীদের ভয় করছেন খোদার চাইতেও বেশী। আজ রাত্রে খলিফা আবার আমায় ও ফৌজের কয়েকজন কর্মচারীকে মোলাকাতের দাওয়াত দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, খলিফার মহলে আজ মুসলমানদের কিসমতের ফয়সালা হয়ে যাবে। সালতানাতের বড় বড় কর্মচারীদের মধ্যে কেউ খারেযম শাহের সাহায্য করে তাতারীদের দুশমনি খরিদ করতে রাজী নয়, কিন্তু আমি আমার শেষ কর্তব্য পালন করব। আজ কাসিম যদি আমার কাছে থাকত! কিন্তু সে আজ বহু দূরে। আমি আজ তোমায় এক বড় কর্তব্য সঁপে যাচ্ছি। তুমি জানো, খলিফাকে নারাজ করে খুব কম লোকই তাঁর মহল থেকে জিন্দাহ ঘরে ফিরতে পেরেছে। হয়ত আমারও পরিণাম তার চাইতে আলাদা হবে না। মধ্যরাত্রের মধ্যে আমি ঘরে ফিরে না এলে, তুমি সাঈদকে ডেকে এই চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে তাকে নির্দেশ দেবে যে, যথাসম্ভব শীগ্‌গির সে ছুটে গিয়ে চিঠিখানা জালালউদ্দীনের হাতে পৌঁছে দেবে যে, কেননা খলিফা যদি জালালউদ্দীনকে গ্রেফতার করাবার ফয়সালা করেন, তাহলে আমার বিশ্বাস, আজ রাতেই তিনি ফৌজ পাঠাবেন এবং রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে আমায় ঘরে ফিরবার এজাযত দেওয়া হবে না। আমি সাঈদকে সব বুঝিয়ে বলেছি। সে তাহিরের পুরানো সাথী কতিপয় নওজোয়ানকে সাথে নিয়ে আস্তাবলের কাছে আমার হুকুমের ইন্তেজার করবে। তাকে কোন কর্তব্য নিয়ে যেতে হবে, তা আমি এখনও বলিনি। প্রয়োজন না হলে এমনি জরুরি লিপি আমি তার হাতে দিতে চাই না। সম্ভবতঃ খলিফা আমার কথা মানবেন এবং জালালউদ্দীনকে এ চিঠি পাঠাবারই প্রয়োজন হবে না। অবশ্যি মধ্যরাত্র পর্যন্ত যদি আমি ফিরে না আসি, তাহলে বাগদাদের উজিরে আজমের জিন্দেগীর এক শেষ কর্তব্য পালন করবে তাঁর ভাতিজী। সাঈদ ও তাহিরের আর সব সাথী আমার চাইতে তোমায়ই বিশ্বাস করবে বেশী।'

সুফিয়া বললেন ঃ 'আপনি বিশ্বাস করুন, আমার তরফ থেকে কোন ত্রুটি হবে না।'

উজিরে আযম হেসে বললেন ঃ 'আমি তোমার উপর ভরসা করি। আজ কাসিম এখানে থাকলেও হয়ত কাজের জন্য আমার দৃষ্টি তোমারই উপর পড়তো।'

উজিরে আযম শাহী মহলের দিকে চললেন।

●

এশার নামাযের কিছুক্ষণ পর উজিরে আজমের মহলে রোজ কিয়ামতের কোলাহল উঠল। মহলের তামাম নওকর তাঁর বিছানার পাশে জমা হয়ে গেছে। তাঁর সিনা ও পাঁজরের জখম থেকে অবিরাম ঝরছে রক্তধারা।

উজিরে আজমের হুঁশ হলে তিনি চোখ খুললেন এবং ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : 'আমি এখানে কি করে পৌঁছলাম?'

এক নওকর জবাব দিল : 'আপনি দরজার কাছে এসে পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা আপনাকে তুলে এনেছি।'

: 'আমার সাথে যে নওকর ছিল, তারা কোথায়?

এক নওকর সামনে এগিয়ে এসে বলল : 'আমার মামুলী যখম হয়েছে, আর হামিদ কতল হয়ে গেছে।'

: 'তুমি লোকগুলোকে চিনতে পেরেছ?'

: 'জি, আমি মুহাল্লাবকে চিনেছি। আপনি যখন খলিফার মহল থেকে বাইরে এলেন, তখনও সে আপনার সাথে ছিল। আমরা দু'জন সিড়ির নিচে কয়েক কদম দূরে আপনার ইন্তেজার করছিলাম। আপনি যখন নীচে নেমে আসছিলেন, তখনও চারজন নেকাব পোশ লোক গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে আপনার উপর হামলা করল।

'আপনি মোড় ফিরে দরজার দিকে ছুটলেন, কিন্তু মুহাল্লাব আপনার পথ রোধ করে খঞ্জর নিয়ে দু'তিনবার আঘাত করল। তারপর সে নিজেই সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করে দিল। হামিদ ছিল আমার আগে। সে মুহাল্লাবের উপর হামলা করল, কিন্তু মুহাল্লাব একদিকে সরে গিয়ে বাঁচল। আর হামিদ এক নেকাব পোশের তলোয়ারের আঘাত ঘায়েল হয়ে পড়ে গেল যমিনের উপর। আমি এগিয়ে গিয়ে এক নেকাব পোশকে মেরে ফেললাম। বাকী তিনজন আমার উপর হামলা চালাল। আরও একজন মারা পড়ল আমার হাতে। এরই মধ্যে খলিফার সিপাহীরা বাইরে বেরিয়ে এল এবং মুহাল্লাব জলদী করে সিড়ির উপর উঠে বলল : 'সিপাহী আসছে। ভাগো।' তারা পালালে আমি আপনার দিকে মনোযোগ দিলাম। আপনি ওখান থেকে মহলের দিকে আসছিলেন। আমি ছুটে এসে আপনার কাছে পৌঁছলাম। তারপর কয়েক কদম আপনার সাথে চলার পর আমার খেয়াল হল, ওরা হয়ত আপনার অনুসরণ করছে। তাই আমি থেমে গেলাম। যখন আমি আশ্বস্ত হলাম যে, আপনি মহলের কাছাকাছি এসে গেছেন তখনও আমিও চলে এলাম।'

উজিরে আজম বললেন : 'সাঈদ কোথায়?'

সাঈদ নওকরদের ভিড় ঠেলে উজিরে আজমের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। উজিরে আজম তাঁর বিবি, সুফিয়া, সকিনা আর সাঈদ ছাড়া আর সবাইকে কামরার বাইরে যেতে বললেন।

কামরা খালি হলে তিনি সাঈদকে বলছেন : 'তোমার যিম্মায় যে কাজ রয়েছে, সুফিয়া তা তোমায় বলে দেবে। তোমার সাথীরা তৈরী?'

: 'জি হ্যাঁ।'

উজিরে আজম তাঁর বিবিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ' আমি চলে গেলে তোমাদের বাগদাদ থেকে মিসরে চলে যাওয়াই ভাল হবে। আমি এখনও ক্ষণিকের মেহমান।'

সুফিয়া বললেন ঃ 'চাচা, একটা কথা আমি এখনও আপনাকে বলিনি। তাহির জিন্দাহ্ রয়েছেন, আর আপনার প্রতিশোধ আর কেউ না নিলেও তিনি নেবেন নিশ্চয়ই।'

ঃ 'বেটী, সত্যি বলছো? আমার দীলের উপর এ এক বড় বোঝা চেপে রয়েছে।'

ঃ 'হ্যাঁ, একথা সত্যি। তাকে মোর্দা মনে করে দরিয়ায় ফেলে দিয়েছিল ওরা। সাঈদেরও জানা আছে তা।'

উজিরে আজম কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন সাঈদের দিকে। সাঈদ বলল ঃ 'জি হ্যাঁ, তিনি জিন্দাহ্ রয়েছেন।'

উজিরে আজম সুফিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'সুফিয়া বেটী! আমি যাবার আগেই খলিফা তিন হাজার সিপাহী পাঠিয়েছেন সুলতানকে গ্রেফতার করবার জন্য। এবার তোমায় পালন করতে হবে নিজের কর্তব্য। ওরা...আজ রাত্রে বহুত দূর চলে গেছে। ....সকিনা! তোমার সাথে কথা বলবার ফুরসত আমি পাইনি কোন দিন। ....আজ এসে বস আমার কাছে....।'

সকিনা অশ্রুভরা চোখে পিতার কাছে এসে বসলেন। উজিরে আজম খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। তিনি বেদনায় কাতরাতে লাগলেন। তারপর আবার চোখ খুলে তিনি ইশারায় পানি চাইলেন। সাঈদ তাঁর গর্দান হাতের সাহায্যে তুলে ধরলো উপরে, আর পানির পেয়ালা লাগিয়ে দিল তাঁর ঠোঁটে।

এক ঢোক পানি গিলেই তিনি চোখ বুঝে শুয়ে পড়লেন। সকিনা বললেন ঃ 'আব্বা মুর্ছা গেছেন।'

সাঈদ জলদী করে তাঁর মুখ খুলে ধরে সুফিয়াকে পানি দিতে বলল। সুফিয়া তাঁর মুখে পানি দিলে তা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। উজিরে আজম আর একবার চোখ খুলে কয়েকবার শ্বাস টেনে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকিনা আর তাঁর মা যখন উজিরে আজমে লাশের উপর পড়ে আর্তস্বরে কাঁদছেন, তখনও সুফিয়া অশ্রুভরা চোখে বেরিয়ে গেলেন। তার পিছন বেরুলো সাঈদ।

' আমি আপনার হুকুমের ইন্তেজার করছি।' সে বলল।

সুফিয়া জবাব দিলেন ঃ 'দাঁড়াও। আমি এখখুনি আসছি।'

খানিকক্ষণ পরেই সুফিয়া বেরিয়ে এলেন তাঁর কামরা থেকে। তিনি তখনও সওয়ারের লেবাস পরে আছেন। তাঁর কোমরে ঝুলানো রয়েছে এক তলোয়ার। এক বাঁদীর হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়ে তিনি বললেন ঃ 'ভোর হলে এটা সকিনাকে দিও।'

সাঈদ হয়রান হয়ে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো। সুফিয়া বললেন ঃ 'চলো, সাঈদ!'

ঃ 'কিন্তু আপনি আমাদের সাথে যাবেন?'

ঃ 'হ্যাঁ, আমি তোমাদের সাথে যাব। চাচা বলছিলেন, এ তাঁর জীবনের শেষ ও সব চাইতে জরুরি কর্তব্য। আমি তা পালন করব।'

ঃ 'কিন্তু আমার উপর বিশ্বাস থাকা উচিত আপনার।'

ঃ 'তোমার উপর বিশ্বাস আছে আমার, কিন্তু আমার ভয় হয়, ওঁরা যদি তোমার কাছ

থেকে খবর পেয়ে আমল না দেন। তাছাড়া মুহাল্লাব আমায় বেশ ভাল করে জানে। এখান থেকে আমি এ ঘরের দুর্ভাগ্যের বোঝা আর বাড়াতে চাই না।'

●

সবে মাত্র সূর্য উঠেছে। তাহির আর তাঁর সাথীরা এক পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করে চলেছেন। এক প্রশস্ত উপত্যকায় ঢুকেই তাঁরা দেখলেন, সামনের এক পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসা পায়ে চলা পথ বেয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে আটদশজন সওয়ার। আর তাদের পিছনে আসছে পঞ্চাশের কাছাকাছি সংখ্যক সওয়ারের একটি দল। তাহির ভাল করে তাকিয়ে দেখে আবদুল মালিকের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'মনে হচ্ছে ওরা পলাতকের অনুসরণ করছে। আমাদের সাহায্য করা উচিত।'

আবুদল মালিক বললেন ঃ 'ওরা পেছন থেকে তীরও চালাচ্ছেন। ওই দেখুন, একটি লোক যখম হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওরা দু'দলে ভাগ হয়ে এদেরকে ঘিরে ফেলছে। ওরা আট দশজন শুধু জান নিয়ে পালাতে চাচ্ছে। ওরা লড়তে চায় না। চলুন, আমরা ওদের সাহায্য করি।'

তাহির সাথীদের তাকিয়ে উঁচু গলায় বললেন ঃ 'জলদী, ওরা ওদের ঘেরার মধ্যে এসে গেল বলে।'

দেখতে দেখতে তাহির আর তাঁর সাথীরা পাহাড় থেকে নীচে উপত্যকায় নেমে এলেন। তাহির বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ ' আবদুল মালিক! ওই দেখ, সবার আগে একটি নারী। তুমি বাম দিক দিয়ে সওয়ারদের গতি রোধ কর। আমি ডান দিকে যাচ্ছি। ওরা দু'দিক দিয়েই ওদের তীরের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। ওদের জন্য পায়ে চলার পথ ছেড়ে দাও। ওরা যদি মনে করে আমাদেরকে অনুসরণকারী সওয়ারদের সাথী মনে করে এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে ওরা মরা পড়বে।'

তাহিরের সাথীরা দুই অংশে ভাগ হয়ে অনুসরণকারী সওয়ারদের পথ রোধ করলেন এবং পলাতক সওয়াররা তাঁদেরকে তাদের সাহায্যকারী মনে করে কিছুদূরে গিয়ে থেমে গেলে। তাহির এগিয়ে গিয়ে বুলন্দ আওয়াজে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ' কেন তোমরা এ লোকগুলোর পিছু ধাওয়া করছ?'

তাঁর জবাবে অনুসরণকারী দলের ভিতর থেকে লৌহ আবরণে মাথা ও মুখ ঢেকে একটি লোক এগিয়ে এল। তাকে দেখে মনে হল বাগদাদের কোন ফৌজী অফিসার। সে বলল ঃ 'এরা খারেযম শাহের চর। তোমরা আমাদের পথ রোধ কর না।'

ঃ 'তোমরা মনে হচ্ছে খলিফার সিপাহী। তুমি হয়ত জানো না, খলিফা আর খারেযম শাহের মধ্যে এক মৈত্রী চুক্তি হয়ে গেছে।'

ঃ 'সে খবর আমরা ভাল করেই জানি। তোমরা আমাদের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও। নইলে আমরা তোমাদেরকে সরে যেতে বাধ্য করব।'

ঃ 'না, যতক্ষণ আমরা না জানবো, ওদের অপরাধ কি, ততক্ষণ আমরা ওদের হেফাজত করব।'

ঃ 'আমাদের সন্দেহ হচ্ছে' ওরা খারেযম শাহের কাছে যাচ্ছে।'

ঃ 'নিছক সন্দেহ বশে তোমরা মানুষকে কতল করতে পারবে না। আর খারেযম শাহের কাছে যাওয়াই কোন অপরাধ নয়।'

ঃ 'তাহলে মোকাবিলা করবার জন্য তৈরী হও।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'মুসলমানের জান বহুত দামী। তোমাদের ফিরে যাওয়াই হবে ভাল। গুণতিতে তোমারা আমাদের চাইতে পনেরো বিশজন বেশী রয়েছ। কিন্তু আমার সাথে যে সিপাহীরা রয়েছে, তারা বহু ময়দানে তাদের শক্তি পরীক্ষা দিয়েছে। আমরা তোমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি, আমরা খলিফার দুশমন নই। তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি ওদের কাছে একটি লোক পাঠাচ্ছি। যদি ওরা আমায় আশ্বস্ত করতে না পারে, তাহলে আমি নিজে ওদেরকে ধরে বাগদাদে নিয়ে যাব।' তাহির ইশারা করে আবদুল মালিককে কাছে ডেকে বললেন ঃ 'তুমি ওখানে গিয়ে জেনে এস, ওরা কারা?'

ফৌজী অফিসার বলল ঃ 'কিন্তু তুমি কে?'

তাহির জবাব দিলেন ঃ ' ঘাবড়িয়ো না। আমি মুসলমান, তাতারী নই।

ঃ 'তোমরা তাতারী হলে আমাদের পথ কখনও রোধ করতে না।'

ঃ 'ভয়ে, না বন্ধুত্বের খাতিরে?'

অফিসার খানিকটা ইতস্ততঃ করে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে বললেন ঃ 'তোমার বলার ভঙ্গী ও আওয়াজ ঠিক আমারই পরিচিত একটি লোকের মত। সেও ঠিক তোমারই মত প্রত্যেক ব্যাপারে অমনি আপত্তি তুলতো।'

ঃ 'হয়ত আমার চেহারাটাও তারই মত, আর এও হতে পারে যে, আমিই সেই লোকটি।'

ঃ 'সে মরে গেছে।'

ঃ 'কখনও কখনও মোর্দাও জিন্দাহ্ হয়ে যায়।'

ঃ 'তুমি বিলকুল তাহির বিন ইউসুফের মত কথা বলছো।'

ঃ 'তাহির বিন ইউসুফ মরে গেছে, আর তারই এক দোস্ত তার পিছু ধাওয়া করতে করতে আরেক দুনিয়ার সীমানায় পা দিয়েছে। তোমারই আওয়াজ আর বলার ভঙ্গী এমন একটি লোকের সাথে মেলে, যে উচ্চ পদের লোভে তার দোস্তদের ধরে দেবার ওয়াদা করেছিল।'

ঃ 'তুমি কে?'

ঃ 'যদি দোস্তকে ভুলে যাবার অভ্যাস না থাকে, তাহলে হয়ত আমায় চিনতে পারবে।'

তাহির এই কথা বলে তাঁর লৌহ শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললেন।'

ঃ 'তাহির!........তুমি'

ঃ 'হ্যাঁ, আফজল, তমি তোমার সুরত একবার দেখাবে না?'

ঃ 'তুমি এখনও জিন্দাহ্ রয়েছো?'

ঃ 'এখনও তোমার সন্দেহ থাকলে জলদী এগিয়ে এস।'

ঃ 'কিন্তু তোমায় তো....।'

ঃ 'হ্যাঁ, আমায় যহর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সব যহরই মানুষকে মারতে পারে না।'

ঃ 'তাহির খোদা সাক্ষী, আমি সে চক্রান্তে শরীক ছিলাম না। আর তোমায় ধরিয়ে

দেবার জন্যও আমি কোন ষড়যন্ত্র করিনি।'

তাহির মাথার উপর শিরস্ত্রাণ রাখতে রাখতে বললেন ঃ 'তুমি আমায় ধরিয়ে দেবার মওকাই পেলে না, তার জন্য আমার আফসোস হচ্ছে। আমি জানতে পারি, এখনও তুমি কোন নিয়ত নিয়ে এখানে এসেছ? যাদের অনুসরণ করছ তোমরা, তারাই বা কারা?'

ঃ ' তা আমি তোমায় বলতে পারবো না। আমি শুধু বলছি, তোমরা আমার পথ রোধ করে সিপাহ্সালারের হুকুমের বিরোধিতা করছ।'

ঃ 'সিপাহ্সালার! তিনি কোথায়?'

ঃ 'আমি তা বলতে পারব না।'

ঃ 'তাহলে ফিরে যাওয়াই তোমার জন্য ভাল হবে।'

ঃ 'তুমি তো জানো, আমি বুজদীল নই।'

ঃ 'যতদিন তুমি গাদ্দার ছিলে না, ততদিন আমারও মত ছিল তা-ই। কিন্তু গাদ্দারী আর বাহাদুরী একই ব্যক্তির মধ্যে জমা হতে পারে না।'

ঃ 'ওদের পিছু ধাওয়া করার হুকুমই ছিল আমার উপর। পথচারীর উপর তলোয়ার উঠবার এজাযত থাকলে তুমি আমায় বুজদীল বলে বিদ্রূপ করতে পারতে না।'

ঃ 'তুমি যখন জানো যে, আমাদের লাশের উপর দিয়ে ছাড়া ওদের পিছু ধাওয়া করবার জন্য এক পা এগুতে পারবে না, তখনও কেন ফিরে যাচ্ছো না?'

আফজল কোন জওয়াব দিল না। সে ইতস্ততঃ করে সাথীদের দিকে তাকালো। ইতিমধ্যে আবদুল মালিক ঘোড়া হাকিয়ে তাহিরের কাছে এসে নেযাহ্ নিয়ে আফযলের উপর হামলা করবার জন্য তৈরী হলেন।

তাহির বললেন ঃ 'আবদুল মালিক! লড়াই করবার প্রয়োজন নেই। এই আমাদের দোস্ত আফজল। ও হয়ত এতক্ষণে ফিরে যাবার ফয়সালা করে ফেলেছে।

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'ওকে কোন ফয়সালা করতে হবে না। তৈরী হও, আফজল।

'না, না, আবদুল মালিক, থামো।' ঃ তাহির চীৎকার করে উঠলেন। কিন্তু আবদুল মালিক তাঁর কথায় কান না দিয়ে ঘোড়া হাকিয়ে আফজলের উপর হামলা করলেন। আফজল বাঁচবার চেষ্টা করল, কিন্তু আবদুল মালিকের নেযাহ্ তার সিনা প্রায় পার হয়ে চলে গেলে।

উভয় পক্ষের মধ্যে একটা স্তব্ধতা ছেয়ে গেল। আবদুল মালিক ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বুলন্দ আওয়াজে আফজলের সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে আর কে আছে খলিফার নিমকহালাল? এই উষর জমিন চায় মুনাফেক, বুজদীল আর গাদ্দারের রক্ত। আমার দিকে তাকাও, আমি আবদুল মালিক। হয়ত তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমায় চেন।' তারপর তিনি এক মুহূর্তের জন্য লৌহ শিরস্ত্রাণ খুলে আবার মাথার উপর রাখতে রাখতে বললেন ঃ 'আহা! যদি তোমরা বাঁচতে আর মরতে জানতে। কমজোরের সামনে তোমরা শের হয়ে দেখা দাও, আর শক্তিমানের সামনে শৃগালের রূপ ধরো। নারীর উপর তোমরা তীর বর্ষণ কর, কিন্তু পুরুষদের সামনে তোমাদের হাত কাঁপে। যাও, ফিরে গিয়ে সিপাহসালারকে বল, যে জঙ্গলে সে শিকার খেলতে এসেছে, সেখানে খরগোশ থাকে না, থাকে চিতা। খারেযম শাহের সাথে রয়েছে

কয়েকটা মাত্র লোক, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হাজার লোকের সাথে লড়াই করতে জানে। যাও, আমাদের তলোয়ার তোমাদের রক্তে রঞ্জিত করাকে লজ্জাকর না মনে করলে হয়ত তোমাদের পালাবার মওকা মিলত না।'

আফযলের সাথীরা একে একে সরে পড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরেই ময়দান খালি হয়ে গেল।

আবদুল মালিক তাহিরের কাছে এলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে এক অদ্ভুত হিংস্রতা। তিনি বললেন ঃ 'জলদী করে চলুন। সুফিয়া আপনার জন্য ইন্তেজার করছেন।'

ঃ 'সুফিয়া?'

ঃ 'চলুন, তিনি যখম হয়েছেন।'

তাহির আর কোন প্রশ্ন না করে দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাকালেন।

পাহাড়ের উপর গিয়ে যখন ঘোড়ার গতি শিথিল হয়ে এল, তখনও তিনি আবদুল মালিককে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তিনি কোথায়?'

ঃ 'আমি তাকে এই পাহাড়ের পিছনে নদীর কিনারে রেখে এসেছি।'

ঃ 'যখম খুব সাংঘাতিক নয়তো?'

ঃ 'দু'টো তীর তাঁর গায়ে লেগেছে। একটা যখম মামুলী, কিন্তু দ্বিতীয় তীরটি ভীষণভাবে তাঁর পাঁজরে লেগেছে। তীর আমি বের করে দিয়েছি, কিন্তু.......।'

ঃ 'কিন্তু কি?'

ঃ 'খোদা ভাল করুন।;'

সুফিয়া পাথরে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। সাঈদ তাঁকে পানি দিচ্ছিল। তাহিরকে দেখেই তিনি নিজের অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাহির ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। সুফিয়া কয়েক কদম এগিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। তিনি কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাহির এগিয়ে গিয়ে দু'বাহু বাড়িয়ে তাঁকে ধরে জমিনের উপর শুইয়ে দিলেন।

'সুফিয়া! তুমি এখানে কেন এলে?' ঃ তাহির দরদ-ভরা কণ্ঠে বললেন।

সুফিয়া মুখের উপর একটা বিষণ্ন হাসি টেনে এনে বললেন ঃ 'এখনও এসব কথার সময় নেই। দেখুন, এ নদী কত ছোট, কিন্তু কত স্বচ্ছ এর পানি! দরিয়ায়ে দজলা বহুত বড়, কিন্তু তার ময়লা পানি আমায় বিরক্ত করে তুলেছিল। আপনাদের গাঁয়ের বাগিচায় হয়ত বয়ে যাচ্ছে ঠিক এমনি নদী-ঠান্ডা, মিঠা আর স্বচ্ছ পানিতে ভরা নদী। তারই সন্ধানে আমি এসেছি এখানে।'

তাহিরের কয়েকজন সাথী তাঁদের কাছে এল, কিন্তু আবদুল মালিক তাদেরকে নিয়ে এক পাশে সরে গেলেন।

সুফিয়া বললেন ঃ 'আপনি বিষণ্ন কেন? আমার দিকে তাকান। আমি কত খুশী। হ্যাঁ, এই নদীর কথা আমি বলছিলাম। যদি আমি মরে যাই, এই নদীর কিনারেই রেখে যাবেন আমায়।'

ঃ 'না, না, সুফিয়া! তুমি ভাল হয়ে যাবে। তোমার যখম মামুলী। তোমায় আমি নিয়ে যাব সেই বাগিচায়, যেখানে বয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা, মিঠা আর স্বচ্ছ পানির নদী। কোন বিপদের তুফান আমাদেরকে আলাদা করবে না।'

সুফিয়া বললেন ঃ 'আর রোজ ভোরে আমরা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাব মরুর পথে।'

ঃ 'হ্যাঁ, সুফিয়া! আমি ওয়াদা করছি।'

ঃ 'আপনার সাথে আমি নেযাবাযি আর তীরন্দাযির অভ্যাস করব। বাগিচার ফুলের সন্ধান করব আমরা। আপনি যখন লড়াই করতে যাবেন, তখনও আমি বালুর টিলার উপর চড়ে আপনার পথ চেয়ে থাকব।'

ঃ 'হ্যাঁ, সুফিয়া!'

সুফিয়ার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ

'এখনও আমার মওতের জন্য দুঃখ নেই। আপনি আমার! আপনি আমার!!' তিনি চোখ বন্ধ করলেন।

'সুফিয়া! সুফিয়া!!' ঃ অশ্রুসজল চোখে তাহির বললেন

সুফিয়া চোখ খুললেন, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। তাহির আবদুল মালিকে আওয়াজ দিলে তিনি ছু'টে এলেন। তাহির বললেন ঃ 'উনি মূর্ছা গেছেন। পানি লও।'

কয়েক ঢোক পানি গিলে সুফিয়া যেন কিছুটা সজীব হয়ে উঠলেন। ক্ষীণ অস্পষ্ট আওয়াযে তিনি বললেন ঃ 'আমি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেই বাগিচার....রয়েছে স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা....আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম....আর আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন কোথাও....কোথাও......বহুত......বহুত দূর।' তিনি আবার চোখ বুজলেন। তাঁর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ছিল একটা নীল রঙের আভা। তিনি ধীরে বললেন ঃ আপনি দেরী করবেন না। ফৌজ এখান থেকে...এক মনযিল.....দূর.....!'

আবদুল মালিক হাত দিয়ে তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করে তাহিরের দিকে তাকালেন তারপর 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন' বলে মাথা নত করলেন। তাহির দুনিয়া তার ভিতরকার সব কিছু সম্পর্কে বেখবর হয়ে তাকিয়ে রইলেন এই প্রেম ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তির দিকে। আবদুল মালিক সুফিয়ার মুখ তাঁর নিজের রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর তাহিরের বাযু ধরে বললেন ঃ 'তাহির! উঠে এস। উদ্যম-উৎসাহ হারিয়ো না, দোস্ত!'

তাহির উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আবদুল মালিকের দিকে। তাঁর চোখে ফুটে উঠছে এক ভীষণ হিংস্রতা। আবদুল মালিক অশ্রু-ভেজা চোখে তাঁর দিকে হাত বাড়ালেন। তাহির বে-এখতিয়ার তাঁর বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'তাহির! দুনিয়ায় হয়ত ওঁর যোগ্য এমন কেউ ছিল না, যার জন্য উনি জিন্দাহ্ থাকবেন।'

খানিকক্ষণ পর তাহিরের সাথীরা নদীর কিনারে পাথর স্তূপের তলায় সুফিয়ার লাশ দাফন করলেন। তাহির কতকগুলো বুনো ফুল তুলে এনে ছড়িয়ে দিলেন সুফিয়ার কবরের উপর।

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'চল, তাহির! দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

তাহির ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সাঈদকে বললেন ঃ 'সিপাহ্সালার কত ফৌজ নিয়ে আসছেন।'

ঃ 'বিশ হাজার সিপাহী নিয়ে?'

তাহির আবদুল মালিককে বললেন ঃ 'উজিরে আজমের চিঠি আমায় দাও।'

তাহির চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে বললেন ঃ 'তা' হলে মুহাল্লাব ওখানে এসে গেছে। এবার বাগদাদের খোদা হাফিজ!'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে সুলতান আমাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে বাগদাদের দিকে না গিয়ে থাকলেই ভাল হয়। আমাদের জলদী করে তাঁর কাছে যাওয়া দরকার।'

'চলো।' ঃ বলে তাহির ঘোড়া হাকালেন।

পথে সাঈদের কাছে প্রশ্ন করে জানলেন, তারা আসার পথে সিপাহসালার ফৌজকে এড়িয়ে পাশ কাটিয়ে এসেছে, কিন্তু অগ্রবর্তী একটি দল তাদেরকে এক পাহাড়ের উপর দিয়ে আসতে দেখে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল।

সুলতান জালালউদ্দীন খারেযম শাহের সাথে ছিল প্রায় আড়াই হাজার যোদ্ধা। বাগদাদ থেকে কশতমোরের নেতৃত্বে বিশ হাজার সিপাহীরা আসার খবর পেয়ে তিনি দু'হাজার সিপাহীকে নানান জায়গায় গোপন ঘাঁটিতে মোতায়েন করলেন আর বাকী পাঁচশ সিপাহী নিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক পাহাড়ের উপর খলিফার সেনাবাহিনীর ইনতেযার করতে লাগলেন। এর মধ্যে তিনি খবর পেলেন যে, খলিফার আর এক সালার মুযাফফরউদ্দীন এগিয়ে আসছেন দশ হাজার সিপাহী নিয়ে উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলবার জন্য।

উজিরে আজমের লিপি পড়ে এবং তাহির, আবদুল মালিক ও সাঈদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করে জালালউদ্দীন ঠিকই বুঝলেন যে, খলিফার সিপাহীরা যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তাঁকে গ্রেফতার করবার চেষ্টা করবে। যদি তিনি এখান থেকে বেঁচেও যান, তবু তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পিছু ধাওয়া করবে, যতক্ষণ না তিনি তাতারীদের হাতে গিয়ে পড়েন। কাশতমোরের ফৌজ দেখা দিলে সুলতান তাহিরের হাতে এক শান্তি ঝান্ডা দিয়ে তাঁকে শান্তির আলোচনার জন্য পাঠালেন।

তাহির কাশতমোরের সামনে সুলতানের তরফ থেকে আবেদন জানালেন, তাঁদের বাগদাদ যাবার পথ যেন রোধ করা না হয়। সুলতানের বিশ্বাস, তিনি খলিফার খেদমতে হাযির হলে তাঁদের মধ্যে ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে। তা' না হলে তাঁকে এখান থেকে খলিফার সাথে চিঠির আদান প্রদান করবার মওকা দেওয়া হোক। আর এর কোন প্রস্তাব কবুল করার মত না হলে সুলতান এই শর্তে ফিরে যেতে রাজী আছেন যে, তাঁর পিছু ধাওয়া করা হবে না।

কাশতমোর সুলতান জালালউদ্দীনের সাথে মাত্র পাঁচশ সিপাহী দেখে তাঁদের উপর শক্তি দেখবার সংকল্প করলেন। তিনি উপেক্ষাভাবে জওয়াব দিলেন ঃ 'আমাদের প্রথম ও শেষ ফয়সালা হচ্ছে ঃ সুলতান আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, নইলে আমাদের মোকাবিলা করবেন।'

তাহির তাঁকে যথাসম্ভব বুঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কাশতমোর কোন কথায় কান দিতে রাজি নন। তিনি তাঁর বাকী সালারদের কাছে আবেদন করলেন, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। তাহির হতাশ হয়ে বললেন ঃ 'আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি দোস্তি আর মুহাব্বতের ফুল, কিন্তু তোমরা চাও দুশমনির কাঁটা। আমি শান্তির দূত হয়ে

এসেছি, কিন্তু তোমরা চাও যুদ্ধ। আমি ওয়াদা করছি, তোমাদের আশা পূর্ণ হবে। আফসোস, সর্বহারা হয়েও মুসলমান ফখর করতে পারতো যে, দুনিয়ায় তাদের মত মেহমান নেওয়ায় কেউ নেই, কিন্তু আজ বাগদাদের বাসিন্দারা সে সুনাম থেকেও বঞ্চিত হল। জালালউদ্দীন লড়াইকে ভয় করেন না। কিন্তু যে তলোয়ার বারংবার তাতারীদের খুনে রঞ্জিত হয়েছে, তা আজ মুসলমানদের তলোয়ারের মোকাবিলা করতে লজ্জা বোধ করবে নিশ্চয়ই। এ লড়াইয়ের ফল কি হবে, খোদাই জানেন। কিন্তু তোমরা সাক্ষী থাকলে যে, আমরা এর জন্য তৈরী ছিলাম না। এটা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

কাশতমোর বললেন ঃ 'যাও, এ লড়াইয়ের ফল আমাদের জানা আছে, খানিকক্ষণ পর তোমরাও জানতে পারবে।'

তাহির ঘোড়ার বাগ সামলে নিয়ে বললেন ঃ 'আমি শুধু একটি কথাই জানি। তা' হচ্ছেঃ খারেযমের মত বাগদাদেরও সৌভাগ্যের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের মধ্যে একের বিজয় হবে উভয়েরই পরাজয়।

তাহির ঘোড়া হাকিয়ে দেখতে দেখতে সুলতানের কাছে চলে গেলেন।

মেহমান নেওয়াজী সম্পর্কে তাহিরের কঠোর বাক্য কাশতমোরের ফৌজের সিপাহীদের কাছে ছিল অসহনীয়। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ফয়সালা করল, লড়াইয়ে তাদের হিস্‌সা নেবে না। কোন কোন ইরানী ও তুর্ক সরদারও কেমন দ্বিধায় পড়ে গেলেন। কাশতমোর প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্ভাবনা দেখে শীগ্‌গিরই হামলা করবার হুকুম দিলেন।

জালালউদ্দীন তাঁর পিছনে লুকিয়ে থাকা ফৌজকে নির্দেশ পাঠিয়ে কাশতমোরের ফৌজের মোকাবিলা করলেন। বাগদাদের ফৌজের মধ্যস্থলেও দু'ইটি কয়েকবার হামলা করে তাঁরা পিছু হটতে শুরু করলেন। তাঁরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন মনে করে কাশতমোর তাঁদেরকে অনুসরণ করলেন। সুলতান থেমে থেকে লড়াই করে কাশতমোরের বেশীর ভাগ ফৌজকে নিয়ে গেলেন সেই দুর্গম পাহাড়ের মাঝখানে। সেখানে তাঁর তীরন্দাযরা তৈরী হয়েছিল গোপন ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। সামনে-পিছনে, ডানে-বামে সব দিক থেকে যখন পাথর আর তীর বৃষ্টি হতে লাগল, তখনও কাশতমোরের চৈতন্য হল যে, সুলতানের সৈন্য সংখ্যা আন্দাজ করতে গিয়ে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দেননি। সংকীর্ণ পাহাড়ী পথে তিনি তাঁর ফৌজের অর্ধেকের বেশী সিপাহীর লাশ ফেলে পিছন দিকে ফিরলেন। ফেরার পথে প্রায় তিন ক্রোশ পথ প্রত্যেকটি টিলা থেকে তীর ও পাথর বৃষ্টির মাঝখান দিয়ে চলবার পর তাঁর পিছনে ফিরে দেখবারও সাহস অবশিষ্ট রইল না।

কয়েক ক্রোশ কাকতমারের পিছু ধাওয়া করে সুলতান ফিরে চলে এলেন। পথের মধ্যে মুজাফফরউদ্দীনের দশ হাজার সিপাহীর সাথে তাঁর দেখা হল। কাশতমোরের পরাজয়ের পর মুজাফফরউদ্দীনের ফৌজ সাহস হারিয়ে ফেলেছে। মামুলী লড়াইয়ের পরই তারা হাতিয়ার সমর্পণ করল।

এই বিজয়ের পর দলে দলে রেযাকার এসে দাখিল হতে লাগল সুলতানের ফৌজে। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর সিপাহীদের সংখ্যা হল বিশ হাজার। তাবরিযের হাকীম ছিলেন

তাতারীদের বন্ধু। সুলতান তাঁর গাদ্দারীর শাস্তি দেবার জন্য তাবরিযের দিকে এগিয়ে গেলেন। হাকীম তাতারীদের সাহায্যের জন্য ইনতেযার না করে পালিয়ে গেলেন। সুলতান তাঁর শহর দখল করে নিলেন। তাবরিয দখলের পর সুলতান জয় করে নিলেন আশেপাশের আরও কয়েকটা এলাকা। এরই মধ্যে বাগদাদের খলিফা আন্-নাসিরুদ্দীনিল্লার ওফাত ও তাঁর পুত্র জাহিরের মসনদ নশিনীর খবর তাঁর কাছে পৌছল।

## একুশ

নাসিরের ওফাতের খবর পেয়েই সুলতান তাহির ও আবদুল মালিককে ডেকে খলিফা জাহির সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তাহির সুলতানের প্রশ্নের জবাবে বললেন ঃ 'জাহিরের সাথে আমার মাত্র কয়েকবার দেখা হয়েছে। আমার মনে হয়, তিনি একজন কমজোর লোক, কিন্তু অসৎ-প্রকৃতি নন। তিনি তাঁর পিতার মত তাতারীদের দোস্ত মনে করেন না।'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'আমি তাঁকে বহুকাল ধরে জানি। আমার বিশ্বাস, তিনি আলমে ইসলামের ঐক্য চেষ্টা সমর্থন করেন। যতটা মনে হয়, তিনি তাঁর বাপের উলটো। কিন্তু নিজের ধারণাকে বাস্তব রূপ দেবার মত লোক তিনি নন। তবু বাগদাদে সঠিক পথ দেখাবার মত কোন লোক থাকলে তাঁকে দিয়ে অনেক কিছুই করা যেত।'

সুলতান বললেন ঃ 'আমার ধারণা, তোমরা দু'জন তাঁর শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা হতে পার। আমি যদি তোমাদেরকে আমার দূত হিসাবে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেই, তাহলে তিনি তোমাদের কথা নিশ্চয়ই শুনবেন। বাগদাদে তাতারীদের প্রভাব ও আনাগোনা খুবই বেড়ে গেছে। বাগদাদের নিরপেক্ষতার ফলে মিসর ও শামের বাসিন্দারা আমাদের সাথে যোগ দিতে চাচ্ছে। তোমরা বাগদাদে চলে যাও। খলিফা জাহিরকে তাতারীদের বিরুদ্ধে তামাম ইসলামী মুলুকের পথ নির্দেশের জন্য তৈরী করে তোল। তোমরা তাঁর মনে আস্থা জন্মিয়ে দেবে যে, যতক্ষণ আমি থাকব, তাতারীদের পুরো নজর আমারই দিকে থাকবে এবং তিনি ইচ্ছা করলে এই সুযোগে বাগদাদে তামাম ইসলামী মুলুকের ফৌজ একত্র করতে পারেন। তাঁকে আরও বলবে, যেদিন আমরা বাগদাদ, মিসর, আরব ও শামের সেনাবাহিনী নিয়ে তাতারীদের উপর হামলা করব, সেদিন হিন্দুস্তানে আমাদের দোস্ত সুলতান আলতামশ তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। ইরান, তুর্কীস্তান ও খোরাসানের যে আওয়াম আজ দমে রয়েছে, তারাও উঠবে জেগে। এখনও আমার মনে হচ্ছে, সাহায্যের জন্য আর কোথাও না গিয়ে আমার এখানে থেকে কর্তব্য পালন করাই উচিত। যদি আমি এমনি সহায় সম্বলহীন অবস্থায় কয়েক বছর তাতারীদের সাথে লড়াই করে যেতে পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস তারা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন আমার সাহায্যের জন্য। কয়েক দিনের মধ্যে আজারবাইজান থেকে আরও দশ-পনের হাজার সিপাহী এসে আমার সাথে মিলিত হবে। এই ফৌজ সাথে নিয়ে আমি কম-সে-কম আরও দু'বছর ওদেরকে পেরেশান করতে পারবো। এর মধ্যে তোমরা আলমে ইসলামকে জাগিয়ে তুলতে পারবে।'

'আমরা তৈরী।' ঃ তাহির ও আবদুল মালিক সমস্বরে বলে উঠলেন।

সুলতান বললেন ঃ 'মোবারক আমার কাছ থেকে। সে শুধু এক সিপাহী এবং সে আমার কাজে লাগবে।'

কয়েকদিন পর তাহির ও আবদুল মালিক বাগদাদে পৌঁছে গেলেন। তাঁদের আগমন সংবাদ পেয়েই খলিফা জাহির তাঁদেরকে মোলাকাতের জন্য ডেকে নিলেন।

প্রথম মোলাকাতের পর তাহির জালালউদ্দীনকে লিখলেন ঃ 'খোদার শোকর, আমরা আশাতীত সাফল্য লাভ করেছি। মুহাল্লাব উজিরে আজম পদের জন্য উম্মিদওয়ার ছিল। খলিফার সাথে আমাদের মোলাকাতের পর সে আচানক গায়েব হয়ে গেছে। খলিফা ফৌজের সংগঠন ভার আবদুল মালেকের উপর সোপর্দ করেছেন। আমার সম্পর্কে তিনি ফয়সালা করেছেন যে, আমি তাঁর দূত হিসাবে শাম, মিসর, আরব, মারাকেশ ও আন্দালুসিয়া সফর করব। কালই আমি রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি।

হজ্জ নিকটবর্তী বলে আবদুল মালিক তাহিরকে পরামর্শ দিলেন যে, সবার আগে তাঁর মক্কা শরীফে যাওয়াই ভাল। সেখানে সব দেশেরই মুসলমান জমা হবেন। এবং সেখানে তিনি পাবেন জিহাদী তবলীগের সব চাইতে বড় মওকা। তাছাড়া পথে তিনি তার বাড়ি-ঘরও দেখে আসতে পারবেন।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে যায়েদ এক খুবসুরত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাগিচার বাইরে খোলা হাওয়ায় টহল দিচ্ছিল। আচানক খানিকটা দূরে দেখা গেল, এক সওয়ার দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন। জায়েদ কয়েক কদম এগিয়ে এসে তাঁর পথে দাঁড়ালো। সওয়ার কাছে এসে ঘোড়া থামালেন এবং মুখের উপর থেকে লৌহ-আবরণ সরিয়ে উপরে তুললেন। যায়েদ তাহিরকে দেখে আনন্দ ধ্বনি করে এক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরলো। বাচ্চা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে ঘাবড়ে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য মুখ বিকৃত করে কেঁদে ফেলল।

জায়েদ জলদী করে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল ঃ 'বাহ! আব্বাকে দেখেই এরই মধ্যে আমার শোকায়াৎ শুরু করে দিলে। আর আপনিই বা কি দেখছেন? ঘোড়া থেকে নেমে ওকে চুপ করাচ্ছেন না কেন?'

তাহির ঘোড়া থেকে নেমে বাচ্চাকে কোলে নিলেন। বাচ্চা হঠাৎ চুপ করে গেল এবং তাঁর দিকে ভাল করে তাকিয়ে তাঁর চকচকে বর্মের উপর হাত মারতে লাগল।

'আমি ঘরে গিয়ে খবর দিচ্ছি।' ঃ 'বলে জায়েদ ঘোড়ার লাগাম ধরে বাগিচার দিকে ছুটতে লাগল।

তাহির বাগিচার দিকে কয়েক কদম আস্তে আস্তে চলবার পর থেমে গিয়ে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। বাচ্চা বর্ম-ছেড়ে এবার শিরস্ত্রাণের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। তাহির তাঁর মাথা নত করলেন। শিশুর ছোট্ট ছোট্ট নরম সুন্দর হাত দু'টি তাঁর গালে লাগল। তাঁর অন্তরে জাগলো এক অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ। তিনি শিশুর হাত দুটি ধরে ঠোঁটে লাগালেন। কিছুক্ষণের জন্য তাঁর সবটুকু আকর্ষণ, সবটুকু স্নেহ কেন্দ্রীভূত হল শিশুর ছোট্ট নিষ্পাপ খুবসুরত মুখের উপর। তিনি আপনার অলক্ষ্যে তার গালে; ঠোঁটে, চোখে,কপালে বার বার চুমু খেয়ে বলতে লাগলেন ঃ 'আমার বেটা! আমার জিন্দেগী। আমার রুহ্।

তাহির আস্তে আস্তে পা চালিয়ে ঘরের দরজার কাছে গেলেন।

'আরও কিছুকাল আপনি ওকে এমনি করে আদর করলে ও নষ্ট হয়ে যাবে।' ঃ কথাটা শুনে তাহির চমকে উঠে সামনের দিকে তাকালেন। সুরাইয়া কয়েক কদম দূরে দরজার বাইরে এক খেজুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাসছেন।

ঃ 'সুরাইয়া আমার.......... ।'

সুরাইয়া নিজের ঠোঁটের উপর আংগুল রেখে দরজার দিকে ইশারা করলেন। তাহির পেরেশান হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কয়েক কদম দূরে আহমদ বিন হাসান, শেখ আবদুর রহমান, সাঈদ ও হানিফা আঙিনা পার হয়ে দরজার দিকে আসছেন। তাহির জলদী করে এগিয়ে বাচ্চাকে সুরাইয়ার কোলে দিয়ে বাড়ির আঙিনায় ঢুকলেন। ঘরের লোকজন আর তাহিরের মধ্যে যখন আট-দশ গজের ব্যবধান, তখনও বাগিচার একদিক থেকে ইসমাইল ও আমীন ছুটে এসে হাজির হল এবং তাহিরের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ইসমাইল হাসতে হাসতে বলল ঃ 'আমরা তীরন্দাযীর অভ্যাস করছিলাম। আর মধ্যে যায়েদ গিয়ে আপনার খবর দিল।

ঘরের সবাই তাহিরকে ঘিরে এক প্রশস্ত কামরায় প্রবেশ করলেন, তখনও ইসমাইল দুষ্টু হাসি হেসে শেখের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'নানাজান! আপনি চিনতে পারলেন না? এ ভাই তাহির যে?'

শেখ রেগে হাতের লাঠি উচিয়ে চীৎকার করে উঠলেন ঃ 'দাঁড়া, নালায়েক!' ইসমাইল ছুটে কয়েক গজ দূরে গিয়ে হেসে লুটোপুঠি খেতে লাগল। হানিফা মুখ চেপে হাসছিলেন, কিন্তু আহমদ ও সাঈদা বুঝতে পারলেন না শেখের রাগের কারণ, তেমনি বুঝলেন না ইসমাইলের হাসির কারণ।

এশার নামাজের পর তাহিরের ইরাদা জেনে সুরাইয়া হজ্জ ও তারপর ইসলামী দেশগুলোর তাবলীগ অভিযানে তাঁর সাথে থাকবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন।

সাঈদা তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন ঃ 'সুরাইয়া সম্পর্কে আমি যা শুনেছি, তাতে আমার ধারণা, সে তোমার খুবই সাহায্য করতে পারবে।'

শেখ বললেন ঃ 'আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু বাচ্চা-?

সাঈদা বললেন ঃ 'ও আমারই কাছে থাকবে। এখনও সে আমার ছাড়া আর কারোর কাছে ঘুমোয় না।'

সাঈদার অনুরোধে হানিফা তাঁর নাতনীর ছেলেকে তাঁর কাছে রেখে যেতে রাজী হলেন।

ইসমাইল এতক্ষণ এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। সে এবার বলে উঠল, 'হজ্জের পর আমি যাব ওদের সাথে।

শেখ বললেন ঃ 'চুপ কর। এখনও তোমার পড়াশুনার জামানা।'

আহমদ বিন্ হাসান বললেন ঃ 'আপনি অতি মাত্রায় ব্যস্ত মানুষ। ইসমাইলের লেখা পড়ার ভার আমার উপর ছেড়ে দিলেই ভাল হয়। আমীনের সাথে তার মনও বেশ লেগে যাবে।'

শেখ বললেন ঃ 'কয়েকদিন ধরে আমি এ সব কথা ভাবছি, কিন্তু এ না-লায়েককে ছেড়ে আমার দীল কি করে স্থির থাকবে, তা-ই ভাবছি। আমি ওর ঠাট্টা-তামাসা আর দুষ্টুমিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ওর অট্টহাসি শুনে আমি যেমন রেগে উঠি, তেমনি তা শোনার জন্যও বেকারর হয়ে থাকি। ও আমার বার্ধক্যের একটা অংশ হয়ে গেছে, ছোটবেলায় ও আমার জুতো লুকিয়ে রাখতো, আর এখনও তার মধ্যে খেজুরের বীচি ঢুকিয়ে রাখে। আমি রেগে যাই, আর তার সাথে সাথেই ভাবি, যদি ও এমনি দুষ্টুমি না করত, তাহলে আমার জিন্দেগীই হয়ে যেত অর্থহীন। কিন্তু লেখাপড়ার জন্য ওকে আপনার হাতেই ছেড়ে যেতে হবে। ইসমাইল এদিকে এস।

ইসমাইল লজ্জায় মাথা নত করে এগিয়ে এলে শেখ তাকে সস্নেহে পাশে বসালেন। তারপর বললেন ঃ 'বেটা! আমি হজ্জের পর তোমায় এখানে রেখে যাব, কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তুমি হপ্তায় দুবার শহরে গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে অবশ্যিই।'

ঃ 'আপনি নানীজানকে নিয়ে এখানেই থাকছেন না কেন?'

ঃ 'বেটা আমার কারবার এতটা প্রশস্ত যে, তা গুটাতে গেলে বেশ কিছুকাল সময় লেগে যাবে।'

ঃ 'তাহলে রোযই আমি আপনার কাছে আসব। সন্ধ্যাবেলায় আমি আর আমীন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মুরুভূমির পথে না ঘুরে শহরের দিকে চলে যাব।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, আমি রোয তোমাদের তরফ থেকে একটা নতুন করে দুষ্টুমির জন্য তৈরী থাকব।'

ঃ 'নানাজান! আমায় মাফ করুন। ঃ ইসমাইল অশ্রু-ভরা চোখে বলল ঃ 'ভবিষ্যতে আমি আর কোন দুষ্টুমি করব না।'

রাতের বেলায় শেখ আবদুর রহমান বিছানার উপর আধো-ঘুমের অবস্থায় শুয়েছিলেন। কামরার ভিতরে কারুর পায়ের আওয়াজ পেয়ে তিনি বলে উঠলেন ঃ 'কে?'

'নানজান! আমি' ঃ ইসমাইল ভীতকণ্ঠে বলল।

ঃ ' এ সময়ে এখানে তুমি কি করছ?'

'নানাজান!-আমি-।'

ঃ হ্যাঁ, বল।'

'নানাজান, মাফ করুন। আপনার সাথে ভবিষ্যতে কোন দুষ্টুমি না করবার ওয়াদা করেছি, কিন্তু তার আগেই একটা দুষ্টুমি করে ফেলেছি।'

ঃ 'আমার মৌজার মধ্যে খেজুর-বীচি ঢুকিয়ে রেখেছো তো। আচ্ছা যাও, ঘুমোও গে। ভোরে আমি বের করে নেব।

ঃ 'না, নানাজান! আমি নিজেই বের করছি।'

খানিকক্ষণ শেখের বিছানার তলায় অন্ধকারে হাতড়াবার পর ইসমাইল বলল ঃ 'নানাজান, যদি এজাযত দেন তো বাতিটা আনি। সব কটা জুতা পাচ্ছি না।

শেখ বললেন ঃ 'মনে হচ্ছে, তুমি ভাল-মানুষী দেখাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ। যাও আনো বাতি।

ইসমাইল আরেক কামরায় চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে যখন সে বাতি নিয়ে এল, তখনও আমীনও তার সাথে। ইসমাইল আমীনের হাতে বাতিটা দিয়ে তামাম জুতো

একত্র করে নিল। শেখ পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ 'সবগুলো জুতা বাইরে নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

ইসমাইল পেরেশান হয়ে জবাব দিল ঃ 'ধুয়ে ফেলতে নিচ্ছি, নানাজান।'

'ধুয়ে ফেলতে?'

ঃ 'হ্যাঁ, নানাজান! কথা হচ্ছে, আজ আমি এর ভিতরে বীচি না ঢুকিয়ে রসভরা খেজুরই ঢুকিয়ে রেখেছিলাম।

'দাঁড়াও, নালায়েক!' ঃ শেখ উঠে বসলেন।

ইসমাইল আর আমীন জলদী করে বাইরে চলে গেল।

●

ঘুমোবার আগে সুরাইয়া তাহিরকে বললেন ঃ 'আপনি এখনও তো ছেলেটার নাম জিজ্ঞেস করলেন না!'

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'দিল্লী থেকে রুখসত হবার আগে আমি একটা নাম বলেছিলাম। তুমি আবদুল আযীয ছাড়া আর কোন নাম তো রাখোনি?'

ঃ 'নাম, আমি সেই নামই রেখেছি।'

তাহির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ঃ 'তিনি ছিলেন আমার অতি বড় দোস্ত।'

ঃ 'আপনি একটা ওয়াদা পূরণ করেন নি।'

তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ 'তা কি'

সুরাইয়া তাঁর হাতের আংটি দেখিয়ে বললেন ঃ 'আপনি ওয়াদা করেছিলেন, আপনার বাগদাদে যাবার মওকা হলে..... ।'

ঃ 'সুরাইয়া! এ কিস্সা তুলো না এখনও!'

ঃ 'আমি সন্ধ্যা থেকে খুবই পেরেশান দেখছি আপনাকে। আপনার মুখের উপর আগের সে হাসির আভা নেই। বলুন, কি হয়েছে?

ঃ 'সুরাইয়া! আজ তুমি এ কিস্সা না তুললেই ভাল করতে।'

ঃ 'আমায় মাফ করুন। যদি তিনি আমারই কারণে আপনার সাথে রেগে গিয়ে থাকেন, তাহলে আমি নিজে বাগদাদে গিয়ে তাঁকে বুঝাব।

তাহির দরদ ভরা আওয়াযে বললেন ঃ 'তাঁকে বুঝানো আর কারুর হাতে নেই। তিনি আমার কাছ থেকে বহুত দূরে চলে গেছেন?'

ঃ 'কেন? তাঁর শাদী আর কারুর সাথে?'

ঃ 'না, না, সুরাইয়া! তিনি এ দুনিয়ায় নেই?'

ঃ উহ! আমায় মাফ করুন।

তাহির উঠতে উঠতে বললেন ঃ 'আমি খানিকক্ষণ বাইরে ঘুরে আসি।' বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

চাঁদের রোশনি খেজুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তাহির বাইরে গিয়ে একটা পড়ে-থাকা খেজুর গাছের উপর বসে পড়লেন। তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল চাঁদের

রোশনি আর তারার হাসির মাঝখানে সুফিয়ার সাথে সেই ফেলে-আসা দিনের মোলাকাত। চাঁদের স্নিগ্ধ হাসি তার সিতারার ঝিকিমিকি সত্ত্বেও যেন আসমান-যমিনে ছেয়ে গেছে কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব। বহু সময় এমটি কেটে গেল। অবশেষে কারুর পায়ের আওয়ায শুনে তিনি পিছু ফিরে উঠে দাঁড়ালেন।

ঃ 'সুরাইয়া!'

সুরাইয়া চমকে উঠে বললেন ঃ 'আপনি রাগ করেছেন আমার উপর?-

ঃ 'না, সুরাইয়া! আমার আফসোস, আমি তোমায় পেরেশান করেছি।' সুরাইয়া এগিয়ে গেলেন। তিনি নিজের অলক্ষ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে আলিংগন করে কেঁদে ফেললেন।

ঃ 'আমায় বলুন, তাঁর কি হয়েছিল? হায়! আমার জান বাজি রেখেও যদি আমি তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। আমি সব কিছু বরদাশত করতে পারি, কিন্তু আপনার মুখের উপর বিন্দুমাত্র দুঃখের চিহ্ন আমি বরদাশত করতে পারছি না।'

তাহির সুরাইয়াকে সাথে নিয়ে আবার সেই খেজুর গাছের উপর বসে বললেন ঃ 'সুরাইয়া! মানুষ যা' কিছু আশা করতে পারে, তার সব কিছুই রয়েছে তোমার ভিতরে। কখনও মনে কর না, একটি আকস্মিক ঘটনা আমায় তোমার সম্পর্কে বেপরোয়া করে ফেলেছে। কিন্তু সুফিয়ার মওত এমন একটা ঘটনা নয়, যা আমি খুব শিগগির ভুলতে পারবো। আমার বিশ্বাস, তোমার একটুখানি হাসি আমার প্রত্যেক আঘাতের বেদনা দূর করে দিতে পারে, কিন্তু সুফিয়ার মওতের পর বারংবার আমার দীলের মধ্যে খেয়াল জাগছে, হয়ত এ দুনিয়ায় খুশী হবার কোন হক আমার নেই। এমন একটা হাসি-যার মধ্যে লুকিয়ে ছিল হাজারও অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাসের তুফান, তারই স্মৃতি আমায় অধীর করে রাখবে চিরদিনের জন্য।

সুরাইয়া বললেন ঃ 'আমি তাঁর কথা শুনতে চাই। হয়ত তাতে আপনার দীলের বোঝা হালকা হবে কিছুটা। কেবল আনন্দের হাসিতে নয়, দুঃখের অশ্রুতেও আমি আপনার শরীক হতে চাই।'

ঃ তাহলে শোন।

তাহির সুফিয়ার জীবন-কাহিনীর শেষ পাতাগুলো উলটে যাচ্ছেন আর সুরাইয়ার চোখে নেমে আসছে অঝোর অশ্রুধারা।

তাহির তাঁর কিস্‌সা খতম করলে সুরাইয়া বললেন ঃ ' এ অভিযান শেষ করে আপনি বাগদাদে যাবেন, তখনও আমিও আপনার সাথে যাব। আমি তাঁর অসমাপ্ত কর্তব্য শেষ করব।

●

বাগদাদ অন্যান্য ইসলামী মুলুক থেকে যে উৎসাহব্যঞ্জক পয়গাম পাওয়া গেছে, তা সুলতান জালালউদ্দীনও তাঁর সিপাহীদের মধ্যে সঞ্চার করেছে নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য। আজর বাইজানের যে এলাকা তাতারীরা সুলতানের সাথে গাদ্দারীর বিনিময়ে তাদের তাবেদারের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিল, সুলতান নয়া শাসকদের কাছ থেকে তার

কতকগুলো এলাকা ছিনিয়ে নিলেন। গর্জিস্তান ও তিফ্‌লিসের ওমরাহ ছিলেন তাতারীদের বন্ধু। সুলতান গর্জিস্তানের কয়েকটা শহর দখল করে এগিয়ে গেলেন তিফ্‌লিসের দিকে। তিফ্‌লিসে তাঁর বিজয়ের গতি ছিল বিস্ময়কর, কিন্তু আচানক কিরামান থেকে বারাক হাজিবের বিদ্রোহের খবর এসে পৌঁছাল। তাঁর কাছে সুলতান তিনশ' সওয়ার সাথে নিয়ে সতের দিনে তিফ্‌লিস গিয়ে পৌঁছলেন কিরমানে। বারাক হাজিব সুলতানের কাছে মাফ চেয়ে ভবিষ্যতে ওয়াদা পালন করবার শপথ করলেন। সুলতান ফেরার পথে কয়েকদিন কাটালেন ইস্‌ফাহানে। সেখানে খলিফা জাহিরের ওফাত ও খলিফা মুসতানসিরের মসনদশিরীন খবর পৌঁছলো সুলতানের কাছে। তার সাথে সাথেই খবর এল যে, তিফ্‌লিসে তাতারীদের প্ররোচনায় কতক সরদার আবার বিদ্রোহ করে বসেছে। তারা ঈসায়ীদের সাহায্যে আজারবাইজানের শহরগুলোর উপর হামলা করছে। সুলতান খবর পেয়ে আযারবাইজানে চলে গেলেন এবং কয়েক হফ্‌তার মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন করে ফিরে গেলেন তাবরিয়ে।

তাবরিয়ে পৌঁছে সুলতান জানতে পারলেন যে, পংগপালের মত তাতারী বাহিনী এগিয়ে আসছে রায়ের দিকে। সুলতানের ফৌজী কওৎ বড় বেশী ছিল না, কিন্তু তখনও তাঁর কাছে খবর পৌঁছতে লাগল যে, তাহিরের চেষ্টায় দূরদারায় ইসলামী মুলুকের রেজাকার দল এসে জমা হচ্ছে বাগদাদে। কোন কোন রেজাকার দল সোজাসুজি চলে আসছে তাবরিয়ের দিকে।

তাতারীদের রায়ে পৌঁছবার পর সুলতানের চর এসে খবর দিল যে, তাতারী বাহিনী মোসালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারা বাগদাদ ও আর সব ইসলামী মুলুক থেকে তাঁর রসদ ও সেনাসাহায্য আসবার পথ বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করছে। সুলতানের এ আশঙ্কাও হল যে, যদি তাতারী বাহিনী রায় থেকে হামদান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে সম্ভবতঃ তারা কুর্দিস্তান ও মোসাল পর্যন্ত এক দীর্ঘ আত্মরক্ষা-ঘাঁটি বানানোর পরিবর্তে সোজা বাগদাদের উপর হামলা করবে এবং আলমে ইসলামের শেষ ঘাঁটিটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই সুলতান তাতারীদের পূর্ণ মনোযোগ নিজের দিকে নিবিষ্ট করার জন্য ইস্‌ফাহানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কয়েকদিন প্রস্তুতির পর রায়ের দিকে কুচ করলেন।

রায়ের কাছে তিনি তাতারীদের লশ্‌করের মোকাবিলা করলেন এবং প্রাণপণ হামলা করে তাতারীদের পিছু হটতে বাধ্য করলেন। সুলতানের ফৌজের বাম বাযুর নেতৃত্ব করছিলেন সুলতানের ভাই গিয়াসুদ্দীন। তিনি গাদ্দারী করে নিজের ফৌজ নিয়ে ময়দানে চলে গেলেন। তাতারীরা ফৌজের এক বাযু খালি দেখে মধ্যস্থলে হামলা করে ফৌজকে ছত্রভংগ করে দিল। সুলতান পিছু হটে গিয়ে আবার ফৌজকে সংঘবদ্ধ হামলা করলেন, কিন্তু তাতারী ফৌজের সংখ্যা ও গিয়াসুদ্দীনের গাদ্দারী সিপাহীদের নিরুৎসাহ করে দিয়েছিল। তারা বিজয়ের আশা না করে কেবল সুলতানের হুকুম তামিল করবার জন্যই লড়াই করে যাচ্ছিল। সুলতান সবদিক দিয়ে হতাশ হয়ে ফৌজকে পিছপা হবার হুকুম দিলেন এবং আত্মরক্ষার লড়াই করতে করতে ময়দান ছেড়ে গেলেন।

তাতারীরা ইস্‌ফাহান পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করল, কিন্তু ইতোমধ্যে গোবি মরুভূমিতে চেংগিস খানের মৃত্যুসংবাদ তামাম শাহ্‌যাদা ও সরদারকে ফিরে যেতে বাধ্য করল। তাবরিয়ে

ফিরে গিয়ে সুলতান আবদুল মালিকের মারফতে খলিফা মুসতানসিরকে লিখলেনঃ 'এবার চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় এসে গেছে। আপনি তৈরী থাকুন। তাতারীদের ফিরে আসা পর্যন্ত কোহে আলবুর্য থেকে আর্মেনিয়া পর্যন্ত তাদের ঈসায়ী বন্ধুদেরকে দমন করবার জন্য আমার সিপাহীই যথেষ্ট। এ অভিযান শেষ হবার পর যদি আমায় বাগদাদে আসার এজাযত দেন, তাহলে আমি তাতারীদের পুনরায় জৈহুন নদী পার হওয়া পর্যন্ত এক অপরাজেয় ফৌজ গড়ে তুলতে পারবো এবং আমারা তাতারীদের সাথে এক চূড়ান্ত লড়াই চালিয়ে যেতে পারবো। আর যদি খলিফাতুন মুসলেমিন কোন কারণে আমার বাগদাদে আসা মনযুর না করেন, তাহলে আমি বাগদাদের সীমানার বাইরে কোন শহরে কেন্দ্র করে বাগদাদের সেনাবাহিনীর এনতেযার করব।

তাহির বিন ইউসুফের কাছ থেকে সুলতান খবর পেলেন যে, তিনি মিসর ও মারাকেশের সুলতানদের সাহায্যের ওয়াদা নিয়ে ফিরে এসেছেন। শাম মুলুকের আওয়াম ও ওমরাহের সাহায্য পাবেন বলেও তিনি আশা করেন।

সুলতান তাঁকে খবর পাঠালেন ঃ 'তুমি শাম থেকে কর্তব্য শেষ করে শীগ্‌গিরই হিন্দুস্তানে চলে যাও। সুলতান আলতামশকে তাঁর ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দাও। যখনই আমরা সংহত হয়ে ইরান অথবা খোরাসানে তাতারীদের সাথে চূড়ান্ত লড়াই করবার ফয়সালা করব, তখনও সুলতানকে খবর দেওয়া হবে। তখনও যদি সুলতান আলতামশ আফগানিস্তানের দিক দিয়ে তাতারীদের উপর হামলা করেন, তাহলে তাদের মনোযোগ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তাতেই আমার অতি বড় সাহায্য করা হবে। যতদিন সে সময় না আসে, ততদিন হিন্দুস্তানে থাকলেই ভাল হবে।

কয়েকটি লড়াইয়ের পর আজরবাইজানের উত্তর ও পূর্বদিকের বিশাল এলাকা সুলতান জালালউদ্দীনের দখলে এসে গেল। এই অন্তহীন যুদ্ধে তাঁর সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ হয়ে গেছে, কিন্তু সুলতান বারবার তাদের কাছে বাগদাদ, মিসর, মারাকেশ, শাম, আরব ও হিন্দুস্তানের সাহায্যে তাতারীদের সাথে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের ওয়াদা করে তাদের মনে সঞ্চার করছেন নতুন উদ্দীপনা। তাছাড়া কোন কোন দেশ থেকে রেযাকার দল এসে যোগ দিচ্ছে তাঁদের সাথে।

বাগদাদ সম্পর্কে আবদুল মালিক যে খবর পাটাচ্ছেন, তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, কিন্তু তিনি উদ্বেগও প্রকাশ করছেন। খলিফা সুলতানসির ফৌজের সংগঠনের জন্য তাহিরের নির্দেশ মেনে চলছেন। তুর্কী মুহাজির ছাড়া বাগদাদে আগত রেযাকারদের জন্য ফাউজের দরজা খোলা রয়েছে। দরিয়ায়ে দজলার কিনারে তিনি এক বিরাট ফৌজী মাদ্রাসা খুলে দিয়েছেন। আবদুল মালিক হয়েছেন সেখানকার নাযিমে আলা। এসব খবর খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু আবদুল মালিক তাঁর সুলতানকে কিছু কিছু আশঙ্কাও জানিয়েছেন। তাঁর সব চাইতে বড় অভিযোগ, খলিফা পর্দার আড়ালে সবাইকে আশ্বাস দেন, কিন্তু বাগদাদের আওয়ামের সামনে সুলতানের সাহায্য করার সংকল্প ঘোষণা করতে তিনি ঘাবড়ে যান। তাতারীদের যে দূতকে তাঁর বাপের আমলে বাগদাদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি আবার ফিরে এসেছেন এবং খলিফার সাথে তাঁর দীর্ঘ মোলাকাত হচ্ছে। তথাপি খলিফার কাছে যখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তখনও তিনি জবাব দেন যে, প্রস্তুতির জন্য

সময়ের প্রয়োজন। আর এ জন্য তাতারীদের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে রাখা দরকার।

আবদুল মালিক আরও লিখেছেন যে, তাতারী দূত লুটপাটের অফুরন্ত দৌলতের এক হিস্সা বাগদাদে নিয়ে এসেছেন এবং সালতানাতের গণ্যমান্য লোক, কর্মচারী, ওলামা ও উমরাহকে খরিদ করবার চেষ্টা করছেন। কোন কোন লোক প্রকাশ্যে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা বিরোধিতা করছে।

কিন্তু জালালউদ্দীন হতাশ হবার লোক নন। তিনি উত্তর-পশ্চিমের অভিযান শেষ করেই তাবরিয়ে পৌঁছলেন। কয়েকদিন সেখানে থাকার পর খবর পাওয়া গেল যে, তাতারীরা চেংগিস খানের পুত্র তোলাই খানের নেতৃত্বে সেহুন নদী পার হয়ে এসেছে এবং মিল্লাতে ইসলামিয়ার বাছাই-করা গাদ্দারদের এক প্রতিনিধিদল বাগদাদের খলিফার দরবারে পাঠিয়েছেন।

সুলতান আবদুল মালিকের কাছে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে হামদানের পথে চললেন।

## বাইশ

মোলাকাতের আবেদনের জবাব পেয়ে আবদুল মালিক খলিফার কাছে হাযির হলেন। খলিফা আবদুল মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর সাথে নির্জনে আলাপ-আলোচনা করলেন।

খলিফা সুলতান জালালউদ্দীনের লিপি পড়বার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ 'তোলাই খান পাঁচ লাখ সিপাহী সাথে নিয়ে সেহুন নদী পার হয়ে এসেছে। দরকার হলে হয়ত আরও পাঁচ লাখ সিপাহী চেয়ে নিতে পারবে। তোমার ধারণায় সুলতান জালালউদ্দীনের কাছে এখনও কত ফৌজ রয়েছে?'

আবদুল মালিক জবাব দিলেন ঃ 'একথা সত্য যে, এখনও সুলতান জালালউদ্দীনের কাছে খুব কম ফৌজ রয়েছে, কিন্তু আপনি জানেন, তিনি ষাট সত্তর হাজার সিপাহী সাথে নিয়ে আফগানিস্তানে শিগি তোতোর দু'লাখ সিপাহীকে শোচনীয়রূপে পরাজিত করেছেন, আর এখনও মুষ্টিমেয় সিপাহী সাথে নিয়ে কিরমান, আযরবাইজান, কাফচান, তিফলিশ ও আর্মেনিয়ার বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছেন।'

খলিফা বললেন ঃ 'বর্তমানে আমার ফৌজের সংখ্যা হচ্ছে তিন লাখ। ধরে নাও, যদি বাগদাদের বাইরে কোন ময়দানে পরাজয় ঘটে, তাহলে তাতারীদের হাতে বাগদাদের পরিণাম কি হবে?'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'খলিফাতুল মুসলেমিন যদি আজই জিহাদ ঘোষণা করেন, তাহলে আমি আশ্বাস দিচ্ছি, এক হফতার মধ্যে কেবল এই শহর থেকেই আরও তিন লাখ রেজাকার ভর্তি করব। আবার আপনি দেখবেন, মারাকেশ থেকে শুরু করে ইরাক পর্যন্ত অগুণতি সিপাহী এসে আপনার ঝাণ্ডাতলে জমা হয়ে যাবে। তারা কেবল আপনার ঘোষণার প্রতীক্ষা করছে। তাতারীরা আজ পর্যন্ত আমাদের উপর বিজয় অর্জন করেনি, আমাদের ভিতরকার অনৈক্যের সুযোগ নিয়েছে। আমার বিশ্বাস, যেদিন বাগদাদের সেনাবাহিনী হামদানে পৌঁছে যাবে, সেই দিনই সুলতান আলতামশ হিন্দুস্তান থেকে বলখ পর্যন্ত পৌঁছবেন

এবং তুর্কীস্তান, খোরাসান ও ইরানের নিভে যাওয়া ভস্মস্তূপে জ্বলে উঠবে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা। আমার আরও বিশ্বাস, এ অবস্থা থেকে তাতারী ফৌজ জৈহুন নদীর এপারে এগুতে সাহস করবে না।'

খলিফা বললেন ঃ 'আবদুল মালিক, আমার ভয় হয়, পরাজয় ঘটলে বাগদাদের পরিণাম কি হবে?'

ঃ 'জয় পরাজয় খোদার হাতে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ভয় করে কোন কওম আজ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করেনি। আপনি ভেবে দেখুন, বর্তমান মুহূর্তে জালালউদ্দীন আলমে ইসলামের শেষ ঘাঁটি সামলাচ্ছেন। যদি এ ঘাঁটি একবার ভেঙে পড়ে, তাহলে আমরা বাগদাদের দিকে তাতারী সয়লাবের অগ্রগতি রোধ করতে পারব না। আমি শুধু এইটুকু জানতে এসেছি, কবে আমাদের ফৌজ বাগদাদ থেকে রওয়ানা হচ্ছে। সময় খুবই কম। লড়াই শুরু হবার বেশ কিছুদিন আগেই সুলতানের কাছে আমাদের সেনাবাহিনীর পৌঁছা প্রয়োজন যাতে তিনি তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন।'

ঃ ' বাইরের রাজ্যগুলো যদি আমাদের সাহায্য না করে, তা হলে তাতারীরা মওকা পেলেই আমাদের উপর হামলা চালাবে, সে ভয়ও আমাদের রয়েছে।'

ঃ 'আপনার কর্তব্য আপনি পুরো করুন, আর বিশ্বাস রাখুন, অপর কারুরই পিছে পড়ে থাকবার সুযোগ মিলবে না।'

ঃ 'তুমি জানো, বাগদাদের বেশীর ভাগ ওলামা তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার বিরোধী?'

ঃ 'বেশীর ভাগ নয়, মাত্র কয়েকজন। আমি তাদেরকে ওলামা বলতেই রাজী নই। তারা হচ্ছে মিল্লাতের গাদ্দার, যারা তাদের আত্মার দাম উসুল করে নিয়েছে তাতারী দূতাবাস থেকে।'

ঃ 'কিন্তু আওয়ামের একটি বড় জামা'আত তাঁদের পেছনে রয়েছে।'

ঃ 'আপনার জিহাদ ঘোষণার পর তাদের প্রভাব সবটুকু লোপ পেয়ে যাবে।'

ঃ 'তুমি জানো, তুর্কীস্তান থেকে ওলামা ও সরদারদের এক প্রতিনিধিদল এসেছে আমার কাছে।'

ঃ 'আমি জানি, কিন্তু তারা হচ্ছে কেবল সেই লোক, যারা কওমের নওজোয়ানদের খুন ও নারীর ইজ্জতের মূল্য উসুল করে নিয়েছে। সে কওম কারুর তলোয়ারের কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি, এদের গাদ্দারীই তাদেরকে পরাজিত করেছে। কিন্তু, আমীরুল মুমেনিন। কথা কাটাকাটির সময় নেই আর। আমাদের মধ্যে কতক লোক গাদ্দার হয়ে গেছে বলেই কি আমরা চিরন্তন অভিশাপ মাথায় তুলে নেব? আপনি কি মনে করেন, যেসব লোক সুলতান জালালউদ্দীনের সাথে গাদ্দারী করেছে, সময় হলে তারা আপনার সাথে গাদ্দারী করবে না? তারা আপনার কাছে নিয়ে এসেছে তাতারীদের দোস্তির পয়গাম। আপনি যদি মনে করেন যে, তাতারী মুসলমানদের দোস্ত, তা'হলে এদেরকেও আপনার খায়েরখাহ মনে করুন; আর যদি মনে করেন যে, তাতারীদের চাইতে বড় দুশমন আমাদের আর কেউ নেই, তা'হলে

এদেরকে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম গাদ্দার বলে আপনাকে মানতেই হবে।'

ঃ 'আবদুল মালিক, তুমি হামেশা আমাদের, তোমার কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে এসেছ, কিন্তু এ সমস্যা বড়ই নাযুক। তাতারীদের সাথে যুদ্ধের যিম্মাদারী মাথায় তুলে নেবার আগে আমায় অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে।'

আবদুল মালিক নিরাশ হয়ে খলিফার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তা'হলে আপনার ইরাদা বদলে গেছে? আমাদের এতসব প্রস্তুতি কেবল লোক দেখানোর জন্য? আপনি জানেন, বাগদাদের সাহায্যের আশায় সুলতান হিন্দুস্তান ছেড়ে এসেছেন। আপনার ওয়ালেদ মরহুমের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে তিনি হতাশার অন্ধকারে আমার আলোক শিখা জ্বেলেছেন এবং তারপর তিনি কেবল এই আশা নিয়েই আজ পর্যন্ত হিম্মৎ হারান নি যে, তাতারীদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য আপনি আমাদের এক ওফাদার সিপাহী মনে করে তাঁকে সাহায্য করবেন। এখনও তিনি হামদানের কাছে তাঁবু ফেলে বাগদাদের সেনাবাহিনীর ইনতেযার করছেন। এখনও মুষ্টিমেয় লোক কেবল এই জন্যই তাঁর সাথে রয়েছে যে, আপনার সাহায্য পেলে তারা তাতারী যুলুমের প্রতিশোধ নিতে পারবে। মনে রাখবেন, বাগদাদের সাহায্য না পেলেও তারা তাদের কর্তব্য পালন করে যাবে। আপনার দিক থেকে হতাশ হলে এও সম্ভব যে, সুলতানের কোন কোন সাথী তাঁকে ছেড়ে যাবে। কিন্তু তাতারীদের বিজয়ের পরও কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক একথা বলতে সাহস করবেন না যে, সুলতান জালালউদ্দীন খারেযম শাহ্‌কে তাতারীরা পরাজিত করেছিল, বরং তাঁরা বলবেন যে, তিনি যখন তাতারীদের সাথে শেষ সংগ্রাম করছিলেন, তখনও তাঁরই এক ভাই তাঁর হাতের তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। দুনিয়া আপনার সম্পর্কে কি রায় দেবে তা' আপনিই ভেবে দেখবেন।'

খলিফা বললেন ঃ 'তুমি বলতে চাও যে, দুনিয়া আমায় মনে করবে ইসলামের দুশমন?

ঃ 'না, না, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আপনি নিরপেক্ষ থাকবার ফয়সালা করে ফেলেছেন। খোদার দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। আমি আপনার ব্যক্তিত্বের উপর সন্দেহ পোষনের অপরাধে অপরাধী। আমায় আপনি শাস্তি দিন।'

খলিফা উঠতে উঠতে বললেন ঃ 'চল।'

ঃ 'কোথায়? ফৌজের আড্ডায়

ঃ 'না, আর এক কামরায় ওখানে বহুলোক জমা হয়ে রয়েছে। হয়ত তাঁরা তোমায় আমার অসুবিধার কারণ বুঝিয়ে দিতে পারবেন।' বলতে বলতে খলিফা তালি বাজালেন। অমনি এক গোলাম এসে কামরায় প্রবেশ করল। খলিফা বললেন ঃ 'আবদুল মালিককে আমার দরবারে পৌছে দাও।'

আবদুল মালিক দরবারে হাজির হলেন। সেখানে সালতানাতের বাছাই করা কর্মচারীরা তো রয়েছেই, তা'ছাড়া আরও শহরের সেইসব ওলামা, যারা তাতারীদের সাহায্য ও খারযম শাহের দুশমনির ফতোয়া প্রচার করে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট খ্যাতি হাসিল করেছেন। খলিফার মসনদের নীচে ডান দিকে শাহ্‌জাদা মুসতানসির বসে রয়েছেন। তাঁর পাশের কুরসীগুলো দখল করে আছেন ওলামা ও সরদারদের প্রতিনিধি দল। এরা এসেছেন তুর্কীস্তান থেকে

বাগদাদের খলিফা ও আওয়ামের নামে তাতারীদের দোস্তির পয়গাম নিয়ে। তাদের মাঝখানে একটি পরিচিত চেহারা দেখে আবদুল মালিকের দেহের রক্ত ফুটে উঠল টগবগ করে। লোকটি মুহাল্লাব বিন দাউদ। বাগদাদে তাঁর আগমন সংবাদ আবদুল মালিকের কানে আসেনি। তিনি এক খানি কুরসীতে বসে পড়লেন।

নকীব মসনদের পিছনের দরজা থেকে মাথা বের করে খলিফার আগমন ঘোষণা করল। দরবারের লোকজন সবাই উঠে দাঁড়ালেন।

খলিফা মসনদে আসীন হয়ে আবদুল মালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'আবদুল মালিক, তোমার বক্তব্য আমি সবই শুনেছি। তুমি বলছো, তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা আমাদের কর্তব্য, কিন্তু তুর্কীস্তানের বিশিষ্ট ওলামা প্রতিনিধিদলসহ এই সব সম্মানিত লোকেরা তোমার মতের বিরোধী। এঁদের সামনে তোমার ধারণা প্রকাশ করবার মওকা আমি তোমায় দিচ্ছি। তুমি যদি তাঁদেরকে তোমার সাথে একমত করতে পার, তাহলে কালই আমি এখান থেকে আমার সেনাবাহিনী রওয়ানা করবার হুকুম দেব। তা' না হলে আমি আশা করি, এঁদের যুক্তি ভেবে দেখবে।'

আবদুল মালিকের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, এর সব কিছুই করা হচ্ছে তাঁর মুখ বন্ধ করবার জন্য। তবু তিনি উঠে এক উদ্দীপনাব্যঞ্জক দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করলেন।

আবদুল মালিক ও তাঁর সাথীরা আওয়ামের ভিতরে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে জানেন, বাগদাদের ওলামার কাছে তা' অজানা ছিল না। তাই তাদের মধ্যে কেউ হঠাৎ উঠে কোন জবাব দেবার সাহস করলেন না। খলিফা প্রতিনিধিদের দিকে তাকালেন, কিন্তু আবদুল মালিকের বক্তৃতার পর তাঁরাও হয়ে পড়লেন পেরেশান। মুহাল্লাব খলিফার কাছ থেকে কিছু বলবার এযাজত নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তিলকে তাল করবার, সরষেকে পাহাড় বানাবার কৌশল তার জানা ছিল। পরাজিত মনোবৃত্তির লোকদের হতাশার শেষ সীমানায় পৌঁছে দেওয়া কঠিন ছিল না তাঁর কাছে। তাই তিনি তাতারীদের বহু দূরে না দেখে তাদেরকে আনাগোনা করতে দেখছিলেন বাগদাদের অলিগলিতে আর বাজারে। মুহাল্লাবের বক্তৃতার পর তুর্কীস্তান ও বাগদাদের ওলামা তাঁকে সমর্থন করলেন এবং শেষ পর্যন্ত সিপাহ্সালার ও ওমরাহ্ তাদের ধারণা পেশ করলেন। তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আত্মহত্যার শামিল, কম বেশী করে এই কথাই বললেন সবাই।

বক্তৃতার পরবর্তী ধারা শুরু হল জালালউদ্দীনের ব্যক্তিত্ব ও মযহাবী মতামত নিয়ে। শেষ হয়ে গেলে খলিফা আবদুল মালিককে প্রশ্ন করলেন ঃ 'আবদুল মালিক' তুমি এবার খুশী হলে কি না, বল। কওমের পথ প্রদর্শকদের সবাই যখন এই মত পোষণ করেন, তখনও আমি এর খেলাফ কাজ কি করে করব?'

আবদুল মালিক উঠে দাঁড়ালেন। রাগে তিনি তখনও কাঁপছেন। তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ শ্রোতাদের কানে লাগছিল তীক্ষ্ণ ছুরির মত। তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন, তা'ও যেন তিনি জানেন না। খলিফা তাঁকে বলবার মওকা দিয়ে এখনও হয়রান হয়ে পড়ছেন। আবদুল মালিক বলছেন ঃ 'আমার যা জানবার তা' আমি জেনেছি। যে পাহাড়ে আঘাত খেয়ে কওমের কিশতি চুরমার হয়ে যাবে, সে পাহাড় আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আপনি হয়ত ভুল ধারণায়

ডুবে আছেন, নয়তো নিজেকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এ সব লোক কওমের পথপ্রদর্শক নয়। এরা তাতারীদের সাহায্যের জন্য যে আওয়াজ এখানে তুলছে তা' এদের দীল থেকে বেরুচ্ছে না, বেরুচ্ছে পেট থেকে। তুর্কীস্তানের এই শ'দ দশজন গাদ্দারকে ওলামা আর সরদার বলে অভিহিত করায় সেই হাজারো ওলামা ও ওমরাহের অবমাননা করা হচ্ছে, যাঁরা তাতারীদের গোলামীর চাইতে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে তৈরী, আর আমাদের এ শহরের যেসব বোযর্গ আজ বড় জুব্বা পরিধান করে আপনার দরবারে এসেছেন, তারা আওয়ামের কাছে মুখ দেখাতে শরম বোধ করছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাঁদের মধ্যে কারুর সাহস আছে বাগদাদের কোন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াবার? আপনি আমায় এজাযত দিলে একদিনে আমি বাগদাদের হাজার হাজার ওলামাকে এই মহলের সামনে দাঁড় করিয়ে দেব এবং তাঁদের প্রত্যেকে তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার দাবী জানাবেন। কওমকে যারা বিক্রী করে দিয়েছে, কওমের পথপ্রদর্শক তারা নয়। কওমের পথপ্রদর্শক তাঁরা, যাঁরা কওমের জন্য মরতে জানেন, বাঁচতে জানেন। খলিফাতুল মুসলেমিন! আমি জানি, আমার এসব কথা নিরর্থক। আমার জানা আছে, এ সওদাগররা মুসলমানদের বেচে দিয়েছে তাতারীদের হাতে। যেসব লোক আপনাকে বিশ্বাস দিচ্ছে যে, তাতারীরা বাগদাদের বাসিন্দাদের সাথে চুক্তিভংগ করবে না, তাদেরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে, তাতারীদের তলোয়ার যেদিন কোষমুক্ত হবে, সেদিন লাল ও সফেদ রক্তের পার্থক্য করবে না তারা। আত্মরক্ষার যুদ্ধে আমাদের সাথে থাকতে তারা তৈরী নয়, কিন্তু ধ্বংসের বেলায় তারাও আমাদের সাথে হিস্যাদার হবে নিশ্চয়ই। আমার হয়ত বাগদাদ ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু যতক্ষণ আমি এখানে আছি, ততক্ষণের জন্য আমি এ নাম-সর্বস্ব ওলামাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে, তারা যেন আমার বিরুদ্ধে কোন ফতোয়া প্রচার করবার চেষ্টা না করে। সালতানাতের কর্মচারীদেরও আমি বলব তাঁরা যেন আমার পথে কাঁটা না ছড়ান। আমি সে কাঁটা দলে যেতে জানি। সে বুযুর্গদের চেষ্টা সত্ত্বেও বাগদাদে এমন বহু লোক রয়েছে, যাদেরকে লাঠি নিয়ে তাড়া করা সহজ হবে না। আমি চাই না যে, বাগদাদে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হোক যাতে তাতারীরা সুলতান জালালউদ্দীনের পিছু ছেড়ে এখানে আসাই বেশী ভাল মনে করবে। আমি সরকারী সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করব না, কিন্তু বাইরে থেকে যেসব রেযাকার কেবল জালালউদ্দীনের সাহায্যের ইরাদা নিয়ে এসেছে, তাদেরকে ওখানে পাঠাবার দাবী আমার রয়েছে। সম্ভবতঃ হুকুমাতে বাগদাদ ও তাতারীদের মধ্যে মৈত্রীচুক্তির খবর শুনেই তারা নিরাশ হয়ে দেশে চলে যাবে। যা'ই হোক আমি চেষ্টা করব, যেন তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, তা পূর্ণ করে। আমি এখনও চলে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে একটি বিষয়ের দিকে খলিফাতুল মুসলেমিনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কথাটি হচ্ছে ঃ এই মুহাল্লাব বিন দাউদ ওয়াহিদউদ্দীন ও সাবেক উজিরে আযমের হত্যাকারী। আমি তাকে গ্রেফতার করতে বললে তা' নিরর্থক হবে, কিন্তু খলিফার মহল থেকে বেরুবার সময়ে খলিফার এজাযতে হোক আর বিনা এজাযতে হোক, কারুর উপর পেছন থেকে হামলা করা এক অভদ্রোচিত কার্য এবং আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, আমি কিছুটা সতর্ক হয়ে চলতেও অভ্যস্ত। মহলের বাইরে

এ মুহূর্তে কম-সে-কম দশ হাজার লোক এমন রয়েছে যারা আমি সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে না গেলে মহলের ভিতরে তালাশী নেবার চেষ্টা করবে। - আচ্ছা, আমি এখনও চলে যাচ্ছি।'

মহলের বাইরে বেরুবার সময়ে আবদুল মালিকের চোখ বেয়ে নেমেছে অশ্রুধারা। তিনি বলছেন ঃ 'এ পাথরের মাঝে জীবন সঞ্চার করা আমার সাধ্যাতীত। বাগদাদের ধ্বংস ভাগ্যলিপির শামিল হয়ে গেছে।'

দরজার বাইরে ছিল জনতার ভিড়। তাঁর মুখ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা শুনবার জন্য তারা ছিল বেকারার, কিন্তু তাঁকে দেখে তারা ছুটে পালাতে লাগল। তাঁর চোখে অশ্রুধারা দেখে কেউ তাঁর পথ রোধ করবার সাহস করল না। সন্ধ্যার মধ্যে সারা শহরে খলিফা ও তাতারীদের মধ্যে মৈত্রীচুক্তির খবর রটে গেল। রেযাকাররা দেশে ফিরবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

রাতের বেলায় আবদুল মালিক তাঁর বাড়িতে বসে সুলতান জালালউদ্দীন ও তাহির বিন ইউসুফের নামে দীর্ঘ চিঠি লিখছিলেন। তাঁর বাড়ির বাইরে পাহারায় ছিল বাগদাদের কয়েকটি নওজোয়ান ফৌজী মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।

●

সুলতান জালালউদ্দীন এক উপত্যকায় তাঁবু ফেলে বাগদাদের সেনাবাহিনীর ইন্‌তেযার করছেন। তাতারী সেনাবাহিনী যত নিকটবর্তী হচ্ছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে সুলতানের অধৈর্য। একদিন সূর্যোদয়ের খানিকক্ষণ পরে সুলতান রোজকার অভ্যাসমত এক পাহাড়ে উঠে বাগদাদের পথের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন কয়েকজন ফৌজী অফিসার। দূরে এক উঁচু পাহাড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল একদল ঘোড়সওয়ার। তারা পনের বিশজন হবে। ভাল করে তাদের দিকে দেখে সুলতান খুশীতে চীৎকার করে উঠলেন ঃ 'ওই যে এসেছে! ওই যে এসেছে! বাগদাদের তিন লাখ ফৌজের আগমনের খবর নিয়ে এসেছে ওরা। দেখলে, তোমরা বলছ, আবদুল মালিকের জবাব আসতে লাগবে আরও কয়েকদিন; আর আমি বলেছি আমার দূত মধ্যরাত্রে গিয়ে বাগদাদে পৌঁছলেও তখখুনি আবদুল মালিক খলিফাকে জাগিয়ে আমার চিঠির জবাব হাসিল করবেন। তোমরা খলিফার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছ। কিন্তু আমি বলেছি যে, বর্তমানে খলিফা চুপচাপ থেকে বুদ্ধিরই পরিচয় দিচ্ছেন। আফগানিস্তানে শিগি তোতোকে আমরা যে শিক্ষা দিয়েছিলাম, তোলাই খানকেও সেই একই শিক্ষা দেব এবার। খলিফার দূত আসছে। ফৌজের তামাম সিপাহীকে হুকুম দাও, খিমার বাইরে এসে তারা যেন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানায়।'

কিছুক্ষণ পরে সুলতানের স্বল্পসংখ্যক সিপাহী কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল বাইরের খোলা জায়গায়। সওয়ার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। সুলতান কয়েকজন সালার সথে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে বললেন ঃ 'তোমরা খুব জলদী পৌঁছে গেছ। তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে খেলাত পাবার হকদার হয়েছ।'

এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে আবদুল মালিকের চিঠি সুলতানের হাতে দিল। সুলতান বললেন, 'চিঠি পড়বার আগে আমায় বল, বাগদাদ থেকে সেনাবাহিনী কবে রওয়ানা হচ্ছে?

তারা পেরেশান হয়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। চিঠি খুলতে খুলতে সুলতান বললেন ঃ 'তোমরা হয়ত জান না এ সব কথা। আবদুল মালিক বড়ই হুঁশিয়ার লোক।'

চিঠি পড়বার সময়ে সুলতানের মুখ পাণ্ডুর হয়ে এল। আচানক তাঁর মাথায় যেন বাজ পড়ল। তিনি তাঁর সাথীদের দিকে তাকালেন। তাঁর কম্পিত হাত থেকে চিঠিখানা পড়ে গেল। তিনি হাসলেন, কিন্তু সে হাসি কান্নার চাইতেও মর্মান্তিক।

তিনি বেদনা-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন ঃ 'আমি জানতাম কিন্তু নৈরাশ্যের শেষ সীমানায় পৌঁছে মানুষ এমনি করে আত্মপ্রতারণায় অভ্যস্ত হয়ে থাকে। বালুর উপর আমি তৈরী করেছিলাম মহল। মোবারক, আবদুল মালিকের চিঠি পড়ে শোনাও সবাইকে। তারপর যারা চলে যেতে চায়, আমার তরফ থেকে তাদেরকে এজাযত দাও। শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমি পারি, নৈরাশ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি, কিন্তু কুদরতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমি পারি না। কুদরতের বিরুদ্ধে কোন শেকায়েৎ নেই আমার। আমাদের উপর কুদরতের দান সামান্য নয়। বছরের পর বছর ধরে মুষ্টিমেয় মানুষকে তিনি দিয়েছেন তাতারী সয়লাব রোধ করবার হিম্মৎ। মুসলমানই যখন সচেতন নয়, যখন তারা সমষ্টিগত জীবনের চাইতে ব্যক্তিগত মৃত্যুর জন্য বেশী উদ্বিগ্ন, তখনও কুদরতের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করব। কুদরত কারুর জন্য তাঁর কানুনের ব্যতিক্রম করেন না।'

দূতদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন ঃ 'তোমরা যাও। আবদুল মালিক আমায় লিখেছেন, কয়েক দিনের মধ্যে কম বেশী করে সিপাহী নিয়ে তিনি আমার কাছে পৌঁছবেন। তাঁকে বলবে এখনও তার আসা নিষ্ফল।'

সুলতান তাঁর খিমায় চলে গেলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক জন যোদ্ধা বার বার তাঁর সাথে দেখা করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুলতান ঘুমিয়ে আছেন বলে দরজার পাহারাদার প্রতিবার তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিল। তিনি ভিতরে যেতে নিষেধ করেছেন।

কয়েক দিন পর সুলতান আযারবাইজানের পথে ধরলেন।

●

সুলতান জালালউদ্দীন খারেযম শাহ্ তাবরিযের উত্তর পশ্চিমের এক পাহাড়ী কেল্লায় অবস্থান করছেন। তাতারী লশকর তাঁর অনুসরণ করে তেহরান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, কিন্তু পাহাড়ী এলাকায় কঠিন বরফ পাতের দরুণ পূর্ব ও দক্ষিণে তাতারীদের দ্রুত অগ্রগতির বিপদ সম্ভাবনা নেই। সুলতানের সাথীরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। দুনিয়ায় যাদের কোন ঠিকানা নেই আর যারা জীবন মৃত্যুর পরোয়া না করে তাঁর সাথে থাকার ফয়সালা করছে, এমনি দেড়শোর কাছাকাছি সিপাহী তাঁর সাথে রয়েছে।

সুলতানের বেশীর ভাগ সময় কাটে নিঃসঙ্গ একা। দুনিয়ায় সকল আকর্ষণ তাঁর শেষ হয়ে গেছে। তৈমুর মালিক ও অন্যান্য যোদ্ধাদের শাহাদতের পুর সুলতানের আর কেউ নেই উৎসাহ ও সান্ত্বনা যোগাবার। তিনি শুধু বাঁচবার জন্যই বেঁচে রয়েছেন।

বাগদাদ থেকে নৈরাশ্যজনক খবর পাবার পর সুলতান শরাব ধরেছেন জীবনের তিক্ত বাস্তবকে ভুলে থাকার জন্য চেতনার প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কাছে দুর্বহ। তাই তিনি মাতাল হয়ে থাকতে চান। শরাবের মত্ততার মাঝেও যখন তলোয়ারের ঝংকার তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠে তাঁকে পেরেশান করে তোলে, তিনি তখনও নাচগানের আসর জমাবার হুকুম দেন। কিন্তু শান্তি তাঁর নসীবে নেই। সাথীদেরকে তিনি বলেনঃ 'শরাব আর সংগীত রাগ বাগদাদের ওমরাহকে জিন্দেগীর তিক্ত বাস্তব থেকে সরিয়ে রাখে দূরে কিন্তু আমি তাতেও শান্তি পেলাম না।'

কখনও কখনও তিনি সাথীদের বলেন ঃ 'আমি এক অতি বড় মিনার, যার বুনিয়াদ টলে গেছে। তোমরা চলে যাও এখান থেকে আমার ভয় হয়, যখন আমি পড়ে যাব, তোমরা চাপা পড়বে নীচে।' কখনও তিনি কেল্লার দরজা খুলিয়া বাইরে যান এবং প্রহরের পর প্রহর বরফের তুফানের ভিতর দিয়ে ঘুরতে থাকেন। কখনও শরাবের জাম মুখের কাছে নিয়ে তিনি ছুড়ে ফেলেন, সোরাহী ভেঙে ফেলেন। কখনও আবার কোণায় পড়ে থাকা তলোয়ার তালে তুলে নেন, কোষমুক্ত করে কোন সাথীকে ডেকে বলেন ঃ এটা আমায় মুখ ভেংচাচ্ছে। না, হয়ত এ প্রাণহীন লোহা আমারই মত বিক্ষুব্ধ। হয়ত এরও আত্মভোলা হবার প্রয়োজন রয়েছে। যাও, এটাকে শরাবের পাত্রে ডুবিয়ে রাখ।'

একদিন অবিরাম বরফ পড়ছিল। কেল্লার ভিতরে সুলতানের সামনে নাচ গানের মাহফিল সরগরম হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত চলছে শরাবের মউজ। দরজার পাহারাদার এসে খবর দিল ঃ 'বাগদাদ থেকে আবদুল মালিক আপনার সন্ধানে এখানে এসে পৌছেছেন। তিনি আপনার খেদমতে হাজির হবার এজাযত চান।'

সুলতান বললেন ঃ 'আবদুল মালিক! তিনি কি করে এলেন এখানে? আমার কাছে তাঁর কি কাজ এখনও? আর কে আছে তাঁর সাথে?'

ঃ ' আরও পাঁচজন সিপাহী।'

ঃ 'তোমরা কেন বললে, আমরা এখানে রয়েছি?'

ঃ 'আমি বলেছিলাম যে, আপনি নেই এখানে, কিন্তু তাঁরা কাছের বস্তির একটি লোককে নিয়ে এসেছেন সাথে। তাঁরা নাকি আযরবাইজানে কয়েক হফতা ঘুরে ফিরে বহু কষ্টে আপনার সন্ধান পেয়েছেন।'

এক ব্যক্তি বললেন ঃ 'সুলতানে মুয়াযযম! হয়ত তিনি বাগদাদ থেকে কোন ভাল খবর নিয়ে এসে থাকবেন।'

সুলতান চিৎকার করে বললেন ঃ 'আমার সামনে বাগদাদের কথা বল না। ডাকো তাকে।'

আবদুল মালিক কামরায় ঢুকে মাহফিলের ধরণ দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

'এস, আব্দুল মালিক! এগিয়ে এস। থেমে গেল কেন? আমার কাছে এসে বস।' বলে সুলতান শরাবের পিয়ালা তুলে মুখে ধরলেন।

আবদুল মালিক এগিয়ে গিয়ে সুলতানের কাছে বসলেন।

গায়কদের উদ্দেশ্যে খারেযম শাহ্ বললেন ঃ 'তোমরা কেন চুপ করে গেলে? গাও।' আবার সংগীত রাগ শুরু হয়ে গেল। সুলতান সোরাহী তেকে শরাব ঢেলে পিয়ালা ভরলেন। খানিকটা পান করে তিনি পিয়ালা সামনে রেখে বললেন ঃ 'আবদুল মালিক, আমি মনে করেছিলাম এ জায়গা জিন্দেগীর কোলাহল থেকে বহুত দূর। আশা ছিল, এখানে কেউ আমায় অনুসরণ করবে না, কিন্তু এবার এ ঠিকানাও বদলাতে হবে। বাগদাদের সৈন্যদলকে তুমি কোথায় ছেড়ে এলে? যেসব কথা আমি ভুলতে চাচ্ছি, তুমি এখানে এসে তাই আমার মনে জাগিয়ে দিচ্ছো।'

সুলতান আবার পিয়ালা তুলে নিলেন, কিন্তু আবদুল মালিক তাঁর হাত থেকে পিয়ালা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন এবং খঞ্জর বের করে সুলতান জালালউদ্দীনের সামনে রেখে বললেনঃ 'সুলতানে মুয়াযযম! আমি হয়ত গোস্তাখী করেছি আপনার কাছে। এই নিন, আপনার নিজ হাতে আমায় মৃত্যুর গহ্বরে ফেলে দিন। এ আমি দেখতে পারছি না। আপনি আমার চোখ উপড়ে ফেলুন।'

গান তখনও থেমে গেছে। মাহ্‌ফিলে ছেয়ে গেছে এক স্তব্ধ শূন্যতা। সুলতান অপ্রত্যাশিত নির্ভরতা সহকারে তাকালেন আবদুল মালিকের মুখের দিকে। তারপর সোরাহী তুলে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন ঃ 'এই নাও, এটাকেও ভেঙে ফেল। আমি নিজে কয়েকবার ভেঙেছি। এসব জিনিষ ভেঙেও শেষ হয় না। এসব মাটির তৈরী জিনিষ, একবার ভেঙে ফেললে আবার জোড়া লাগে। আর জোড়া না লাগলেও নতুন করে তৈরী করা যায়। মত আর মানুষের দীল নয়, একবার ভাঙলে যা ব্যর্থ হয়ে যায় চিরকালের জন্য।'

আবদুল মালিকের পেরেশানি ও দ্বিধা লক্ষ্য করে সুলতান জালালউদ্দীন সোরাহীটি ছুঁড়ে মারলেন দেয়ালের দিকে।

আবদুল মালিক সজল চোখে বললেন ঃ 'সুলতানে মুয়াযযম! আমার জিন্দেগীতে একটি মাত্র লোক দেখেছি, যিনি নৈরাশ্য কাকে বলে, জানেন না। কিন্তু আজ?'

জালালউদ্দীন বললেন ঃ 'যে লোকটিকে তোমরা জালালউদ্দীন খারেযম শাহ্ নামে জানতে, তিনি মরে গেছেন। তুমি এখনও কথা বলছো তাঁর লাশের সাথে। আচ্ছা বলত, তুমি কি করে এখানে এলে?'

ঃ 'আমি বাগদাদ থেকে রেযাকারদের একটি জামা'আত নিয়ে এসেছিলাম আর-।'

সুলতান বাধা দিয়ে বললেন ঃ 'কত রেযাকারের জামা'আত?'

ঃ 'আমার সাথে পাঁচ হাজার লোক রওয়ানা হয়ে এসছিল।'

ঃ 'তুমি ভুল করেছ। আমি তোমায় মানা করেছিলাম।'

ঃ 'আপনার হুকুম যখন পেলাম, তখনও আমরা বাগদাদ থেকে এক মঞ্জিল এগিয়ে এসেছি। আপনার হুকুম শুনে তিন হাজার সিপাহী ফিরে চলে গেল আর-।'

সুলতান আবার বাধা দিয়ে বললেন ঃ 'আর বাকী দু'হাজার নিশ্চয়ই কোথাও তাতারীদের ঘেরার মধ্যে পড়েছিল।'

আবদুল মালিক বিষন্ন কণ্ঠে জওয়াব দিলেন ঃ 'হাঁ, তাবরিয ও হামদানের মাঝখানে তাদের কয়েকটি দল আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল।'

ঃ 'কত সিপাহী জিন্দাহ্ রয়েছে?'

ঃ 'দু'শোর কাছাকাছি। তাবরিযে পৌঁছে আপনার সন্ধান না পেয়ে পাঁচজন ছাড়া আর সবাই নিরাশ হয়ে চলে গেছে। এই পাঁচজনকে সাথে নিয়ে প্রায় দু'মাস পাহাড়ে পাহাড়ে আপনাকে তালাশ করে এখানে পৌঁছে গেছি।'

জালালউদ্দীন বললেন ঃ 'এতগুলো জান তুমি বিফলে নষ্ট করলে।'

ঃ 'আমার ভুল আমি বুঝতে পারছি। আমার উচিত ছিল কুর্দিস্তান থেকে ঘুরে চলে আসা। কিন্তু যে লাখো লাখো মানুষ শেষ বিজয়ের আশা নিয়ে আপনার সাথে সাথে রয়েছে, পরাজয় সম্পর্কে আপনার নিশ্চিত বিশ্বাস যে তাদের সকল কোরবানী ব্যর্থ করে দেবে, তাকি আপনি বুঝতে পারছেন না?'

সুলতান জবাব দিলেন ঃ 'তুমি তো চাচ্ছো, যতদিন আমি জিন্দাহ্ থাকব, ততদিন কিছু কিছু মুসলমানকে জমা করে মওতের মুখে ঠেলে দিতে থাকব। আলমে ইসলাম একদিন সচেতন হয়ে উঠবে, এই আশা নিয়ে আমি এতদিন লড়াই করে এসেছি। তাদেরকে আমি প্রস্তুতির জন্য সময় দিতে চেয়েছিলাম এবং আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। মারাকেশ থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত সব জায়গা থেকে আমি বিশ্বাসসূচক পয়গাম পেয়েছি, কিন্তু তার ফল কি হল? আমি কার উপর ভর করে উঠে দাঁড়াব, কোন আশা নিয়ে লড়াই করব? এ কওমের কাছে তুমি কি প্রত্যাশা করছো? এ কওমের ওমরাহ্ আজ মিল্লাতকে বিক্রী করে দিচ্ছে। ওলামার ভিতরে পয়দা হয়েছে এমন এক জামা'আত, যারা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে দিচ্ছে তাতারীদের গোলামীর ফতোয়া। সিপাহীর তলোয়ার ভোতা হয়ে গেছে দুশমনের দৌলতের লালসায়। আর এ কওমের খলিফা-তাঁর কথা আমি আর বলতে চাই না।'

ঃ 'এর সব কিছুই হয়েছে খলিফার কারণে, কিন্তু খলিফার ওয়াদা খেলাফের পর আল্লাহ্র রহমতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। আপনি আবার হিন্দুস্তানে চলুন। হিন্দুস্তান না হয়, মিসর অথবা মারাকেশের দরজা আপনার জন্য খোলা থাকবে। তাতারীদের উপর উত্তরের বরফ ঢাকা এলাকার পরাজয়ের বদলা নিতে পারবো আমরা আফ্রিকার তপ্ত মরুভূমির ভিতরে। সম্ভবতঃ এখনও আল্লাহ্র রহমত নাযিল হবার সময় আসেনি। আল্লাহ্র রহমতের জোশ না জাগা পর্যন্ত আমরা লড়াই করে যাব। ধরুন, তুর্কীস্তান থেকে তাতারীদের আপনি বিতাড়িত করতে না পারলেন, কিন্তু সুলতান ও সিপাহ্‌সালার হিসাবে না হলেও এক সিপাহী হিসাবে আপনি আর কোন রাজ্যের খেদমত করতে পারেন, এটা তো আপনার আয়ত্তেরই ভিতরে।'

সুলতান তিক্ত কণ্ঠে বললেন ঃ 'কেন তুমি আমার পেরেশান করছ? কয়েকটি রাজ্যে আমি পয়গাম পাঠিয়েছি, আর তাদের কাছ থেকে জবাবও পেয়েছি। তারা ঠিক কথাই বলেছে। এক পরাজিত বাদশাহকে আশ্রয় দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তাতারীদের পাঁচ লাখ ফৌজ আমার পেছনে রাতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা তাদের ফৌজে একজন পরাজিত সিপাহীকে টেনে নিয়ে কেন তাতারীদের হামলা ডেকে নেবে? আমি ছিলাম শুধু একজন

সিপাহী এবং আমার কর্তব্য আমি পালন করেছি। আমার সম্বল ছিল শুধু তলোয়ার। তার ধার যতক্ষণ ছিল, আমি লড়াই করেছি। কিন্তু তুমি তো শুধু সিপাহী নও, আলেমও। তোমার কর্তব্য আজ শেষ হয়নি। তুমি যাও, এখনও আমার আর তোমার পথ আলাদা হয়ে গেছে।'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'কিন্তু একটি পথ আমাদের দু'জনেরই জন্য রয়েছে খোলা।'

ঃ 'সে কোন পথ?'

ঃ 'ইজ্জতের সাথে মওত। সে পথে আমরা দু'জন একত্র হয়ে চললে কেউ বাঁধা দেবে না।'

জালালউদ্দীন উঠে কোন কথা না বলে আর এক কামরায় চলে গেলেন। খানিকক্ষণ পর তিনি ফিরে এলেন সওয়ারের বেশে। মজলিসের সব উঠে দাঁড়ালেন।

সুলতান বললেন ঃ 'আবদুল মালিক, ইজ্জতের সাথে মরবার জন্য আমায় কোন সাথী খুঁজতে হবে না। দুনিয়ার সকল অশান্তি, সকল কোলাহল আমি শরাবে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু শান্তি আমার নসীবে জোটেনি। সঙ্গীত সুরে বিভোর হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তলোয়ারের ঝংকার আমার মনে বেজেছে অবিরাম। আমি চলে যাচ্ছি, আর তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছি, কেউ যেন আমার অনুসরণ না করে। মুসলমানদের হেফাজতের জন্য আমি তোমাদের তলোয়ারের উপর নির্ভর করেছিলাম, কিন্তু আজ আমার নিজের জন্য আমি কারুর জান বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে চাই না। আবদুল মালিক! আমার শরাবের মত্ততা দেখে তুমি দুঃখ পেয়েছ। আমার দীলের মধ্যে তৈমুর মালিকের খুনের পর তোমার অশ্রুর জন্যই সব চাইতে বেশী শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি ওয়াদা করেছি, জীবনের আর কোনদিন শরাব স্পর্শ করব না। তুমি ফিরে গিয়ে তোমার কর্তব্য করে যাও। হিন্দুস্তান যাওয়াই তোমার জন্য ভাল হবে। তাহির এখনও সেখানেই রয়েছেন। তার সাথে দেখা হলে আমার তরফ থেকে বল, তিনি যেন সুলতান আলতামশের কাছে থাকেন। তিনি মানতে না চাইলে বল ঃ এ আমার হুকুম-আমার আখেরী হুকুম।'

সুলতান এক ব্যক্তিকে ঘোড়া তৈরী করবার হুকুম দিলেন।

এক সরদার প্রশ্ন করলেন ঃ 'এ বরফ পাতের ভিতর দিয়ে আপনি কোথায় যাবেন?'

সুলতান বললেন ঃ 'এ প্রশ্ন করবার এজাযত আমি তোমায় দেইনি। যদি তুমি আমার জন্য কিছু করতে চাও, তাহলে দোআ কর, খোদা আমায় যেন ইজ্জতের মৃত্যু থেকে বঞ্চিত না করেন। তোমরা শীগ্‌গির এখান থেকে চলে যাও। আমি চাই না যে, তোমাদের উপস্থিতির জন্য তাতারীরা এ এলাকাটিও তাবা ও বরবাদ করে দেয়। আবদুল মালিক! এদের মধ্যে বেশীর ভাগের বাড়ি-ঘর কিছু নেই। তাদেরকে আমি তোমার হাতে সোপর্দ করে গেলাম। তাদেরকে তুমি হিন্দুস্তানে নিয়ে যাও। আমার বিশ্বাস, সুলতান আলতামশ তাদের সাহায্য করবেন।'

কিছুক্ষণ পর কেল্লার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সবাই সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিলো। সবারই চোখ তখনও অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছে। সুলতান যখন ঘোড়া হাকাচ্ছেন,

তখনও একটি লোক ছুটে গিয়ে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরলে তিনি থেমে গেলেন। লোকটি বলল ঃ 'ছোটবেলা থেকে আমি আপনার সাথে থেকেছি। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমায় আপনার সাথে যাবার এযাজত দিন।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা, তুমি আমার সাথে আসতে পার। কিন্তু আর কেউ আমার হুকুম অমান্য করলে আমি খুবই দুঃখিত হব।'

সুলতান জালালউদ্দীন খারেযম শাহ্‌ বরফপাতের তুফানের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর তিনি কোথায় থাকলেন আর কি অবস্থায় থাকলেন, তা কেউ জানলো না। কয়েক বছর ধরে তাঁর সম্পর্কে শোনা যেতে লাগল নানারকম বিচিত্র কাহিনী। কখনও গুজব শোনা গেল, অমুক বস্তিতে তাঁকে দেখা গেছে দরবেশের লেবাসে। কখনও কিসা শোনা গেল, কোন এক জংগলে তিনি গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। কেউ বা বলল, তিনি দুনিয়ার লোকের চোখের আড়ালে গিয়ে তাতারীদের সাথে শেষ লড়াই করবার জন্য এক যবরদস্ত ফৌজ সংঘবদ্ধ করছেন এবং আচানক একদিন অমুক জায়গায় আত্মপ্রকাশ করবেন।

তাতারীরা সুলতানের সন্ধান করে বেড়ালো রাজ্যের প্রতি কোণে। অগুণ্তি মানুষকে জালালউদ্দীন মনে করে হত্যা করল তারা এবং তাঁর সন্ধান পাবার জন্য মোটা মোটা ইনাম ঘোষণা করল, কিন্তু কোথাও তাঁর কোন সন্ধান মিলল না।

কোন কোন লোক বলল ঃ তিনি সাধারণ সিপাহীর লেবাস পরে তাতারীদের কোন এক চৌকির উপর হামলা করে শহীদ হয়েছেন। আবার কেউ ধারণা করল কওমের কোন গাদ্দার অথবা তাতারীদের চর তাঁকে কতল করে ফেলেছে।

অবশ্যি সময় অতিক্রান্ত হতে হতে মানুষের মনে ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মাতে লাগল যে, শেরে খারেযম আর এ দুনিয়ায় নেই।

●

এক সন্ধ্যায় বাগদাদ থেকে কয়েক মঞ্জিল দূরে এক বস্তির সরাইখানার সামনে এসে আবদুল মালিক ও তাঁর সাথীরা ঘোড়া থেকে নামলেন।

রাতের বেলায় যখন সরাইখানার তামাম কামরা লোকে ভরে গেল, তখনও সরাইখানার মালিক আবদুল মালিকের কামরায় এসে বললেন ঃ 'আর একজন গণ্যমান্য লোক এসেছেন। বাকী কামরাগুলোয় তিল ধারণের স্থান নেই। তাঁর জন্য আপনাকে খানিকটা তকলীফ করতে হবে।'

ঃ 'আমি তাঁকে না দেখে আমার কামরায় থাকবার এজাযত দেব না।' আবদুল মালিক বলে দিলেন।

সরাইর মালিক বলল ঃ 'লোকটি খুবই ক্লান্ত, আর তাঁকে তাতারীদের চর বলে মনে হয় না।'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'তাতারীদের না হলে খলিফার চর হবে।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস লোকটি গুপ্তচর নয়। সরাইওয়ালাদের সাথে গুপ্তচররা অমনি হুকুমের স্বরে কথা বলে না। আমি তাঁকে স্থান দিতে অস্বীকার করলে তিনি পেট চিড়ে ফেলবার ধমক দিয়েছেন।'

একটি লোক ভিতরে প্রবেশ করে বললেন ঃ 'আমি এঁর সাথে ফয়সালা করে নিচ্ছি।' তুমি জলদী খানা নিয়ে এস।'

'তাহির!' আবদুল মালিক ছুটে গিয়ে আগন্তুককে আলিঙ্গন করে বললেন ঃ 'তুমি কি করে এলে এখানে?'

ঃ 'আমি বাগদাদ থেকে এসেছি এবং সুলতানের সন্ধানে আযরবাইজান যাচ্ছি।'

আবদুল মালেক প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি বাগদাদে কবে এলে?'

ঃ 'চারদিন হল। মধ্যরাত্রে বাগদাদে পৌছে আমি তোমার বাড়ি থেকে সব খবর জেনে ভোরে এদিকে ফিরে এসেছি।'

ঃ তাহলে তুমি সব খবরই জেনেছ?

তাহির নৈরাশ্যের স্বরে জওয়াব দিলেন ঃ হ্যাঁ।

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'তুমি এখানে আসতে খুব দেরী লাগিয়েছ।

তাহির বললেন ঃ 'সুলতান আলতামশ আমায় এক কাজের ভার দিয়ে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। তোমার দূতের সাথে আমার দেখা হয়েছে দেরীতে।'

ঃ ' তোমার বিবি কোথায়?'

ঃ 'তাঁকে দিল্লীতে রেখে এসেছি। এ সফর ছিল খুবই কঠিন। বাগদাদে আমি জানলাম যে, তোমাদের উপর তাতারীরা পথে হামলা করেছে। তোমার জন্য আমার খুবই উদ্বেগ ছিল। এখনও তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ঃ 'আমি কেবল বাচ্চাদেরকে আনতে বাগদাদে যাচ্ছি।'

ঃ 'সুলতান জালালউদ্দীন সুলতান আলতামশের নামে কোন পয়গাম পাঠিয়েছেন কি?'

ঃ 'না।'

তাহিরের কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে আবদুল মালিক তাঁর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তাহির বহুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। সরাইর মালিক খানা এনে তাঁর সামনে রেখে গেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধা তখনও মরে গেছে।

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'আমি এদেরকে আমার সাথে বাগদাদে নিয়ে যেতে চাই না। আমার ইরাদা ছিল, এদেরকে এই সরাইখানায় রেখে আমি বাগদাদ থেকে বাচ্চাদের নিয়ে আসবো। তারপর আমরা যাব হিন্দুস্তানের দিকে। এখনও তুমি এসে গেছ। আমার চাইতে তুমি ভাল চিন্তা করত পার।'

তাহির বললেন ঃ 'যদি সুলতানকে খুঁজে আমি হিন্দুস্তানে যেতে রাজী করত পারি, তাহলে আমার বিশ্বাস, এখনও সুলতান আলতামশের কোন আপত্তি হবে না।

জালালউদ্দীনের পয়গাম পেয়ে তিনি তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে রাজী হয়েছিলেন।

ঃ 'কিন্তু খারেযম শাহকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। আর যদি আমরা তাকে খুঁজে পাই, তবু তিনি হিন্দুস্তানে যেতে রাজী হবেন না। পড়ে যাওয়া পাঁচিল হয়ত আবার তোলা যায়, কিন্তু পড়ে যাওয়া পাহাড়কে আবার দাঁড় করানো যায় না।'

তাহির খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন ঃ ' বহুত আচ্ছা, তুমি সাথীদের এখানে রেখে যাও, কিন্তু আমি অবশ্যি তোমার সাথে বাগদাদে যাব।'

ঃ 'সে তোমার মর্জি, কিন্তু ওখানকার নিভে যাওয়া ছাইয়ে ফু দিয়ে কোন লাভ হবে না। ওখানে এখনও এমন কোন ওলামাও পয়দা হয়েছেন, যাঁরা তাতারীদের 'যিল্লুল্লাহ' আর 'উলিল আমর' বলে থাকেন।'

ঃ 'ওখানে আমি আমার শেষ কর্তব্য পালন করতে চাই।'

ঃ 'সে কি?'

ঃ 'আওয়ামকে আমি বলব যে, বাগদাদের ধ্বংস আসন্ন প্রায়। যদি তারা আসন্ন তুফানের মোকাবিলা করবার জন্য তৈরী না হয়ে থাকে, তাহলে আমি তাদের আরও কোন আশ্রয় খুঁজে নিতে বলব। খলিফাকে আমি বলতে চাই যে, তাঁর নিজের ঘর হেফাজত করবার জন্য তৈরী থাকা উচিত।'

ঃ 'কিন্তু এসব নিরর্থক। তুমি হয়ত জান তাতারীদের সাথে চুক্তি হবার সাথে সাথেই খলিফা মুহাল্লাবকে উজিরে আজম বানিয়ে নিয়েছেন।'

ঃ 'তাঁর জন্যও আমি ওখানে যেতে চাই। হ্যাঁ, মোবারক কোথায়?'

ঃ 'সে বাগদাদেই রয়েছে'।

## -তেইশ-

বাগদাদে অন্তহীন বিতর্কের নতুন ধারা আবার শুরু হয়ে গেছে। দরিয়ার কিনারে খোলা ময়দানে শিয়া ও সুন্নি ওলামার মধ্যে চলছে জবরদস্ত বিতর্ক। উভয় জামা'আতের বড় বড় ওলামা হিস্যা নিচ্ছেন বিতর্কে। আওয়ামের মনে হচ্ছে যেন তাদের জীবনের হারিয়ে যাওয়া আনন্দ ফিরে এসেছে আবার।

হামদানে তাতারীদের সেনাসমাবেশ বাগদাদের বাসিন্দাদের কাছে মনে হয় এক তিক্ত বাস্তব। খলিফা ও তোলাই খানের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক সত্ত্বেও কার মনে এ ভুল ধারণা জাগে না যে, মওকা পেলে তাতারী বাগদাদের উপর হামলা করবে না। বাগদাদের বাসিন্দারা যেন ঠিক সেই উটপাখীরই মত, যারা ঝড়ের আভাস দেখলে মাথা লুকায় বালুর ঢিবির মধ্যে। বাহসে আর বিতর্ক যেন তাদের কাছে এক নিদ্রাকর নেশা। ইসলামের দুশমন যখন তুর্কীস্তান, খোরাসান ও ইরানের ময়দানে তাঁবু ফেলে আলমে ইসলামের উপর শেষ আঘাত হানবার জন্য শাণিত করছে তাদের তীর তলোয়ার, বাগদাদে তখনও নামধারী মুসলমানরা শুধু এইটুকু জানবার জন্য বেকারার যে, কোন দলের ওলামার জবানের ছুরি অপরের চাইতে বেশী ধারালো-বেশী বিষাক্ত?

তাহির বিন ইউসুফ আর তাঁর সাথীরা তাদের ভিতরে প্রাণচাঞ্চল্য এনেছিলেন ক্ষণিকের জন্য, আর তাঁদের উদ্যম উৎসাহে এসব ওলামার কারবারে ভাটা পড়েছিল সাময়িকভাবে। গত চার শতাব্দী ধরে একে অপরকে ঝুটা কাফির প্রমাণ করাকে যারা মনে করত ইসলামের অতি বড় খিদমত, তাদের স্থান সাময়িকভাবে দখল করেছিলেন হকপরস্ত ওলামার দল-যারা আল্লাহ ও রসুলের পথের নামে মাত্র অনুসারীদের ধ্বংস ও বরবাদির হাত থেকে বাঁচানোকে মনে করতেন তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য। কিন্তু হক পরাস্তদের এ জামা'আত তাদেরকে তলোয়ারের গুরুত্ব বোঝাতে পারেননি। ফলে বাগদাদের ওলামা অত্যন্ত হয়ে পড়েছে কিতাবের মধ্যে সব ব্যাধির এলাজ খুঁজতে। তাহিরের দাওয়াতে তারা নেমেছিল ময়দানে, আর তাঁদেরই চেষ্টায় আচানক আওয়ামের মনে এসেছে এক পরিবর্তন। কথার পরিবর্তে কাজেরই ভিতরে তারা দেখতে পেয়েছিল তাদের নাযাতের পথ। খারেযম শাহকে তারা আত্মরক্ষার শেষ প্রাচীর মনে করে ঝুঁকে পড়েছিল তাঁরই দিকে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে সব উদ্যম উৎসাহে ভাটা পড়ে গেছে। দূরদারায় মুলুক থেকে আগত রেযাকার হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। খলিফা ছিলেন তাদের হেফাযতের জামিন, আর খলিফার নয়া উযির দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তাতারীদের বানিয়ে ফেলেছিলেন বাগদাদবাসীদের মুহাফিয ও দোস্ত। তাদের চোখে ঐক্য, সংহতি ও জিহাদের উপর গুরুত্ব আরোপকারী ওলামার গুরুত্ব কমে যেতে লাগল। তারা ঝুঁকে পড়ল আবার সেই সব ওলামার দিকে, যাঁরা বিতর্কের কামিয়াবীকে মনে করতেন দুনিয়া ও আখেরাতের সব চাইতে বড় সৌভাগ্য। শিয়া-সুন্নীর এ বিতর্ক ছিল বাগদাদে এলম ও জ্ঞানের বারিবর্ষণের দ্বিতীয় ধারার সূচনা।

●

বিতর্কের তৃতীয় রাত্রি। সামনা-সামনি স্টেজের উপর সামিয়ানা খাটানো। বিতর্কে হিস্যাদার ওলামা কুরসীর উপর সমাসীন। তাদের সামনে বড় বড় টেবিলের উপর। কিতাবের স্তুপ। আলোর জন্য দু'টি জামা'আতের রেযাকার মশাল নিয়ে দাঁড়ানো। তাছাড়া কোথাও কোথাও ঝুলছে ফানুস। মাঝখানে সালিসের জন্য এক আলাদা মঞ্চ। চারদিকে অগুণতি জনতার ভীড়।

আগের দু'দিন বিতর্কের নীতি ও পদ্ধতি স্থির করতে কেটে গেছে। দু'দিকের ওলামা হলফ করেছেন যে, তারা কোন রকম উত্তেজনা সৃষ্টি করবেন না। শ্রোতাদের ধারণা, এ আকর্ষণ কমসে কম ছয় মাস তো চলবেই। বিতর্কের মজলিস শেষ হবার আগে মওসুমের পরিবর্তন হোক, কিষাণ ছাড়া আর কেউ তা চায় না। তারা বারবার মনে করেছে, যদি বা ঝড় বৃষ্টির জন্য বিতর্ক দু'একদিন মুলতুবী থাকে, তাহলে বিতর্ককারীরা আবার নতুন উদ্যম নিয়ে বহস শুরু করবেন গোড়া থেকে। আজ সন্ধ্যার আগে পশ্চিম আসমানে ছেয়ে গেল কালো মেঘ। কিন্তু লোকের ধারণা ঝড় আসবে না এ মওসুমে। তাছাড়া বহস শুরু হবার আগে সালিসের আবেদনে তারা দোয়াও করেছে, যেন আজকের মজলিস ভালয় ভালয় শেষ হয়।

কাতারে কাতারে লোক বসে আছে। দ্বীনের ঘাঁটি থেকে এলমের তোপ ছুটবার উপক্রম হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ঝড়ের এক তীব্র ঝাপটা এল। মশালগুলো নিভে গেল। শামিয়ান-

ার রসিগুলো ছিঁড়ে গেল। শামিয়ানায় লটকানো ফানুসের বদৌলত দু'দিকের মঞ্চেই ধরে গেল আগুন। ওলামা দল জান নিয়ে বাইরে ছুটে গেলেন, কিন্তু হট্টগোলের মধ্যে বহু দামী কিতাবগুলো আর বের করা গেল না বাইরে।

কয়েকবার আগুনের হলকা ওঠার পর হাওয়া থেমে গেল। আসমান সাফ হয়ে এল। কিন্তু মঞ্চের উপর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা শত জিহ্বা মেলে তখনও উঠছে আসমানের দিকে। সালিসের মঞ্চ তখনও আগুনের কবল থেকে বেঁচে রয়েছে। তাঁর শামিয়ানা তখনও নিরাপদ। তাঁর ডানে বায়ে অগ্নিশিখার আলোয় লোকেরা দেখলো, সিপাহীর পোষাকে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছেন সালিসের কাছে এবং তিনি দু'হাত উঁচু করে তাদের চুপ করবার আবেদন জানাচ্ছেন।

কাছের বেশীর ভাগ লোক তাঁকে চিনলো এবং খানিক্ষণের মধ্যে ময়দানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল তাহির বিন ইউসুফের খবর। লোক চারদিক থেকে এসে জমা হতে লাগল সালিসের চারপাশে। আগুনের শিখা তখনও সেই শামিয়ানার দিকেও এগিয়ে আসবার বিপদ সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু কয়েকটি নওজোয়ান রসিগুলো কেটে শামিয়ানা একদিকে ছুঁড়ে ফেলল।

তাহির বিন্‌ ইউসুফকে বক্তৃতা করবার উপক্রম করতে দেখে সালিস বললেন ঃ 'আমার এ মঞ্চ থেকে কাউকেও বক্তৃতা করবার এজাযত দেওয়া যাবে না।' কিন্তু আবদুল মালিক দ্রুতপদে এগিয়ে এসে তাঁর কানের কাছে বললেন ঃ ' আপনি চুপ করে বসে থাকলেই ভাল হবে, নইলে খঞ্জর খুবই ধারালো। আর আপনার সদারতেই এ জলসা চলবে এখনও। আপনি চুপচাপ বসে থাকুন।

বিতর্কে যারা শরীক হতে এসেছেন, তাদের নযর তখনও জ্বলন্ত শামিয়ানার নীচে চাপাপড়া কিতাবগুলোর দিকে। সালিসের মঞ্চে কি হচ্ছে, তার কোন খবরই রাখেন না তাঁরা। তাহির বিন ইউসুফের নাম শুনে যখন তারা চমকে উঠেছেন, তখনও তাঁর বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে। তাঁর এই ক'টি কথাই আওয়ামের মন আকর্ষণ করবার জন্য ছিল যথেষ্ট।

'তোমরা যারা হাসি তামাসায় জিন্দেগী কাটাচ্ছ, তাদের কাছে এ ঝড় আর আগুন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক হুঁশিয়ারী। বাবেল ও নিনোয়ার ধ্বংসের কাহিনী হয়ত শুনেছ তোমরা, কিন্তু আল্লাহ যেন সেই দিনটি এগিয়ে না আনেন, যেদিন ভবিষ্যতের মানুষ অতীতের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে বলবে যে, একদিন এখানেও আবাদ ছিল এক "আযীমুশশান শহর, যার নাম ছিল বাগদাদ, যেখানে বাস করত বিশ লাখ মানুষ আর যার মহলগুলো ছিল পাঁচ শতাব্দীর স্থাপত্যের নিদর্শন, কিন্তু তারা বাবেল ও নিনোয়ার বাসিন্দাদের মতই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের ধ্বংসের একমাত্র কারণ, তারা কর্মহীন জীবন যাপন করে খোদা ও রসুলের হুকুমের বিরোধিতা করে চলেছে; তারা কোরআনে হাকীম থেকে জীবনের শিক্ষা গ্রহণ করেনি; কোরআন তাদের শিখিয়েছে ঐক্য ও সংহতি, কিন্তু তাদের জিন্দেগীর সব চাইতে বড় লক্ষ্য ছিল দলাদলি ও অনৈক্য সৃষ্টি; আল্লাহ্‌ তাদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন কুফরের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে, কিন্তু তারা কাফিরদের নিজেদের মুহাফিয ও নিগাহবান মনে করে নিজেরা পরস্পর লড়াই করে এসেছে। বর্বর হামলার ভয়াবহ তুফান তাদের দরজায়

করাঘাত করেছে, আর তারা তখনও আসন্ন হামলার দিক থেকে চোখ বন্ধ করে পরস্পরকে কথার তীরে বিদ্ধ করাই যথেষ্ট মনে করেছে।

বাগদাদের জনগণ! তোমাদের খলিফা আর তোমাদের ওমরাহ্ মাত্র কয়েক বছর নিরাপদ আরামে কাটাবার জন্য তোমাদের ও তোমাদের ভাবী বংশধরদের ইজ্জত ও আবাদী তাতারীদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছে, কিন্তু যে ওমরাহ্ এখানে হাজির রয়েছেন, তারা কান পেতে শুনুন-'বাগদাদের পরিণাম খারেযমের শহরগুলো থেকে আলাদা হবে না। তোমরা বজ্রবিদ্যুতকে দাওয়াত করে আনছো বাগদাদের শস্য-শ্যামল বাগিচার দিকে। তোমরা আপন ঘরের দিকে বয়ে আনছো আগুনের শিখা। আগুন শুধু দগ্ধ করতেই জানে। মনে রেখ, আগুনের শিখা যখন জ্বালাতে শুরু করবে, তখনও বালাখানা আর কুঁড়ে ঘরের মধ্যে তফাৎ থাকবে না।'

মুসলমানগণ! তোমাদের ইতিহাস সাক্ষী, আজ পর্যন্ত কারো তলোয়ার তোমাদেরকে দমিত করতে পারেনি। তোমাদের শক্তি পরাভূত করেছে সকল শক্তিকে। তোমাদের মুষ্টিমেয় সেনাদল পরাজিত করেছে দুশমনের বড় বড় সেনাবাহিনীকে। তোমাদের কমজোরীর কারণ তোমাদের ব্যর্থতা নয়। বরং তোমরা কোথাও পরাজয় বরণ করে থাকলে তার কারণ তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ। তোমরা কোথাও ধ্বংসের মোকাবিলা করে থাকলে সেখানে ছিল তোমাদের গাদ্দারদের হাত।'

এক ব্যক্তি বুলন্দ আওয়াজে বলল ঃ 'জালালউদ্দীনের পরাজয়ের মূলেও কি কোন গাদ্দারের হাত ছিল?'

তাহির জবাবে বললেন ঃ 'কে বলবে, জালালউদ্দীন তাতারীদের হাতে পরাজিত হয়েছেন? তিনি এক পাহাড়ের মত দাঁড়িয়েছিলেন তাতারী সয়লাবের গতিরোধ করে। কোন বড় তুফানই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, কিন্তু সেই পাহাড়কে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য আলমে ইসলামের কারিগররা তাদের হাতের যন্ত্র তুলে দিয়েছে তাতারীদের হাতে। জালালউদ্দীনের ভিতরে তোমরা হারিয়েছ তোমাদের মদদগার বন্ধুকে। তিনি পাহারা দিচ্ছিলেন বাগদাদের দরজায়, কিন্তু তাঁর পিঠে মারা হয়েছে ছুরি। তিনি বছরের পর বছর ধরে তাতারীদের দৃষ্টি তাঁর নিজের দিকে নিবদ্ধ রেখেছেন, যেন তোমরা তৈরী হবার সুযোগ পেতে পার। তুর্কীস্তান, খোরাসান ও ইরানের শহরগুলোর পরিণাম তোমাদের চোখের সামনে। তোমাদের চোখ খুলবার জন্য তাই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সামগ্রিক জীবনের চাইতে তোমরা ব্যক্তিগত মৃত্যুকে দিয়েছো বেশী প্রাধান্য। তোমাদের বোঝা যিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তারই পায়ে তোমরা কুঠার মেরেছ। বাগদাদের জনগণ! তোমাদের ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, খলিফা তোমাদের জন্য বপন করেছেন কাঁটার গাছ। ভবিষ্যতের কাছ থেকে তোমরা ফুলের প্রত্যাশা কর না। তোমরা কি চিন্তা কর না যে, বাগদাদ............।'

তাহিরের মুখের কথা শেষ হবার আগেই দরিয়ার উঁচু কিনার থেকে তীর বর্ষণ শুরু হল এবং একই সঙ্গে তিনটি তীর এসে গেঁথে গেল তাহিরের বর্মে। মঞ্চের আশপাশে কয়েকটি লোক জখম হল এবং চারদিকে গোলযোগ শুরু হয়ে গেল। তাহির নিজের জায়গা থেকে নড়লেন না। তিনি

বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ ' বাগদাদের বাসিন্দারা! আমার পয়গাম শুনে যাও!'

আবদুল মালিক জলদী করে ধাক্কা দিয়ে তাহিরকে মঞ্চের নীচে নামিয়ে দিলেন। আর এক ধমক তীর বৃষ্টি হল এবং মঞ্চের আশেপাশে কিছু লোক জখম হল। ইতিমধ্যে তাহিরের কয়েকটি ভক্ত তলোয়ার হাতে দরিয়ার দিকে ছুটে গেল এবং আরও কতক লোক তাদের অনুসরণ করল। তাদের পৌঁছবার আগেই তীরন্দাযরা উধাও হয়ে গেছে। কয়েকখানা কিশ্‌তি দরিয়া পার হয়ে অপর কিনারের দিকে চলে যাচ্ছে। আবদুল মালিক কয়েকজন রেযাকারকে বললেন দরিয়ার কিনারে পাহারা দিতে; তারপর তিনি ছুটে এলেন তাহিরের কাছে। তিনি বললেন ঃ 'ওরা পালিয়ে গেছে, কিন্তু তুমি জখম হয়েছ। চল, এখানে থাকা ঠিক হবে না।'

কিন্তু তাহির তাঁর বর্মে আটকে থাকা দুটি তীর বের করে ফেলে দিয়ে বললেন ঃ 'এ যখম খুবই মামুলী। আর একটা তীর তুমি বের করে নাও।'

ঃ ' কিন্তু রক্ত?'

ঃ 'কয়েক ফোটা রক্তে খুব ক্ষতি হবে না। জলদী কর। আমি কয়েকটি কথা বলা জরুরি মনে করছি।'

আবদুল মালিক বললেন ঃ 'সে তোমার মর্জি, কিন্তু এ এমন মুর্দা নয় যে, ইস্‌রাফিলের শিংগা ধ্বনি শুনে জেগে উঠবে।'

●

তাহির আর একবার মঞ্চের উপর দাঁড়ালেন। লোকগুলো চুপচাপ বসে গেল। তাহির বললেন ঃ 'বাগদাদের বাসিন্দারা! তোমরা কি চিন্তা কর না যে তোমাদের গাদ্দারীর কারণে খারেযেমের লাখো শহীদের খুন ব্যর্থ হতে চলেছে। কত এতিমের আর্তনাদ আর বিধবার অশ্রু নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। মনে রেখ, বাগদাদের যেসব লোক খারেযম শাহের সাথে গাদ্দারী করছে, তারা কওমের কাছে অপরাধী, কুদরত তাদেরকে মাফ করবেন না কখনও। কুদরতের ফয়সালা অটল। আমার দোয়া হয়ত সে ফয়সালা বদল করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা যদি শুধু বেঁচে থাকতেই চাও, তাহলেও আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দেব ঃ তোমরা বাগদাদ ছেড়ে আর কোথাও চলে যাও। যে শহরে এত গাদ্দার, এত দুষ্কৃতকারীর বাস, প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে তার রেহাই নেই। যারা তাতারীদের কাছে মিল্লাতকে বিক্রী করে দিয়ে তার দাম উসুল করে নিয়েছে, তাদের কাছে আমার এ পরামর্শ হয়ত কবুল করার যোগ্য হবে না, কিন্তু আওয়ামকে আমি বলবো, তারা যেন না থাকে এখানে। তোমাদের ওলামার দলাদলি, ওমরাহের গাদ্দারী আর খলিফার অপরিণামদর্শিতার কারণে বাগদাদ যমিনের বুক এক দুষ্টক্ষতে পরিণত হয়েছে। কুদরত যখন সে ক্ষতের উপর অস্ত্র চালনা করবেন, তখনও তাঁর তীক্ষ্ণ নির্মম ছুরি শুধু দূষিত রক্তই বের করে দেবে না, তার সাথে সাথে বিশুদ্ধ রক্তও বেরিয়ে আসবে।

'তোমরা মনে কর না যে, তোমাদের খলিফার আধ্যাত্মিক শক্তি তোমাদের নিরাপত্তার জামিন হবে। মনে কর না যে, তাতারী আল্লাহ্ রসুলকে মানে না বলেই তোমাদের মত নাম-

কা-ওয়াস্তে মুসলমানের উপর বিজয়ী হবে না। খোদা ও রসূলের সাহায্য শুধু তাদেরই জন্য যারা হুকুম তামিল করে চলে। তাতারীরা কাফির, তারা মুসলমান হবার দাবীও করে না। কিন্তু কর্মের দিক দিয়ে তোমরাও খোদা রসূলের হুকুমের বিরোধী।

তাতারী মিথ্যাবিধানের বিজয়ের জন্য জীবন বাজি রেখে লড়ছে। ইসলাম তোমাদেরকে দিয়েছে জিহাদের দাওয়াত। ইসলাম তোমাদেরকে শিখিয়েছে যে, তোমরা দুনিয়ার তামাম বিভেদের মূলোচ্ছেদ করবার জন্য পয়দা হয়েছ, কিন্তু খোদার সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও তোমরা লড়ছ না। মনে রেখ এমনি হিম্মৎ হারা বুজদীল কওম কখনও আল্লাহর রহমতের যোগ্য হতে পারে না। পূর্ব পুরুষের আমানতের বোঝা বইবার যোগ্য তোমরা নও। মনে কর না যে, তোমরা মিটে গেলে ইসলামও তার সাথে সাথে মিটে যাবে। না, আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনের ভালরই জন্য আর কোন কওমকে বাছাই করে নেবেন। আল্লাহ্‌র দ্বীন তোমাদের মুখাপেক্ষী নয়, তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। কুদরতের পক্ষে এও অসম্ভব নয় যে, যে তাতারী আজ ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমন, ইসলামের সংরক্ষণের জন্য তাদেরকেই তিনি মনোনীত করবেন। ইসলাম চায় এমন দীল, যে দীল খোদা ছাড়া কাউকেও ভয় করে না। প্রয়োজন রয়েছে এমন দলের, যারা খোদা ছাড়া আর কারো সামনে শির ঝুঁকাবে না। এমন তলোয়ার চাই, যা কখনও ঝিমিয়ে পড়বে না। ইসলাম চায় এমন সিপাহী, যারা আল্লাহ্‌র রাহে জয় পরাজয়ের পরোয়া না করে লড়াই করতে পারে। ইসলাম চায় নেকদীল, নেক স্বভাব ও বিশ্বস্ত মানুষ, যারা কওমের সাথে গাদ্দারী করে না। সে ওলামার প্রয়োজন নেই, যারা কাফিরের হুকুমাতের পক্ষে ফতোয়া দেয়। প্রয়োজন সেই ওলামার, যাঁরা তীরবৃষ্টি ও তলোয়ারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কলেমা পড়তে পারেন। খোদার দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন নেই মর্মরের বালাখানার বাসিন্দার ও বহু দামী লেবাস পরিহিত ওমরাহের। প্রয়োজন সেই সহিষ্ণু ও শোকরগুজার সিপাহীর, যারা পেটে পাথর বেঁধে লড়াই করে যেতে পারে।

'বাগদাদের জনগণ! তোমাদের সামনে রয়েছে দুটি পথ। এক হচ্ছে, তোমরা অতীতের ভুলত্রুটির জন্য তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য সচেষ্ট হও এবং আসন্ন মুসীবতের মোকাবিলার জন্য ঐক্যবদ্ধ হও, কিন্তু তা তোমরা ততক্ষণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা বাগদাদের অলিগলি থেকে গাদ্দার ও বিভেদ সৃষ্টিকারী লোকগুলোকে দূর করে দিতে পারবে। দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে ঃ তোমরা বাগদাদ ছেড়ে আর কোথাও চলে যাও। এর উপর খোদার গযব আসন্ন। আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, দজলার পানি লাল হয়ে যাচ্ছে তোমাদেরই বুকের খুনে, তোমাদেরই মাথা দিয়ে তাতারীরা তৈরী করছে তাদের বিজয় মিনার। এই শহরকেই দেখতে হবে নৃশংস বর্বরতার ও জুলুমের তাণ্ডব নৃত্য, যা আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি। হয়ত বাগদাদের ধ্বংসলীলার সামনে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে বাবেল ও নিনোয়ার ধ্বংসতাণ্ডব।

'এই বক্তব্য শেষ করে আমি বাগদাদে আমার শেষ কর্তব্য পালন করছি। এরপর আর তোমরা আমায় দেখতে পাবে না। তার কারণ এ নয় যে, আমি বিপদ সম্ভাবনা দেখে পালিয়ে যাচ্ছি; বরং তার কারণ আমি আত্মহত্যাকারীদের সাথে না থেকে তাদের সাথেই থাকতে চাই, যারা জিন্দাহ্ থাকতে চায়। তোমরা আমার প্রয়োজন অনুভব করছো না বলেই আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু যদি আমি বুঝতাম যে, তোমাদের মধ্যে জিন্দাহ্ থাকার আকাঙ্খা পয়দা হচ্ছে

এবং তোমরা বাগদাদকে গাদ্দারদের অস্তিত্ব থেকে পাক করবার জন্য তৈরী হচ্ছো, তাতারীদের হেফাজতে জিন্দাহ্ থাকবার চাইতে মওতকেই কামনা করছ, তাহলে ইজ্জতের সাথে মওতকে আমন্ত্রণ করবার জন্য আমি তোমাদের সাথে থাকতে পারতাম। জিল্লতের জিন্দেগী যাপনের জন্য আমি তোমাদের সাথী হতে রাজী নই। খোদা হাফিয!'

বিতর্কে হিস্যাদার লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাহির মঞ্চ থেকে নেমে আবদুল মালিক ও কয়েকজন নওজোয়ানের সাথে অন্ধকারে গায়েব হয়ে গেলেন।

আবদুল মালিক একদিন আগেই তাঁর বাচ্চাদেরকে বাগদাদ থেকে রওয়ানা করে দিয়েছেন। পনের বিশজন নওজোয়ানের আর একটি দল শহরের বাইরে এক জায়গায় তাদের ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। জলসা থেকে বেরিয়ে এসে আবদুল মালিক বললেন ঃ 'যদি যখমের জন্য তোমার সফর করতে তকলীফ হয়, তাহলে এখনও এমন কয়েকটি আশ্রয়স্থল রয়েছে, যেখানে হুকুমাতের সিপাহীরা পৌঁছতে পারবে না।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'বর্মের জন্য তীর বেশী কিছু করতে পারেনি। যখম এত মামুলী যে, আমি তা টেরও পাচ্ছি না। কিন্তু যাবার আগে বাগদাদে আমার আর একটি কর্তব্য শেষ করতে হবে। তার জন্য হয়ত আমাদের কয়েকটি নওজোয়ানদের সাহায্য প্রয়োজন হবে।'

ঃ 'কি কর্তব্য?'

ঃ 'মুহাল্লাব বিন দাউদের সাথে খানিকটা আলাপ।'

ঃ 'কিন্তু এ সময়ে উজিরে আজমের মহলে ঢোকা খুব সহজ হবে না।'

ঃ 'আমার একটি সহজ পথ জানা আছে।'

ঃ 'কত লোক দরকার হবে।'

ঃ 'খুব বেশী হলে দশজন।'

ঃ 'তাহলে চলো। কিন্তু যেখানে তুমি দশজনের প্রয়োজন বোধ করছো, আমি সেখানে পনেরো জন নিয়ে যাব।'

ঃ ' বহুত আচ্ছা, পনের জনই ঠিক, কিন্তু এ অভিযানে লোকের চাইতে বেশী দরকার হবে হুঁশিয়ারী।'

## -চব্বিশ-

উজিরে আজম মুহাল্লাব বিন দাউদের মহলের যে প্রশস্ত কামরাটি দরিয়ার কিনারের দিকে, সেখানে তিনি বসে আছেন। নায়িমে শহর, কয়েদখানার দারোগা ও বাগদাদের সেনাবাহিনীর সিপাহসালার কাশতমোর সে মাহ্ফিলে শরীক হয়েছেন। শরাব পানের সাথে সাথে বাগদাদের নয়া পরিস্থিতির আলোচনা চলছে।

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'আমার ধারণা, সে বেঁচে গেছে। সেদিনের মারাত্মক বিষ তার কিছু করতে পারলো না। মামুলী যখম তার কি করবে?'

নাযিমে শহর জবাব দিলেন ঃ 'না, আমি কোতোয়ালের কাছ থেকে সঠিক জেনে এসেছি, অতটুকু দূর থেকে কমসে কম চারটি তীর লাগার পর সে বেঁচে থাকতে পারে না। সেদিনকার বিষ সম্পর্কে আমার ধারণা, তার কাছে নিশ্চয়ই কোন প্রতিষেধক ছিল।'

ঃ 'কিন্তু লোকটি খুবই দূরদর্শী। সম্ভবত, বর্ম পরেই সে এসেছিল। কোতোয়াল তাকে পড়ে যেতে দেখেছে কি?'

ঃ ' আমার নির্দেশ ছিল, তার জলদী করে কিশ্‌তি নিয়ে অপর কিনারে পৌছে যাবে। তাই ফলাফল দেখাবার জন্য তারা ইন্তেজার করতে পারেনি।'

মুহাল্লাব বললেন ঃ 'সে আবার এ শান্তিপূর্ণ শহরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এখনও আমায় আর একবার তাতারীদের আশ্বস্ত করতে হবে এবং আমার ধারণা, তারা দাবী জানাবে যে, যারা এমনি করে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, তাদেরকে ধরে তাদের হাতে দেওয়া হোক।'

দারোগা বল্লেন ঃ 'তাছাড়া আমাদের সামনে আর কোন পথও নেই। তাহির মওকা পেলে আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবেই।'

নাযিমে শহর বললেন ঃ 'কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কোন দ্রুত ব্যবস্থা হলে আওয়াম আমাদের বিরুদ্ধে খুব বেশী করে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। আওয়ামের উৎসাহউদ্দীপনা দেখলে খলিফাও আমাদের কোন দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার এজাযত দেবেন না। আজ বক্তৃতা করতে গিয়ে সে বলেছে যে, সে বাগদাদ থেকে চলে যাচ্ছে। যদি সে সত্যি সত্যি চলে যায়, তাহলে ব্যাপারটা আপনাআপনি ঠাণ্ডা হয়ে আসবে। আর যদি সে এখানে থাকাবার চেষ্টাই করে, তাহলে ওলামার একটি বড় দলকে আমরা এর মধ্যেই তার বিরুদ্ধে দুশমনি করবার জন্য তৈরী করে রেখেছি। তাদের অনুসারীরা তাদের কার্যকলাপে বাধা দেবে। আজ তার বক্তৃতা ছিল অপ্রত্যাশিত, নইলে আমরা জলসায় গোলযোগ সৃষ্টি করবার জন্য লোক পাঠাতে পারতাম। পরবর্তী সময়ের জন্য আমি ব্যবস্থা করব, যাতে প্রত্যেক মসজিদে, প্রত্যেক চকে তাকে বাধা দেবার জন্য ওলামা মওজুদ থাকে। কাল পর্যন্ত তাদের মকসাদ বিদ্রোহমূলক বলে কমসে কম দেড়শ' ওলামার তরফ থেকে এক ফতোয়া প্রচার করা হবে।'

আচানক তাহির নাংগা তলোয়ার হাতে ভিতরে প্রবেশ করে বললেন ঃ 'তোমাদের মিথ্যা ফতোয়া প্রচার করবার প্রয়োজন হবে না।'

মুহাল্লাবের হাত থেকে শরাবের জাম পড়ে গেল। তাঁরা মূর্ছা যাবার উপক্রম হল। কাশতমোর জলদী করে উঠে তলোয়ারের হাতলের দিকে হাত বাড়ালেন, কিন্তু তাহির বিদ্যুদ্বেগে তাঁর তলোয়ার কাশমোরের সিনার উপর রেখে বললেন ঃ 'বসে পড়।'

কাশতমোর রাগে ঠোঁট কাটতে কাটতে বসে পড়লেন।

মুহাল্লাব সামলে নিতে নিতে বললেন ঃ 'তুমি কোন নিয়তে এসেছ এখানে?'

তাহির জওয়াব দিলেন ঃ 'তুমি বহুকাল আমার পিছনে লেগে রয়েছ। তাই আমি বাগদাদ ছেড়ে যাবার আগে তোমার সাথে কয়েকটা কথা বলা জরুরি মনে করলাম।'

ঃ 'তুমি কি জানো না যে, আমার আওয়াজ পেলে পঞ্চাশজন পাহারাদার এখানে এসে হাজির হবে?'

তাহির ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দিলেন ঃ 'পঞ্চাশ নয়, পঁয়তাল্লিশ। পাঁচ জন দরিয়ার কিনারে ঝিমাচ্ছিলো। তারা এখনও আমাদের হাতে। বাকী সবাইকে যদি তুমি আওয়াজ দাও, তাহলে তা হবে তোমার আখেরী আওয়াজ।'

আবদুল মালিকের সাথে আর পাঁচজন নওজোয়ান নাংগা তলোয়ার হাতে কামরার মধ্যে প্রবেশ করল।

তাহির বললেন ঃ 'ভিতরে বেশী লোকের দরকার নেই। বাইরের দিকে খেয়াল রেখ।'

আবদুল মালিকের ইশারায় দু'জন নওজোয়ান বাইরে বেরিয়ে গেল। বাকী তিনজন নাযিমে শহর, কাশতমোর ও দারোগার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল।

তাহির বললেন ঃ 'ওঠ!'

মুহাল্লাব ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন ঃ কি চাও তুমি?'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'আমি আগেই বলেছি, আমার কয়েকটা কথা বলবার আছে।'

ঃ 'আমি তোমার যে কোন দাবী মিটাতে রাজী। বল, কি চাও তুমি?'

ঃ 'শুধু এই চাই যে, তোমরা সবাই আমাদের সাথে চলো।'

ঃ "কোথায়?'

ঃ 'যেখানে আমরা নিয়ে যাই।'

ঃ 'যদি অস্বীকার করি, তাহলে?'

ঃ 'তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদের তলোয়ার কাজে লাগাতে হবে। এতে একবার হাত লাগিয়ে দেখে নাও।' বলে তাহির তাঁর তলোয়ারের অগ্রভাগ ধীরে তাঁর সিনার উপর রাখলেন।

ঃ 'না, না, আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আমার উপর রহম কর। আমি ওয়াদা করছি, বাগদাদ ছেড়ে আমি চলে যাব।'

ঃ 'তোমার ওয়াদার উপর আমার বিশ্বাস নেই। তাই আমি তোমাদেরকে আমাদের সাথে নিয়ে যেতে চাই।'

ঃ 'কোথায়?'

ঃ বাগদাদ থেকে দূরে এমন কোন জায়গায়, সেখান থেকে তোমরা আর ফিরে আসতে পারবে না।'

ঃ তুমি ওয়াদা কর যে, আমায় কতল করবে না।

তাহির বললেন ঃ 'আমি ওয়াদা করলে তুমি বিশ্বাস করবে?'

ঃ 'আমি জানি, তুমি ঝুটা ওয়াদা করতে পার না।'

ঃ 'আবদুল মালিক বললেন ঃ 'বাগদাদের বহস শুনে শুনে ওর বহস করবার অভ্যাস হয়ে গেছে। এর এলাজ আমার জানা আছে।'

তাহিরকে একদিকে সরিয়ে আবদুল মালিক তাঁর তলোয়ার মুহাল্লাবের গর্দানের উপরে রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন ঃ 'উঠবে, না...?'

মুহাল্লাব ঘাবড়ে গিয়ে বললেন ঃ 'খোদার দিকে চেয়ে আমার উপর রহম কর। আমি চলছি।'

আস্তে কথা বল। আবদুল মালিক শাসনের স্বরে বললেন।

কাশতমোর আর একবার তলোয়ারের হাতলের দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাহির দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তলোয়ারের অগ্রভাগ তাঁর পেটের উপর রেখে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথীরা তাঁর কোষ থেকে তলোয়ার বের করে নিলো।

কাশতমোর বললেন ঃ 'বাহাদুর কারো হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তার উপর হামলা করে না।'

তাহির বললেন' ঃ তুমি বিশ্বাস রেখ, তুমি তোমার তলোয়ারের শক্তি দেখাবার মওকাও পাবে।'

ঃ 'তুমি এ ওয়াদা করলে আমি তোমাদের সাথে চলতে রাজী।'

ঃ 'আমি ওয়াদা করছি এবং তোমায় আরও আশ্বাস দিচ্ছি যে, তোমার সাথে মোকাবিলা করতে আমাদের তরফ থেকেও কেবল একখানি তলোয়ারই উঠবে।'

কাশতমোর বললেন ঃ 'চল।'

তাহির নাযিমে শহর ও দারোগাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'ওঠো, তোমাদেরও প্রয়োজন রয়েছে।'

●

মুহাল্লাব ও তাঁর সাথীরা তাদের পাঁজরে তীক্ষ্ণ তলোয়ারের চাপ অনুভব করতে করতে কামরা থেকে বাইরে বেরুলেন। তাহিরের আট দশজন সাথী এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিল। এবার তারা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। দরিয়ার কিনারে দু'খানা কিশ্‌তি দাঁড়িয়ে ছিল। তাহিরের সাথীরা মুহাল্লাবের বেড়াবার কিশ্‌তিগুলো ততক্ষণে দরিয়ার মাঝখানে ঠেলে দিয়েছে। দরিয়ার কিনারে যে পাঁচজন পাহারাদার ঝিমুচ্ছিলো, তাদেরকে রসি দিয়ে বেঁধে একখানা কিশ্‌তির উপর ফেলে রাখা হয়েছে।

তাহির মুহাল্লাবকে কিশ্‌তিতে সওয়ার হতে ইশারা করলেন। মুহাল্লাব তাঁর ইশারার চাইতে বেশী করে আবদুল মালিকের তলোয়ারের ভয়ে বাধ্য হয়ে কিশ্‌তিতে সওয়ার হলেন। কাশতমোর, নাযিম ও দারোগা তাঁর অনুসরণ করলেন। তাহিরের আটজন সাথী সেই কিশ্‌তিতে সওয়ার হল। যে কিশ্‌তিতে পাহারাদারদের বেঁধে রাখা হয়েছিল, তাতে সওয়ার হল বাকী সাতজন।

খানিকক্ষণ পর কিশ্‌তি দু'খানা দরিয়ার মাঝখান দিয়ে পানির স্রোত ভেসে চলল। মুহাল্লাব কয়েকবার নেহায়েৎ বিনয় সহকারে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমরা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

আবদুল মালিক প্রত্যেকবারই জবাব দেন ঃ 'চিন্তা কর না। তোমাদের মঞ্জিল খুবই কাছে।'

লোকবসতি পূর্ণ কিনার থেকে অর্ধক্রোশ দূরে যাবার পর তাহির কিশতির ভিতর থেকে অনেকগুলো পাথরের একটা তুলে মুহাল্লাব ও তাঁর সাথীদেরকে দেখিয়ে বললেন ঃ 'তোমরা জানো, এ পাথরটা কি কাজে লাগবে?'

মুহাল্লাব ভীত কম্পিত স্বরে বললেন ঃ 'না, না, এ জুলুম। খোদার দিকে চেয়ে আমার উপর রহম কর।'

তাহির কাশতমোরের দিকে লক্ষ্য করে করলেনঃ 'বলুন তো, হযরত, আপনিই বলুন, দরিয়ার কিনারে পড়ে থাকা পাথরগুলো কি কাজে লাগবে, জিজ্ঞেস করাটা কি জুলুম হল?'

ঃ 'আমি এর মতলব বুঝতে পারিনি।'

আবদুল মালিক বললেনঃ 'এ মোটা বুদ্ধির লোক। এর কাছে এসব প্রশ্ন করে লাভ নেই।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাশতমোর বললেনঃ 'তোমরা আমার সাথে বাহাদুরের মত মোকাবিলা করবার ওয়াদা করেছিলে।'

তাহির বললেন ঃ 'আমার দীলে বাহাদুরীর জন্য ইজ্জত রয়েছে এবং আবদুল মালিক যাতে আপনার সাথে গোস্তাখী না করে বসে, তার জন্য আমি তাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। তার সাথে সাথে আমি এ আশাও করছি যে, আপনি বুজদীলদের সাহায্য করবেন না। আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। না, বরং আপনাকে কাজী মনে করে আপনার কাছেই আমার মোকদ্দমা পেশ করছি।'

কাশতমোর বললেন ঃ 'কিন্তু আমি এক সিপাহী মাত্র।'

ঃ 'আমার মোকদ্দমাও মোটেই জটিল নয়। একবার একটি লোক আমার কোমরে পাথর বেঁধে আমায় দরিয়ায় ফেলে দিয়েছিল। লোকটিকে হাতে পেলে আমি তাকে কি রকম শাস্তি দেব?'

কাশতমোর বললেন ঃ 'তাকে পাওয়া গেলে সেই একই আচরণ করতে পারে।'

তাহির বললেন ঃ 'বাহাদুর সিপাহীর কাছ থেকে এই জবাবই আমি আশা করেছিলাম। দারোগার কোমরের সাথে এ পাথরটা বেঁধে দাও তো!'

তাহিরের তিনজন সাথী দারোগাকে উপুড় করে শুইয়ে দিল। দারোগা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আবদুল মালিক তালোয়ারের ধারালো মুখ তাঁর গর্দানের উপর রেখে বললেনঃ 'খবরদার! বিন্দুমাত্র নড়লে আমি তোমায় যবেহ করে ফেলবো।'

দারোগার কোমরের সাথে যখন পাথর বাঁধা হচ্ছিল, মুহাল্লাব তখনও দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাহির বাম হাত দিয়ে তাঁর কানের উপর এক ঘুষি মারলে তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন কিশতির উপর। নাযিমে শহরও উঠবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাহিরের এক সাথী তাঁর গলায় রসি লাগিয়ে তাকে কিশতির ভিতরে চিৎ করে ফেলল।

খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর নাযিমে শহর ও মুহাল্লাবের পিঠেও পাথর বাঁধা হয়ে গেল।

মুহাল্লাব আবদুল মালিকের ধমকের পরোয়া না করে চিৎকার করে বলতে লাগলেনঃ 'আমার পাথরটা ওদের দুজনের চাইতে ভারী। ওরা আমার চাইতে সাতরাতে পারে ভাল। আল্লাহ্‌র দিকে চেয়ে আমায় ছেড়ে দাও। আমি তোমাদেরকে এক লাখ আশ্‌রফী দিতে রাজী।

তাহির বলে উঠলেনঃ 'প্রায় অর্ধেক ইসলামী দুনিয়ার ধ্বংসের বিনিময়ে এ অর্থ খুবই সামান্য।'

ঃ 'আমি তোমায় দু'লাখ দিচ্ছি। আমায় ছেড়ে দাও।'

তাহির বললেন ঃ কিন্তু এ অর্থ দিয়ে তো খারেযমের একটি বিরান শহরও আবার নতুন করে আবাদ করা যাবে না।'

ঃ 'আমি তোমায় পাঁচ লাখ দেব। এর বেশী আমার কাছে নেই।'

ঃ 'কিন্তু সম্ভবতঃ তোমার বাপ ছিলেন এক গরীব লোক। এত দৌলত তুমি কোত্থেকে জমা করলে? আমার মনে হয়, জান বাঁচাবার জন্য ঝুট বলছ তুমি।'

ঃ 'না, খোদার কসম, আমি ঝুট বলছি না। আমার কাছে পাঁচ লাখ আশ্‌রফী আর তার সমান মূল্যের জওয়াহের রয়েছে। আমায় ছেড়ে দাও। আমি আমার তামাম দৌলত তোমায় দেব।'

ঃ 'তার মানে, বাগদাদের লোকদের কাছ থেকে তুমি ঘুষ-রেশওয়াত জমা করেছ।'

ঃ 'না, খোদার কসম, ঘুস-রেশওয়াত আমি নিইনি।'

ঃ 'তাহলে এতটা দৌলত এল কোত্থেকে?'

ঃ 'এ আমি তাতারীদের কাছ থেকে হাসিল করেছিলাম।'

ঃ 'আমি যতটা জানি, তাতারীরা মাত্র একটি লোককে মাল-দৌলত দিয়ে ভরে দিয়েছিল-যে লোকটি খারেযমের উপরে হামলার সময়ে চেংগিস খানকে পৌছে দিয়েছিল খলিফার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, যে লোকটি ওয়াহিদুদ্দীনকে কয়েদ করে তাকে যহর পান করিয়েছিল, যে কতল করেছিল উজিরে আজমকে, আর যে লোকটি খলিফা মুসতানসিরের কাছে নিয়ে এসেছিল তাতারীদের দোস্তির পয়গাম।'

মুহাল্লাব বললেন ঃ আমার সকল অপরাধ আমি স্বীকার করছি। খোদার দিকে চেয়ে আমায় মাফ করে দাও। আমার জান নিয়ে তোমাদের কোন ফায়দা হবে না।'

তাহির বললেন ঃ 'আমি জানি, তোমার মওত হলেও বাগদাদের উপর নেমে আসবে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কালো ছায়া। বাগদাদে মুনাফেক ও গাদ্দারের সংখ্যা তোমার মাথার চুলের চাইতেও বেশী। কিন্তু বাগদাদের ধ্বংস এগিয়ে এনে তাতারীদের ইনাম হাসিল করবার লোক তুমি ছাড়া আরও কেউ রয়েছে হয়ত। তুমি তাতারীদের জন্য বাগদাদের দরজা খুলে দিয়েছ, কিন্তু তাদের তলোয়ারের ছায়ায় হুকুমাত চালাতে চায় যে গাদ্দার, সে হয়ত তোমার খান্দান থেকে না এসে অপর কোন খান্দান থেকে এসেছে।'

নাযিমে শহর বললেন ঃ 'তোমায় যহর দেওয়ার ও দরিয়ায় ফেলার ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমার কোন হাত ছিল না।'

তাহির বললেন ঃ 'তাহলে তুমি কি করে জানলে যে, আমার বিরুদ্ধে তেমনি একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল?'

ঃ ' দারোগা আমায় বলেছিল।'

দারোগা বললেন ঃ 'বুজ্‌দীল হয়ো না। আমাদেরকে ছেড়ে তোমার দীল এ দুনিয়ায় কি করে লাগাবে?'

তাহির বললেন ঃ 'তোমরাই এবার ফয়সালা করে নাও, তোমরা নিজেরা লাফ দিয়ে দরিয়ায় পড়বে, না আমরা তোমাদের হাত পা ধরে ছুড়ে ফেলব।'

দারোগা বললেন ঃ 'আমাদের জন্য তোমরা যদি কিছু করতে চাও, তাহলে তা এই হতে পারে যে, আমাদেরকে এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বার মওকা দেবে।'

তাহির বললেন ঃ 'আমি রাজী। শেষ সময়ে আমি তোমাদের সাথে জবরদস্তি করতে চাই না। আমি যে পাথরের বোঝা নিয়ে দরিয়া পার হয়েছিলাম, তার চাইতে ভারী পাথর এর মধ্যে একটাও নেই।'

নাযিম বললেন ঃ ' কিন্তু আমরা সাঁতার জানি না।'

ঃ 'তাহলে তোমাদেরকে জবরদস্তি করে ঠেলে ফেলার তকলীফ নিতে হবে আমাদেরকে। আবদুল মালিক! প্রথম মুহাল্লাবের পালা।'

দারোগা তাঁর সাথীদেরকে বললেনঃ 'একে একে আমাদেরকে পানিতে ঠেলে ফেললে তোমাদের ডুবে মরা নিশ্চিত। যদি এক সাতে লাফিড়ে পড়ো, তাহলে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবার ওয়াদা করছি। এ পাথর খুবই মামুলী। আমি এর চাইতে বড় বোঝা নিয়েও দরিয়া পার হতে পারি।'

তাহির আর তাঁর সাথীরা দারোগার কথা শুনে হয়রান হলেন, কেননা শরীরের দিকে দিয়ো দারোগা তাঁর সাথীদের তুলনায় জীর্ণশীর্ণ। তবু তাঁরা বিশ্বাস করছিলেন যে, এতটা বোঝা নিয়ে কেউ কিনারে যেতে পারবে না।

দারোগা বললেন ঃ 'তাহলে আমরা এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বার এজাযত পাচ্ছি?'

তাহির বললেন ঃ 'আমার কোন আপত্তি নেই।'

দারোগা উঠে কিশ্‌তির পাশে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আমি চললাম। আমার সাহায্যের প্রয়োজন থাকলে তোমরা আমার সাথে এস। নইলে আমি পিছু ফিরেও দেখব না।'

নাযিম আর মুহাল্লাব ঝট করে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দারোগা দু'বাহু প্রসারিত করে বললেন ঃ ' তোমাদের গর্দান আমার হাতের তলায় নিয়ে এস। আমি তোমাদেরকে তরঙ্গের বাইরে নিয়ে যাব। তারপর তোমাদের কিস্‌মত।'

ডুবন্ত মানুষের সামনে তৃণগুচ্ছের আশ্রয়! নাযিম ও মুহাল্লাব তাদের তকদীর দারোগার উপর সোপর্দ করে দিলেন।

আবদুল মালিক তাহিরের কানের কাছে বললেন ঃ 'লোকটা মোটেই সাঁতার জানে না। ও যখন ফৌজ ছিল, তখনও থেকে আমি ওকে জানি।'

তাহির ধীরে বললেন ঃ 'আমার জানা আছে। সাঁতার জানলে সে লোক এতটা বে-অকুফ হতে পারে না।

তিনজনই খানিকক্ষণ ইতস্তত ঃ করে কিশতির প্রান্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে তাহিরের সাথীরা তলোয়ার নিয়ে তাড়া করে তাদেরকে দরিয়ায় ঝাঁপা দিতে বাধ্য করল।'

ঃ 'আমায় ছাড়ো। তুমি সাঁতরাতে জানো না। মিথ্যাবাদী, ফেরেববায, দাগাবায, প্রতারক! ছাড়ো আমাদেরকে!'

মুহাল্লাব ও নাযিমে শহর পানির মধ্যে হাত পা মারতে মারতে চিৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু দারোগার চাতের চাপ শিথিল হলনা। দারেগা তখনও বলছেন ঃ 'আমরা.....জীবনে.....মরণে.....একে অপরের ...সাথী হবার.....শপথ করেছিলাম।'

তাঁরা কয়েকবার ডুবে ডুবে তারপর একবার ভেসে উঠে পানির মধ্যে গায়েব হয়ে গেলেন।

এতক্ষণ দু'টি নওজোয়ান ও কাশতমোরের মাথার উপর তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাশতমোর তাহির ও আবদুল মালিককে তাঁর দিকে মনোযোগ দিতে দেখে বললেন ঃ 'তোমরা আমায় এক সিপাহীর মত মরবার মওকা দেবে বলে ওয়াদা করেছিলে। এখনও তোমাদের ইরাদা কি?'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'আমরা তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ করব।'

ঃ 'তুমি আরও ওয়াদা করেছিলে যে, আমার মোকাবিলা কেবল একজনের সাথেই হবে।'

ঃ 'আমরা আমাদের ওয়াদায় কায়েম থাকব।'

মধ্যরাত্রে চাঁদ দেখা দিয়েছে। দু'খানি কিশ্‌তিই এসে কিনারে লাগল। তাহির সাথীদেরকে অপর কিশ্‌তির পাঁচজন কয়েদীকে পাহারা দিতে বললেন এবং বাকী সাথীরা তাঁর নির্দেশ মোতাবেক দরিয়ার কিনার ও পানির মাঝখানে এক বালুর টিবির উপর নেমে পড়লেন।

তারপর আবদুর মালিক ও তাহির কাশতমোরকে তলোয়ারের পাহারায় কিশ্‌তি থেকে নামিয়ে আনলেন। তাদের সাথীরা কাশতমোরের চারপাশে বৃত্তকারে দাঁড়িয়ে গেলে তাহির তাঁর ছিনিয়ে নেওয়া তালোয়ার ফিরিয়ে দিতে হুকুম দিলেন।

আবদুল মালিক তাহিরের কানের কাছে বললেন ঃ 'তীরের যখমের ফলে তোমার দেহের অনেকখানি রক্ত ক্ষয় হয়েছে। আমার ওর সাথে তলোয়ারের শক্তি পরীক্ষার এজাযত দাও।'

তাহির জবাব দিলেন ঃ 'সুফিয়ার শাহাদতের পর আমি এক শপথ করেছিলাম। আমি তা পূরণ করতে চাই। আমার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি বিলকুল ঠিকই আছি।'

আবদুল মালিক অনেক অনুনয় করলেন। তারা যখন চাপা গলায় পরস্পরকে বুঝাবার পরিবর্তে বেশ উঁচু গলায় তর্ক শুরু করেছেন, তখনও কাশতমোর বললেন : আমার সাথে মোকাবিলা করতে আমার সমান কোন লোকেরই সামনে আসা উচিত, দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের কেউ আমার সমান নও। তবু আমি তাহিরকেই পছন্দ করছি।'

তাহির আবদুল মালিককে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললেন : 'তৈরী হও।'

কাশতমোর তলোয়ার নেড়ে স্বস্তির স্বরে বললেন : 'আমি তৈরী।'

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে তলোয়ারের ঝংকার শোনা গেল। খানিকক্ষন দ্রুত হামলার পর কাশতমোর পরাজিত হয়ে পিছু হটতে লাগলেন।

তাহির বললেন :'পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য পিছু হটবার চেষ্টা কর না। আমি তোমায় বাহাদুরের মত লড়বার মওকা দেব বলে ওয়াদা করেছিলাম, পালাবার মওকা দেবার ওয়াদা করিনি।'

কাশতমোর বললেন : তা'হলে তোমার কাছে আমার শাস্তি মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নয়।'

তাহির বললেন : ' মৃত্যু সম্পর্কে তোমার নিশ্চত বিশ্বাস হয়েছে?'

: ' হ্যাঁ, আমি এখনও বুঝতে পারছি যে, তোমার জখম সম্পর্কে আমার অনুমান ঠিক হয়নি। আবদুল মালিকের পরিবর্তে তোমায় মোকাবিলার জন্য বাছাই করে নিয়ে আমি ভুল করেছি।'

: 'সে ভুলের প্রতিকার তুমি করতে পার।'

: 'তা' কি করে?'

: 'হাতিয়ার সমর্পণ করে।'

তাহিরকে খানিকটা অমনোযোগী দেখে আচানক কাশতমোর স্থান পরিবর্তন করে তাঁর উপর জোর হামলা চালালো। একবার তাঁর তলোয়ার হাওয়ায় শনশন আওয়াজ তুলে তাহিরের মাথার উপর দিয়ে গেল। তাহির নীচের দিকে ঝুঁকে গর্দান বাঁচিয়ে আচানক তাঁর উপর এক সোজা আঘাত হানলেন। কাশতমোর মুখ থুবড়ে যমিনের উপর পড়ে গেলেন। ততক্ষণে তাহিরের তলোয়ার তাঁর পেটের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গেছে।

তাহির ঝুঁকে তাঁর কাপড়ে তলোয়ার মুছে নিতে নিতে আবদুল মালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'লোকটা তওবা করলে আমি ওকে অবশ্যি ছেড়ে দিতাম। কিন্তু ও আমায় কথাবার্তায় ভুলিয়ে মনে করেছিল যে, আমি বেপরোয়া হয়ে গেছি।'

আবদুল মালিক বললেন : 'চলো এবার। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার মতে দু'খানি কিশ্‌তিই পানির দিকে ঠেলে দেওয়া যাক আর কয়েদীরাও ওখানেই থাক। ভোর পর্যন্ত কিশ্‌তি অনেক দূর চলে যাবে। যতক্ষণে কেউ কয়েদীদের খোঁজ নিয়ে তাদের কাহিনী শুনবে, ততক্ষণ আমরা চলে যাব বহুত দূর।'

তাহির প্রশ্ন করলেন ঃ 'তাদের ঘোড়া এখান থেকে কত দূরে?' আবদুল মালিক জবাব দিলেন ঃ ' প্রায় আধ ক্রোশ দূরে।'

●

আবুদল মালিকের নির্দেশে তাঁর কয়েকজন দোস্ত একদিন আগেই এসে পৌছে গেছেন সেই সরাইখানায়। খারেযম শাহেব দেড়শ সিপাহীকে তিনি রেখে গেছেন সেখানে। আবদুল মালিকের বিবি তাঁর দুটি বাচ্চাকে সাথে নিয়ে পৌছে গেছেন। একটি আট বছরের ছেলে, অপরটি পাঁচ বছরের মেয়ে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় তাহির ও আবদুল মালিক বিশজন সওয়ার সাথে নিয়ে সেখানে পৌছলেন। চতুর্থ দিন ভোর হতেই কাফেলা চলল হিন্দুস্তানের পথ ধরে।

কয়েকদিন পর যখন তাঁরা ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পথ চলছিলেন, তখনও তাহির এক উঁচু টিলার উপর উঠে ঘোড়া থামালেন, তারপর তিনি তাকিয়ে রইলেন উত্তরের উঁচু পাহাড়গুলোর দিকে। তাঁর কল্পনার চোখে তখনও ভেসে উঠেছে এক নদীর কিনারে একটি পাথরের স্তুপ যার তলায় সুফিয়া ঘুমিয়ে আছেন অনন্তকালের জন্য। আবদুল মালিক ঘোড়া থামিয়ে খানিকক্ষণ তাঁর ইন্‌তেজার করলেন এবং অবশেষে বললেন ঃ 'তাহির, কি ভাবছো তুমি?'

তাহির চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দু'টো তখনও অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। আবদুল মালিক বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ঃ 'চল, কাফেলা দূরে চলে গেছে।'

তাহির ঘোড়া হাঁকাতে গিয়ে বললেন ঃ ' আবদুল মালিক! আমি ভাবছি-বাগদাদ সম্পর্কে এতটা নিরাশ হয়ে আমরা ভুল করিনি তো?'

আবদুল মালিক জবাব দিলেন ঃ 'না, আমার মতে বাগদাদের বাসিন্দাদের সম্পর্কে এত বড় আশা করেই আমরা ভুল করেছিলাম।'

ঃ 'যে শহর সুফিয়ার মত মেয়েকে পয়দা করতে পারে, তা' যে চিরকালের জন্য খতম হয়ে যাবে, এও কি সম্ভব?'

ঃ 'যে শহরে মুহাল্লাবের মত হাজারো মানুষ মওজুদ রয়েছে, তাকে ধ্বংসের কবল থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না। যে শহরে আল্লাহ্‌র গযব নাজিল হওয়া নিশ্চিত, সুফিয়া সেখানকার মাটিতে দাফন হতেও রাযী হন নি।'

ঃ 'আবদুল মালিক! আমরা আমাদের কর্তব্য থেকে তো পালিয়ে যাচ্ছি না?'

ঃ 'না, কর্তব্য আমাদেরকে যেখান তেকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে আমরা সেখানেই যাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, হিন্দুস্তানে থেকে আমরা কওমের সঠিক খিদমত করতে পারব। সুলতান আলতামশের প্রয়োজন আছে আমাদের তলোয়ারের। বাগদাদে আমরা আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করেছি। যারা আত্মহত্যার ইরাদা করে বসেছে, তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না। অতীতে যে কওম তুফানে ডুবে মরবার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল, হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালামের মত পয়গাম্বরও তাকে বাঁচাতে পারেন নি। আমরা কোন ছার! আমরা বাগদাদের লোকদেরকে তাদের পথের ভয়াবহ গর্ত দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা যাচ্ছে চোখ বন্ধ করে চলতে। এর ভিতরে আমাদের কসুর কোথায়? খারেযমের শহরগুলো এক এক করে তাদেরই চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু কুদরতের তরফ থেকে বার-

ংবার হুশিয়ারী সত্ত্বেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি। বাগদাদের বাসিন্দারা পতনের শেষ স্তরে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে তাদেরকে জাগিয়ে তোলা মানুষের সাধ্যাতীত। যে বস্তির প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন গাদ্দার, তাকে ধ্বংসের হাতে থেকে বাঁচাবে?- একটি কওমের ধ্বংসের জন্য মুহাল্লাবের মত একটি লোকই যথেষ্ট, আর বাগদাদে মওজুদ রয়েছে হাজারো মুহাল্লাব।'

তাহির বললেন ঃ 'বাগদাদের ধ্বংসের আয়োজন মুস্তাসিমের তখতনশীনীল সাথে সাথেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আমি শুনেছি, শরাব, মেয়েদের নাচ ও গান ছাড়া আর কিছুর উপর আকর্ষণ নেই তাঁর। আমার মতে এই ধরণের লোককে খলিফাতুল মুসলেমিন আখ্যা দেওয়াই বাগদাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। তিনি যাকে তাকে উজির বানাবেন, তিনি নিশ্চয়ই মুহাল্লাবের চাইতেও বড় মুনাফেক ও ধূর্ত হবেন।'

তাহির ও আবদুল মালিক সুলতান আলতামশের শ্রেষ্ঠ সালারদের মধ্যে গণ্য হলেন। জালালউদ্দীন খারেযম শাহ সম্পর্কে কেউ কোন খবর জানতে পেল না। তাতারীরা তার সন্ধানে আযরবাইজান, কুফাকায ও আর্মেনিয়ার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াল।

●

তাদের তরফ থেকে বারংবার তাঁর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হল, কিন্তু দুনিয়া তা' মেনে নিতে রাজী হল না। সময় অতীত হতে লাগল। তাহির ইজ্জত ও খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছলেন। দুনিয়ার সব রকম নিয়ামত আল্লাহ্ তাঁকে দিলেন। সুরাইয়ার প্রেম-প্রীতি তাঁর গৃহকে করে তুললো জান্নাতের সমতুল্য। বার্ধক্যে তাঁর তিনপুত্র তলোয়ার চালনা ও অদ্যবধি অস্ত্রবিদ্যায় খ্যাতি অর্জন করলেন। সুরাইয়ার ভাই ইসমাইল মশহুর হলেন তেজারতের ময়দানে। তাহিরের পাশেই আবদুল মালিকের বাসভবন, আর তাঁর পুত্রও ফৌজের উচ্চপদ দখল করেছেন। মোবারক ও তাহিরের আর সব সাথী নিরুদ্বেগ জিন্দেগী যাপন করছেন।

তাহিরের জিন্দেগী ছিল দিল্লীর হাজারো মানুষের কাছে কামনার বস্তু। কিন্তু তাহিরের দীলের মধ্যে একটি কাঁটা যেন অবিরাম বিঁধছিল। অতীতের বিস্মৃতি বাগদাদকে আড়াল করতে পারেনি তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে।

দিল্লীতে পনের বছর ফৌজী ও রাজনৈতিক তৎপরতার পর বাকী জিন্দেগী তিনি ওয়াক্‌ফ করে দিলেন ইসলামের তবলীগে। প্রত্যেক ময়দানেই আবদুল মালিক ছিলেন তাঁর সাথী। হিন্দুস্তানের অমুসলমান জনগণকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে তাঁর ভিতর এল এক আত্মিক প্রশান্তি। কিন্তু কখনও কোন মজলিসে অথবা জনসমাবেশে বক্তৃতা করতে করতে তার মনে পড়তো বাগদাদের স্মৃতি, তখনও তিনি জলদী করে বক্তৃতা খতম করে দিয়ে চলে যেতেন কোন জনহীন জায়গায় এবং ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে বসে ভাবতেন। বারবার তাঁর মন বলতঃ ' আহা! আমি যদি শহরটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম! নিজেকে তিনি ধিক্কার দিতেন। আবদুল মালিক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন ঃ তোমারই কারণে হিন্দুস্তানে হাজার হাজার মানুষ কলেমা পড়ছে। এখনওও কোটি কোটি মানুষের কানে পৌছে দিতে হবে খোদার পয়গাম। এখনও বাগদাদের চিন্তা করে কোন ফায়দা নেই। বাগদাদের অনুর্বর জমিনে তুমি নেকীর বীজ থেকে গাছ জন্মাতে পারনি। হিন্দুস্তানের উর্বর জমিন। আমাদের মেহনতের ফল আমরা পাচ্ছি এখানে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ।' ঃ তাহির এই কথা বলে আবার শুরু করে দিতেন নিজের কাজ।

●

আটাশ বছর কেটে গেল। আটাশ বছরে জামানার কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। চেংগিস খানের পৌত্র হালাকু খান হয়েছেন ইরানের শাসক আর বাগদাদে মুস্তাসিমের খিলাফতে তৃতীয় বছর এসে গেছে।

তাতারী বাগদাদের উপর হামলা করবার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। খলিফার উজির ইবনুল আলকেমী হালাকু খানের সাথে চক্রান্ত করে খলিফাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, এলম ও আধ্যাত্মিক গৌরবের কেন্দ্রভূমি বাগদাদে তিন লক্ষ ফৌজ পুষবার কোন প্রয়োজন নেই। খলিফার মালখানার উপর এ হচ্ছে এক অনাবশ্যক বোঝা। তাই বাগদাদের মাত্র কয়েক হাজার সিপাহী ছাড়া বাকী ফৌজকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। আর এক দিকে কওমের বোযর্গ ও এলামায়ে দ্বীন তাঁদের বিতর্কের মজলিস খতম হবার নাম নেই। শিয়া-সুন্নীর বহস গ্রহণ করেছে গৃহযুদ্ধের রূপ!

শহরের ওমরাহের মধ্যে হুকুমাতের বেতনভোগীদের তুলনায় তাতারীদের কাছ থেকে আত্মা ও কওমের ইজ্জতের মূল্য উসুল করা লোকের সংখ্যাই বেশী। খলিফার হাতে শরাবের জাম এবং মসনদের সামনে নর্তকীর নূপুর-নিক্কন অবিরাম চলছে। কাসেদ এসে খবর দিল যে, হালাকু খান এসে পৌঁছে গেছে বাগদাদের নিকটে। শরাবের জাম হাত থেকে পড়ে খলিফার সফেদ লেবাস চিহ্নিত হয়ে গেল।

ঝড়ের তাণ্ডব নিয়ে নাযিল হলেন হালাকু খান এবং বাগদাদের উপর দিয়ে বয়ে চলল উদ্দাম ধ্বংসলীলা। তার সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গেল বাবেল ও নিনোয়ার ধ্বংসতাণ্ডব।

বিশ লাখের মধ্যে মাত্র চার লাখ মানুষ পালাল প্রাণ নিয়ে। দজলার পানি রক্তরঞ্জিন হয়ে গেল। কুতুবখানা, মাদ্রাসা ও বাড়ি-ঘর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা সহস্র জিহ্বা মেলে উঠল আসমানের দিকে। বছরের পর বছর ধরে তারা বিতর্ক করে একে অপরকে কাফির বানাতে ব্যস্ত রয়েছে, যে ওমরাহ্ ও ওলামা বহু বছরের গাদ্দারীর আখেরী ইনাম হাসিল করতে চেয়েছেন এবং যে খলিফা মসনদ দখল করে বসে আল্লাহ্র দ্বীনকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন, তাঁরা সবাই বহু দামী তোহফা নিয়ে হাজির হলেন হালাকু খানের খিদমতে, কিন্তু জিন্দাহ ফিরে আসা কার ভাগ্যে জুটল না।

খিলাফতে আব্বাসিয়ার শেষ বংশধরকে সহজভাবে হত্যা না করে তুলায় জড়িয়ে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হল। যখন হালাকু খানের সন্দেহ হল যে, আরও বহু লোক জমিনের নীচে আশ্রয় নিয়ে তাঁর তলোয়ার ও আগুন থেকে বেঁচে গেছে, তখনও তিনি দরিয়ার বাঁধ ভেঙে দিলেন। হালাকু খানের ফিরে যাবার পর বাগদাদের চিল শকুন ও কুকুর ছাড়া আর কোন প্রাণী রইল না। -বাগদাদ পরিণত হল পুরাকাহিনীতে- বাগদাদের বাসিন্দারা যে বীজ বপন করেছিল, তারই ফল পেল তারা।

**সমাপ্ত**